নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

# সরস গল্প

নতুন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-২০

প্রকাশক
সুশীলকুমার সিংহ
নতুন সাহিত্য ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলিকাতা-২০
মুদ্রাকর
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯
অঙ্গসজ্জা
অহিভূষণ মল্লিক

• •

R.L
৮৯১.৪৪৩০৩

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬৬
দাম আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

“ডমরুধর”-এর স্রষ্টা
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে

# সম্পাদকের কথা

## এক

"To laugh at fate through life's short span
Is the prerogative of man."

ষোড়শ শতাব্দীতে হাসির এই সুমহান্ ভূমিকার কথা বলেছিলেন র‍্যাব্‌লে। হাসি মানুষের মানসিক ব্যাধিকে দূর করে—দুর্ভাগ্যকে জয় করে উপরে ওঠবার শক্তি দেয়, এনে দেয় বুকভরা স্বাস্থ্য। যে হাসতে জানে না, সে বাঁচতেও জানে না। কোনো ব্যক্তি মানুষ সম্বন্ধে এ যেমন সত্য, কোনো জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি সত্য।

র‍্যাব্‌লে যে হাসির কথা বলেছেন তা হল বেপরোয়া উদ্দাম অট্টহাসি। তার জন্যে চাই মোহমুক্তি, জীবন সম্পর্কে, জগৎ সম্বন্ধে একটা দার্শনিক বিচ্ছিন্নতার মনোভাব। উপমা দিয়ে বলা যাক, একটা ঘরের মধ্যে বসে আছি আর জানলার কাচের ভেতর দিয়ে দেখছি বাইরের মানুষগুলোকে। কাচটার বিশেষত্ব আছে ; তার ভেতর দিয়ে যা দেখছি কিছুই স্বাভাবিক নয়, সব কেমন আঁকাবাঁকা, ভাঙাচুরো, উল্‌টো-পাল্‌টা—সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না সব কিছু এক বিচিত্র প্রহসন ; নিজেকেও সেই প্রহসন থেকে বাদ দিচ্ছি না। জানলার বাইরে থেকে যারা আমাকে দেখছে—তারা হয়তো দেখতে পাচ্ছে আমি শূন্যে পা দিয়ে ঝুলে আছি, আমার কপালের উপর দুটো কান গজিয়েছে।

সব অস্বাভাবিক, সব হাস্যকর—নিজের অস্তিত্বটাও সেই শোভাযাত্রায় পা ফেলেছে। দুঃখ মিথ্যে, দুর্ভাবনা অবান্তর। কালের প্রচণ্ড ছুটন্ত স্রোতে ফুটন্ত ফেনার হাসির মতো ধেয়ে যাক জীবন ; দুঃখ-দুর্বিপাক যদি কখনো এক-আধটু বিপর্যয় ঘটিয়েই বসে, তা হলে এই বলে সান্ত্বনা দাও নিজেকে :

"Life is quite an unpleasant business but it is not so very hard to make it wonderful……when your matches suddenly go off in your pocket rejoice and offer thanks to heaven that your pocket is not a gun-powder magazine. When your relations come to pay you a visit during your holiday in the country, don't get pale but exclaim triumphantly, How very lucky it's not the police...If you are flogged with a birch rod, kick your legs in rapture and exclaim, How very happy I am that I am not being flogged by nettles !"

জীবন যে অতি মনোহর, এইটি প্রমাণ করবার জন্যে কথাগুলি লিখেছিলেন তরুণ আন্তন চেকভ। র‍্যাব্‌লের হাসিতত্ত্বের মর্মটি এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে। সংসার যেমন ভাবে আছে—তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করো ; যতটুকু পেয়েছ তার চাইতে বেশি পাওয়ার কোনো দরকার নেই—এর চাইতে অনেক কমও তো তুমি পেতে পারতে ; লটারির টিকেট কিনো না—তা হলেই আর না-পাওয়ার মনঃক্ষোভের কারণ থাকবে না। আর এই মানসিক প্রশান্তিতে পৌঁছে—অট্টহাসিতে সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি ভয়-ভাবনার অবসান ঘটাও। মানুষকে এই নির্বিকার হাসির মন্ত্রই দিয়েছেন র‍্যাব্‌লে—এরই দার্শনিক নাম 'পাঁতাগ্রুয়েলিজম্'।

কিন্তু এ হাসির অধিকার সকলের জন্যে নয়। সবাই এমনভাবে আঘাতকে তুচ্ছ করতে পারে না, এমন করে ক্ষতি-দুঃখ-পরাজয়ের গ্লানিকে ভুলতে পারে না ; ব্যক্তিগত, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক ব্যথা-ব্যর্থতা-অপমান তাদের ক্ষত-বিক্ষত করে। আর তাদেরই কেউ কেউ ক্রোধ-কান্না-অভিশাপকে এক অদ্ভুত হাসিতে রূপান্তরিত করে দেয়। সে হাসি আমাদের আচম্‌কা চাবুক মারে—রক্তের মধ্যে জ্বালা ধরায়, সে হাসিতে লুকিয়ে থাকে সাপের বিষ। সে হাসি হেসেছেন জোনাথান সুইফ্‌ট্‌, চার্লস ল্যাম, কমলাকান্তের দপ্তরের বঙ্কিমচন্দ্র।

আয়ার্ল্যাণ্ডের শোষণ ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমতা নিয়ে—শোষক সমাজের প্রতি অসহ্য ঘৃণায়, এই হাসির ভয়ালতম নমুনা রেখে গেছেন সুইফ্‌ট্‌ :

"A child will make two dishes at an entertainment of friends ; and when the family dines alone, the fore or hind quarter will make a reasonable dish, and seasoned with a little pepper or salt will be very good boiled on the fourth day, especially in winter.

...I grant this food will be somewhat dear, and therefore very proper for landlords, who, as they have already devoured most of the parents, seem to have the best title for the children !"

সমালোচকেরা বলেছেন—সুইফ্টের এই রচনা বেরিয়ে এসেছে পৈশাচিকতা থেকে, এর চাইতে বীভৎস অমানুষিক হাসি আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ হাসেনি। কিন্তু সেদিনের আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন - লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত অত্যাচারিত মানুষের প্রাণের জ্বালা ফোটাতে গিয়ে এভাবে ছাড়া সুইফ্ট্ হাসতে পারেননি। চার্লস ল্যামের ব্যক্তিজীবনের সমস্ত নৈরাশ্য আর ব্যর্থতাবোধও এমনিভাবে হাসির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে—'কমলাকান্তের দপ্তরে'ও হাসির আবরণের তলায় টলটল করছে কান্নার মুক্তো।

এ-ছাড়া আর একটি হাসি আছে।

সে হাসিতে দর্শন নেই—কোনো ব্যক্তিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণাকেও তা বহন করছে না। তা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে জলের উপর সূর্যের আলোর মতো চিকচিক করে জ্বলে। জীবনের ছন্দে কোথাও একটু পতন ঘটলেই সঙ্গতিবোধে আঘাত লাগে—তখনই এই হাসি উছলে ওঠে; কথার ভুল, চোখের ভুল, মনের ভুল, যে-কোনো আতিশয্য—এরা সবাই-ই এই হাসির উপকরণ। বাতিকগ্রস্তকে চটিয়ে দিয়ে এ হাসি উৎসারিত হয়—এ হাসি থাকে মোটা মানুষের পা পিছলে পড়ার ভেতর—এ হাসি আসে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে, এর আবির্ভাব ঘটে সম্পূর্ণ দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়াতে। প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে অক্সিজেন টেনে নেওয়ার মতো এই হাসিই আমাদের স্বাস্থ্য আনে --ক্লান্তিকর দিনযাত্রাকে বৈচিত্র্যে ভরিয়ে তোলে—পরম দুঃখের মুহূর্তেও এ হাসি মনে করিয়ে দেয়ঃ সব কিছুই শূন্য হয়ে যায়নি সংসার থেকে—'এখনো অনেক রয়েছে বাকি।' কখনো এ রঙ্গে উতরোল -- কখনো বা চতুর কৌতুকে দীপ্ত। রাম-শ্যাম-যদু, টম-ডিক-হ্যারী চেতন অচেতনভাবে এ হাসিকে মুহূর্তে মুহূর্তে সৃষ্টি করে চলে।

নতুন ছাত্র হ্যারীকে ক্লাস-টিচার প্রশ্ন করেন: তোমার নাম কী?

উত্তর আসে: হ্যারী রবিন্‌সন।

ক্লাস-টিচার ভ্রূকুটি করেন: শিক্ষককে কিছু বলতে হলে তার সঙ্গে স্যার বলতে হয়। এইবার ঠিক করে বলো, তোমার নাম কী?

জবাব আসে: স্যার হ্যারী রবিন্‌সন।

এইবারে ক্লাস-টিচারের নিঃশব্দ হওয়ার পালা।

## দুই

আমাদের বাংলা সাহিত্যে র‍্যাব্‌লেপন্থী হাসির সন্ধান মেলে না—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘হাসির গানে’ তার অল্প স্বল্প আভাস হয়তো আছে। সুকুমার রায় যখন ‘এই দুনিয়ার সকল ভালো’ দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত ‘পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়ে’ পরম প্রাপ্যটি দেখতে পান—তখন এর একটি চকিত-চমক আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু দর্শনে চার্বাক থাকলেও এ হাসি আমাদের জীবনে নেই; অন্তত বাঙালী লেখকদের কলমে এ বস্তু কখনো ফুটে ওঠেনি।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ব্যক্তি কৌতুক এবং সমাজ কৌতুক পার হয়ে আমরা যখন রামমোহন রায়ের ঘাটে এসে পৌঁছোই—তখন বাংলাদেশে পশ্চিমী রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির অভ্যুদয়। রামমোহন সেই সন্ধিকালে দাঁড়িয়ে পুর্ব-পশ্চিমের মধ্যে সেতু রচনার চেষ্টা করছেন। আকাশে বাতাসে তখনো ভারতচন্দ্রের হাসি কলঝংকৃত, কবিগানের ক্ষীণ রেশ তখনো শোনা যায়, দাশরথির কৌতুক তখনো জীবন্ত। কিন্তু রামমোহনের কাল নতুনতর কৌতুকের জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল।

একদিকে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলতা, অন্যদিকে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে অত্যুৎসাহী মিশনরীর দল—এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষের মধ্য দিয়ে মুক্তবুদ্ধি রামমোহনকে পথ কাটতে হয়েছে। ফলে তাঁর সমস্ত জীবনটাই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। আলোচনায় ও বিচারে স্বভাবত গম্ভীরবেদী রামমোহন কখনো কখনো প্রতিপক্ষের উদ্দেশে শ্লেষের বাণ বর্ষণ করেছেন। তাঁর “এক খ্রীষ্টিয়ান পাদ্‌রী ও তাঁহার তিনজন চীনদেশস্থ শিষ্য, ইঁহাদের পরস্পর কথোপকথন” থেকে কিছু অংশ আমরা স্মরণ করতে পারি। পাদ্‌রি যথোচিত খ্রীষ্টধর্মের উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর তিনটি চৈনিক শিষ্য সমস্ত ব্যাপারটাই গুলিয়ে ফেলেছে। সব চাইতে মারাত্মক কথা বলেছে তৃতীয় শিষ্য, সে জানিয়েছে ঈশ্বর নেই।

“পাদ্‌রী ॥ ঈশ্বর নাই, যাহা উত্তর করিয়াছ, তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

তৃতীয় শিষ্য ॥ এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিলেন যে, দেখ, এই এক বস্তু বর্ত্তমান আছে, ইহাকে স্থানান্তর করিলে, এ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবেক্‌।

পাদ্‌রী ॥ এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এস্থলে সঙ্গত হইতে পারে।

তৃতীয় শিষ্য ॥ আপনারা পশ্চিম দেশীয় বুদ্ধিমান লোক, আমারদিগের ন্যায় নহে, আপনকারদিগের দুরূহ কথা আমারদিগের বোধগম্য হয় না। কারণ

পুনঃপুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না, এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল, আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি ?

পাদ্‌রী ॥ আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমারদিগের অপরাধ মার্জনার জন্যে প্রার্থনা করিব। কারণ তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্মকে স্বীকার করিলে না। অতএব তোমারদের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল।

সকল শিষ্য ॥ এ অতি আশ্চর্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না এমত ধর্ম মহাশয় উপদেশ করেন, পরে কহেন যে, তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে, যেহেতু বুঝিতে পারিলে না। ইতি।”

রামমোহনের এই কৌতুক তীক্ষ্ণ এবং লক্ষ্যভেদী হলেও—এর রুচি মার্জিত, এতে বিদগ্ধ রসিক মনের অভিব্যক্তি। কিন্তু এর পর থেকে বাংলা সাহিত্যে যেন পঙ্ক মন্থনের পালা এল। এবং তা শুরু হল প্রাচীন পন্থা আর নতুন চিন্তাধারার মধ্যে।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন এনিমি নাম্বার ওয়ান। কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে কৃষ্ণমোহন কেবল ক্রীশ্চানই হয়েছেন তা-ই নয়, তাঁর প্রভাবে দেশের ছেলেরা ধর্মকর্ম বিসর্জন দিচ্ছে, খাদ্যাখাদ্য মানছে না—বিলিতি আচার-আচরণ গ্রহণ করছে এবং ক্রীশ্চান হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে তাঁর উপর আরম্ভ হল প্রচণ্ড আক্রমণ। “ব্যানরজি ভায়া” জাতীয় রচনায় হিন্দু সমাজের ক্রোধ ফেটে পড়ল।

কেবল ‘কেষ্টা ব্যাণ্ডো’ কেন ? স্বধর্মে বিধর্মী রামমোহন রয়েছেন , রয়েছেন ডিরোজিয়ো—‘সমাচার চন্দ্রিকা’ সক্রোধে যাঁকে বলেছিল “ড্রুজো নামে অসুর”। আর এইসব প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হচ্ছে নব্য সম্প্রদায়—যার নাম “ইয়ং বেঙ্গল”। অন্যদিকে কলকাতা তখন হঠাৎ জেগে উঠেছে, তৈরি হচ্ছে নব্য ধনিক সম্প্রদায়—বাঈজী-বুল্‌বুলির লড়াই—খেউড় গানের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে এক বেপরোয়া বাবুয়ানির স্রোত। এদের উপরেও আক্রমণ আসতে দেরি হল না। আক্রমণকারীদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন তৎকালীন ‘ধর্মসভার’ এবং ‘সমাচার চন্দ্রিকা’র খ্যাতনামা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণের

'বাবু উপাখ্যান', 'কলিকাতা কমলালয়', 'নব বাবু বিলাস' এবং 'নব বিবি বিলাস' এই আক্রমণের কতগুলি রূপ। এতে যেমন ইয়ং বেঙ্গলদের কঠোর সমালোচনা—তেমনি নব্য ধনিকতন্ত্রের কুরুচি, সামাজিক বিকৃতি এবং অন্যান্য দোষত্রুটির নির্মম নিন্দাবাদ। ভবানীচরণের সদিচ্ছা অবশ্যই ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। তাই বিকৃতির সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি নিজেই বিকৃত হয়ে উঠেছেন এবং 'নব বিবি বিলাসের' পাতা ওল্টালেই বোঝা যাবে ক্রোধপরবশ ভবানীচরণের কতখানি অধঃপতন ঘটেছিল, যে সুরুচির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান—সেই কুরুচিই তাঁকে কতখানি পেয়ে বসেছিল।

কিন্তু ভবানীচরণের হাতে এই যুগে কৌতুক সাহিত্যের দ্বার মুক্ত হল। নতুনের আতিশয্য, ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে অনেক সময় মাত্রাহীনতার অভাব এবং নতুনকালের সন্ধিলগ্নে বিমূঢ়চিত্ততা থেকে যেমন প্রাচীনপন্থীরা কৌতুকের উপকরণ খুঁজে পেলেন, তেমনি নতুনরাও প্রত্যুত্তরের চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' নতুন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নীতিশিক্ষা প্রচারের সঙ্গে প্রাচীন পন্থার প্রতি সকৌতুক প্রতিবাদ রূপে উপস্থিত হল।

ইংরেজি শিক্ষিত মধুসূদন খানিকটা অদলীয় নিরপেক্ষ জগতে বাস করেছিলেন। তিনি কোনো পক্ষকেই ক্ষমা করলেন না। তাঁর দুখানি উৎকৃষ্ট প্রহসনে তিনি দুই দলেরই সমালোচনা করলেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় যেমন তিনি মদ্যপান-বিলাসী নব্যবাবু সম্প্রদায়ের বিশ্লেষণ করলেন—অন্যদিকে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে প্রাচীন ভক্তপ্রসাদবাবুরাও বাদ পড়লেন না। আসলে তখন দু-দিক থেকেই আতিশয্যের রূপটা চক্ষুষ্মানদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল; মাইকেলের প্রহসনে আমরা সেই দৃষ্টিরই আলোকসম্পাত দেখতে পাই।

এর মধ্যে বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব ঘটেছে।

আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বর গুপ্ত রক্ষণশীল, "হুট করে বুট পায়ে যারা চুরুট ফুঁকে স্বর্গে" যেতে চায়, কিংবা টেবিলে গাঁদা ফুল সাজিয়ে যারা "ইষুভাবে খানা খায়",—অথবা যে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের প্রবক্তা, এইসব প্রতিপক্ষের উপর তাঁর ব্যঙ্গ প্রবলভাবে বর্ষিত হলেও—তিনিও মূলত যুক্তিবাদী এবং বাস্তব চেতনা-সম্পন্ন মানুষ। প্রাচীন পন্থার প্রতি তাঁরও বিশেষ কোনো মোহ ছিল না। যা তাঁর কাছে অসঙ্গত, অস্বাভাবিক এবং কৌতুককর মনে হয়েছে—তাকেই তিনি ব্যঙ্গের ও বিদ্রূপের আঘাত দিয়েছেন।

যথোচিত শিক্ষা ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না—কালের পাঠশালায় তিনি পাঠ

নিয়েছিলেন। সেই সংক্ষুব্ধ সময়ের তরঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মন যতটা ইতস্তত আন্দোলিত হয়েছে, সে-পরিমাণে কোনো নির্দিষ্ট স্রোত পায়নি। তাই ঈশ্বর গুপ্ত প্রগতিশীল না রক্ষণশীল এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। তাঁর সাহিত্যের নৌকো ঢেউয়ের মুখেই দোলা খেয়েছে—কোনো অনুকূল বায়ুতে পাল তুলে নির্দিষ্ট তটরেখার দিকে অগ্রসর হতে পারেনি।

তা ছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত মূলত ছিলেন সাংবাদিক। জনরঞ্জনের দিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সুতরাং তাঁর পাঠকদের খুশি করার কাজেই নিজের শক্তিকে তিনি নিয়োগ করেছেন। বিদ্যাসাগর, চুনোগলির ফিরিঙ্গি, ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য কিংবা ঝাঁসীর রানী সকলেই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন। পাঠকদের করতালিতেই তিনি তৃপ্ত– জনপ্রিয় সাংবাদিকতার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিমতের সঠিক পরিচয় মেলে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে আরও একটি জিনিস বিকশিত হয়ে উঠেছিল—সে হল অস্ফুট স্বাদেশিকতার চেতনা। ইংরেজ সরকার এবং বিদেশী রাজতন্ত্রের প্রতি কিছু কিছু মৃদু-কঠোর ব্যঙ্গ তাঁর কৌতুকে অন্যতর স্বাদ এনেছিল। “আমরা ভূষি পেলেই খুশি হব, ঘুষি খেলে বাঁচবো না—” এর মধ্যে যে জ্বালা ছিল—তা ভবিষ্যৎ ব্যঙ্গ সাহিত্যের আর একটি সম্ভাবনাকে সূচিত করে দিয়েছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যরূপে দেখা দিলেন দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র। গুরুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সব ক-টি দিকই দীনবন্ধুর মধ্যে প্রতিফলিত হল। নব্য সম্প্রদায়ের মানস-বিকৃতির একটি রূপ এল “সধবার একাদশী”তে, আবার প্রাচীন কৌলীন্য প্রথার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ পড়ল “জামাই বারিকে”। নাটুকে রামনারায়ণের “কুলীন কুলসর্বস্ব” কৌলীন্যের উপর যে আঘাত হেনেছিল– দীনবন্ধু সেই আঘাতকে উচ্ছ্বসিত কৌতুকে আরো মর্মঘাতী করে তুললেন। তাঁর গম্ভীর নাটক “নীলদর্পণ”ও রঙ্গে-কৌতুকে উদ্ভাসিত—ঈশ্বর গুপ্তের স্বাদেশিক চেতনা এবং বৈদেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি এই নাটকে উচ্চারিত হল।

আর অনন্য ব্যক্তিত্ব হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সার্থক কথাশিল্পীর হাতে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-রসিকতা পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করল। বঙ্কিমের মানসলোক তখন নানা আলোড়ন-বিলোড়নে সমুত্তাল। অন্যতম প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিনব মন নিয়ে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ এবং ‘ধর্মতত্ত্ব’ রচনা করেছিলেন, হিন্দুধর্মকে তিনি যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমি দিতে চেয়েছিলেন, প্রাচীন হিন্দু সমাজের পক্ষে তা গ্রহণ

করা সম্ভব ছিল না ; অপর দিকে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ এবং ইওরোপীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গেও তাঁকে মসীযুদ্ধ করতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুসমাজের সংস্কার চেয়েছিলেন, কিন্তু বিধবা বিবাহের সমর্থন করবার মতো মানসিক প্রবণতা তাঁর ছিল না। বঙ্কিমের দেশপ্রেমে খাদ ছিল না—কিন্তু সরকারী চাকরি এবং ইংরেজের রক্তচক্ষু সেই দেশাত্মবোধের পরিপুর্ণ প্রকাশ ঘটতে দেয়নি। ইতিহাস পাঠে বঙ্কিম বাঙালীর এক মহিমোজ্জ্বল অতীতের সন্ধান পেয়েছিলেন—কিন্তু তাঁর সমকালে যে চাকুরিপ্রাণ ভীরু মধ্যবিত্তের দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন—তা তাঁকে বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল।

বঙ্কিমের কৌতুক এই বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতেই উপজাত। কৌতুকের আড়ালে জ্বালা—হাসির আড়ালে চোখের জল। ‘লোক রহস্য’, ‘মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত’ এবং সর্বোপরি ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ বঙ্কিমের এই মনোযন্ত্রণার পরিচয় বয়ে এনেছে। বঙ্কিমের সাহিত্যিক প্রতিভার ছোঁয়ায় এই রচনাগুলি হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে। আক্রমণ যতই তিক্ত হোক—শুচিতায় এবং মার্জিত বুদ্ধিতে এরা আশ্চর্য শিল্পসফল।

বঙ্কিমের কৌতুক-সৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুপরিজ্ঞাত শ্রদ্ধার্ঘ্যটি আবার স্মরণ করছি :

“বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে ; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গ-সাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।” রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনায় কৌতুক স্রষ্টা বঙ্কিমের বৈশিষ্ট্যটি সত্যরূপে প্রকটিত হয়েছে। উজ্জ্বল-শুভ্র হাসির আড়ালে কবি-দার্শনিক-দেশপ্রেমিকের যে গভীর সত্তাটি থেকে থেকে অশ্রুকরুণ হয়ে উঠেছে—সেইখানেই বঙ্কিমী-কৌতুকের ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনা।

“বিচারের বাজারে গেলাম—দেখলাম সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায়—ছোটবড়ো কসাই সকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড়ো

বড়ো পশুসকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে ; ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল, 'এও গোরু, কাটিতে হইবে।' আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।"

এ যেমন কমলাকান্তের কথা, তেমনি লোক-রহস্তে 'কোনো স্পেশিয়ালের পত্রে' পরাধীনতা জর্জরিত ক্ষুব্ধ বঙ্কিমের আর একটি আত্মপ্রকাশ :

"দুঃখের বিষয় যে আমি কয়দিনে বাঙালিদিগের ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই ; তবে কিছু কিছু শিখিয়াছি। এবং গোলেস্তান্ এবং বোস্তান্ নামে যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। ঐ দুইখানি পুস্তকের স্থূল মর্ম এই যে, যুধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করিয়া পরিশেষে তাঁহার পিতা কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।"

এই আক্রমণ তখনকার ওরিয়েণ্টালিস্ট পণ্ডিতদের প্রতি। কিছুকাল মাত্র এদেশে বাস করে, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে নামমাত্র অধিকার নিয়ে যাঁরা প্রাচ্য বিদ্যার গবেষণা করেন—তাঁদের উদ্দেশেই অপমানিত অভিমানী বঙ্কিম এ শ্লেষবজ্র ক্ষেপণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মসমালোচনা, দার্শনিক মনন এবং দেশপ্রেম তাঁর কৌতুক সাহিত্যকেও একটা গম্ভীর গুরুত্বে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

বঙ্কিমের চাইতে বয়সে নবীন হলেও কালীপ্রসন্ন সিংহ কৌতুকসৃষ্টিতে প্রবীণতর। তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' ভবানীচরণ প্রভৃতির ঐতিহ্যে রচিত হয়েও যুক্তিতে সুস্থ—বিচারে নিরপেক্ষ। নির্ভীক কালীপ্রসন্নও তাঁর ছোট ছোট নক্শাগুলির মধ্যে তৎকালীন প্রগতিশীল মনোভঙ্গিকেই রূপায়িত করেছেন। তীব্র আত্ম-সমালোচনা, সামাজিক ভণ্ডামির উন্মোচন এবং সেই সঙ্গে দেশাত্ম-বোধের দীপ্তি তাঁর রচনা থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে। রুচিতে কোথাও কোথাও কিছু গ্রাম্যতা আছে—কিন্তু অশালীনতা নেই। কালীপ্রসন্নের প্রভাবে যে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের দল রুচিহীনতা এবং ইতর গালাগালির পসরা নিয়ে আসরে নেমেছিলেন, 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য চোখে পড়তে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। কলকাতার কথ্য ভাষার পরম দুঃসাহসী ব্যবহার কালীপ্রসন্নের কৌতুককে আরো প্রাণবন্ত এবং

অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল।

কিন্তু হুতোম এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাই পরবর্তী কৌতুকমূলক কথাসাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করল। হুতোমের প্রভাব একদল কুভাষাবিলাসী অনুকারকের উপর পড়ে পঙ্কের মধ্যে লুপ্ত হল, কিন্তু বঙ্কিমের রসিকতা থেকে রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হলেন। রবীন্দ্রনাথের 'হাস্য-কৌতুক'—যার কিছু কিছু তাঁর প্রথম জীবনে 'হেঁয়ালি নাট্য -( শ্যারাডের পদ্ধতিতে ) রূপে 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের উপর 'লোক রহস্যের' প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন, তা তাঁর নিজেরও প্রাপ্য।

বঙ্কিম নিজে জাতীয়তাবাদী হিন্দু—ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাঁর যে বিশেষ পক্ষপাত ছিল, তা-ও নয়। বরং শেষের দিকে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎ তিক্ত সম্পর্কেরই সৃষ্টি হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেই তিক্ততার মাত্রাধিক্য ঘটানোয় আনুকূল্য করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের হাসি ব্রাহ্ম-সমাজেরই নিকট-নিহিত। সুরুচি, স্বচ্ছতা, বুদ্ধিগত প্রাখর্য এবং শিক্ষিত-পরিশীলিত মনন তাকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। তাই হাসির সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু হিন্দু-রসিকতারও একটা নিজস্ব রূপ ছিল। সে রসিকতা ভবানীচরণ থেকে একটি অন্তঃশীলা ধারায় বয়ে আসছিল—তা বঙ্কিমকেও ক্ষমা করেনি। বাংলাদেশে কেশবচন্দ্র সেনের আবির্ভাবে তার একটি অভিনব বহিঃপ্রকাশ ঘটল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন একটি আশ্চর্য বিতর্কমূলক ব্যক্তিত্ব। অসামান্য পণ্ডিত—অদ্বিতীয় বক্তা। সমাজ-সংস্কারে এবং ধর্মপ্রচারে সমর্পিত প্রাণ, সমুচ্চ আদর্শবাদের উদ্‌ঘোষক। কিন্তু ব্রাহ্ম হয়েও তিনি রামকৃষ্ণ ভক্ত, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েও নিজ কন্যাব বাল্যবিবাহ দাতা, অপৌত্তলিক হয়েও হরগৌরীর সামনে তাঁর নিজ কন্যা সম্প্রদান—যার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো সংযতবাক্ মানুষেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল।

অথচ, বাঙালী তরুণদের উপর কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও ব্যক্তি মানুষের অদ্ভুত প্রভাব পড়েছিল তখন। দলে দলে কলেজের ছাত্র কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শোনবার জন্য ভিড় করত—অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের দিকে পা-ও বাড়িয়েছিল। স্বভাবতই, হিন্দুসমাজের ক্রোধ এবং আক্রমণ ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে পুর্ণোৎসাহে ধাবিত হল। কিছু কিছু ব্যঙ্গ ইতঃপুর্বে ছিলই, কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করে তা

একটা আন্দোলনে পরিণত হল

কেশবচন্দ্র প্রচারক পাঠিয়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম বিস্তারের প্রয়াস করেছিলেন। এই প্রচারকেরা মেয়েদের মধ্যে গিয়ে কিভাবে তাদের ধর্মে আকৃষ্ট করেন—তাই নিয়ে অকথ্য কুৎসিত ব্যঙ্গ-রচনা প্রকাশিত হতে লাগল ; শিক্ষিতা ব্রাহ্মিকাদের সহজ মেলামেশাকে বিকৃত, বীভৎস করে দেখানো হতে লাগল ‘বিবির নাচ’ জাতীয় রচনায়। এই দলেরই পরিমার্জিত শক্তিমান সংস্করণ বঙ্গবাসীর যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—যিনি ‘মডেল ভগিনী’ রচনা করেছিলেন। আর যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে বিকশিত হলেন আর একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব—তিনি হলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

‘পঞ্চানন্দ’ ইন্দ্রনাথের রচনাবলী বর্তমানে প্রায় অপ্রাপ্যতার কোঠায়। কিন্তু ‘ভারত উদ্ধার কাব্যে’র অসামান্য রচয়িতা, ‘পঞ্চানন্দের’ পরিবেশক একদা বাঙালীর চিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজকে তিনি নির্মম ব্যঙ্গে বার বার জর্জরিত করেছেন—কেশবচন্দ্র তাঁর প্রধান ‘টার্গেট’ ; কিন্তু ইন্দ্রনাথের পরিচয় ওখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর ছোটখাটো রঙ্গ-কৌতুকের উর্ধ্বে যে ব্যঙ্গরসিক সত্তাটি বিরাজ করছে—সেটি দেশপ্রেমিকের—‘পেট্রিয়ট্‌ স্যাটায়ারিস্টের’।

যে আক্রমণ বঙ্কিম কিঞ্চিৎ কুণ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন—ইন্দ্রনাথ সে আক্রমণে কোথাও ক্ষমা রাখেননি ; দুর্গাপূজা সম্পর্কে দারোগার গোপন রিপোর্টে, ‘কাবুলস্থ সংবাদদাতার রিপোর্ট সিরিজে’ ‘কঙ্গরসের’ অধিবেশনের ব্যাখ্যানে—দেশপ্রেমিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন ইন্দ্রনাথ। নির্ভীকভাবে তিনি নতুনকালের দুর্গামূর্তির পরিকল্পনা জানিয়েছেন এইভাবে : দুর্গা রানী ভিক্টোরিয়া, কার্তিক-গণেশ স্ফীতোদর ইংরেজ বণিক, বলির পশু দেশের হিন্দু মুসলমান এবং খাঁড়া হাতে কামার—ইংরেজ রাজপুরুষ।

দু-একটি কাব্য ছাড়া ইন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ—রিপোর্টাজের ভঙ্গিতে লেখা। এই লেখাগুলি সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের তির্যক পরিচয় বহন করছে। স্থায়ী সাহিত্যের মর্যাদা হয়তো এদের অনেকেই দাবি করতে পারে না—কিন্তু খাঁটি দেশপ্রেমিকের দুঃসাহসী প্রয়াসরূপে এদের নিঃসংশয় ঐতিহাসিক গৌরব আছে।

ইন্দ্রনাথের কালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এই লেখকটিও অসাধারণ। বাংলা দেশের পুরনো বৈঠকী গল্পের মধ্যে তিনি

আনলেন সমাজ-সমালোচনা, উচ্ছ্বসিত হাসির এবং উদ্ভট কল্পনাবিলাসের আড়ালে আনলেন সর্বসংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিবাদ। ত্রৈলোক্যনাথ কোনো দলের নন; বাস্তব ব্যাপক অভিজ্ঞতায়, বহু দুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষকে চিনেছিলেন তিনি, দেশকে ভালবেসেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ পুরো হিউম্যানিস্ট। তাই তাঁর কাছে ‘ব্যাঙসাহেব মিঃ গমিশ’ আর ধর্মধ্বজী ‘ঢাক মহাশয়’, স্বদেশী কোম্পানির ডমরুধর আর ভণ্ড সন্ন্যাসী—সবাই সমান ধিক্কারের বস্তু। সর্বোপরি ভূত নিয়ে তাঁর রসিকতা এক অপূর্ব কৌতুকস্রষ্টার প্রতিভাদীপ্ত চরিতার্থতা।

ত্রৈলোক্যনাথের আরো কৃতিত্ব আছে। ‘লোক রহস্যের’ ‘সুবর্ণ গোলকে’ কিংবা ‘কমলাকান্তের’ দু-একটি রচনায় ব্যঙ্গ গল্পের যে সূচনা ঘটেছিল, যার কিছু কিছু আভাস ছিল ‘হুতোম প্যাঁচার নকশায়’—ত্রৈলোক্যনাথের হাতে তা রূপ লাভ করল। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা সাহিত্যে নকশা আর রহস্যকে ছাড়িয়ে প্রথম খাঁটি হাসির গল্প লিখলেন। এ কাজ ইন্দ্রনাথও হয়তো করতে পারতেন খানিক পরিমাণে—কিন্তু রিপোর্টধর্মী রচনার মধ্যেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়ে গিয়েছিল। তাই ত্রৈলোক্যনাথকেই এই দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। এবং, বলতে দ্বিধা নেই - যথাযোগ্য ভাবেই ত্রৈলোক্যনাথ এ দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের কাছ থেকেই সম্ভবত পূর্ণাঙ্গ হাসির গল্পের প্রেরণা পেলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনা এবং রূপকের দিকে তিনি গেলেন না—পারিবারিক জীবনের, পারিপার্শ্বিক সমাজের ছোটখাটো অসঙ্গতি, টুকরো টুকরো হাসি এবং কৌতুককেই আশ্রয় করলেন তিনি। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের আঙ্গিক ছিল দুর্বল—প্রভাতকুমারের হাতে তা নিখুঁত আর নিপুণ হয়ে উঠল।

বাংলা সাহিত্যে কৌতুক গল্পের কাহিনী এইভাবে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। ইন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচনায় প্রেরণা পেলেন প্রমথ চৌধুরী—এল “নীল লোহিত”, বৈঠকী গল্পের আসর বসালেন “ঘোষালের” গল্পমালায়। ত্রৈলোক্যনাথের মেজাজ নিয়ে, অথচ প্রভাতকুমারের পারিবারিকতা আশ্রয় করে গল্পের বৈঠক জমিয়ে তুললেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যঙ্গ-কৌতুকের পসরা সাজিয়ে বসলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ বসু। ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনাবিলাস আরো সুমার্জিত এবং নাগরিক হয়ে দেখা দিল পরশুরামের লেখায়; এলেন

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল। ত্রৈলোক্যনাথ-পরশুরামের পথে খানিকদূর এগিয়ে এলেন সম্বুদ্ধ। সূক্ষ্ম কৌতুকের বৈদগ্ধ্যে সংযত মৃদু হাসি বিকীর্ণ করলেন পরিমল গোস্বামী। 'রাণুর' ঘরোয়া গল্প নিয়ে আসরে এসে শিবপুরের গণশা অ্যাণ্ড কোংকে নিয়ে নির্মল হাসির ডালা সাজালেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এক ঝলক আলোর মতো দেখা দিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী, তাঁর রশ্মিতে দীপ্ত হলেন রূপদর্শী, নীলকণ্ঠ। কথার কারুশিল্পে আর রঙ্গসৃষ্টির বৈচিত্র্যে শিবরাম চক্রবর্তী একক মহিমায় বিরাজ করতে লাগলেন।

বাংলা কৌতুক গল্পের ঐতিহাসিক পরিক্রমা সংক্ষেপে মোটামুটি এই।

## তিন

'সরস গল্পের' ভূমিকার এই নীরস দৈর্ঘ্য পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে কিনা জানি না। তবে তাঁদেব জন্য যে ভোজের আয়োজন এখানে করা হয়েছে—আশা করি, তাতে অনেক বেশি ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।

আমরা বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই এই সংকলন আরম্ভ করেছি; তাই বলে পূর্ববর্তী লেখকদের সম্পর্কে কোনো অস্বীকৃতির ইঙ্গিত এর মধ্যে নেই। একটা নির্দিষ্টতার মধ্যে বইটিকে ধরে রাখার জন্যই এই সীমারেখা টানতে হয়েছে। সংকলনের উদ্দেশ্য নামের মধ্যেই পরিস্ফুট। আমরা 'সরস গল্প' পরিবেশন করতে চেয়েছি; তাদের কোনো কোনোটিতে তীব্র ব্যঙ্গ বা কঠিন শ্লেষ হয়তো নিহিত আছে—কিন্তু একান্তভাবে শ্লেষমূলক রচনাকে আমরা এতে স্থান দিইনি। আঘাতের মধ্যেও যাতে মধুলেপনটিই মুখ্য থাকে, জ্বালা থাকলেও কৌতুক যাতে তাকে স্নিগ্ধ করে দেয়—সেই দিকেই আমরা লক্ষ্য রেখেছি। এর মধ্যে বিশুদ্ধ আনন্দের গল্প আছে—বেপরোয়া রঙ্গের উপাখ্যান আছে—উইটের আলোয় ঝকঝকে লেখাকেও এই সংকলনে পাঠক খুঁজে পাবেন। মোটের উপর, হাসির উপচার সাজানোই সংকলনটির লক্ষ্য। কিন্তু হাসির নেপথ্যে যেটুকু 'নটিনেস্' থাকে যে ব্যঙ্গটুকু প্রায় ক্ষেত্রেই অপরিহার্য সেটুকুর দায়িত্ব এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এমন হতে পারে, কোনো-কোনো পাঠক তাঁদের কোনো-কোনো প্রিয় লেখককে এই বইতে খুঁজে পাবেন না, হয়তো সেই লেখকের উপযুক্ত রচনা আমরা খুঁজে পাইনি—হয়তো অনবধানতায় দু-একজন বাদও পড়তে পারেন। এ সমস্ত

ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকদের কাছ থেকে সহায়তা পেলে পরের সংস্করণে আমরা এগুলিকে সংশোধন করে নেবার চেষ্টা করব। গল্পের নির্বাচনেও হয়তো অনেকের সঙ্গে মতভেদ ঘটবে। সে ক্ষেত্রে সম্পাদক নিরুপায়—তবে সকলের বক্তব্য শোনবার জন্যেই আমাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা মুক্ত রইল।

আধুনিক খ্যাতনামা লেখকদের হাসির গল্প সন্ধান করতে গিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই নিরাশ হতে হয়েছে। শ্লেষতিক্ত রচনা কারো কারো দু-একটি হয়তো আছে—কিন্তু এই সংকলনের আনন্দের ভোজে সেগুলিকে খুব মানানসই বলে মনে করতে পারিনি। তা ছাড়া অধিকাংশ সাম্প্রতিক লেখকই বড়ো বেশি গম্ভীর—হাসিটাকে যেন তার লঘুচেতাসুলভ চাপল্যের মতো দূরে সরিয়ে রেখেছেন। গম্ভীর কঠিনতা, তিক্ত নির্লিপ্তি আর দার্শনিক প্রৌঢ়তা ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যে হাসির উৎসটাকে শুকিয়ে আনছে। কিন্তু এ-কথা বলতেই হবে ভবিষ্যতের পক্ষে এ লক্ষণ শুভ নয় এবং বর্তমান সংকলনের পক্ষে একান্ত দুর্ভাগ্য।

কৌতুক সৃষ্টিতে আধুনিক কালের এই কুণ্ঠা কেন? এমন-কি ব্যঙ্গ রচনাতেও কেন সাম্প্রতিক লেখকেরা উৎসাহ পান না? তাঁরা কি হেসে ওঠবার মতো কোনো কিছুই জীবনে দেখতে পাচ্ছেন না আর?

ব্যঙ্গ-রঙ্গ-কৌতুক অনেকটাই প্রেরণা পায় কোনো যুগ-সংঘাতের ভেতর—কোনো ভাবদ্বন্দ্বের মধ্যে। নব্য কলকাতার বাবুয়ানির উদ্দামতা, ইংরেজি শিক্ষার প্রথম দিকের আতিশয্য অথবা ব্রাহ্মধর্মের বিস্তার—এগুলি সেই ভাবদ্বন্দ্বের উপকরণ জুগিয়েছে। কোনো নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা সাহিত্যিক আন্দোলনও ব্যঙ্গ-রঙ্গের উৎসকে মুক্ত করে। কিন্তু আমাদের বর্তমান বাংলা দেশ কি সেই সংঘাত থেকে মুক্ত? আমাদের মধ্যে কি কোনো দ্বন্দ্ব নেই—কোনো অসঙ্গতিবোধের বিমূঢ়তা নেই?

এ-কথা স্বীকার করা শক্ত। আমরা নিশ্চয়ই আজ কোনো স্থির সত্যের মধ্যে পৌঁছে স্থিতচিত্ত হয়ে যাইনি, বরং এই মুহূর্তের বাঙালী দেখছে—তার পুরনো সমাজ-জীবন ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে মূল্যবোধ শ্রেণী-সংঘাতের রূপ তীব্রতর হচ্ছে। এই কালে ব্যঙ্গ রচনার সম্ভাবনা সীমাহীন। কিন্তু কিছু কিছু সাংবাদিক-ধর্মী রচনা ছাড়া স্থায়ী রস-সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহিত্যিকদের বিশেষ উৎসাহ চোখে পড়ছে না।

কিংবা এ-কালের বাঙালী লেখকেরা ভাবছেন—হাসিটা inferior art ? ওতে তাঁদের মর্যাদা নষ্ট হবে ? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ তো সে-কথা ভাবেননি। পাঠক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে নতুন রস-স্রষ্টার জন্যেই আমরা পথ চেয়ে রইলাম।

রবীন্দ্রনাথের গল্পটিকে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। তা ছাড়া যে-সব লেখক ও প্রকাশক তাঁদের রচনা মুদ্রণের সম্মতি জানিয়েছেন, তাঁদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তরুণ সাহিত্যিক আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অমলেন্দু চক্রবর্তী এর জন্যে অকুণ্ঠ পরিশ্রম করেছেন—তাঁর অকাতর সাহায্য না থাকলে রচনাগুলির সংগ্রহ ও নির্বাচন দুঃসাধ্য হত। চিত্রশিল্পী অহিভূষণ মল্লিক বইখানিকে চমৎকার করে সাজিয়ে আরো শোভন করে তুলেছেন—তাঁর গুণপনার বিচার পাঠকেরাই করবেন।

'সরস গল্প' সমাদৃত হলেই আমরা ধন্য হব।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দোল পূর্ণিমা,
১৩৬৬

## সূচীপত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ পলিটিক্‌স্‌ ২৫
কালীপ্রসন্ন সিংহ ॥ মাহেশের স্নানযাত্রা ২৯
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ নয়নচাঁদের ব্যবসা ৪৩
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দুর্ভিক্ষ ও বিউবনিক প্লেগ ৬৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ রাজটিকা ৭৫
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি ৮৯
প্রমথ চৌধুরী ॥ নীললোহিতের স্বয়ংবর ১০১
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ দুই বন্ধু ১১৯
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ বিবাহের বিজ্ঞাপন ১৩০
পরশুরাম ॥ জাবালি ১৪১
অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ॥ অকিঞ্চনের দাদা ১৫৭
জগদীশ গুপ্ত ॥ লাঙ্গুলোপাখ্যান ১৮০
সুকুমার রায় ॥ হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি ১৯৭
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা ২০৫
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ ডম্ফার ভয়ে ২২৪
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ॥ ত্রিলোচন কবিরাজ ২৩৭
পরিমল গোস্বামী ॥ অভিনন্দন ২৪৭
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ট্রিটি ২৫৩
অশোক চট্টোপাধ্যায় ॥ পীতাম্বর সাণ্ডেল ২৬৮

বনফুল ॥ থিয়োরি অব রিলেটিভিটি ২৮৯
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ তন্দ্রাহরণ ২৯৬
সজনীকান্ত দাস ॥ শিকারী ৩০১
মনোজ বসু ॥ দিকপাল সরকার ৩০৬
প্রমথনাথ বিশি ॥ চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোশ ৩১২
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ ইনি আর উনি ৩২৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ একটি অমানুষিক আত্মত্যাগ ৩৪৮
অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ গাধা পিটিয়ে ঘোড়া ৩৫৯
কপিল ভট্টাচার্য ॥ প্রিন্স ৩৭৫
সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ দাম্পত্য জীবন ৩৮৮
শিবরাম চক্রবর্তী ॥ ধার ঘেঁষার ভারী ফ্যাসাদ ৩৯২
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ॥ বাঘা তেঁতুল ৪০২
আশাপূর্ণা দেবী ॥ প্রস্তাব ৪১০
গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ দুর্ঘটনা ৪১৫
সুবোধ বসু ॥ ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ৪২০
সম্বুদ্ধ ॥ বাইসন ও বায়োস্কোপ ৪২৮
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ইদু মিঞার মোরগা ৪৩৯

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA

### বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৮—১৮৯৪ )

# পলিটিক্স্

শ্রীচরণেষু, আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু—আরও কিছু আফিঙ্গ পাঠাইবেন। কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কি জন্য হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পলিটিক্স্ কম পড়িবে—তুমি কিছু পলিটিক্স্ ঝাড়িলে ভালো হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে পলিটিক্স্ সাবজেক্টরূপী ঝামা ইট মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্স্ লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে, আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই। আমার উপর পলিটিকেল্ চাপ কেন? আমি রাজা, না খোশামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূলবুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য আমি আপনার খোশামোদ করিয়াছি বটে কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে পলিটিক্স্ লিখি। ধিক্ আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্ আপনার আফিঙ্গ দানে! আপনি

আজিও বুঝিতে পারেন নাই যে কমলাকান্ত শর্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যন নহে।

আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়োই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন সম্পাদকের বুদ্ধি-বৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। কি করি! ভরিটাক্ আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ি—বাড়ির প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—মাটিতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্তমিশ্রিত খলি মিশানো ললিত বিচালিচূর্ণ গো-গণ মুদিতনয়নে সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম—এখানে তো পলিটিক্স্ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে গো-গণ পলিটিক্স্-বিকার-শূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম। তখন অহিফেন-প্রসাদ-প্রসন্নচিত্তে লোকের এই পলিটিক্স্ প্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দরের যাত্রার একটি গান মনে পড়িল।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে
ইচ্ছা বটে ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স্—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স্; কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মতো, খঞ্জের দ্রুত গমনের আকাঙ্ক্ষার মতো, অন্ধের চিত্রদর্শন লালসার মতো, হিন্দু বিধবার স্বামীপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মতো, আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মতো, হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগকে হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ি আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!' ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি

কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুক্কুরের পেটটা দেখিলাম, পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিল। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল। এক এক বার কলুর পুত্রের অন্নপরিপুরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই তো পলিটিক্স্। এই কুক্কুর তো পলিটিশ্যন! তখন মনোভিনিবেশ পূর্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুক্কুর পাকা পলিটিকেল্ চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কুলুপুত্র কিছু বলে না—বড়ো সদাশয় বালক। কুক্কুর কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া হ্যা হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল। তাহার পলিটিকেল্ এজিটেশ্যন সফল হইল;—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্বণ, লেহন, গেলন এবং হজম করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্য কণ্টক সম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে হইল যে আর একখানা কাঁটা পাইলে ভালো হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপনমনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুক্কুর পানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটি bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যন না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আর একবার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধহয় বলিতেছিলেন, হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই—এক মুষ্টি ভাত কুক্কুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দন-কাননে বসিয়া সুধাপান করেন, কার্ডিনেল উল্সি বা কার্ডিনেল জেরেজ যে সুখে কার্ডিনালের টুপি পরিয়াছিলেন, কুক্কুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুক্কুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী

রোষ-কষায়িত-লোচনে এক ইষ্টক খণ্ড লইয়া কুক্কুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্বক বহুবিধ রাগ-রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর আপন উদরপূর্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি পরিপুর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল - বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতর নয়নে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুক্কুরকে দূরীকৃত করিয়া, কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন। কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না—এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্তী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাঁহার হৃদয় মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ কবিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান কবিল।

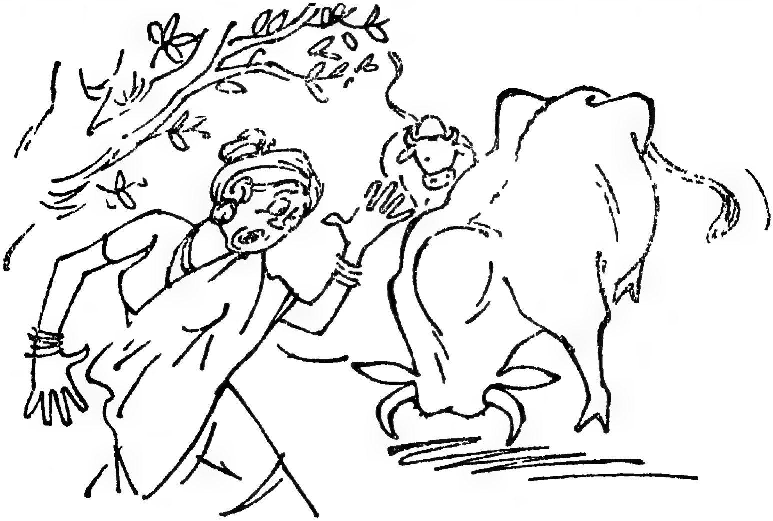

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্‌স্. দুই রকমের পলিটিক্‌স্ দেখিলাম—এক কুক্কুর জাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্‌মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষেব দরের পলিটিশ্যন—আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশ্যন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ( ১৮৪০—১৮৭০ )

# মাহেশের স্নানযাত্রা

গুরুদাস গুঁই শেরুড কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্তিরি। তিরিশ টাকা মাইনে, এ সওয়ায় দশ টাকা উপরি রোজগারও আছে—গুরুদাসের চাঁপাতলা অঞ্চলে একটি খোলার বাড়ি ছিল ; পরিবারের মধ্যে এক বুড়ো মা, বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসী মাত্র।

গুরুদাস বড়ো সাখরচে লোক, যা দশ টাকা রোজগার করেন সকলই খরচ হয়ে যায় ; এমন-কি কখনো কখনো মাস কাবারের পূর্বে গয়নাখানা ও জিনিসটে পত্তরটাও বাঁদা পড়ে ; বিশেষতঃ শ্রাবণ মাসে ইলিশ মাছ ওঠবার পূর্বে ঢ্যালা ফ্যালা পার্বণে গুরুদাসের দু-মাসের মাইনেই খরচ হয়—ভাদ্দর মাসের আরম্ভটি বড়ো ধুমে গ্যাচে, আর পিঠে পার্বণেও দশ টাকা খরচ হয়েছিল—ক্রমে স্নানযাত্রা এসে পড়লো। স্নানযাত্রাটি পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে ; সুতরাং স্নানযাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস বড়োই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নাওয়া খাওয়ারও অবকাশ রইল না ; ক্রমে আরো পাঁচ ইয়ার জুটে গেল। স্নানযাত্রায় কি রকম আমোদ হবে, তারি তদ্‌বির ও পরামর্শ হতে লাগলো, কেবল দুঃখের বিষয়—চাঁপাতলার হলধর বাগ, মতিলাল বিশ্বেস ও হারাধন দাস, গুরুদাসের বুজুম্ ফ্রেণ্ড ছিলেন, কিন্তু কিছুদিন হল হলধর একটা চুরি মামলায় গেরেপ্তার হয়ে দু-বছরের জন্যে জেলে গ্যাচেন, মতি বিশ্বেস মদ খেয়ে পাতকোর ভেতর পড়ে গিয়েছিল, তাতেই তাঁর দুটি পা ভেঙে গিয়েছে, আর হারাধন গোটাকতক টাকা বাজার-দেনার জন্যে ফরাশডাঙায় সরে গ্যাচেন। সুতরাং এবারে তাঁদের বিরহে স্নানযাত্রাটা ফাঁক ফাঁক লাগচে, কিন্তু তাহলে কি হয়—সম্বৎসরের আমোদটি বন্ধ করা কোনো ক্রমেই হতে পারে না বলেই নিতান্ত গমিতে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রায় যাবার আয়োজন কত্তে হচ্ছে। এদিকে পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে সকল রকম জিনিসের আয়োজন হতে লাগলো—গোপাল দৌড়ে গিয়ে একখানি বজরা ভাড়া করে এলেন। নবীন আতুরী, আনিস, রম ও গাঁজার ভার নিলেন। ব্রজ ফুলুরি ও বেগুনভাজার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবি খিলির দোনা, মোমবাতি ও মিটে কড়া তামাক ও আর আর জিনিসপত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখলেন। কাল রাত্তিরের জোয়ারে

নৌকোয় ওঠা হবে স্থির হল।

পুর্বে স্নানযাত্রায় বড়ো ধুম ছিল—বড়ো বড়ো বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশ যেতেন, গঙ্গায় বাচ খেলা হত, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যামটা ও বাইয়ের হাট লেগে যেতো! কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতোর, কাঁসারি, কামার ও গন্ধবেনে মশাইরাই যা রেখেচেন, মধ্যে মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের দু-চার জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোনো কোনো ছোকরা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।

ক্রমে সে দিনটি দেখতে দেখতে এসে গেল। ভোর হতে না হতেই গুরুদাসের ইয়াররা সেজেগুজে তৈরি হয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। গোপাল এক জোড়া লাল রঙের এস্টকিং ( মোজা ) পায়ে দিয়েছিলেন, পেতলের বড়ো বড়ো বোদাম দেওয়া সবুজ রঙের একটা ফতুই ও গুল্‌দার ঢাকাই উড়ুনি তাঁর গায়ে ছিল আর একটা বিলিতি পেতলের শিল আংটিও আঙুলে পরেছিলেন—কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিনতে পারেন নাই বলেই সুদু পায়ে আসা হয়। নবীনের ফুলদার ঢাকাই চাদরখানি বহুকাল ধোপার বাড়ি যায়নি, তাতেই যা একটু ময়লা বোধ হচ্ছিল, নতুবা তাঁর চার আঙুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেইদিন মাত্র পাটভাঙা হয়েছিল—মেরজাইটিও বিলক্ষণ ধোবো ছিল। ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্ডে কর্ম হয়েচে, বয়সও অল্প, সুতরাং আজো ভালো কাপড়-চোপড় করে উঠতে পারেননি, কেবল গত বৎসর পুজোর সময় তাঁর আই ন-সিকে দিয়ে যে ধুতি চাদর কিনে দেয় তাই পরে এসেছিলেন, সেগুলি আজো কোরা থাকায় তাঁরে দেখতে বড়ো মন্দ দেখায়নি। আরো তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বললেই হয়—বলতে কি, তিনি তো বেশিদিন পরেননি, কেবল পুজোর সময় সপ্তমী পুজোর একদিন পরে গোকুল দাঁয়ের প্রতিমে দেখতে গিয়েছিলেন—ভাসান দেখতে যাবার সময় একবার পরেন, আর হাটখোলার যে সেই ভারী বারোইয়ারী পুজো হয়, তাতেই একবার পরে গোপালে উড়ের যাত্রা শুনতে গেছলেন—তাছাড়া অমনি সিকের উপর হাঁড়ির মধ্যে তোলাই ছিল।

ইয়ারেরা আসবামাত্র গুরুদাস বিছানা থেকে উঠে দাওয়ায় বসলেন। নবীন, গোপাল ও ব্রজ খুঁটি ঠ্যাসান দিয়ে উপু হয়ে বসলেন। গুরুদাসের মা চকমকি, সোলা, টিকে ও তামাকের মেটে বাক্সটি বার করে দিলেন। নবীন চকমকি

ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজলেন। ব্রজ পাতকোতলা থেকে হুঁকোটিকে ফিরিয়ে এনে দিলেন; সকলেরই এক একবার তামাক খাওয়া হল। গুরুদাস তামাক খেয়ে হাতমুখ ধুতে গেলেন; এমন সময় ঝম্ ঝম্ করে এক পশলা বৃষ্টি এল, উঠোনের ব্যাঙগুলো থপ্ থপ্ করে নাপাতে নাপাতে দাওয়ায় উঠতে লাগলো; কিন্তু নবীন, গোপাল ও ব্রজ তারি তামাশা দেখতে লাগলেন। নবীন একটি সখের গাওনা জুড়ে দিলেন:

শখের বেদেনী বলে কে ডাকলে আমারে!

বর্ষাকালের বৃষ্টি মানুষের অবস্থার মতো অস্থির। সর্বদাই হচ্ছে যাচ্ছে তার ঠিকানা নাই—ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল। গুরুদাসও হাত মুখ ধুয়ে এসেই মাকে খাবার দিতে বললেন, ঘরে এমন তৈরি খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পান্তা ভাত আর তেঁতুল দিয়ে মাছ ছিল, তাঁর মা তাই চারখানি মেটে খোরায় ভাত বেড়ে দিলেন, গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহু মান করে খেলেন।

পুর্বে স্থির হয়েছিল, রাত্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে, কিন্তু স্নানযাত্রাটি যে রকম আমোদের পরব, তাতে রাত্তিরের জোয়ারে গেলে স্নানযাত্রার দিন বেলা দুপুরের পর মাহেশ পৌঁছতে হয়, সুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হল। এদিকে গির্জের ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং করে দশটা বেজে গেল। নবীন, ব্রজ,

গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে, পানতামাক খেয়ে, তোবড়া-তুবড়ি নিয়ে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন। তাঁর মা একখানি পাখা ও দুটি ধামা কিনে আনতে বললেন, তাঁর স্ত্রী পুর্বের রাত্তিরে একটি চিত্তির করা হাঁড়ি, ঘুনসি ও গুরিয়া পুতুল আনতে বলেছিল, আর তাঁর বিধবা পিসীর জন্যে একটি খাজা কোয়াওলা ভালো কাঁঠাল, কানাইবাঁশি কলা ও কুলী বেগুন আনতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

গুরুদাসের পোশাকটিও নিতান্ত মন্দ হয়নি; তিনি একখানি সরেস গুলদার উড়ুনি গায়ে দিয়েছিলেন, উড়ুনিখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাঠের কুচো বাঁদবার দরুন চার-পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচে গেছলো—তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিতি ঢাকা প্যাটার্নের পিরান ছিল, তাব ওপর বুলু রঙের একটি হাপ চায়না কোট—তিনি 'বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে' পেড়ে এক শান্তিপুরে ফরমেশে ধুতি পরেছিলেন, জুতা জোড়াটিতে রূপোর বক্লস্ দেওয়া ছিল।

ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌঁছলেন। সেথায় কেদার, জগো, হরি ও নারাণ তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল; তখন সকলে একত্র হয়ে বজরায় উঠলেন। মাঝিরা শুঁটকী মাছ, লঙ্কা ও কড়ায়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছিল। জোয়ারও আসে নাই, সুতরাং কিছুক্ষণ নৌকো খুলে দেওয়া বন্ধ রইল।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকোয় উঠেই আয়েস জুড়ে দিলেন। গোপাল সন্তর্পণে জবাবির চৌপলের সোলার ছিপিটি খুলে ফেললেন। ব্রজ এক ছিলিম গাঁজা তৈরি কত্তে বসলেন—আতুরী ও জবাবিরা চলতে শুরু হল। ফুলুরি ও বেগুনভাজীরা সেকালের সতী স্ত্রীর মতো আতুরীদের সহগমন কত্তে লাগলেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠলো—এদিকে নারাণ ও কেদার বাঁয়ার সঙ্গতে—

হেসে খেলে নেও রে যাদু মনের সুখে
কে কবে যাবে শিঙে ফুঁকে।
তখন কোথা রবে বাড়ি, কোথা রবে জুড়ি,
তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে দেয় ট্যাঁকে।
তখন মুড়ো জেলে দেবে ও চাঁদমুখে॥

গান জুড়ে দিলেন—ব্রজ গাঁজায় দম্ মেরে আড়ষ্ট হয়ে জোনাকি পোকা দেখতে লাগলেন, গোপাল ও গুরুদাসের ফুর্তি দেখে কে!

এদিকে শহরের স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধুম পড়ে গ্যাছে। বুড়ী বুড়ী মাগী, কলাবউয়ের মতো আধ হাত ঘোম্‌টা দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে কনে বউ ও বুকের কাপড় খোলা হাঁ করা ছুঁড়িয়া রাস্তা জুড়ে স্নানযাত্রা দেখতে চলেচে; এমন-কি রাস্তায় গাড়ি পাল্‌কি চলা ভার, আজ শহরে কেরাঞ্চী গাড়ির ঘোড়ায় কত ভার টানতে পারে, তার বিবেচনা হবে না, গাডির ভেতর ও পেছতে কত তাংড়াতে পারে, তারই তক্‌রার হচ্ছে—এক একখানি গাড়ির ভেতর দশজন, ছাতে দুজন, পেছনে একজন ও কোচবাক্সে দুজন--একুনে পনেরজন, এ সওয়ায় তিনটি করে আঁতুড়ে ছেলে ফাও! গেরস্তর মেয়েরাও বড়ো ভাই, শ্বশুর, ভাতার, ভাদ্দরবউ ও শাশুড়ীতে একত্র হয়ে গ্যাচেন। জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন—অনেকেই কেষ্ট সাজবেন!

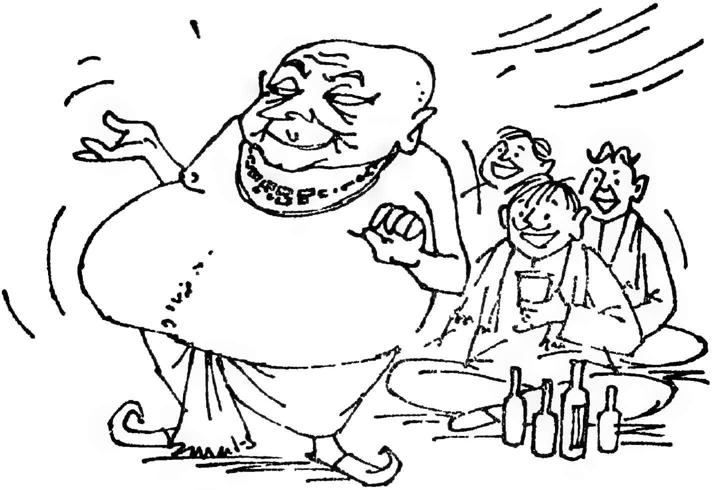

গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার; বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌গিজ্ কচ্চে, সকলগুলি থেকেই মাতলামো, রং, হাসি ও ইয়ার্কির গর্‌রা উঠ্‌চে, কোনোটিতে খ্যাম্‌টা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন; মধ্যে ঢাকাই জালার মতো, পেল্লাদে পুতুলের মতো ও তেলের কুপোর মতো শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মতো গুটি দশ মাদুলি ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা ও পৈতের গোচ্ছা গলায়—মৈমনসিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা পাতানো কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে ন্যাকামি

কচ্চেন ; বয়স ষাট পেরিয়েচে, অথচ 'রাম'কে 'আম' ও 'দাদা' ও 'কাকা'কে 'দাঁদাঁ' 'কাঁকাঁ' বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রংপুর অঞ্চলে 'বিদ্যোৎসাহী' কব্‌লান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও বেলা চারটে অবধি পুজো করেন। অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্যোদয় দেখেছেন কি না সন্দেহ !

কোনো পিনেসে এক দল শহুরে নব্য বাবুর দল চলেচেন, ইংরেজি ইস্পিচে লিড্‌নি ময়েরর শ্রাদ্ধ হচ্চে, গাওনার সুরে জলও জমে যাচ্চে।

কোনো পান্‌সিখানাতে একজন তিলকাঞ্চুনে নবশাক বাবু মোসাহেব ও মেয়েমানুষের অভাবে পিসতুতো ভাই, ভাগ্নে ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে চলেচেন—বাঁয়া নাই, গোলাবি খিলি নাই, এমন কি একটা থেলো হুঁকোরও অপ্রতুল—তবু এমনি খোসমেজাজ, এমনি শক যে, পানসির পাটাতনের তক্তা বাজিয়ে গুন গুন করে গাইতে গাইতে চলেচেন, যেমন করে হোক কায়ক্লেশে শুদ্ধ হওয়াটা চাই।

এদিকে আমাদের নায়ক গুরুদাসবাবুর বজরায় মাজিদের খাওয়া-দাওয়া হয়েচে, দুপুরের নমাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে, এমন সময়ে গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দ্যাখ্ ভাই গুরুদাস ! আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েচে, কিন্তু একটার জন্যে বড়ো ফাঁক ফাঁক দ্যাখাচ্চে ; সবই হয়েচে, কেবল মেয়েমানুষ না হলে তো স্নানযাত্রায় আমোদ হয় না ! যা বলো, যা কও' —অমনি কেদার 'ঠিক বলেচ বাপ !' বলে কথার খি ধরে নিলেন ; অমনি নারায়ণ বলে উঠলেন, 'বাবা, যে নৌকোখানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষ্‌যি ! আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিতে গয়া কাশী যাচ্চি।'

গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে গ্যাচে, সুতরাং 'বাবা ঠিক বলেচ ! আমিও তাই ভাব্‌ছিলেম, ভাই ! যত টাকা লাগে, তোমরা তাই কব্‌লে একটা মেয়েমানুষ নিয়ে এসো আমি বাবা তাতে পেচ্‌পাও নই, গুরুদাসের সাদা প্রাণ !' এই কথা বল্‌তে না বল্‌তেই নারাণ, গোপাল, হরি ও ব্রজ নেচে উঠলেন ও মাজিদের নৌকো খুলতে মানা করে দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন।

এদিকে গুরুদাস, কেদার ও আর ইয়ারেরা চিৎকার করে—

যাবি যদি যমুনা পারে ও রঙ্গিণী।
কত দেখবি মজা রিষড়ের ঘাটে শ্যামা বামা দোকানী।

কিনে দেব মাথা-ঘষা, বারুইপুরে ঘুনসি খাসা
উভয়ের পুরাবি আশা ও সোনামণি ॥

গান ধরেচেন, এমন সময় মেকিণ্টশ বর্ন কোম্পানির ইয়ার্ডের ছুতোরেরা এক বোট ভাড়া করে রঁাড় নিয়ে আমোদ কত্তে কত্তে যাচ্ছিল ; তারা গুরুদাসকে চিনতে পেরে তাদের নৌকো থেকে—

চুপে থাক্ থাক্ রে ব্যাটা কানায়ে ভাগ্নে।
গোরু চরাস্ লাঙল ধরিস, এতে তোর এত মনে ॥

গাইতে গাইতে হুর্‌রে ও হরিবোল দিয়ে সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গেল ; গুরুদাসেরাও দুউত্ত ও হাততালি দিতে লাগলেন ; কিন্তু তাঁর নৌকোয় মেয়েমানুষ না থাকাতে সেটি কেমন ফাঁক ফাঁক বোধ হতে লাগলো ! এদিকে বোটওয়ালারাও চেপে দুউত্ত ও হাততালি দিয়ে তাঁরে যথার্থই অপ্রস্তুত করে দে গেল।

গুরুদাস নেশাতেও বিলক্ষণ পেকে উঠেছিলেন, সুতরাং ওরা ঠাট্টা করে আগে বেরিয়ে গেল, ইটি তিনি বরদাস্ত করতে পাল্লেন না। শেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ারদের অপেক্ষা না করে টল্‌তে টল্‌তে আপনিই মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন। কেদার ও আর ইয়ারেরা—

আয় আয় মকর গঙ্গাজল
কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে যাবো জল।
গোলাপ ফুলের হাতটি ধরে, চলে যাবো সোহাগ করে,
ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নেচে ঝমঝমাবে মল ॥

গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

ঘণ্টাখানেক হল গুরুদাস নৌকো হতে গ্যাচেন, এমন সময় ব্রজ ও গোপাল ফিরে এলেন। তাঁরা শহরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেচেন, কিন্তু কোথাও একজন মেয়েমানুষ পেলেন না ; তাঁদের জানত ও শহরের ছুটো গোছের বাছতে বাকি করেন নাই। কেদার এই খবর শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, ( জয়কেষ্টো মুখুজ্যের জেলে যাওয়াতে তাঁর প্রজাদেরও এত দুঃখ হয় নাই, রাবণের হাতে রামের কাটা মুণ্ড দেখে অশোকবনে সীতে কত বা দুঃখিত হয়েছিলেন ? ) ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।—

হৃৎপিঞ্জরের পাখি উড়ে এল কার।
ত্বরা করে ধর গো সখি দিয়ে পীরিতের আধার ॥

কোন্ কামিনীর পোষা পাখি, কাহারে দিয়েছে ফাঁকি,
উড়ে এল দাঁড় ছেড়ে শিক্‌লি কাটা ধরা ভার ॥

এমন সময় গুরুদাসও এসে পড়লেন—গুরুদাস মনে করেছিলেন যে, যদি তিনিই কোনো মেয়েমান্‌ষের সন্ধান নাই পেলেন, তাঁর ইয়ারেরা একটা না একটাকে অবশ্যই জুটিয়ে থাকবে। এদিকে তাঁর ইয়ারেরা মনে করেছিলেন, যদিও তারাই কোনো মেয়েমান্‌ষের সন্ধান করতে পাল্লেন না, গুরুদাসবাবু আর ছেড়ে আসবেন না। এদিকে গুরুদাস নৌকোয় এসেই মেয়েমানুষ না দেখতে পেয়ে মহাদুঃখিত হয়ে পডলেন। কিন্তু নেশার এমনি অনির্বচনীয় ক্ষমতা যে, তাতেও তিনি উৎসাহহীন হলেন না, গুরুদাস পুনরায় ইয়ারদের স্তোক দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন। কিন্তু তিনি কোথায গেলে পূর্ণমনোরথ হবেন, তা নিজেও জানতেন না, বোধ হয় তিনি যার অধীন ও আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যাচ্ছিলেন, কেবল তিনি মাত্র সে কথা বলতে পাত্তেন, গুরুদাসকে পুনরায় যেতে দেখে তাঁর ইয়ারেরাও তাব পেছুনে পেছুনে চললেন। কেবল নারাণ, ব্রজ ও কেদার নৌকোয় বসে অত্যন্ত দুঃখেই—

নিশি যায় হায় হায় কি করি উপায়।
শ্যাম বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায় ॥
হের হেব শশধর অস্তাচল গত সখি,
প্রফুল্লিত কমলিনী কুমুদ মলিনমুখী,
আর কি আসিবে কান্ত তুষিতে আমায় ॥

গাইতে লাগলেন—মাজিরা 'জুয়োব বই যায' বলে বারংবার ত্যক্ত কত্তে লাগলো। জলও ক্রমশঃ উডোনচণ্ডীর টাকার মতো জাযগা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো - ইয়ার দলের অসুখের পরিসীমা রইলো না! গুরুদাস পুনরায় শহরটি প্রদক্ষিণ কল্লেন—সিঁদুরেপটি, শোভাবাজার ও বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী তলাটাও দেখে গেলেন, কিন্তু কোনোখানেই সংগ্রহ কত্তে পাল্লেন না—শেষে আপনাব বাড়িতে ফিরে গেলেন। আমবা পুর্বেই বলেচি যে গুরুদাসের এক বিধবা পিসী ছিল। গুরুদাস বাডি গিয়ে তাঁর সেই পিসীরে বল্লেন যে, 'পিসী! আমাদের একটা কথা রাখতে হবে।' তার পিসী বল্লেন, 'বাপু গুরুদাস কি কথা রাখতে হবে? তুমি একটা কথা বললে আমরা কি বাখবো না! আগে বলো দেখি কি কথা?' গুরুদাস বললেন, 'পিসী যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখতে যাও তাহলে বড়ো ভালো হয়। দেখ পিসী সকলেই একটি দুটি মেয়ে-

মানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্ছে, কিন্তু পিসী আমাদের একটিও জুটে উঠে নাই— দেখ পিসী সুদুই বা কেমন করে যাওয়া হয়, আমার নিজের জন্যে যেন না হল, কিন্তু পাঁচো ইয়ারের সুদু নিরিমিষষি রকমে যেতে মন সচ্চে না—তা পিসী আমোদ কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাধ্যি তোমারে কেউ কিছু বলে।' পিসী এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁই গুঁই কত্তে লাগলেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, সুতরাং শেষে গুরুদাস ও ইয়ারদের নিতান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গেলেন।

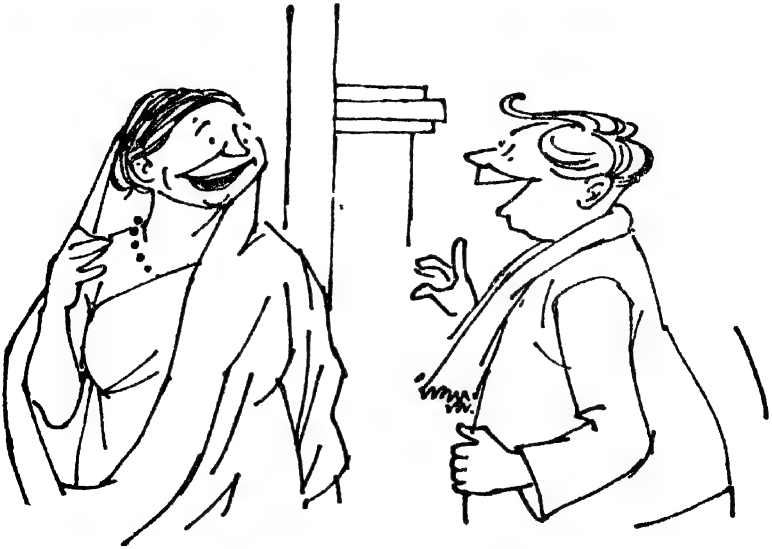

ক্রমে পিসীকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌছলেন, নৌকোর ইয়ারেরা গুরুদাসকে মেয়েমানুষ নিয়ে আসতে দেখে হুর্‌রে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাঁয়ায় দামামার ধ্বনি কত্তে লাগলো, শেষে সকলে নৌকোয় উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়িরা কষে ঝপাঝপ্ ঝপাঝপ্ করে দাঁড় বাইতে লাগলো, মাজি হাল বাগিয়ে ধরে সজোরে দেদার ঝিঁকে মাত্তে লাগলো। গুরুদাস ও সমস্ত ইয়ারে—

ভাসিয়ে প্রেমতরী হরি যাচ্ছে যমুনায়
গোপীর কুলে থাকা হল দায়।
আরে ও! কদমতলায় বসি বাঁকা বাঁশরী বাজায়,
আর মুচকে হেসে নয়ন ঠারে কুলের বউ ভুলায়
হুরর্ হো! হো! হো!

গাইতে লাগলেন, দেখতে দেখতে নৌকোখানি তীরের মতো বেরিয়ে গেল। বড়ো বড়ো যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ দুপুরের জোয়ারে নৌকো ছেড়েচেন। এদিকে জোয়ারও মরে এল, ভাটার সারানী পড়লো—নোঙর করা ও খোঁটায় বাঁধা নৌকোগুলির পাছা ফিরে গেল—জেলেরা ডিঙি চড়ে বেঁউতি জাল তুলতে আরম্ভ কল্লে, সুতরাং যিনি যে অবধি গ্যাচেন, তাঁরে সেইখানেই নোঙর কত্তে হল—তিলকাঞ্চনে বাবুদের পানসি, ডিঙি, ভাউলে, বজরা ও বোট বাজার পোট জায়গায় ভিড়ানো হল—গয়নাব যাত্রীরা কিনেরার পাশে পাশে লগি মেরে চললেন। পেনেটি, কামারহাটি, কিংবা খড়দহে জলপান করে খেয়া দিয়ে মাহেশ পৌঁছবেন।

ক্রমে দিনমণি অস্ত গেলেন, অভিসারিণী সন্ধ্যা অন্ধকারের অনুসরণে বেরুলেন, প্রিয়সখী প্রকৃত প্রিয় কার্যের অবসব বুঝে ফুলদাম উপহাব দিয়ে বাসরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কল্লেন, বায়ু মৃদু মৃদু বীজন কবে পথক্লেশ দূর কত্তে লাগলেন, বক ও বালহাঁসেরা শ্রেণী বেঁধে চললো, চক্রবাকমিথুনের কাল সময় প্রদোষ, সংসারের সুখ বর্ধনের জন্য উপস্থিত হল। হায় সংসারের এমনি বিচিত্র গতি যে কোনো কোনো বিষয় একের অপাব দুঃখবহ হলেও শতকের সুখাস্পদ হয়ে থাকে। পাড়াগাঁ অঞ্চলের কোনো কোনো গাঁযের বওয়াটে ছোঁড়াবা যেমন মেয়েদের সাঁঝ সকালে ঘাটে যাবার পুর্বে পথের ধারেব পুবনো শিবেব মন্দির, ভাঙা কোটা পুকুর পাড় ও ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে থাকে—তেমনি অন্ধকারও এতক্ষণ চাবি দেওয়া ঘরে, পাতকোব ভেতর ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন—এখন শাঁক ঘণ্টার শব্দে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বেরুলেন—তাঁর ভয়ানক মূর্তি দেখে রমণী-স্বভাবসুলভ শালীনতায় পদ্ম ভয়ে ঘাড হেঁট করে চক্ষু বুজে রইলেন, কিন্তু ফচকে ছুঁড়ীদের আঁটা ভার—কুমুদিনীর মুখে আর হাসি ধরে না। নোঙর করা ও কিনারার নৌকোগুলিতে গঙ্গাও কথনাতীত শোভা পেতে লাগলেন, বোধ হতে লাগলো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমালা ধারণ করে নাচতে লেগেচেন! বায়ুচালিত ঢেউগুলি তবলা বাঁয়ার কাজ কচ্চে—কোনোখানে বালির খালের নিচে একখানি পিনেস নোঙর করে বসেচেন—রকমারি বেধড়ক চলচে, গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউয়ের ঈষৎ দোলায়, কারু কারু শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে, কেউ বা ভাবে মজে পূরবী রাগিণীতে—

যে যাবার যাক্ সখি আমি তো যাব না জলে।
যাইতে যমুনাজলে, যে কালা কদম্বতলে,

আঁখি ঠেরে আমায় বলে, মালা দে রাই আমার গলে !

গান ধরেচেন, কোনোখানে এইমাত্র একখানি বোট নোঙর কল্লে—বাবু ছাতে উঠলেন, অমনি আর সঙ্গীরাও পেছনে পেছনে চললো ; একজন মোসাহেব মাজিদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'চাচা ! এ জায়গার নাম কি ?' অমনি বোটের মাজি হজুরে সেলাম ঠুকে 'আইগে কাশীপুর কর্তা ! এই রতন বাবুর গাট' বলে বকশিশের উপক্রমণিকা করে রাখলে। বাবুর দল ঘাট শুনে হাঁ করে দেখতে লাগলেন ; অনেক ঘাটে বউ ঝি গা ধুচ্ছিলো, বাবুদলের চাউনি হাসি ও রসিকতায় ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হল, দু-একটা পোষ মান্‌বারও পরিচয় দেখাতে ক্রটি কল্লে না—মোসাহেব দলে মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত ; বাবুদের প্রধান ইয়ার রাগ ভেঁজে—

অনুগত আশ্রিত তোমার
রেখো রে মিনতি আমার ॥
অন্য ঋণ হলে, বাঁচিতাম পলালে,
এ-ঋণে না মলে, পরিশোধ নাই ।
অতএব তার, ভার তোমার,
দেখো রে কোরো নাকো অবিচার ॥

গান জুড়ে দিলেন—সন্ধ্যা আহ্নিকওয়ালা বুড়ো বুড়ো মিন্‌সেরা, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে, নিষ্কর্মা মাগীরা ঘাটের উপর খাতা বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল ; বাবুরাও উৎসাহ পেয়ে সকলে মিলে গাইতে লাগলেন—মড়াখেকো কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠলো, চরন্তী শোয়ারগুলো ময়লা ফেলে ভয়ে ভোঁৎ ভোঁৎ করে খোঁয়াড়ে পালিয়ে গেল।

কোনো বাবুর বজরা বরানগরে পাটের কলের সামনেই নোঙর করা হয়েছে, গাঁয়ের বওয়াটে ছেলেরা বাবুদের রঙ্গ ও সঙ্গের মেয়েমানুষ দেখে ছোট ছোট নুড়ি পাথর, কাদা ও মাটির চাপ ছুঁড়ে আমোদ কত্তে লাগলো, সুতরাং সে ধারের খড়খড়েগুলো বন্ধ করতে হল—আরো বা কি হয় !

কোনো বাবুর ভাউলেখানি রাসমণির নবরত্নের সামনে নোঙর করেছে, ভেতরের মেয়েমানুষরা উঁকি মেরে নবরত্নটি দেখে নিচ্চে।

আমাদের নায়ক বাবু গুরুদাস বাগবাজারের পোলের আশে পাশেই আছেন ; তাঁদের বাঁয়ার এখনও আওয়াজ শুনা যাচ্চে, আতুরী ও আনিসদের বেশির ভাগ আনাগোনা হচ্চে—আনিস ও রমেদের মধ্যে যারা গেছেন, তারাই দুনো হয়ে

বেরিয়ে আসচেন ফুলুরি ও গোলাপী খিলিরা দেবতাদের মতো বর দিয়ে অন্তর্ধান হয়েচেন, কারু কারু তপস্যার ফললাভও শুরু হয়েচে —স্নেহময়ী পিসী আঁচল দিয়ে বাতাস কচ্চেন, নৌকোখানি অন্ধকার।

এমন সময় ঝম ঝম করে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি এল, একটা গোলমেলে হাওয়া উঠলো, নৌকোর পাছাগুলো দুলতে লাগলো মাজিরা পাল ও চট মাথায় দিয়ে বৃষ্টি নিবারণ কত্তে লাগলো রাত্রি প্রায় দুপুর। সুখের রাত্রি দেখতে দেখতেই যায়- ক্রমে সুখ-তারার সিঁতি পরে হাসতে হাসতে উষা উদয় হলেন, চাঁদ তার দল নিয়ে আমোদ কচ্ছিলেন, হঠাৎ উষারে দেখে লজ্জায় ম্লান হয়ে কাঁপতে লাগলেন, কুমুদিনী ঘোমটা টেনে দিলেন, পূর্ব দিক ফরসা হয়ে এল, 'জোয়ার আসচে' বলে মাজিরা নৌকো খুলে দিলে —ক্রমে সকল নৌকোয় সার বেঁধে মাহেশ ও বল্লভপুর চললো। সকলখানিই এখনো রং পোরা, কোনো কোনোখানিতে গলা ভাঙা সুরে —

এখনও রজনী আছে বল্ কোথা যাবে রে প্রাণ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব করে হোক নিশি অবসান॥
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝংকার দিত,
কুমুদী মুদিত হত, শশী যেত নিজ স্থান॥

শোনা যাচ্চে। কোনোখানি কফিনের মতো নিঃশব্দ—কোনোখানিতে কান্নার শব্দ —কোথাও নেশার গোঁ গোঁ ধ্বনি।

যাত্রীদের নৌকো চললো, জোয়ারও পেকে এল, মাল্লারা জাল ফেলতে আরম্ভ কল্লে—কিনারায় শহরের বড়োমানুষের ছেলেদের টুকপি ধোপার গাধা দেখা দিলে। ভটচাযিরা প্রাতঃস্নান কত্তে লাগলেন, মাগী ও মিনসেরা লজ্জা মাথায় করে কাপড় তুলে হাগতে বসেচে, তরকারির বজরা সমেত হেটোরা বদ্যিবাটি ও শ্রীরামপুর চললো, আড়খেয়ার পাটুনীরা সিকি ও আধ পয়সায় পার করতে লাগলো, বদর ও দফর গাজীর ফকিরেরা ডিঙেয় চড়ে ভিক্ষে আরম্ভ কল্লে, সূর্যদেব উদয় হলেন দেখে কমলিনী আহ্লাদে ফুটলেন, কিন্তু ইলিশ ধড়ফড়িয়ে মরে গেলেন। হায়। পরশ্রীকাতরদের এই দশাই ঘটে থাকে। যে সকল বাবুদের খড়দ, পেনেটি, আগড়পাড়া, কামারহাটি প্রভৃতি গঙ্গাতীর অঞ্চলে বাগান আছে, আজ তাদের ভারী ধুম, অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে গ্যাচে, কোথাও আজ শনিবার, কারু ক-দিনই জমাট বন্দোবস্ত—আয়েস ও চোহেলের হদ্দ। বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে কারু কারু বাচ খেলাবার জন্যে

পানসি তৈরি, হাজার টাকার বাচ্ হবে, এক মাস ধরে নৌকোর গতি বাড়াবার জন্যে তলায় চর্বি ঘষা হচ্ছে ও মাজিদের লাল উর্দী ও আশু পেছুর বাদশাই নিশেন সংগ্রহ হয়েছে—গ্রামস্থ ইয়ারদল, খড়দ-র বাবুরা ও আর আর ভদ্রলোক মধ্যস্থ। বোধহয় বাদী মহিন্দর নফর—চীনেবাজারের কেবিনেট মেকর—ভারী সৌখিন শকের সাগর বললেই হয়।

এদিকে কোনো কোনো যাত্রী মাহেশ পৌছলেন, কেউ কেউ নৌকোতেই রইলেন, দুই একজন উপরে উঠলেন—মাঠে লোকারণ্য, বেদীমণ্ডপ হতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত লোকের ঠেল মেরেচে। এর ভেতরেই নানাপ্রকার দোকান বসে গ্যাচে, ভিকিরিরা কাপড় পেতে বসে ভিক্ষে করছে, গায়েনরা গাচ্ছে আনন্দলহরী, একতারা, খঞ্জনী ও বাঁয়া নিয়ে বোস্টুমরা বিলক্ষণ পয়সা কুড়ুচ্চে। লোকের হর্‌রা, মাঠের ধুলো ও রোদের তাত একত্র হয়ে একটি চমৎকার মেওয়া প্রস্তুত হয়েচে; অনেকে তাই দিল্লীর লাড্ডু স্বাদে সাধ করে সেবা কচ্চেন।

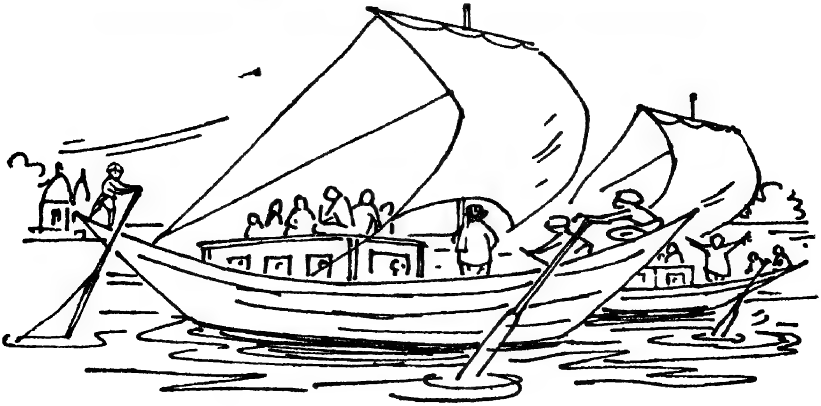

ক্রমে বেলা দুই প্রহর বেজে গেল। সূর্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে যাচ্ছে। গামছা, রুমাল, চাদর ও ছাতি ভিজিয়ে পার পাচ্চে না। জগবন্ধু চাঁদমুখ নিয়ে বেদীর উপর বসেচেন, চাঁদমুখ দেখে কুমুদিনীর ফোটা চুলোয় যাক প্রলয় তুফানে জেলেডিঙির তক্‌রা খাওয়ার মতো সমাগত কুমুদিনীদের দুর্দশা দেখে কে?

ক্রমে বেলা প্রায় একটা বেজে গেল। জগন্নাথের আর স্নান হয় না—দশ আনির জমিদার 'মহাশয়' বাবুরা না এলে জগন্নাথের স্নান হবে না। কিন্তু পচা আদা ঝালে ভরা—তাদের আর আসা হয় না, ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো, আশপাশের গাছতলা, আমবাগান ও দাওয়া দরজা লোকে ভরে

গেল, অনেকের সর্দিগর্মি উপস্থিত, কেউ কেউ শিঙে ফুঁকলেন, অনেকেই ধুতরো ফুল দেখতে লাগলো। ডাব ও তরমুজে রণক্ষেত্র হয়ে গেল, লোকের যন্না দ্বিগুণ বেড়ে উঠলো, সকলেই অস্থির। এমন সময় শোনা গেল বাবুরা এসেচেন। অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী করে জল ঢালা হল, যাত্রীরাও চরিতার্থ হলেন। চিড়ে, দই, মুড়ি, মুড়কি, চাটিম কলা দেদার উঠতে লাগলো; খোস পোশাকী বাবুরা খাওয়া দাওয়া কল্লেন। অনেকের আমোদেই পেট ভরে গ্যাচে, সুতরাং খাওয়া দাওয়া আবশ্যক হল না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনটে, শেষে চারটে বেজে গেল, বাচ খেলা আরম্ভ হল—কার নৌকো আগে গিয়ে নিশেন নেয়, এরি তামাশা দেখবার জন্যে সকল নৌকোই খুলে দেওয়া হল, অবশ্যই একদল জিতলেন; সকলে জুটে হারের হাততালি ও জিতের বাহবা দিলেন, স্নানযাত্রার আমোদ ফুরলো। সকলে বাড়িমুখো হলেন, যত বাড়ি কাছে হতে লাগলো ততই গর্মি বোধ হতে লাগলো। শেষে কাশীপুরের চিনির কল, বালির ব্রিজ পার হয়ে কেউ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উঠলেন, কেউ বাগবাজার ও আইরিটোলার ঘাটে নাবলেন। সকলেই বিষণ্ণ বদন—ম্লান মুখ; অনেককেই ধরে তুলতে হল; শেষ চার-পাঁচ দিনের পর আমোদের নাগাড় মরে—ফিরতি গোলের দরুন আমরা গুরুদাসবাবুর নৌকোখানা বেছে নিতে পাল্লেম না।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ( ১৮৪৭—১৯১৯ )

# নয়নচাঁদের ব্যবসা

---

## প্রথম পর্ব

### আঠারো

নয়নচাঁদের বাড়ি ফরাশডাঙা। নয়নচাঁদ গুলি খাইয়া থাকেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা। নয়ন, লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বন্ধুগণ আড্ডায় বসিয়া নিত্য-ক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। ক্রিয়াটির গুণ এই যে, মাঝে মাঝে মজার মজার কথা চাই। তাহা না হইলে, প্রাণে ততটা আয়েস হয় না।

তাই, লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নয়ান! আজকাল তোমার কিছু সুখ সওয়াল দেখিতেছি। চিনির জলে আর তোমার সে সোলা নাই। এখন সন্দেশটুকু রসগোল্লাটুকু এ না হইলে আর তোমার চাট হয় না। মুখে একটু তোমার কান্তি বাহির হইয়াছে, শরীরে লাবণ্য দেখা দিয়াছে, গায়ে তোমার তেলা মারিয়াছে। যকের টাকা পাইয়াছ নাকি?"

আর সকলেও বলিয়া উঠিলেন-—"সত্য হে! ব্যাপারখানা কি বলো দেখি নয়ান? গুলিখোর বলিয়া তোমাকে আর চেনা যায় না। স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে বাটিয়া যেন তুমি মুখে মাখিয়াছ। নয়ান! কিসে তোমার কপাল ফিরিল, তা বলো।"

নয়ন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া, অবশেষে বাজখাই-স্বরে বলিলেন,—"আড্ডাধারী মহাশয়! ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইঁহারা হিন্দু কি মুসলমান?"

গগন বলিলেন,—"ধান ভানিতে শিবের গীত। কোথাকার কথা কোথা! মুসলমান কেন আমরা হইতে যাইলাম? কবে তুমি কারে কাছা খুলিয়া নামাজ করিতে দেখিয়াছ যে, ফট করিয়া এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে? নয়ান! আজ তুমি আর অধিক ছিটে টানিও না, তোমার হেড্ খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"চটো কেন ছাই। কথাটা যখন বলিলাম, তখন অবশ্য তাহার মানে আছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার সংসার সচ্ছল কিসে হইল? যদি সব কথা খুলিয়া বলি, হয়তো তোমরা হাসিয়া উঠিবে। তার চেয়ে না বলা ভালো। আজকাল আমার হইল ধর্মগত প্রাণ। বন্ধু হইলে

কি হয়? তোমাদের মতি-গতি অন্যরূপ। কিসে আমার দু-পয়সা হইল, তা আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই না, আর তোমরাও জিজ্ঞাসা করিও না।"

নয়নের কথায় সকলের ঘোরতর কুতূহল জন্মিল। কিসে নয়নের পয়সা হইল, এ কথাটি শুনিবার জন্য সকলের প্রাণ বড়োই উৎসুক হইল। বলিবার জন্য নয়নকে সকলে বার বার অনুরোধ করিলেন। নয়ন কিছুতেই বলেন না। অবশেষে স্বয়ং আড্ডাধারী মহাশয় আসিয়া অনুরোধ করিলে, নয়ন বলিতে লাগিলেন।

নয়ন বলিলেন,—"আমি বলি। কিন্তু যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া যদি হাসো, কি ঠাট্টা বিদ্রূপ করো, তাহা হইলে জানিব যে, তোমরা বন্ধু নও, তোমরা মুসলমান, নাস্তিক, শাক্ত, খ্রীষ্টান, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী;—আর কি নাম করিতে বাকি রহিল, আড্ডাধারী মহাশয়?"

আড্ডাধারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"আর কি বাকি আছে? বাকি আর কিছুই নাই। সেই যে ব্রাহ্মণ-দেবতা বলিয়াছিলেন—'ওরে আঁটকুড়োর বেটারা। যদি সতেরো পর্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠারোর বাকি কি রাখিলি?' ছেলেরা কেবল সতেরো পর্যন্ত বলিয়াছিল, তা নয়ান তুমি সতেরো ছাড়িয়া উনিশ পর্যন্ত উঠিয়াছ, বাকি আর কিছু রাখো নাই। হিন্দু, ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টান যা কিছু আছে সব বলিয়াছ।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ কারে গালি দিয়াছিল, আর এ সতেরো আঠারোর মানে কি?"

আড্ডাধারী মহাশয় উত্তর করিলেন,—"এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি আঠারো বলিলে ক্ষেপিতেন। দেখা পাইলেই ছেলেরা তাই তাঁকে আঠারো বলিয়া ক্ষেপাইত। গালি তো যা মুখে আসিত তা দিতেন, তা ছাড়া ইট, পাটকেল যা কিছু সম্মুখে পাইতেন, তাহা ছুঁড়িয়া সেই ব্রাহ্মণ দেবতা ছেলেদের মারিতেন। একদিন এক পুষ্করিণীতে ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। কতকগুলি ছেলেও সেই পুকুরে স্নান করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আঠারো বলিবার নিমিত্ত ছেলেদের মুখ চুলকাইয়া উঠিল। কিন্তু ভয়! ছেলেদের গন্ধ পাইয়াই রাগে ব্রাহ্মণের গা গশ্ গশ্ করিতেছিল, জবা ফুলের মতো চক্ষু করিয়া মাঝে মাঝে তিনি কট্মট্ করিয়া ছেলেদের পানে চাহিতেছিলেন। একবার আঠারো বলিলে হয়! মনে মনে ভাবটা তাঁর এইরূপ। বড়োই বিপদ! আঠারো না বলিলেও নয়, ও-দিকে ব্রাহ্মণের এইরূপ উগ্রশর্মা মূর্তি। অনেক

ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—'ভাই। এ পুকুর পাড়ে কয়টা তাল গাছ আছে?' এ কথা বলিতেই অপর সব বালকেরা গুণিতে আরম্ভ করিল—এক, দুই, ৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।—এতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। ছেলেরা যেই সতেরো বলিল আর ব্রাহ্মণ একেবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন—'তবেরে আঁটকুড়োর বেটারা! আর বাকি রইল কি? যদি সতেরো পর্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠারোর বাকি রাখিলি কি?' এই বলিয়া নানারূপ গালি দিয়া ব্রাহ্মণ ছেলেদের মারিতে দৌড়িলেন। ছেলেরা পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া যে যে-দিকে পাইল, ছুটিয়া পলাইল। তাই বলিতেছি, নয়ান! তুমি আমাদিগকে খ্রীষ্টান বলিলে, শাক্ত বলিলে, বৈষ্ণব বলিলে মায় ব্রহ্মজ্ঞানী পর্যন্ত বলিলে। বাকি আর কি রহিল? আঠারো ছাড়িয়া উনিশ বিশ পর্যন্ত হইয়া গেল।"

নয়ন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। নয়নের মন কিছু নরম হইল। নয়ন বলিলেন—"না, না, তোমাদের আমি ও সব কথা বলি নাই। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টান কি তোমাদের আমি বলিতে পারি? আমি বলিয়াছি, যে, যে আমার কথা বিশ্বাস না করিবে, সে তাই।"

## দ্বিতীয় পর্ব

### কপাৎ

নয়ন বলিলেন, "মনের মিল থাকে, তবে বলি ইয়ার। তোমরা হিন্দু হও আমিও তাই। মুসলমান হও আমিও তাই। তোমরা যে ঠাকুরগুলি মানিবে, আমিও সেগুলিকে মানিব, আমিও যে ঠাকুরগুলিকে মানিব, তোমাদেরও সেগুলিকে মানিতে হইবে। তা না হইলে মনের মিল রহিল কোথায়?"

সকলেই বলিলেন—"ঠিক! ঠিক! নয়ান বলিতেছে ভালো। আমাদেরও ঐ মত।"

নয়ন বলিলেন,—"আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা একটু ফিরিয়াছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিব না; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করিতে বলি। আজকাল দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মতো এখন আর হাবড় হাটি

ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটি দেবতার পায় তেল দিলে চলিবে না। উহারই মধ্যে দুই চারিটি মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই চারিটি দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন! ঘরের ভাত বেশি করিয়া খাবেন।”

সকলেই বলিলেন,—“ঠিক! ঠিক! ঠিক কথা! হাবড় তাবড তেত্রিশ কোটির চাল-কলা যোগায় কে হে বাপু! পূজা না পাইয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকে, থাক। বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ সে-টি তো বুঝিতে হবে? উহার মধ্যে দু-একটি বাছিয়া লও, লইয়া বাকি সব না-মঞ্জুর করিয়া দাও।”

নয়ন বলিলেন,—“আমারও ঠিক ঐ মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দুইটি দেবতা বাহির করিয়াছি, এক গেলেন কাটিগঙ্গা আর এক হইলেন ফণীমনসা। বাকি সব না-মঞ্জুর।”

সকলেই এক বাক্য হইয়া সায় দিলেন। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, এই দুইটি দেবতাই অতি চমৎকার দেবতা। আব সমুদয় দেবতাকে না-মঞ্জুর করিয়া, মাটিতে মাথা ঠুকিযা, এই দুইটি দেবতাকে সকলে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাটিতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সকলে বলিলেন, – “হে মা কাটিগঙ্গা, হে বাবা ফণীমনসা। তোমাদেব পাযে গড। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ।”

নয়ন পুনরায বলিলেন,—“কিন্তু এখনও আসল দেবতাটির কথা বলা হয় নাই। শেষে বলিব তাই মনে কবিয়া সেটি বাকি বাখিয়াছি। সে দেবতাটি মা শীতলা। তাঁরই ববে আমার সুখ সম্পত্তি আর আমার ঐশ্বর্য। সাবধান! কাঁচা খাওয়া দেবতা!”

সকলেই বলিলেন, —“সাবধান! কাঁচা খাওয়া দেবতা।”

নয়ন বলিলেন,—“এ বাপু ঘেঁটু নয়, পেঁচো নয়, তোমার মানিকপীর নয়। এ মা শীতলা! ইংরেজি খবরের কাগজে পর্যন্ত মা-র নাম বাহির হইয়াছে। মা-র বরে আমার সব।”

শীতলাব নাম শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। ভয়ে সকলের প্রাণ আডষ্ট হইয়া উঠিল। আর একটু আগে তেত্রিশ কোটি দেবতা না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। আড়াল হইতে পাছে শীতলা সে কথাটি শুনিয়া থাকেন, এই ভয়ে সকলের মনে ঘোরতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহসে ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি করিয়া হইল ভাই? তুমি আধ পয়সার

চিনির জলে সোলা ফেলিয়া সেই সোলাটি চুষিয়া চাট করিতে। তা ঘুচিয়া আজ তোমার সন্দেশ রসগোল্লা কি করিয়া হইল ভাই?"

নয়ন বলিলেন,—"হাঁ! এখন পথে এসো! পুজা মানো তো সব কথা খুলিয়াই বলি তা না হইলে নয়ান এই চুপ।"

এই কথা বলিয়া নয়ান কপাৎ করিয়া মুখ বুজিলেন।

যার যেমন ক্ষমতা সকলে শীতলার পুজা মানিলেন। নয়ন তখন পুনরায় মুখের চাবি খুলিয়া আপনার কথা আরম্ভ করিলেন।

## তৃতীয় পর্ব

## এই কিল তো এই কিল!

নয়ন বলিতেছেন, "এবার আমার বড়োই দুর্বৎসর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনো দিন হয়, কোনো দিন হয় না। ভাগ্যক্রমে এমন সময় কলিকাতায় বসন্তের হিড়িকটি পড়িল। পরে যিনি যা করুন্ কিন্তু ফিকিরটি আমিই প্রথমে বাহির করি। জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটি লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটি শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটির একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম। টানা টানা লম্বা লম্বা দুটি চক্ষু করিলাম। পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি ছোট বড়ো বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম।

সেখানে উপস্থিত হইয়া একস্থানে শুনিলাম যে, একজন শীতলার পাণ্ডা ছিল। বসন্তরোগে তাহার তিনটি ছেলে মরিয়া গিয়াছে। রাগ করিয়া লাঠি দিয়া সে তাহার শীতলা ভাঙিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধান করিয়া সে যে খোলার ঘরে থাকিত, আমি সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার সেই ঘরটি ভাড়া করিলাম। বাড়িওয়ালী ও আশেপাশের লোককে বলিলাম যে, মা আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন। স্বপ্নে বলিয়াছেন যে, ঐ যে পাণ্ডা ছিল, সে ভালো করিয়া মা-র পুজা করিত না। লোকে পুজা দিলে, আগে থাকিতে সে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডাটি খাইয়া ফেলিত। মা তার উপর কুপিত হইয়া তাহাকে নির্বংশ করিয়াছেন। সেই দুরাচারের পরিবর্তে মা আমাকে সেবাদাস নিযুক্ত করিয়াছেন। তখন চারিদিকে খুব ডামাডোল, খুব মহামারী, লোক মরিয়া

উড়কুড় উঠিতেছে। ভয়ে লোক কাঁটা হইয়া রহিয়াছে। আমাকে পাইয়া সকলের প্রাণটা আশ্বস্ত হইল। সকলেই বলিল যে,—'মা জাগ্রত বটে! একজন পাণ্ডা যাইতে না যাইতে, কোথা হইতে শীতলা হাতে করিয়া আর একটি পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল। আর আমাদের কোনোও ভয় নাই।'

পাড়ায় আমার বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি হইল। পাড়ার পুজাতেই অনায়াসে আমার সব খরচ নির্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু অভিপ্রায় আমার তো আর তা নয়! আমার অভিপ্রায় যে, মরসুম্ থাকিতে থাকিতে দু-পয়সা রোজগার করিয়া পুনরায় ইয়ারবক্সির কাছে ফিরিয়া আসি। কলিকাতার আড্ডাগুলি সাহেবরা সব উঠাইয়া দিয়াছেন। সেখানে আমার মন টিকে না। তাই, শীতলাটি হাতে করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষায়ও বাহির হইতাম। তাই কি ছাই শীতলার গান জানি! কিন্তু চিরকাল হইতে আমি দশ-কর্মা; যে কাজে দাও, সেই কাজে আছি, সব কাজে হুনহর। নিজেই একটি শীতলার ছড়া বাঁধিলাম, তাহার কতকটা বলি, শুন—

শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই।
ছেলে বুড়ো আণ্ডা বাচ্চা টপ্ টপ্ খাই॥
চৌষট্টি হাজার এই বসন্তের দল।
গৃহস্থের ঘরে গিয়া দেয় রসাতল॥
বড়ো বসন্ত ছোট বসন্ত বসন্তের নাতি।
কারো ঘরে নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি॥
ডেকে বলে যত ঐ কাল বসন্তের পাল।
পাঁটা ছাড়া করে ছাড়াই লোকের গায়ের ছাল॥
ফাটা বসন্ত বলে আমরা কেও-কেটা নই।
ফেটে মরে মানুষ যেন তপ্ত খোলার খই॥
নেচে নেচে বলে ওই ধসা বসন্ত যত।
মাংস পচা গন্ধে প্রাণ করি ওষ্ঠাগত॥
পাতাল-মুখো বসন্ত বলে নিচে করে মুখ।
হাড় মাস খেয়ে আমরা প্রাণে পাই সুখ॥
খুদে বসন্ত বলে তোমরা মিছে করো গোল।
আমার চোটে লোকের গা ফুলে হয় ঢোল॥

হাড়ভাঙা বসন্ত বলে যারে যেথা পাই।
ছেলে বুড়ো সব আমরা কাঁচা ধরে খাই॥
শীতলা বলেন, আমি চাল পয়সা চাই।
না দিলে ছেলের মা আর রক্ষা নাই॥
চাল পয়সা আনো হবে পুজার বাজার।
বসন্ত ধরিবে নয় তো চৌষট্টি হাজার॥

বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা! ধামা ধামা চাল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা। ধামায় যেন পয়সা বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে সময় যদি কেহ বলিত যে,—'নয়ান! হাইকোর্টের জজগিরি খালি হইয়াছে, তুমি সেই জজগিরিটি করো।' আমি তাতেও রাজী হইতাম না। প্রথম দিনের রোজগারটি আনিয়া গিন্নীকে বলিলাম,—'গিন্নী! একবার বাহির হইয়া দেখো দেখি বাপ-ধন! ব্যাপারখানা কি? বড়ো যে গুলিখোর বলিয়া মুখঝামটা দাও! গুলিখোর না হইলে এরূপ ফিকির বাহির করে কে, বাপ-ধন? এরূপ বুদ্ধি যোগায় কার?'

কিন্তু, দেখো লম্বোদর ভায়া! তোমাদের আমি একটি জ্ঞানের কথা বলি। সাদা-চোখোদের যে কখনও বিশ্বাস করিবে না, সে কথা বলা বাহুল্য। সাদা-চোখোদের মনটি সদাই জিলেপির পাক। সত্য কথা কারে বলে, তারা একেবারে জানে না। প্রমাণ চাও? আচ্ছা প্রমাণ করিয়া দিই। এই দেখো, ছিঁচকে-চোর বলিয়া তাহারা আমাদের মিথ্যা অপবাদ রটায়। আচ্ছা তাহারা তামা, তুলসী, গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলুক,—কবে কার ছিঁচকে কোন্ গুলিখোর চুরি করিয়াছে? আড্ডাধারী মহাশয়! আপনিও বলুন,—ছিটের জন্য কবে কোন্ গুলিখোর আপনার নিকট ছিঁচকে আনিয়াছে? ঘটি চোর বলো, বাটি চোর বলো, ঘাড় হেঁট করিয়া মানিয়া লই। তোমাদের দু-কড়ার ছিঁচকে কে চুরি করে বাপু? তাই বলি, হে সাদা-চোখোগণ! ভুলিয়াও কি কখনও তোমরা সত্য কথা বলিতে শিখিবে না?"

লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। সাদা-চোখোদের বিশ্বাস নাই। সাদা-চোখোদের ছাওয়া মাড়াইলে নাইতে হয়।"

য়ন বলিলেন,—"আর বিশ্বাস করিও না, এই পেশাদার মাতালদের। মন াদের সাদা বটে, কিন্তু কখন কি ভাবে থাকে, তার ঠিক নাই। সাত ঘাটের এক করিয়া তুমি চারিটি পয়সা যোগাড় করিলে, আড্ডায় আসিয়া সেই

চারি পয়সার ছিটে টানিলে, নেশাটি করিয়া তুমি আড্ডা হইতে বাহির হইলে, আর হয়তো কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল। তোমার নেশাটি চটিয়া গেল। শীতকাল, মেঘ করিয়াছে, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুরফুর করিয়া বাতাস হইতেছে। সহজেই নেশাটি বজায় রাখা ভার, তার উপর কোথা হইতে হয়তো একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ে হড়হড় বমি করিয়া দিল। তোমার নেশাটির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল। পেশাদার মাতালেরা এইরূপ লোকের মর্মান্তিক করে। পাল-পার্বণে পেট ভরিয়া মদটুকু খাওয়া গেল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকা গেল, মৌজ হইল, এ কথা বুঝি তা নয়। সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, দিন নাই, ক্ষণ নাই, অষ্টপ্রহর তুমি মদ খাইয়া তর্ হইয়া থাকিবে। মেজাজটি গরম করিয়া রাখিবে। ঠাকুর দেবতা লইয়া তোমার বাড়িতে লোকে গান করিতে আসিবে, আর লাঠি লইয়া তুমি তাদের মারিতে দৌড়িবে। এ কি বাপু! এরে কি ভালো কাজ বলে? না এরে হিন্দুধর্ম বলে? থুঃ! ছিঃ!"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"এইরূপ কোনোও একটা মাতালের পাল্লায় পড়িয়াছিলে না কি?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই! তবে ভাগ্যে আমার শীতলাটি জাগ্রত, হেলা ফেলা গুড়ুক তামাকের শীতলা নয়, তাই সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।"

সকলেই অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপারখানা কি বলো দেখি?"

নয়ন বলিলেন,—"ভাই! একদিন প্রাতঃকালে শীতলাটি হাতে করিয়া এক মাতালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। জানি কি ছাই যে, সে মাতালের বাড়ি? তাহা হইলে কি আর যাইতাম? তার বাড়িতে গিয়া, মন্দিরেটি বাজাইয়া সবেমাত্র আরম্ভ করিয়াছি,—"শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই"— আর মিন্‌সে করিল কি জানো ভাই! এক না কম্বল-মুড়ি দিয়া, 'আঁ আঁ' শব্দ করিতে করিতে, ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে দৌড়িয়া আসিল। তার সেই বিকট 'আঁ আঁ' শব্দ শুনিয়াই পেটের পিলে আমার চম্‌কিয়া গেল। শশব্যস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া আমি পলাইবার উদ্যোগ করিলাম। তা ভাই! পলাইতে না পলাইতে বেটা যেন ঠিক কেঁদো বাঘের মতো আসিয়া আমার পিঠের উপর পড়িল। তারপর দুঃখের কথা বলিব কি ভাই, এই কিল! এই কিল,

এই কিল! আর সে কিল তো নয়! এক একটি কিলে মনে হইল যেন পিঠের সব জায়েন খুলিয়া গেল। ভাবিলাম,—হায় হায়! কেন মরিতে শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়াছিলাম? শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়া, এমন যে সখের প্রাণটি, সে প্রাণটি আজ হারাইলাম।”

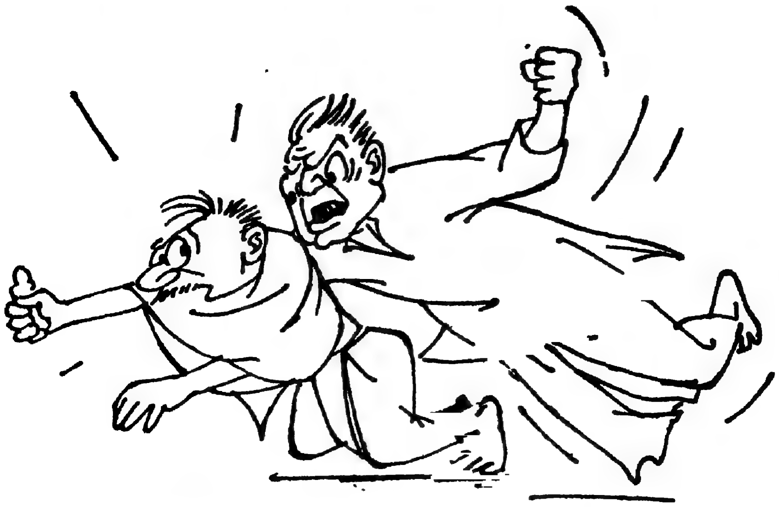

## চতুর্থ পর্ব

### বসিয়া আছে দুইটি ভূত

“যাহা হউক মনের সাধে কিল মারিয়া মিনসে আমার শীতলাটি কাড়িয়া লইল। আমি পলাইলাম। প্রাণটা যে রক্ষা পাইল, তাই ঢের। পথে যাইতে যাইতে, মনে মনে শীতলাকে বলিলাম যে,—“মা! আর তোমার গান করিতে আমি চাই না, তোমার চাল পয়সা আর চাই না। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই তুমি রক্ষা করো, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই।”

গগন বলিলেন,—“ঈশ! তাই তো। এ যে ঠিক সেই সুবল ঘোষের কথা।”

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সুবলের কি হইয়াছিল?”

গগন বলিলেন,—“দুধ বেচিয়া সুবলের পিসী কিছু টাকা করিয়াছিলেন। পিসী মরিয়া যাইলে সুবল সেই টাকাগুলি পাইলেন। টাকা পাইয়া সুবল মনে করিলেন যে, দুর্গোৎসবটি করি। ঠাকুর গড়া হইল, পুজার দিন আসিল। সিঙ্গি, চোরা, ময়ুর, গণেশের শুঁড়, এইসব দেখিয়া সুবলের মনে বড়ো আনন্দ

হইল, হাড়ে হাড়ে তাঁর ভক্তি বিঁধিয়া গেল। পুজার কয়দিন স্বয়ং নিজে ক্রমাগত শাঁক বাজাইলেন। প্রাণপণ চিক্কুড়ে শাঁকে ফুঁ দিলেন। কোঁত পাড়িয়া শাঁক বাজাইতে বাজাইতে এখন গোগ্‌গোলটি বাহির হইয়া পড়িল। তারপর সেই গোগ্‌গোলের জ্বালায় অস্থির! গোগ্‌গোলের জ্বালায় অস্থির হইয়া, বিসর্জনের সময় সুবল গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গলায় কাপড় দিয়া, হাত জোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—

ধন চাই না মা! মান চাই না মা!
চাই না পুত্তুর বর।
এখন শঙ্খ বাজাইতে গিয়া এই বেরিয়েছে
গোগ্‌গোল তাই রক্ষা কর॥

নয়ানেরও ঠিক তাই হইয়াছিল। চাল চাই না মা! পয়সা চাই না মা! এখন এই হাড়গুলি জোড়া লাগাইয়া দাও। কেমন হে নয়ান! ঠিক নয়?"

নয়ান বলিলেন,—"হাঁ ভাই, ঠিক তাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বলিব কি ভাই! পাঁচ-সাত দিন পরে আমার নামে এক চিঠি! যে শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল তার চিঠি। ডাকে সেই খোলার ঘরে গিয়া চিঠি উপস্থিত। মাতালটা আমার ঠিকানা জানিল কি করিয়া? চিঠিতে লেখা ছিল যে শীঘ্র আসিয়া তোমার শীতলা লইয়া যাইবে। তোমার এ জাগ্রত শীতলা। এ শীতলা লইয়া আমি বড়ো বিপদে পড়িয়াছি। তোমার কোনো ভয় নাই। শীঘ্র তোমার শীতলা লইয়া যাইবে।

যাই কি না যাই? এই কথা লইয়া মনে মনে অনেক তোলা-পাড়া করিতে লাগিলাম। গিন্নী রাগিয়া বলিলেন,—'যাও-ই-না ছাই! তোমায় সে কি খাইয়া ফেলিবে?'

আমি বলিলাম,—'তুমি তো বলিলে, যাও-ই-না ছাই! কিন্তু সে কিলের স্বাদ তো আর তুমি জানো না? মনে করিতে গেলে এখনও আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। চুনে-হলুদ বাটিয়া হাতে তোমার কড়া পড়িয়া গেল, তবু বলো, যাও-ই-না-ছাই। এঁটেল মাটি দিয়া আর একটি শীতলা গড়িতে পারিব, প্রাণটি তো আর এঁটেল মাটি দিয়া গড়িতে পারিব না!'

যাহা হউক, অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। সন্ধ্যার পর, ভয়ে ভয়ে, কাঁপিতে কাঁপিতে, প্রাণটি হাতে করিয়া সেই মাতালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটির ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ন জনঃ ন মানবঃ। কাহাকেও

দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাপ্‌ রে! বলিতে এখনও সর্বশরীর শিহরিয়া ওঠে! বাহিরের ঘরের ভিতরে দেখি, না, বসিয়া আছে দুইটি ভূত!"

লম্বোদর বলিলেন,—"মাইরি!"

নয়ন বলিলেন,—"মাইরি ভাই! দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন দুইটি ভূত।

সর্বশরীর ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পা যেন মাটিতে পুঁতিয়া গেল। টাকরা পর্যন্ত ধূলি মাড়িয়া গেল! পলাইতে পা উঠে না, চেঁচাইতে রা সরে না! অজ্ঞান হতভোম্বা হইয়া আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দুইজনের মধ্যে যিনি কর্তা ভূত, আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ দিয়া তাঁর আগুনের হল্‌কা বাহির হইতে লাগিল। তিনি আমাকে হাতছানি দিয়া ভিতরে ডাকিলেন। আমাতে কি আর আমি ছিলাম যে, ভাবিব চিন্তিব? সুড়সুড় করিয়া ভিতরে যাইলাম। আমাকে বসিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে আমি ঘরের একপাশে বসিলাম।

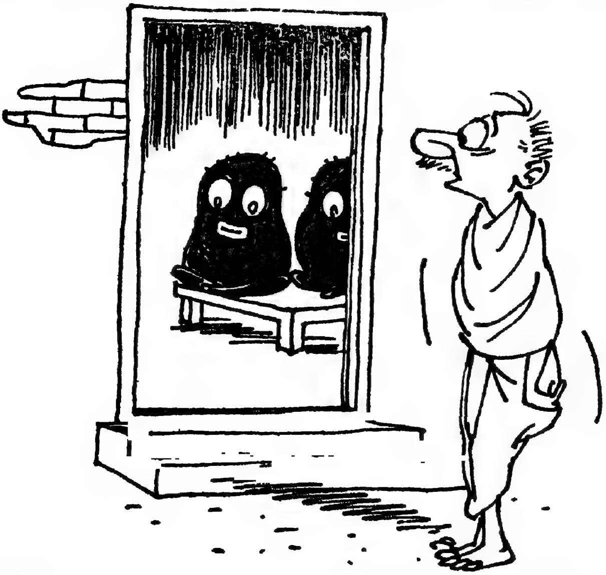

কর্তা ভূত বলিলেন,—'আমাকে চিনিতে পারিলে না। আমি আর কেহ নই, আমি সেই মিত্তির-জা, যে তোমার শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল। তোমার এ শীতলাটি জাগ্রত বটে! কেবল ঐ শীতলাটির জন্য ভূত হইয়া আমাকে আট্‌কে থাকিতে হইয়াছে, তা না হইলে বাস আমার বৈকুণ্ঠে। এখন তোমার

শীতলাটি ফিরিয়া লও, আমি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাই।'

দ্বিতীয় ভূত বলিলেন,—'আহা! ইহারে তুমি অনেক কিল মারিয়াছ, তাড়াতাড়ি বিদায় করিও না। ইহার শীতলা কেন যে জাগ্রত, সে কথাগুলি ইহাকে খুলিয়া বলো। লোকের কাছে গিয়া এ গল্প করিবে। তাহা হইলে লোকে আরও ভক্তিভরে ইহার শীতলাকে পুজা দিবে। ইহার দু-পয়সা রোজগার হইবে। পেটে খাইলে পিঠে সয়। পিঠে বিলক্ষণ হইয়াছে; এখন পেটে খাইবার সুবিধা করিয়া দাও।'

কর্তা-ভূত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেমন হে! সব কথা শুনিতে চাও? কিসে বৈকুণ্ঠটি আমার কানের কাছ দিয়া গিয়াছে, সে কথা শুনিতে চাও?'

ভূতেদের কথা শুনিয়া আমার মনে অনেকটা সাহস হইয়াছিল, ধড়ে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল; আমি বলিলাম,—'আজ্ঞে হাঁ, শুনিতে চাই বই কি? তবে মহাশয়ের কিলের কথা মনে হইলে, আর জ্ঞান থাকে না।'

কর্তা-ভূত হাসিয়া বলিলেন,—'না, না, আর কিল মারিব না। তোমার ঘাড়ও মটকাইয়া দিব না। কেন তোমার শীতলাকে জাগ্রত বলিতেছি, এখন সে সকল কথা শুন।"

আড্ডাধারী মহাশয় ও লম্বোদর গগন প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন,—"নয়ান! তোমার সাহস তো কম নয়! স্বচ্ছন্দে বসিয়া ভূতেদের সঙ্গে তুমি গল্পগাছা করিলে? বুকের পাটা তো তোমার কম নয়?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"বেঁধে মারে সয় ভালো। করি কি? ভূতের খর্পরে গিয়া পড়িয়াছি, পলাইবার তো যো ছিল না। কাজেই কাদায় গুণ ফেলিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তা না হইলে সদাই ভয় হইতেছিল। কি জানি? ভূতের মরজি! যদি বলিয়া বসে যে, তোমার পিঠ দেখিয়া আমাদের হাত সুড়-সুড় করিতেছে, এসো দুইটি কিল মারি। তোমার ঘাড় দেখিয়া আমাদের হাত নিশ-পিশ করিতেছে, এসো ভাঙিয়া দিই! তাহা হইলে কি করিতাম! যাহা হউক, সেরূপ কোনো বিপদ ঘটে নাই। ভূতগুলি দেখিলাম, ভালো মানুষ ভূত। সেই কর্তা-ভূতের এখন আশ্চর্য কাহিনী শুন।"

## পঞ্চম পর্ব

### কর্তা-ভূত বলিতেছেন!

কর্তা-ভূত বলিতেছেন,—তোমার শীতলাটি কাড়িয়া মনে মনে আমার বড়োই

আনন্দ হইল। কারণ এইরূপ কাজে যেরূপ আমার আনন্দ হইত, এমন আর কোনোও কাজে নয়। কিন্তু তোমার শীতলাটি জাগ্রত শীতলা ; মরা শীতলা নয়। ভালো এঁটেল মাটি, ভালো সিন্দুর, ভালো রাঙতা দিয়া গড়া। বেলে মাটি নয়, মেটে সিন্দুর নয়, জাল রাঙতা নয়। তাই দুই দিন পরেই আমার বসন্ত হইল। তোমার সেই চৌষট্টি হাজার বসন্তে আমায় ছাইয়া ধরিল। চুলের ডগা হইতে পায়ের কড়ে আঙুলের আগা পর্যন্ত, তিল রাখিবার স্থান ছিল না। বৈদ্য আসিয়া মহাদেব-চূর্ণ ও গৌরচন্দ্রিকা ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। মহাদেব চূর্ণ খাইতে দিলেন, আর গৌরচন্দ্রিকা ঘৃত গায়ে মাখিতে বলিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা দেখিয়াই বুঝিলাম যে, এবার গতিক বড়ো ভালো নয়। তিন দিন পরে রাত্রিকালে যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিল। চারিটি যমদূত আসিয়াছিল। সব বিকট মূর্তি, দেখিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিটি খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে, টিকিটি ধরিয়া আমাকে যমপুরে লইয়া যায়! কিন্তু আগে থাকিতে আমি একটি বুদ্ধির কাজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেইদিন প্রাতঃকালে, রোগের বে-গতিক দেখিয়া মনে মনে করিলাম যে, পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কোনোও একটি পুণ্যকর্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি জাল প্রভৃতি যাহা কিছু পাপ কর্ম, সকলই করিয়াছি। ভালো কাজ একটিও কখনও করি নাই। এখন তো দেখিতেছি, মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কি? তাই মনে করিলাম যে, এই অন্তিমকালে একটি পুণ্য কাজ করি। আমি চান্দ্রায়ণটি করিলাম! গোয়ালে আমার একটি এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিত্তির-জা! আমার গোয়ালের এঁড়ে বাছুর কেমন তা বুঝিয়া লও। এক ফোঁটা দুধ থাকিতে গাইকে আমি কখনও ছাড়ি নাই। মা-র দুধ কারে বলে বাছুরটি তা কখনও চক্ষে দেখে নাই। অন্য খাওয়া দাওয়াও তদ্রূপ। সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটি অস্থিচর্মসার হইয়াছিল। মর মর হইয়াছিল। সেই এঁড়ে বাছুরটি একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলাম। দড়ি ধরিয়া বাছুরটিকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ির বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুর শুইয়া পড়িল, সেইখানেই মরিয়া গেল।

চান্দ্রায়ণ করিতে মাথাটি নেড়া হইয়াছিলাম। মাথাটি ঠিক বোম্বাই ওলের মতো হইয়াছিল। যমদূতেরা টিকি ধরিয়া আমাকে যমের বাড়ি লইয়া যাইবেন, তার যো ছিল না। অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে,

টিকি নাই। যমদূতেরা ফাঁপরে পড়িল। কি করিয়া আমাকে লইয়া যায়? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌরচন্দ্রিকা-ঘৃতে আর বসন্তের রসে আমার গা হড়হড়ে হইয়াছিল। অনায়াসেই আমি হাতটি ছাড়াইয়া লইলাম। পা ধরিল, হড়াৎ করিয়া পা-টিও ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আর আমি পিছলে গিয়া সরিয়া বসি। কখনও তক্তপোশের উপর, কখনও তক্তপোশের নিচে, কখনও ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ কোণে, সে কোণে, যমদূতদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে আমি এইরূপ পেছলা-পিছলি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তারা হইল চারিজন, আমি হইলাম একা। কতক্ষণ আর পেছলা-পিছলি করিব? ভোর মাথায় তাহারা হাতে ছাই ও মাটি মাখিয়া আসিল। সুতরাং আর আমি পিছলে যাইতে পারিলাম না। তাহারা আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

উত্তমরূপে বাঁধিয়া, যমদূতেরা আমাকে কাঁটাবন দিয়া হিঁচড়ে লইয়া চলিল। আমি পাপী কি না? কাঁটা ফুটিয়া, ছড়িয়া গিয়া, শরীর হইতে আমার দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। অবশ্য জীয়ন্ত অবস্থায় যে শরীরে আমি মিত্তির-জা ছিলাম, সে শরীর নয়। যে শরীর যমালয়ে যায়, সেই শরীর; ঠিক বুড়ো আঙুলের মতো। সকাল হইল। প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিবার নিমিত্ত যমদূতেরা একটি পুকুরের শান-বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল। একটি যমদূত আমার নিকট পাহারা রহিল, বাকি তিনজন মাঠে ঘাটে যাইল।

আমার নিকট যে যমদূতটি ছিল, সে আমাকে বলিল—"খুব মজার লোক তো তুমি। এত লোককে আমরা লইয়া যাই,—কিন্তু সমস্ত রাত্রি পেছলা-পিছলি কাহারও সঙ্গে কখনও করিতে হয় নাই। আচ্ছা, ভালো, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার মাথায় তো টিকি দেখিলাম না। অনেকের মাথায় আজকাল টিকি দেখিতে পাই না। টিকি না পাইলে আমাদের বড়োই অসুবিধা হয়। তা আমাদের অসুবিধা হয় হউক, তাহাতে বড়ো ক্ষতি নাই। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করি এই যে, এই যাদের মাথায় টিকি না থাকে, তাদের সঙ্গে লোকের ঝগড়া হইলে, লোকেরা কি ধরিয়া তাদের দুই গালে দুই থাবড়া মারে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"চড় খাইতে সুবিধা হইবে বলিয়া কি লোকে মাথায় টিকি রাখে?"

যমদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি জন্যে? আমরা ভালো করিয়া ধরিতে

পারিব, সেই জন্যে ?”

আমি উত্তর করিলাম—“তাও নয়। এই যে তারের খবর আছে, সেই টুক্ টুক্ করিয়া শব্দ হয় ? টিকি না থাকিলে, মাথা দিয়া সেই তারের খবর বাহির হইয়া যায়। সেই জন্য লোকে মাথায় টিকি রাখে।”

যমদূত বলিলেন,—“ওঃ বটে। সেই জন্যে ? এখন বুঝিলাম।”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যমদূত বলিলেন,—“তোমাদের পাড়ার নেই-আঁকুড়ে দাদাকে জানিতে ?”

আমি বলিলাম,—“জানিতাম বই কি, আজ কয় বৎসর তিনি মরিয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি, মরিয়া ভূত হইয়াছেন।”

যমদূত বলিলেন,—“হাঁ ! তিনি ভূত হইয়াছেন। ভগিনীকে যমযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি বলিয়াছিলেন, এই পুষ্করিণীটি আমার।”

আমি বলিলাম,—“এ পুষ্করিণী তাঁর কেন হবে ? এ পুকুর যে রাঘব গাঙ্গুলীর !”

যমদূত বলিলেন,—“হাঁ, এ পুষ্করিণী রাঘব গাঙ্গুলীর বটে, তবে নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিয়াছিলেন যে, আমার—সে কেবল ভগিনীকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কি হইয়াছিল বলিবেন ?”

যতদূত বলিলেন ;—“বলিব না কেন, বলিব ! তবে তুমি যে মহিরাবণের বেটা অহিরাবণের মতো পেছলা-পিছলি করো ! সে জন্য তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। যাহা হউক, শুন।”

## ষষ্ঠ পর্ব

### নেই-আঁকুড়ে দাদা

যমদূত বলিতেছেন,—নেই-আঁকুড়ে দাদার একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। একাদশীর দিন বৈকাল বেলা বাড়ির নিকট বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি কলা গাছে দিব্য একখানি আঙট পাতা হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে করিলেন যে, কাল এই আঙট পাতা খানিতে আমি ভাত খাইব। দৈবের কর্ম, সেই রাত্রিতে তাঁর মৃত্যু হইল। বিধবা অতি পুণ্যবতী ছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার নিমিত্ত

আসিল। এদিকে আবার একাদশীর দিন খাবার বাসনা করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও তাঁহাকে লইতে যাইলাম। বিধবাকে লইয়া বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইল! সেই ঘরের ভিতর, সেই রাত্রিতে, বিষ্ণুদূতে আর যমদূতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল! অবশেষে আমরা জিতিলাম। বিষ্ণুদূতদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। যেমন তোমাকে লইয়া যাইতেছি, সেইরূপ বিধবাকেও কাঁটাবন দিয়া হিড হিড করিয়া টানিয়া লইয়া

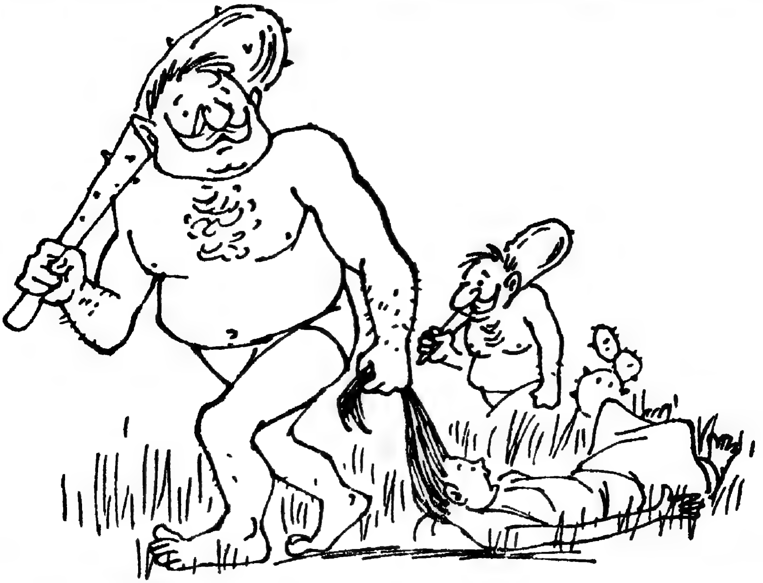

চলিলাম। যমপুরীতে লইয়া উপস্থিত করিলাম। বিধবার মাথায় ক্রমাগত ডাঙ্গশ মারিতে যম হুকুম দিলেন। ডাঙ্গশের প্রহারে জর-জর হইয়া বিধবা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল যে,—“হায় রে! যদি আমার নেই-অঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, কি করিয়া যম আমার এরূপ সাজা দিত?” যমের কানে সেই কথাটি প্রবেশ করিল। যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মাগী কি বলিতেছে?” আমরা বলিলাম,—“বিধবা বলিতেছে যে, যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম যম কি করিয়া আমার এরূপ সাজা করিত।” যমের রাগ হইল। যম বলিলেন—“নিয়ে আয় তো রে ওর নেই-আঁকুড়ে দাদাকে! দেখি, কি করিয়া সে আপনার বোনকে বাঁচায়?” নেই-আঁকুড়ে দাদাকে আনিতে আমরা দৌড়িলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভগিনী যে মরিয়াছে, ভগিনীর যে এরূপ দুর্দশা হইয়াছে,

তাহার তিনি কিছুই জানিতেন না। আমরা তাঁহাকে উঠাইলাম। আমরা বলিলাম—"চলুন, যম আপনাকে ডাকিতেছেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কি সময় হইয়াছে?" আমরা বলিলাম,—"না, আপনার এখনও সময় হয় নাই, এই শরীরেই আপনাকে একবার যমের বাড়ি যাইতে হইবে। একটা কথার মীমাংসা করিয়া আপনি ফিরিয়া আসিবেন।" নেই-আঁকুড়ে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কথাটি কি? শুনিতে পাই না?" যমের বাড়ি গিয়া তাহার ভগিনী কি বলিয়াছিলেন, আমরা সে-সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—"বটে! আচ্ছা, চলো যাই।" পথে যাইতে যাইতে নেই-আঁকুড়ে দাদা ক্রমাগত বলিতে বলিতে চলিলেন,—"দেখ, এই স্থলে আমি একটি দেবালয় করিব মানস করিয়াছি।" আবার খানিক দূর গিয়া,—"এই স্থলে আমি একটি অতিথিশালা করিব, আমার এই ইচ্ছা।" আবার খানিক দূর গিয়া,—"সাধারণে জল পান করিবে বলিয়া এই জলাশয়টি আমি করিয়া দিয়াছি।" এইরূপ স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, রাস্তা ঘাট করিবার কথা আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন। যমপুরীতে উপস্থিত হইলাম, যমের সম্মুখে নেই-আঁকুড়ে দাদাকে খাড়া করিয়া দিলাম। যম বলিলেন,—"নেই-আঁকুড়ে শোন্, তোর বোন্ ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন আওট পাতে ভাত খাইবার মানস করিয়াছিল। সেই পাপের জন্য আমি তার মাথায় ডাঙ্গশ মারিতে হুকুম দিয়াছি। সে বলে আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা থাকিলে যম আমার এরূপ সাজা দিতে পারিত না। তার আস্পর্ধার কথা শুনিয়া তোরে আমি এখানে আনিয়াছি। কী করিয়া বোন্‌কে বাঁচাইবি বাঁচা।" নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—"আমার পুণ্যের অর্ধেক আমি আমার ভগিনীকে দিলাম। সেই পুণ্য লইয়া আমার ভগিনীকে আপনি খালাস দিন।" নেই-আঁকুড়ের কি পুণ্য আছে দেখিবার নিমিত্ত যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। খাতা-পত্র দেখিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, নেই-আঁকুড়ের পুণ্য কিছুই নাই। রাগিয়া যম বলিলেন,—"শুন্‌লি তো নেই আঁকুড়ে, তোর এক ছটাকও পুণ্য নাই। বোন্‌কে তার আবার ভাগ দিবি কি?" নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—"পুণ্য আছে কি না আছে, আপনার এই যমদূতদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।" যম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম,—"হাঁ মহাশয়! পথে আসিতে আসিতে; এখানে দেবালয় করিবার মানস আছে, এখানে স্কুল করিবার মানস আছে,

নেই-আঁকুড়ে এইরূপ নানা কথা বলিয়াছিলেন।” যম আরও রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—“ভণ্ড! সে সকল কাজ তো তুই করিস্ নাই, কেবল মনে মনে মানস করিলে কি হইবে?” নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—“আমার ভগিনী আঙটপাতে ভাত খাইয়াছিলেন, না কেবল মানস করিয়াছিলেন?” যম বলিলেন,—“মানস করিয়াছিল।” নেই-আঁকুড়ে বলিলেন,—“তবে?” যম বুঝিলেন। যম বুঝিলেন যে, কেবল মানস করিলে যদি পাপের শাস্তি দিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যের মানস করিলেও পুণ্যের ফল দিতে হয়। বে-আইনী করিয়া তিনি যে বিধবার মাথায় ডাঙ্গশ মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যম এখন তাহা বুঝিলেন। বিধবাকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া বিধবাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নেই-আঁকুড়ে দাদা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কিছুদিন পরে নেই-আঁকুড়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার গতি হয় নাই। ভূত হইয়া তিনি এখন লোকের উপর উপদ্রব করিতেছেন।

## সপ্তম পর্ব

### এঁড়ে গোরু

কর্তা-ভূত অর্থাৎ মিত্তির-জা বলিতেছেন —যমদূতদিগের কাজ সারা হইলে পুনরায় তাহারা আমাকে যমালয় অভিমুখে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পরে যমপুরীতে গিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। যমদূতেরা যমের সম্মুখে আমাকে খাড়া করিয়া দিল। যম সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে খাতা-পত্র লইয়া চিত্রগুপ্ত। চারিদিকে শত শত বিকটমূর্তি যমদূত। কাহারও হাতে মুগুর, কাহারও হাতে ডাঙ্গশ, কাহারও হাতে সাঁড়াশি। আমার পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখিতে যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। অনেক খাতাপত্র উল্টাইয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—“মহাশয়! ইহার পুণ্য তো কিছুই দেখিতে পাই না, সকলই পাপ! অতি উৎকট উৎকট পাপ। ইহার মতো মহাপাতকী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। মরিবার সময় এ যে চন্দ্রায়ণটি করে, তাও সব ফাঁকি। যমদূতদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত কেবল মাথাটি নেড়া হইয়াছিল। পুণ্য ইহার কিছুমাত্র নাই, কেবল পাপ। তবে এক বিন্দু পুণ্য আছে এই যে, মৃত্যু হইবার পূর্বে একজন ব্রাহ্মণকে একটি মর-মর এঁড়ে গোরু দান করিয়াছিল।

কিন্তু বাছুরটি ব্রাহ্মণকে ঘরে লইয়া যাইতে হয় নাই ; পথেই শুইল, আর মরিল। মরিয়া সে এঁড়ে বাছুরটি এখন যমপুরীতে আসিয়াছে।”

আমাকে সম্বোধন করিয়া যম বলিলেন,—“কেমন হে মিত্তির-জা! চিত্রগুপ্তের মুখে তোমার হিসাব শুনিলে তো! এখন তুমি কি করিতে চাও! তোমার যে রতিমাত্র পুণ্যটুকু আছে, আগে তাহার ফল ভোগ করিয়া লইতে চাও, না আগে পাপের ভোগ ভুগিতে চাও ?”

আমি উত্তর করিলাম,—“মহাশয়! আপনার এখানে কিরূপ দস্তুর, কিরূপ আইন কানুন, তা তো আমি জানি না। আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন, আমার পুণ্যের ফল কিরূপ হইবে, আর পাপের ভোগই বা কি প্রকার হইবে ? তারপর আমি আপনাকে বলিব, আগে আমি কোন্‌টি চাই।”

যম উত্তর করিলেন,—“সমস্ত জীবন তুমি উৎকট উৎকট মহাপাতক করিয়াছ। সেজন্য চিরকাল তোমাকে রৌরব প্রভৃতি নরকে বাস করিতে হইবে। তোমার গলিত দেহে কৃমি প্রভৃতি নানারূপ ভয়াবহ কীট দংশন করিবে, অগ্নিতে তোমাকে পুড়িতে হইবে। অষ্টপ্রহর যমদূতে তোমার মাথায় ডাঙ্গশ মারিবে। সাঁড়াশি দিয়া যমদূতে তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়িবে। বিধিমতো তোমার যন্ত্রণা হইবে, যাতনায় তুমি চিৎকার করিবে। চিরকাল তোমাকে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তবে সেই যে, সামান্য একটু নামমাত্র পুণ্য করিয়াছিলে, মরিবার পুর্বে সেই যে মর-মর এঁড়ে বাছুরটি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলে, কেবলমাত্র একদিনের জন্য সেই পুণ্যটুকুর ফল ভোগ করিতে পাইবে। সেই এঁড়ে গোরুটি এখন এখানে আসিয়াছে। এক দিনের জন্য তাহারে তুমি যা আনিয়া দিতে বলিবে, তাহাই সে আনিয়া দিবে ; যা করিতে বলিবে, তাহাই সে করিবে। তোমার পুণ্যের ফল এই।”

আমি বলিলাম,—“পুণ্যের ফলটি আমি প্রথমে ভোগ করিয়া লইব। পাপের দণ্ড যাহা হয়, তাহার পর আপনি করিবেন।”

যম আজ্ঞা করিলেন,—“ওরে! মিত্তির-জার সেই এঁড়ে গোরুটা আন্ তো!”

এঁড়ে গোরু আনিতে যমদূত সব দৌড়িল। এঁড়ে গোরু আনিয়া যমের দরবারে হাজির করিল। আমি দেখিলাম, এখন আর সে অস্থিচর্ম-সার এঁড়ে বাছুর নাই। আমার ঘরে খাবার কষ্ট ছিল, যমের ঘরে তো আর সে কষ্ট ছিল না! যমপুরীতে অনেক খোল ভূষি খাইয়া বাছুরটি এখন বিপর্যয় এক ষাঁড় হইয়াছিল। লম্বা লম্বা বিপর্যয় দুই শিং! দেখিলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়! চক্ষু ঘোর

রক্তবর্ণ! রাগে আস্ফালন করিয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে। রাগে পা দিয়া মাটি চষিয়া ফেলিতেছে। কারে গুঁতোই, কারে মারি, সদাই এই মন! দুই দিকে দুই দড়ি ধরিয়া চারিজন যমদূতে টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

যম বলিলেন,—"মিত্তির-জা! এই তোমার সেই এঁড়ে গোরু! তুমি ইহাকে যাহা বলিবে, এই এঁড়ে গোরু আজ সমস্ত দিন তাহাই করিবে।"

এঁড়ে গোরুকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত যম আদেশ করিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, শিং নিচে করিয়া, এঁডে গোরু আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেমন হে এঁডে গোরু! আজ আমি তোমাকে যা বলিব, তাই তুমি করিবে তো?"

এঁড়ে গোরু উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ! আজ সমস্ত দিন আপনি যাহা করিতে হুকুম করিবেন, আমি তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম,—"এঁডে গোরু। তবে তুমি এক কাজ করো। তোমার একটি শিং যমের নাভিকুণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দাও, আর একটি শিং চিত্রগুপ্তের নাভিকুণ্ডলে দিয়া, আজ সমস্ত দিন এই দুই জনকে ঘুরাও, সমস্ত দিন দুই জনকে বন্ বন্ করিয়া চরকির পাক খাওয়াও।"

লম্বোদর, গগন, আড্ডাধারী মহাশয়, সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন,—"বাহবা! বাহবা! মিত্তিব-জা! তুমি একজন লোক বটে! কিন্তু নয়ান, মিত্তির-জা তোমাকে ঠিক কথা বলেন নাই। নাভিকুণ্ডলে মিত্তিরজা যে শিং দিতে বলিবেন, মিত্তির-জা তেমন পাত্র নন্। শরীরের অন্যস্থানে শিং দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি ভদ্রসমাজে বলিবার যোগ্য নয়। সেই জন্য বোধহয় মিত্তির-জা তোমার নিকট আসল কথাটি গোপন করিয়াছিলেন।"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"আমারও মনে সে সন্দেহটি উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, যখন এই নাভিকুণ্ডলের কথাটি বলেন, তখন মিত্তির-জা ভূতের মুখে ঈষৎ একটু হাসির রেখা দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, মিত্তির-জা ভূত কি বলিতেছেন তাহা শুন।"

মিত্তির-জা ভূত বলিলেন,—আমার আদেশ পাইয়া এঁড়ে গোরু, যম ও চিত্রগুপ্তকে তাড়া করিল। ভয়ে দুই জনের প্রাণ উড়িয়া গেল। সিংহাসন হইতে যম লাফাইয়া পড়িলেন। খাতা-পত্র ফেলিয়া চিত্রগুপ্তও লাফাইয়া

পড়িলেন। তারপর, এই দৌড়! দৌড়! প্রাণপণ যতনে দৌড়। কিন্তু দৌড়িয়া যাবেন কোথা? এঁড়ে গোরু নাছোড়বান্দা। যেখানে দৌড়িয়া পালান, শিং বাগাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আমার সেই এঁড়ে গোরু গিয়া উপস্থিত হয়।

## অষ্টম পর্ব

## মিস্তির-জার পুণ্য

কর্তা ভূত বলিতেছেন,—যমপুরীর ভিতর কোনোও স্থলে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত নিস্তার পাইলেন না। যেখানে তাঁহারা যান, আরক্ত ঘূর্ণিত নয়নে এঁড়ে গোরুও সেই স্থলে গিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করে। যমপুরী ছাড়িয়া উর্ধ্বশ্বাসে দুইজনে ইন্দ্রের ইন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেও এঁড়ে গোরু সঙ্গে সঙ্গে। শিবের শিবলোকে যাইলেন, সেখানেও এঁড়ে গোরু! ব্রহ্মার ব্রহ্মালোকে, সেখানেও এঁড়ে গরু! পরিত্রাণ আর কোথাও পান না। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুইজনে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত। যেখানে নারায়ণ শুইয়া আছেন, আর লক্ষ্মী পা টিপিতেছিলেন, গলদঘর্ম মুমূর্ষুপ্রায় যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে গিয়া উপস্থিত। বৈকুণ্ঠের দ্বারে সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছিল। এঁড়ে গোরু বৈকুণ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিতে

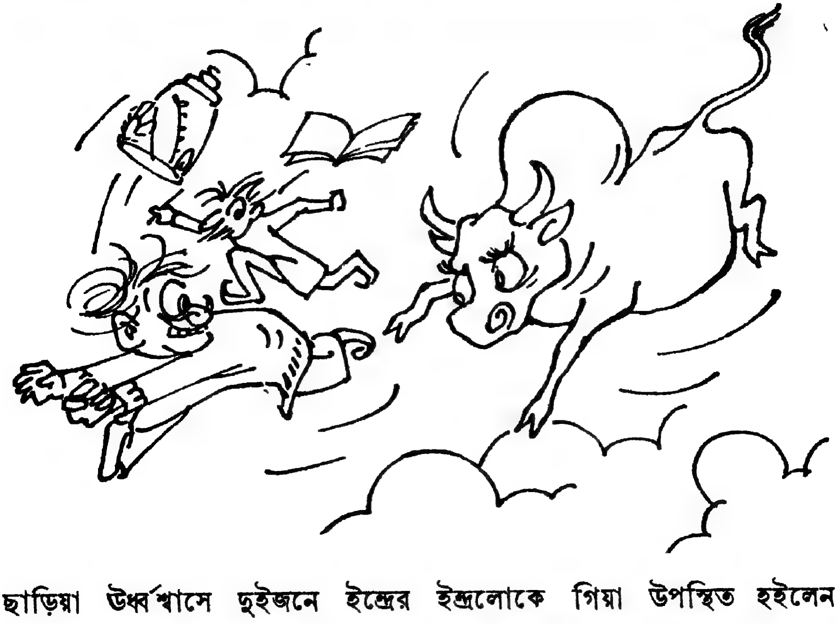

পারিল না। শিং পাতিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। যম ও চিত্রগুপ্ত বাহির হইলেই তাঁহাদিগকে শিঙে লইয়া ঘুরাইবে।

যম ও চিত্রগুপ্তের দুরবস্থা দেখিয়া, নারায়ণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নারায়ণকে তাঁহার আদ্যপান্ত বিবরণ শুনাইলেন। নারায়ণ বলিলেন,—এ মানুষটি দেখিতেছি, সাধারণ মানুষ নয়। ইহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বশ করিতে হইবে। তা না হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, আমার নারায়ণত্ব, এ সব কাড়িয়া লইবে। দেশে দেশে আমাদিগকে ফকির হইয়া বেড়াইতে হইবে। চলো, আমরা এখন সকলে সেই মানুষটির কাছে যাই।”

যম বলিলেন,- “দ্বারে সেই এঁড়ে গোরু দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইলেই আমাদের সে নিগ্রহ করিবে। আপনি গিয়া সেই মিত্তির-জাকে সান্ত্বনা করুন, আমরা এই স্থলে বসিয়া থাকি।”

নারায়ণ বলিলেন,--“তোমাদের ভয় নাই, তোমরা আমার সহিত এসো। আমি এঁড়ে গোরুকে বুঝাইয়া বলিব, সে তোমাদের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিবে না।”

এইরূপ আশ্বাস পাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত ভয়ে ভয়ে নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, নারায়ণ আগে আগে চলিলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, এঁড়ে গোরু শিং পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নারায়ণকে দেখিয়া এঁড়ে গোরু বলিল,—“মহাশয়! আপনার বাটিতে যম ও চিত্রগুপ্ত গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শীঘ্র তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিন। তাহাদিগকে শিঙে লইয়া আমি ঘুরাইব। মিত্তির-জা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন।”

সুমিষ্টভাবে নারায়ণ বলিলেন,—“এঁড়ে গোরু! তুমি ব্যস্ত হইও না। যম ও চিত্রগুপ্ত পলায় নাই। ঐ দেখো, আমার পশ্চাতে আসিতেছে। তাহাদিগকে শিঙে লইয়া ঘুরাইতে মিত্তির-জা তোমাকে বলিয়াছেন। আচ্ছা মিত্তির-জা যদি যম ও চিত্রগুপ্তকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে তুমি তাঁর কথা শুনিবে তো?”

এঁড়ে গোরু উত্তর করিল,—“মিত্তির-জা আমাকে হুকুম দিয়াছেন। মিত্তির-জা যদি পুনরায় বলেন, না, ইহাদিগকে শিঙে করিয়া ঘুরাইতে হইবে না, তাহা হইলে তাঁর কথা শুনিব না কেন? অবশ্য শুনিব।”

নারায়ণ বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে এসো! সকলে চলো, মিত্তির-জার কাছে যাই।"

নারায়ণ আগে, তাঁহার পশ্চাতে এঁড়ে গোরু, তাহার পশ্চাতে যম ও চিত্রগুপ্ত; এইরূপে সকলে পুনরায় যমপুরীর দিকে চলিলেন। এঁড়ে গোরু দুই চারি পা যায়, আর মাঝে মাঝে পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখে, পাছে যম ও চিত্রগুপ্ত পলায়।

মিত্তির-জা ভূত বলিলেন,—"আমার নিকট হইতে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত কি করিয়াছিলেন, কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমি চক্ষে দেখি নাই। পরে নারায়ণের নিকট যাহা আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে বলিলাম। জাগ্রত শীতলার পাণ্ডা! তুমি মনে করিও না যে, আমি মিত্তির-জা, এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম। যম যেই সিংহাসন ফেলিয়া পলাইলেন, আর টুপ করিয়া আমি সেই খালি সিংহাসনে গিয়া বসিলাম। সিংহাসনে বসিয়া যমদূতকে হুকুম দিলাম,—"যমপুরীতে যত পাপী আছে, এই মুহূর্তে তোমরা তাদের সকলকে খালাস করো।"

যমপুরীতে তৎক্ষণাৎ মহাসমারোহ পড়িয়া গেল। শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ পাপী খালাস পাইতে লাগিল। দুর্গন্ধ পুতিময় নরক হইতে উঠাইয়া পাপীগণকে স্নান করাইতে লাগিলাম, সুগন্ধ আতর গোলাপ তাহাদিগের দেহে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম। অগ্নিময় জ্বলন্ত নরক হইতে উঠাইয়া সুস্নিগ্ধ জলে পাপীদিগের শরীর সুশীতল করিতে লাগিলাম। শত শত কর্মকার আনিয়া পাপীদিগের হস্তপদের শৃঙ্খল কাটাইতে লাগিলাম। মর্মভেদী কান্নার ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়া যমপুরীতে আজ চারিদিকে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র পাপী গলবস্ত্র হইয়া জোড়হাতে আমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলে বলিতে লাগিল,—"ধন্য মিত্তির জা! শুভক্ষণে আপনার মা আপনাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন। আজ আপনার কৃপায় যম-যন্ত্রণা হইতে আমরা রক্ষা পাইলাম। না হইলে, নির্দয় যম যে আরও কতকাল আমাদিগকে পীড়ন করিত, তাহা বলিতে পারি না।"

সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাপীগণ এইরূপে আমার স্তবস্তুতি করিতেছে, এমন সময় নারায়ণ, এঁড়ে গোরু, যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভক্তিভাবে তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িলাম।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিত্তির-জা! এ কি বলো দেখি? যমের উপর তোমায় এত রাগ কেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আজ্ঞে না! যমের উপর আর আমার আড়ি কি? তবে রসিকতা করিয়া যম বলিলেন, চিরকাল আমাকে নরকভোগ করিতে হইবে, কেবল একটি দিন আমি পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পাইব। তাই যা! সে যা হউক, এখন আর আমার পাপ কোথায়? এই সাক্ষাতে দেখুন লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছি। যে লোক লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে উদ্ধার করে, তার আবার পাপ কোথায়? তারপর,—আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলাম, যে পাদপদ্ম ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণ, ধ্যানে পায় না, আজ সেই শ্রীপাদপদ্ম আমি স্পর্শ করিলাম। তবে আর আমার পাপ কোথায় রহিল?"

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"না মিত্তির-জা! তোমার আর কিছুমাত্র পাপ নাই, তুমি আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চলো। এঁড়ে গোরুকে মানা করিয়া দাও, যেন যম ও চিত্রগুপ্তের প্রতি সে কোনোরূপ অত্যাচার না করে।"

এঁড়ে গোরুকে আমি মানা করিয়া দিলাম। এঁড়ে গোরু আপনার গোয়ালে চলিয়া গেল। নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম। যাইবার পূর্বে জোড়হস্তে নারায়ণের নিকট একটি প্রার্থনা করিলাম যে, এই পাপীগুলিকে যেন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। সুপ্রসন্ন হইয়া নারায়ণ অনুমতি করিলেন। সেই লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে সঙ্গে করিয়া নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম।

ক্রমে সকলে বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া কিন্তু সুদর্শন চক্র ফোঁস করিয়া উঠিল। আর সকলকে ভিতরে যাইতে দিবে, কেবল আমাকে ভিতরে যাইতে দিবে না। নারায়ণের পায়ে আমি পুনরায় কাঁদিয়া পড়িলাম।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নারায়ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নয়নচাঁদ বলিয়া এক ব্যক্তির শীতলা কি তুমি কাড়িয়া লইয়াছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ মহাশয়! মৃত্যুর পূর্বে আমি সে কাজটি করিয়াছিলাম।"

নারায়ণ বলিলেন,—"ঈশ! করিয়াছ কি? সে যে ভারী জাগ্রত শীতলা! এমন কাজও করে! আর সব পাপ আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু সে শীতলা-

কাড়া পাপটি আমি ক্ষমা করিতে পারি না। যাও শীঘ্র ভূত হইয়া তুমি মর্ত্যে ফিরিয়া যাও। নয়নচাঁদের শীতলাটি ফিরিয়া দাও। আর সকলকে গিয়া বলো, যেন নয়নচাঁদের শীতলাকে সকলে পূজা করে।"

কি করিব ? কাজেই ভূত হইয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এখন তোমার শীতলাটি লইয়া যাও যে, পুনরায় আমি বৈকুণ্ঠে গমন করি। এ
এই বলিয়া মিত্তির-জা ভূত আমার শীতলাটি আমাকে ফিরিয়া দিলেন।

## নবম পর্ব

## পরিশেষ

আড্ডাধারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা নয়ান ! সেই যে আর একটি ভূত সেখানে বসিয়াছিল, সে ভূতটি কে ? তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"হাঁ করিয়াছিলাম ! শুনি যে সেটি নেই-আঁকুড়ে দাদার ভূত। মর্ত্যে আসিবার পূর্বে তাহাকেও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, মিত্তির-জা নারায়ণের অনুমতি পাইয়াছিলেন।"

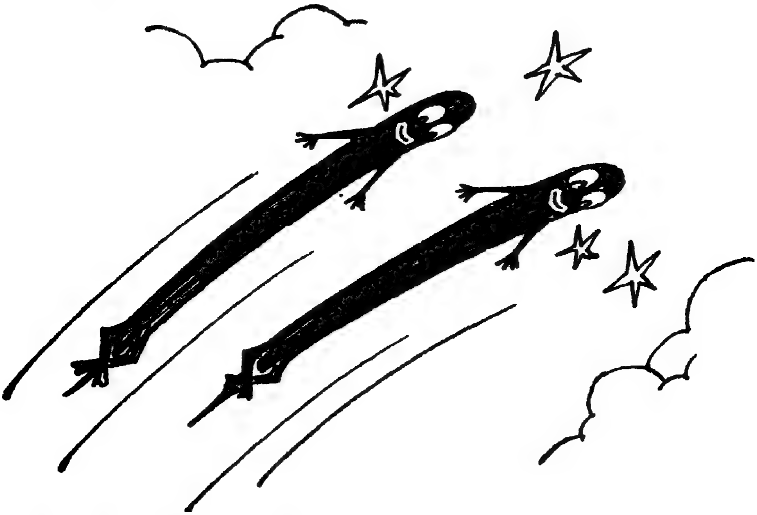

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, - "তাহার পর কি হইল ?"

নয়ন বলিলেন,—"শীতলাটি হাতে করিয়া আমি বাহিরে দাঁড়াইলাম। ভূত দুইটি সরু সরু বাঁশের সলার মতো লম্বা হইল। তাহার পর হাউই-বাজির মতো একে একে সোঁ সোঁ করিয়া আকাশে উঠিল। বৈকুণ্ঠ চলিয়া গেল।"

সকলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর তুমি কি করিলে ?"

নয়ন বলিলেন,—“আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আগে যদি একগুণ পসার ছিল, এখন দশগুণ পসার হইল। কলেজের সেই যারা এম-এ পাস দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পুজা দিতে আরম্ভ করিল। একদিন লোক সব হাঁড়ি-চড়ানো বন্ধ করিয়া খই-কলা খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তর ডাক্তার হইলাম। টাকাকড়ি ঘরে ধরে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মরসুমটি কমিয়া গেল। সাহেবরা গনিয়া বলিয়াছেন যে, আবার পাঁচ বৎসর পরে সেইরূপ হিড়িক পড়িবে। তখন তোমাদেরও এক একটি শীতলা বানাইয়া দিব। রাত্রি হইয়াছে। আজ আর নয়। এসো, একবার সাধের দেবতাগুলিকে নমস্কার করিয়া আপনার আপনার ঘরে যাই।”

সকলে মাটিতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন,—“হে মা কাটিগঙ্গা! হে বাবা ফণীমনসা! তোমাদের পায়ে গড়, ওঁ নমঃ, ওঁ নমঃ, ওঁ নমঃ।”

**ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৪৯—১৯৩০ )**

# দুর্ভিক্ষ ও বৈজ্ঞানিক প্লেগ

[ বিশেষ সংবাদদাতা লিখিত ]

সংবাদদাতা হইলেই সাহেব হইতে হয়; সাহেবী পরিচ্ছদ পরিতে হয়; সাহেবের মতো হাতটিও নাড়িতে হয়; মধ্যে মধ্যে রুমাল দিয়া মুখও ঘষিতে হয়; চুরুটও খাইতে হয়। রং কালো হইলেও আমি সাহেব সাজিলাম। কালো কোট, কালো পেণ্টলুন আর এদিকে কালো বর্ণ আর কালো চুল যেন যমুনা যমুনা সঙ্গম। যেন কাক কাদম্বিনী সঙ্গম! যেন কালিমাখা কুন্দকুসুমের সহিত দ্বারিকানাথ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গম।

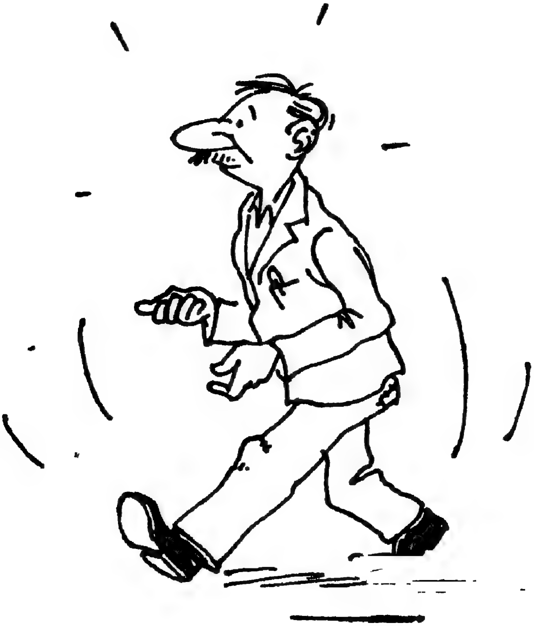

আপনার চেহারা ভাবিয়া আপনি লজ্জিত হইলাম। এদিকে তো ট্রামের পাঁচ-দুগুণে দশটি পয়সা মাত্র সম্বল। ভাবিয়াছিলাম, চলিয়া গিয়া কয়টি পয়সা বাঁচাইব; কিন্তু এ রাজবেশে চলা উচিত কিনা, ইহা ভাবিতে ভাবিতেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম।

সমগ্র ভারতের দুর্ভিক্ষবার্তা ও মড়কবার্তা রিপোর্ট করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত। কলিকাতা ভারতের ভিতর। সুতরাং সর্বাগ্রে কলিকাতার ব্যাপার রিপোর্ট করাই স্থির হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার ভিতর তো এই দর্জিপাড়া। আজ কেবল এই দর্জিপাড়ার রিপোর্ট করিয়া কাটাই, তাহা হইলে, ট্রামের এই দশটি পয়সা উপরি পাওনা হয়। ওই দশ পয়সায় গৃহিণীকে গিয়া যদি নলেন গুড়ের নবাং দিতে পারি, ( কারণ গৃহিণীর সদাই অরুচি ) তাহা হইলে, অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল তাহার সহিত বেশ সংভাবে এবং স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে পারে। উঁ-হু, তা হইবে না; একই রকম জিনিস লইয়া গেলে, গৃহিণীর তাদৃশী প্রীতি হইবে না। গৃহিণী ইলিশ মাছের ডিম বড়ো ভালবাসেন। কিন্তু মায়ের জ্বালায় আর তাহার খাইবার জো নাই, মুখ ফুটিয়া বলিবারও জো নাই। দুই পয়সার ইলিশ মাছের ডিম লইয়া গেলে হয় না! উঁ-হু, তা হইবে না, ভাজিয়া কাগজে মুড়িয়া, পকেটে কবিয়া লইযা গেলে, তবে গৃহিণী খাইতে পাইবেন। ঘরে খিল দিয়া, লেপ মুড়ি দিয়া, গৃহিণী যদি ইলিশ মাছের ডিম ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে, মা কিছুতেই দেখিতে পাইবেন না। তবে গৃহিণী এক আপত্তি করিবেন, ও যে সকড়ি! আমি প্রথমে বলিব, সকড়ি হইলেই বা। কেহ তো আর দেখিতেছে না। তাহা হইলে, আর সকড়ি হইল কেমন করিয়া? তাহাতেও যদি সহধর্মিণী অসম্মতা হয়েন, তবে বলিব, গঙ্গাজলে দোষ নাই। গৃহিণী যদি জিজ্ঞাসেন, তেলে ভাজা মাছের ডিম, গঙ্গাজল কোথা হইতে আসিল? আমি বলিব গঙ্গাজল না হউক, গঙ্গাতীর তো বটে। বিশেষ উহা গঙ্গার ইলিশ। ওই ডিমের হাড়ে হাড়ে গঙ্গার জল প্রবিষ্ট আছে। বিশেষ কথা, এই কুসুম কুসুম গবম ইলিশ মাছের ডিম ভাজা প্রণয়িনীর সম্মুখে ধরিলে, এত বিচারবিতর্ক আদৌ উঠিবে কিনা সে পক্ষেও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। আমি বলিব, প্রাণ-প্রেয়সী, ঘোমটা দিয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন করো।

গৃহিণী কচি কচি লাউডগা খাইতে ভালবাসেন। আধ পয়সার তাই। ডাঁশানো দেশী কুল মুখরোচক,—নয়? এক পয়সার ওই কুল। আচ্ছা, বাজারে, সরু-চাকলি পাওয়া যায় কি? ভীম নাগের সন্দেশ যখন এত উৎকৃষ্ট, তখন অবশ্যই সে সরু-চাকলি না করিয়া থাকিতে পারে না। বউবাজারের বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান করিব, তালতলায় যাইব, ইটালিও উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিব, সরু-চাকলি পাওয়া যায় কি না। তারপর কালীঘাট। এমন-কি

সেখানে ত্রিরাত্রি হত্যা দিতেও প্রস্তুত। তাহার পর ভবানীপুরের রমেশ মিত্রের বাড়ি। অমন সুবিচারকের বাড়ি সরু-চাকলি থাকাই সম্ভব। তথা হইতে, একেবারে যাদুঘরে আসিব। অনুসন্ধান করিয়া জানিব, এখানে সরু-চাকলির 'ফসিল' পাওয়া যায় কি না। এবং 'ফসিল' খাইলে, অন্ততঃ এই সরু-চাকলির কতক আস্বাদ পাওয়া যায় কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত (এইখানে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্য একটু শোক করিয়া) ডাক্তার সিমশনের কাছে গেলে হয় না। এবং সরু-চাকলিতে 'বেসিলি' আছে কি না, তাহারও সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। তথা হইতে, একায়েক ধর্মতলার মোড় দিয়া, লাটসায়েবের বাড়ির সুমুখ দিয়া, উইলসনের হোটেলের কাছে আসিয়া একবার ভাবিতে হইবে, ইহারা সরু-চাকলি গড়ে কি না। যদি বিলাত প্রত্যাগত কোনো ব্রাহ্মণ দ্বারা গঙ্গাজলে চাল-ডাল ভিজাইয়া, শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত ঋগ্বেদ উচ্চারণ করিতে করিতে উইলসন-হোটেলের কোনো পাচক সরু-চাকলি প্রস্তুত করে। তবে তাহা মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইলে, কোনো দোষ আছে কি না। অনেকে বলিতে পারেন, উইলসন-হোটেলের সরু-চাকলিতে নিশ্চয়ই পেঁয়াজ রস থাকিবে। কিন্তু এ পেঁয়াজ রসকে বকযন্ত্রে পাক করিয়া ডিষ্টিল করিয়া লইলে, কোনো দোষ স্পর্শে কি না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লালবাজারের পুলিস-কোর্টে গিয়া স্বয়ং আমীর হোসেনকে একবার এ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে ভালো হয়। তিনি যেরূপ জ্ঞানী এবং গুণী এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাহাতে যে তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যহ সরু-চাকলি খান, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তারপর রাসবিহারী ঘোষের বাড়ি। অত যাহার নজির মুখস্থ, তিনি যে সরু-চাকলি খান না, ইহা লোকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে ? গোপালচন্দ্র শাস্ত্র সরকার হিন্দু 'ল'-য়ে অমোঘ শক্তি। সরু-চাকলি ব্যতীত ও রূপ শক্তি কাহারও সম্ভবে না ; সুতরাং তাহার কাছ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া, একবার আচার্য প্রবর মহাদেব মিশ্রের কাছে গেলে হয় না ?

মহাশয়,—আপনার গৃহে সরু-চাকলি আছে কি ? তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—না !

আস্কে আছে কি ? তিনিও আরও গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—না, এখানে কিছুই নাই ; তুমি চলিয়া যাও।

আমি আরও বিনীতভাবে জোড়হস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আজ্ঞে, রসবড়া আছে কি ?

তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন,—দূর হও।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, মহাশয় রাগ করিতেছেন কেন? আমি ইন্দ্র-চন্দ্র বায়ু-বরুণ সকলের নিকট গমন করিলাম; আমি দেবেন্দ্র-নরেন্দ্র-উপেন্দ্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধানাথ-রমানাথ-কাতিক-হেরম্বের নিকটও এ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই এমন রাগ করেন নাই। আপনি রাগ করিতেছেন কেন? তিনি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া ঘরে খিল দিলেন। আমিও চলিয়া আসিলাম। তাহার পর, মেছুয়াবাজার মন্থন আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কোথাও সে সাধের সরু-চাকলি পাইলাম না।

অবশেষে, বড়োবাজার বিধ্বস্ত করিয়া, নিমতলা ঘাটে পঁহুছিলাম। শ্মশান দেখিয়াই মন উদাস হইল; ভাবিলাম, সরু-চাকলি হইলেই তো শেষ হইবে না; তাহার পর আবার পায়েসের দরকার হইবে। কাজেই, ওসব লেঠায় আর কাজ নাই। ফল-ফুলেই গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিব।

আচ্ছা, খুদে চিংড়ি মাছ বাটিয়া, বড়া করিলে কেমন লাগে? আমার গৃহিণীর কেমন লাগিবে, একবার সকলে ভাবুন দেখি? অল্প অল্প নুন-খরো অল্প অল্প লঙ্কা-বাটাযুক্ত আর সেই কুসুম কুসুম গরম তো আছেই! প্রাণেশ্বরীর অবশ্যই প্রিয়তমা হইতে পারে! তবে ধরুন দুই পয়সার খুদে চিংড়ি। বাকি এখনও হাতে আছে সাড়ে চার পয়সা। কি কেনা যায়। আপনারা মনে করিতেছেন যে, পাতখোলা কেনা হউক। কুমারটুলি গিয়া বিজয়রত্ন এবং ভগবতীপ্রসন্নের নাম করিয়া পাতখোলা চাহিলে বোধ হয়, কিছু অমনিও পাওয়া যাইতে পারে। আর তাঁহারা যদি তাঁহাদের নাম, এ শুভকার্যে সদ্ব্যয় করিতে না দেন, তাহা হইলে, আমি গলায় কাপড় দিয়া কুমারদের বড়ো কর্তার নিকট জোড়হাতে যদি দুখানি পাতখোলা চাই, তাহা হইলেও অমনি পাইতে পারি। অতএব এই সাড়ে চারি পয়সাই মজুত রহিল। এখন ভাবুন দেখি, পয়সা লইয়া কি করি? গৃহিণী যে আর কি কি জিনিস ভালবাসেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও আমি জানি না। যদি জিজ্ঞাসা করি, প্রাণেশ্বরী কাঁচাগোল্লা খাইবে?

তিনি বলেন, না।

প্র। মাছের ঝোল ভালবাসো?

উ। না।

প্র। চাটিম কলা ভালবাসো?

উ। না।

প্র। দই ভালবাসো ?

উ। না।

প্র। আমানি ভালবাসো ?

উ। না।

প্র। ক্ষীরছানা ভালবাসো ?

উ। না।

প্র। লুচি-কচুরি ভালবাসো ?

উ। না।

প্র। আচ্ছা আলুর দম ?

উ। মোটেই না।

প্র। ভুনি খিচুড়ি ?

উ। না বমি আসে।

প্র। গল্‌দা চিংড়ি দিয়া বুটের ডাল ?

উ। ছিঃ।

প্র। পুরনো তেঁতুল দিয়া মৌরলা মাছের অম্বল ?

উ। দুর।

প্র। আচ্ছা, পুরনো তেঁতুল নাই বা দিলাম। যদি কাসুন্দি দিয়া আচার করি। তাহা হইলে ভালো লাগে কি ?

উ। দুর ছাই পাঁশ।

প্র। কোতবা গুড় ভালবাসো ?

কথা শুনিয়াই গৃহিণী উত্তর না দিয়া রাগিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী তো রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন, কিন্তু আমার হাতে সেই সাড়ে চারি পয়সা মজুত রহিল। এ যে বড়ো বিব্রত হইয়া পড়িলাম। গৃহিণী কি ভালবাসেন না জানিলে, আমি ওই সাড়ে চারি পয়সা লইয়া করি কি ? অর্থের সদ্ব্যয় না হইলে পাপ সঞ্চয় হয় শাস্ত্রে লিখিত আছে। দেখিতেছি, প্রত্যেক বাঙালী স্বামীর একটু-আধটু যোগবল থাকা আবশ্যক। নহিলে তিনি গৃহিণীর মনের কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। শুনিয়াছি যোগবলে বলীয়ান হইতে গেলে আঠারো বৎসর অথবা তিন-আঠারো চুয়ান্ন বৎসর লাগে। ওই সাড়ে চারি পয়সা পকেটে লইয়া আমি কি এখন চুয়ান্ন বৎসরকাল যোগশিক্ষা করিব। কিন্তু ততদিনের মধ্যে গৃহিণী যদি দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে গৃহিণীর

ভালবাসার সামগ্রী তো জানিতেই পারিলাম না ; আর জানিতে পারিলেও তাহাতে ফল হইল না। কাজেই, যে সাড়ে চারি পয়সা, সেই সাড়ে চারি পয়সাই মজুত রহিয়া গেল।

তাই সর্বসাধারণকে, সমগ্র ভারতবাসীকে, বিউবনিক প্লেগপীড়িত বোম্বাইবাসীকে এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্যভারতবাসীকে করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসিতেছি—হয় তাঁহারা গৃহিণী কি ভালবাসেন, তাহা বলিয়া দিউন, না হয়, এই সাড়ে চারি পয়সার কিনারা করুন। যদি আপনারা এই প্রশ্নের সদুত্তর না দেন, তাহা হইলে, অগত্যাই আমাকে হিমালয়ের গিরিগুহায় গিয়া চুয়ান্ন বৎসরকাল যোগশিক্ষা করিবার জন্য তপস্যা করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৬১—১৯৪১ )

# রাজটিকা

নবেন্দুশেখরের সহিত অরুণলেখার যখন বিবাহ হইল, তখন হোমধূমের অন্তরাল হইতে ভগবান প্রজাপতি ঈষৎ একটু হাস্য করিলেন। হায়, প্রজাপতির পক্ষে যাহা খেলা আমাদের পক্ষে তাহা সকল সময়ে কৌতুকের নহে।

নবেন্দুশেখরের পিতা পূর্ণেন্দুশেখর ইংরাজ রাজ-সরকারে বিখ্যাত। তিনি এই ভবসমুদ্রে কেবলমাত্র দ্রুতবেগে সেলাম-চালনা-দ্বারা রায়বাহাদুর পদবীর উত্তুঙ্গ মরুকূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; আরও দুর্গমতর সম্মানপথের পাথেয় তাহার ছিল, কিন্তু পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে অনতিদূরবর্তী রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করিয়া এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাববর্জিত লোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার বহু-সেলাম-শিথিল গ্রীবাগ্রন্থি শ্মশানশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিল।

কিন্তু, বিজ্ঞানে বলে, শক্তির স্থানান্তর ও রূপান্তর আছে, নাশ নাই—চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচঞ্চলা সখী সেলামশক্তি পৈত্রিক স্কন্ধ হইতে পুত্রের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং নবেন্দুর নবীন মস্তক তরঙ্গতাড়িত কুষ্মাণ্ডের মতো ইংরাজের দ্বারে দ্বারে অবিশ্রাম উঠিতে পড়িতে লাগিল।

নিঃসন্তান অবস্থায় ইঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যে পরিবারে ইনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন সেখানকার ইতিহাস ভিন্ন প্রকার।

সে পরিবারে বড়ো ভাই প্রমথনাথ পরিচিতবর্গের প্রীতি এবং আত্মীয়বর্গের আদরের স্থল ছিলেন। বাড়ির লোকে এবং পাড়ার পাঁচজনে তাঁহাকে সর্ববিষয়ে অনুকরণস্থল বলিয়া জানিত।

প্রমথনাথ বিদ্যায় বি-এ এবং বুদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু মোটা মাহিনা বা জোর কলমের ধার ধারিতেন না; মুরুব্বীর বলও তাঁহার বিশেষ ছিল না, কারণ ইংরাজ তাঁহাকে যে পরিমাণ দূরে রাখিত তিনিও তাহাকে সেই পরিমাণ দূরে রাখিয়া চলিতেন। অতএব, গৃহকোণ ও পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রমথনাথ

জাজ্বল্যমান ছিলেন, দূরস্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কোনো ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

এই প্রমথনাথ একবার বছর তিনেকের জন্য বিলাতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে ইংরাজের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের অপমান-দুঃখ ভুলিয়া ইংরাজি সাজ পরিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভাই-বোনেরা প্রথমটা একটু কুণ্ঠিত হইল, অবশেষে দুইদিন পরে বলিতে লাগিল, ইংরাজি কাপড়ে দাদাকে যেমন মানায় এমন আর কাহাকেও না, ইংরাজি বস্ত্রের গৌরবগর্ব পরিবারেব অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইল।

প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন ‘কী করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্যায় রক্ষা করিয়া চলিতে হয় আমি তাহারই অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইব’ —নত না হইলে ইংরাজেব সহিত মিলন হয় না এ কথা যে বলে সে নিজের হীনতা প্রকাশ করে এবং ইংবাজকেও অন্যায় অপরাধী করিয়া থাকে।

প্রমথনাথ বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের কাছ হইতে অনেক সাদবপত্র আনিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজ-মহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমন-কি মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক ইংরাজের চা, ডিনার, খেলা এবং হাস্যকৌতুকের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ পাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যমদমত্ততায় ক্রমশই তাঁহার শিরা-উপশিরাগুলি অল্প অল্প ঝাঁঝাঁ করিতে শুরু করিল।

এমন সময়ে একটি নূতন রেলওয়ে লাইন খোলা উপলক্ষে রেলওয়ে কোম্পানির নিমন্ত্রণে ছোটলাটের সঙ্গে দেশের অনেকগুলি বাজপ্রসাদগর্বিত সম্ভ্রান্তলোকে গাড়ি বোঝাই করিয়া নবলৌহপথে যাত্রা করিলেন। প্রমথনাথও তাহার মধ্যে ছিলেন।

ফিরিবার সময় একটা ইংরাজ দারোগা দেশীয় বড়োলোকদিগকে কোনো-এক বিশেষ গাড়ি হইতে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া নামাইয়া দিল। ইংরাজ-বেশধারী প্রমথনাথও মানে মানে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দারোগা কহিল, “আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বসুন না।”

এই বিশেষ সম্মানে প্রমথনাথ প্রথমটা একটু স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, যখন তৃণহীন কর্ষণধূসর পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তসীমা হইতে ম্লান সূর্যাস্ত-আভা সকরুণ রক্তিম লজ্জার মতো সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং যখন তিনি একাকী বসিয়া বাতায়ন পথ হইতে অনিমেষ

নয়নে বনান্তরালবাসিনী কুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তখন ধিক্কারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালাময়ী অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তাঁহার মনে একটা গল্পের উদয় হইল। একটি গর্দভ রাজপথ দিয়া দেবপ্রতিমার রথ টানিয়া চলিতেছিল, পথিকবর্গ তাহার সম্মুখে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিতেছিল এবং মূঢ় গর্দভ আপন মনে ভাবিতেছিল, "সকলে আমাকেই সম্মান করিতেছে।"

প্রমথনাথ মনে-মনে কহিলেন, "গর্দভের সহিত আমার এই একটু প্রভেদ দেখিতেছি ; আমি আজ বুঝিয়াছি, সম্মান আমাকে নহে, আমার স্কন্ধের বোঝাগুলাকে।"

প্রমথনাথ বাড়ি আসিয়া বাড়ির ছেলেপুলে সকলকে ডাকিয়া একটি হোমাগ্নি জ্বালাইলেন এবং বিলাতি বেশভূষাগুলা একে একে আহুতিস্বরূপ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

শিখা যতই উচ্চ হইয়া উঠিল ছেলেরা ততই উচ্ছ্বসিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পর হইতে প্রমথনাথ ইংরাজঘরের চায়ের চুমুক এবং রুটির টুক্‌রা পরিত্যাগ করিয়া পুনশ্চ গৃহকোণদুর্গের মধ্যে দুর্গম হইয়া বসিলেন, এবং পূর্বোক্ত লাঞ্ছিত উপাধীধারীগণ পূর্ববৎ ইংরাজের দ্বারে দ্বারে উষ্ণীষ আন্দোলিত করিয়া ফিরিতে লাগিল।

দৈবদুর্যোগে দুর্ভাগ্য নবেন্দুশেখর এই পরিবারের একটি মধ্যমা ভগিনীকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। বাড়ির মেয়েগুলি লেখাপড়াও যেমন জানে দেখিতে শুনিতেও তেমনি ; নবেন্দু ভাবিলেন, "বড়ো জিতিলাম।"

কিন্তু 'আমাকে পাইয়া তোমরা জিতিয়াছ' এ কথা প্রমাণ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। কোন্‌ সাহেব তাঁহার বাবাকে কবে কী চিঠি লিখিয়াছিল তাহা যেন নিতান্ত ভ্রমবশতঃ দৈবক্রমে পকেট হইতে বাহির করিয়া শ্যালীদের হস্তে চালান করিয়া দিতে লাগিলেন। শ্যালীদের সুকোমল বিম্বোষ্ঠের ভিতর দিয়া তীক্ষ্ণ প্রখর হাসি যখন টুকটুকে মখমলের খাপের ভিতরকার ঝকঝকে ছোরার মতো দেখা দিতে লাগিল, তখন স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে হতভাগ্যের চৈতন্য জন্মিল। বুঝিল, "বড়ো ভুল করিয়াছি।"

শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা লাবণ্যলেখা একদা শুভদিন দেখিয়া নবেন্দুর শয়নকক্ষের কুলুঙ্গির মধ্যে দুইজোড়া বিলাতি বুট সিন্দুরে মণ্ডিত

করিয়া স্থাপন করিল ; এবং তাহার সম্মুখে ফুলচন্দন ও দুই জলন্ত বাতি রাখিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া দিল। নবেন্দু ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দুই শ্যালী তাহার দুই কান ধরিয়া কহিল, "তোমার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করো, তাহার কল্যাণে তোমার পদবৃদ্ধি হউক।"

তৃতীয়া শ্যালী কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোন্স স্মিথ ব্রাউন টম্‌সন প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরাজ নাম লাল সুতা দিয়া সেলাই করিয়া একদিন মহাসমারোহে নবেন্দুকে নামাবলি উপহার দিল।

চতুর্থ শ্যালী শশাঙ্কলেখা যদিও বয়ঃক্রম হিসাবে গণ্যব্যক্তির মধ্যে নহে, বলিল, "ভাই, আমি একটি জপমালা তৈরি করিয়া দিব, সাহেবদের নাম জপ করিবে।" তাহাব বডো বোনেরা তাহাকে শাসন কবিয়া বলিল, "যাঃ তোর আর জ্যাঠামি কবিতে হইবে না।"

নবেন্দুব মনে মনে বাগও হয়, লজ্জাও হয়, কিন্তু শ্যালীদের ছাডিতেও পারে না, বিশেষতঃ বডো শ্যালীটি বডো সুন্দরী, তাহার মধুও যেমন কাঁটাও তেমনি, তাহার নেশা এবং জ্বালা দুটোই মনেব মধ্যে একেবারে লাগিয়া থাকে। ক্ষতপক্ষ পতঙ্গ রাগিয়া ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে অথচ অন্ধ অবোধের মতো চারিদিকে ঘুবিয়া ঘুরিয়া মরে। অবশেষে শ্যালীসংসর্গের প্রবল মোহে পড়িয়া সাহেবের সোহাগ লালসা নবেন্দু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে লাগিল। বডোসাহেবকে যেদিন সেলাম নিবেদন করিতে যাইত শ্যালীদিগকে বলিত, 'সুরেন্দ্র বাড়ুজ্যের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছি।" দাজিলিং হইতে প্রত্যাসন্ন মেজোসাহেবকে স্টেশনে সম্মান জ্ঞাপন কবিতে যাইবার সময় শ্যালীদিগকে বলিয়া যাইত, "মেজোমামার সহিত দেখা করিতে চলিলাম।"

সাহেব এবং শ্যালী এই দুই নৌকায় পা দিয়া হতভাগ্য বিষম সংকটে পড়িল। শ্যালীরা মনে-মনে কহিল. "তোমার অন্য নৌকাটাকে ফুটা না করিয়া ছাডিব না।"

মহারানীর আগামী জন্মদিনে নবেন্দু খেতাব স্বর্গলোকের প্রথম সোপানে রায়-বাহাদুর পদবীতে পদার্পণ করিবেন এইরূপ গুজব শুনা গেল, কিন্তু সেই সম্ভাবিত সম্মানলাভেব আনন্দ-উচ্ছ্বসিত সংবাদ ভীরু বেচারা শ্যালীদিগের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিল না, কেবল একদিন শরৎশুক্লপক্ষের সায়াহ্নে সর্বনেশে চাঁদের আলোকে পরিপূর্ণ চিত্তাবেগে স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। পরদিন দিবালোকে স্ত্রী পাল্কি করিয়া তাহার বড়োদিদির বাড়ি গিয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে

আক্ষেপ করিতে লাগিল। লাবণ্য কহিল, "তা বেশ তো রায়বাহাদুর হইয়া তোর স্বামীর তো লেজ বাহির হইবে না তোর এত লজ্জাটা কিসের!"

অরুণলেখা বারম্বার বলিতে লাগিল, "না দিদি, আর যাই হই, আমি রায় বাহাদুরনী হইতে পারিব না।"

আসল কথা, অরুণের পরিচিত ভূতনাথবাবু রায় বাহাদুর ছিলেন, পদবীটার প্রতি আন্তরিক আপত্তির কারণ তাহাই।

লাবণ্য অনেক আশ্বাস দিয়া কহিল, "আচ্ছা, তোকে সে জন্য ভাবিতে হইবে না।"

বক্সারে লাবণ্যর স্বামী নীলরতন কাজ করিতেন। শরতের অবসানে নবেন্দু সেখান হইতে লাবণ্যর নিমন্ত্রণ পাইলেন। সানন্দচিত্তে অনতিবিলম্বে গাড়ি চড়িয়া যাত্রা করিলেন। রেলে চড়িবার সময় তাঁহার বামাঙ্গ কাঁপিল না কিন্তু তাহা হইতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, আসন্ন বিপদের সময় বামাঙ্গ কাঁপাটা একটা অমূলক কুসংস্কার মাত্র।

লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নবশীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অরুণে পাণ্ডুরে পূর্ণপরিস্ফুট হইয়া নির্মল শরৎ কালের নির্জননদীকূল-লালিতা অম্লান-প্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।

নবেন্দুর মুগ্ধ দৃষ্টির উপরে যেন একটা পূর্ণপুষ্পিতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোজ্জ্বল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।

মনের আনন্দে এবং পশ্চিমের হাওয়ায় নবেন্দুর অজীর্ণ রোগ দূর হইয়া গেল। স্বাস্থ্যের নেশায় সৌন্দর্যের মোহে এবং শ্যালীহস্তের শুশ্রূষাপুলকে সে যেন মাটি ছাড়িয়া আকাশের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের বাগানের সম্মুখ দিয়া পরিপূর্ণ গঙ্গা যেন তাহারই মনের দুরন্ত পাগলামিকে আকার দান করিয়া বিষম গোলমাল করিতে করিতে প্রবল আবেগে নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত।

ভোরের বেলা নদীতীরে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় শীতপ্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্র যেন প্রিয়মিলনের উত্তাপের মতো তাহার সমস্ত শরীরকে চরিতার্থ করিয়া দিত। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া শ্যালীর শখের রন্ধনে জোগান দিবার ভার লইয়া নবেন্দুর অজ্ঞতা ও অনৈপুণ্য পদে পদে প্রকাশ পাইতে থাকিত। কিন্তু অভ্যাস ও মনোযোগের দ্বারা উত্তরোত্তর তাহা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য মূঢ় অনভিজ্ঞের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না; কারণ প্রত্যহ নিজেকে

অপরাধী করিয়া সে যে-সকল তাড়না ভর্ৎসনা লাভ করিত তাহাতে কিছুইতে তাহার তৃপ্তির শেষ হইত না। যথাযথ পরিমাণে মালমসলা বিভাগ, উনান হইতে হাঁড়ি তোলা-নামা, উত্তাপাধিক্যে ব্যঞ্জন পুড়িয়া না যায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়ে সে যে সদ্যোজাত শিশুর মতো অপটু অক্ষম এবং নিরুপায় ইহাই প্রত্যহ বলপূর্বক প্রমাণ করিয়া নবেন্দু শ্যালীর কৃপামিশ্রিত হাস্য এবং হাস্যমিশ্রিত লাঞ্ছনা মনের সুখে ভোগ করিত।

মধ্যাহ্নে একদিকে ক্ষুধার তাড়না অন্য দিকে শ্যালীর পীড়াপীড়ি, নিজের আগ্রহ এবং প্রিয়জনের ঔৎসুক্য, রন্ধনের পারিপাট্য এবং রন্ধনীর সেবামাধুর্য, উভয়ের সংযোগে ভোজন ব্যাপারের ওজন রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত।

আহারের পর সামান্য তাস খেলাতেও নবেন্দু প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিত না। চুরি করিত, হাতের কাগজ দেখিত, কাড়াকাড়ি বকাবকি বাধাইয়া দিত কিন্তু তবু জিতিতে পারিত না। না জিতিলেও জোর করিয়া তাহার হার অস্বীকার করিত এবং সে জন্য প্রত্যহ তাহার গঞ্জনার সীমা থাকিত না; তথাপিও পাষণ্ড আত্মসংশোধন চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

কেবল এক বিষয়ে তাহার সংশোধন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সাহেবের সোহাগ যে জীবনের চরম লক্ষ্য এ কথা সে উপস্থিত মতো ভুলিয়া গিয়াছিল। আত্মীয় স্বজনের শ্রদ্ধা ও স্নেহ যে কত সুখের ও গৌরবের ইহাই সে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছিল।

তাহা ছাড়া, সে যেন এক নূতন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। লাবণ্যর স্বামী নীলরতনবাবু আদালতে বড়ো উকিল হইয়াও সাহেবসুবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না বলিয়া অনেক কথা উঠিত। তিনি বলিতেন, "কাজ কি, ভাই! যদি পাল্টা ভদ্রতা না করে তবে আমি যাহা দিলাম তাহা তো কোনোমতেই ফিরাইয়া পাইব না। মরুভূমির বালি ফুট্‌ফুটে সাদা বলিয়াই কি তাহাতে বীজ বুনিয়া কোনো সুখ আছে! ফসল ফিরিয়া পাইলে কালো জমিতেও বীজ বোনা যায়।"

নবেন্দুও টানে পড়িয়া দলে ভিড়িয়া গেল। তাহার আর পরিণামচিন্তা রহিল না। পৈতৃক এবং স্বকীয় যত্নে পূর্বে জমি যাহা পাট করা ছিল তাহাতেই রায়বাহাদুর-খেতাবের সম্ভাবনা আপনিই বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর নবজলসিঞ্চনের প্রয়োজন রহিল না। নবেন্দু ইংরাজের বিশেষ একটি শখের

শহরে এক বহুব্যয়সাধ্য ঘোড়দৌড়স্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হেনকালে কন্‌গ্রেসের সময় নিকটবর্তী হইল। নীলরতনের নিকট চাঁদা-সংগ্রহের অনুরোধপত্র আসিল।

নবেন্দু লাবণ্যর সহিত মনের আনন্দে নিশ্চিন্ত মনে তাস খেলিতেছিল। নীলরতন খাতা-হস্তে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কহিল "একটা সই দিতে হইবে।"

পূর্বসংস্কারক্রমে নবেন্দুর মুখ শুকাইয়া গেল। লাবণ্য শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "খবরদার, এমন কাজ করিয়ো না, তোমার ঘোড়দৌড়ের মাঠখানা মাটি হইয়া যাইবে।"

নবেন্দু আস্ফালন করিয়া কহিল, "সেই ভাবনায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না।"

নীলরতন আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমার নাম কোনো কাগজে প্রকাশ হইবে না।"

লাবণ্য অত্যন্ত চিন্তিত বিজ্ঞভাবে কহিল, "তবু কাজ কী! কী জানি কথায় কথায়—"

নবেন্দু তীব্রস্বরে কহিল, "কাগজে প্রকাশ হইলে আমার নাম ক্ষইয়া যাইবে না।"

এই বলিয়া নীলরতনের হাত হইতে খাতা টানিয়া একেবারে হাজার টাকা ফস্‌ করিয়া সই করিয়া দিল। মনের মধ্যে আশা রহিল কাগজে সংবাদ বাহির হইবে না।

লাবণ্য মাথায় হাত দিয়া কহিল, "করিলে কী!"

নবেন্দু দর্পভরে কহিল, "কেন অন্যায় কী করিয়াছি।"

লাবণ্য কহিল, "শেয়ালদা স্টেশনেব গার্ড, হোয়াইট্‌-অ্যাবের দোকানের অ্যাসিস্টান্ট, হার্টব্রাদার্‌দের সহিস সাহেব, এঁরা যদি তোমার উপর রাগ করিয়া অভিমান করিয়া বসেন, যদি তোমার পুজাব নিমন্ত্রণে শ্যাম্পেন খাইতে না আসেন, যদি দেখা হইলে তোমার পিঠ না চাপড়ান!"

নবেন্দু উদ্ধতভাবে কহিল, "তাহা হইলে আমি বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিব।"

দিনকয়েক পরেই নবেন্দু প্রাতঃকালে চা খাইতে খাইতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, হঠাৎ চোখে পড়িল এক X-স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়া কন্‌গ্রেসের চাঁদার কথা প্রকাশ করিয়াছে এবং তাঁহার মতো লোককে দলে পাইয়া কন্‌গ্রেসের যে কতটা বল বৃদ্ধি হইয়াছে লোকটা তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

কন্‌গ্রেসের বলবৃদ্ধি! হা স্বর্গগত তাত পুর্ণেন্দুশেখর! কন্‌গ্রেসের বলবৃদ্ধি করিবার জন্যই কি তুমি হতভাগ্যকে ভারতভূমিতে জন্মদান করিয়াছিলে!

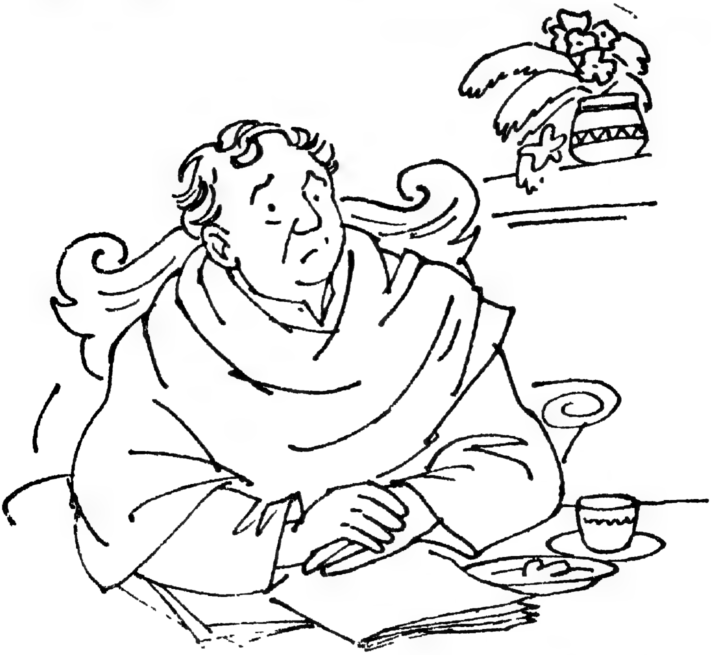

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে সুখও আছে। নবেন্দুর মতো লোক যে যে-সে লোক নহেন, তাহাকে নিজতীরে তুলিবার জন্য যে এক দিকে ভারতবর্ষীয় ইংরাজসম্প্রদায় অপর দিকে কন্‌গ্রেস লালায়িতভাবে ছিপ ফেলিয়া অনিমেষ-লোচনে বসিয়া আছে, এ কথাটা নিতান্ত ঢাকিয়া রাখিবার কথা নহে। অতএব নবেন্দু হাসিতে হাসিতে কাগজখানা লইয়া লাবণ্যকে দেখাইলেন। কে লিখিয়াছে যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে লাবণ্য আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, “ওমা, এ যে সমস্তই ফাঁস করিয়া দিয়াছে! আহা! আহা! তোমার এমন শত্রু কে ছিল! তাহার কলমে যেন ঘুণ ধরে, তাহার কালিতে যেন বালি পড়ে, তাহার কাগজ যেন পোকায় কাটে—”

নবেন্দু হাসিয়া কহিল, “আর অভিশাপ দিয়ো না। আমি আমার শত্রুকে মার্জনা করিয়া আশীর্বাদ করিতেছি তাহার সোনার দোয়াত কলম হয় যেন!”

দুইদিন পরে কন্‌গ্রেসের বিপক্ষপক্ষীয় একখানা ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজি কাগজ ডাকযোগে নবেন্দুর হাতে আসিয়া পৌছিলে পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে ‘One who knows’-স্বাক্ষরে পুর্বোক্ত সংবাদের প্রতিবাদ বাহির

হইয়াছে। লেখক লিখিতেছেন যে, নবেন্দুকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা তাঁহার নামে এই দুর্নামরটনা কখনোই বিশ্বাস করিতে পারেন না; চিতাবাঘের পক্ষে নিজ চর্মের কৃষ্ণ অঙ্কগুলির পরিবর্তন যেমন অসম্ভব নবেন্দুর পক্ষেও কন্‌গ্রেসের দলবৃদ্ধি করা তেমনি। বাবু নবেন্দুশেখরের যথেষ্ট নিজস্ব পদার্থ আছে, তিনি কর্মশূন্য উমেদার ও মক্কেলশূন্য আইনজীবী নহেন। তিনি দুইদিন বিলাতে ঘুরিয়া বেশভূষা-আচারব্যবহারে অদ্ভুত কপিবৃত্তি করিয়া স্পর্ধাভরে ইংরাজ-সমাজে প্রবেশোদ্যত হইয়া অবশেষে ক্ষুণ্ণমনে হতাশভাবে ফিরিয়া আসেন নাই, অতএব কেন যে তিনি এই সকল—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হা পরলোকগত পিতঃ পূর্ণেন্দুশেখর! ইংরাজের নিকট এত নাম, এত বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া তবে তুমি মরিয়াছিলে!

এ চিঠিখানিও শ্যালীর নিকট পেখমের মতো বিস্তার করিয়া ধরিবার যোগ্য। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে যে, নবেন্দু অখ্যাত অকিঞ্চন লক্ষ্মীছাড়া নহেন, তিনি সারবান পদার্থবান লোক।

লাবণ্য পুনশ্চ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, "এ আবার তোমার কোন্ পরমবন্ধু লিখিল। কোন্ টিকিট কালেক্টর, কোন্ চামড়ার দালাল, কোন্ গড়ের বাদ্যের বাজনদার!"

নীলরতন কহিল, 'এ চিঠির একটা প্রতিবাদ করা তো তোমার উচিত।"

নবেন্দু কিছু উঁচু চালে বলিল, "দরকার কী। যে যা বলে তাহারই কি প্রতিবাদ করিতে হইবে।"

লাবণ্য উচ্চৈঃস্বরে চারি দিকে একেবারে হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া দিল।

নবেন্দু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "এত হাসি যে!"

তাহার উত্তরে লাবণ্য পুনর্বার অনিবার্য বেগে হাসিয়া পুষ্পিতযৌবনা দেহলতা লুণ্ঠিত করিতে লাগিল।

নবেন্দু নাকে মুখে চোখে এই প্রচুর পরিহাসের পিচকারি খাইয়া অত্যন্ত নাকাল হইল। একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "তুমি মনে করিতেছ, প্রতিবাদ করিতে আমি ভয় করি!"

লাবণ্য কহিল, "তা কেন! আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার অনেক আশাভরসার সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি বাঁচাইবার চেষ্টা এখনও ছাড়ো নাই—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

নবেন্দু কহিল, "আমি বুঝি সেইজন্য লিখিতে চাই না!" অত্যন্ত রাগিয়া

দোয়াতকলম লইয়া বসিল। কিন্তু লেখার মধ্যে রাগের রক্তিমা বড়ো প্রকাশ পাইল না, কাজেই লাবণ্য ও নীলরতনকে সংশোধনের ভার লইতে হইল। যেন লুচিভাজার পালা পড়িল ; নবেন্দু যেটা জলে ও ঘিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নরম নরম করিয়া এবং চাপিয়া যথাসাধ্য চেপটা করিয়া বেলিয়া দেয় তাঁহার দুই সহকারী তৎক্ষণাৎ সেটাকে ভাজিয়া কড়া ও গরম করিয়া ফুলাইয়া ফুলাইয়া তোলে। লেখা হইল যে, আত্মীয় যখন শত্রু হয় তখন বহিঃশত্রু অপেক্ষা ভয়ংকর হইয়া উঠে। পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারত-গবর্মেণ্টের তেমন শত্রু নহে যেমন শত্রু গর্বোদ্ধত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়। গবর্মেণ্টের সহিত প্রজাসাধারণের নিরাপদ সৌহার্দ্যবন্ধনের তাহারাই দুর্ভেদ্য অন্তরায়। কন্‌গ্রেস রাজা ও প্রজার মাঝখানে স্থায়ী সদ্ভাব সাধনের যে প্রশস্ত রাজপথ খুলিয়াছে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো ঠিক তাহার মধ্যস্থল জুড়িয়া একেবারে কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে। ইত্যাদি।

নবেন্দুর ভিতরে ভিতরে ভয়-ভয় করিতে লাগিল অথচ 'লেখাটা বড়ো সরেস হইয়াছে' মনে করিয়া, রহিয়া রহিয়া একটু আনন্দও হইতে লাগিল। এমন সুন্দর রচনা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া নানা কাগজে বিবাদবিসম্বাদ-বাদপ্রতিবাদে নবেন্দুর চাঁদা এবং কন্‌গ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা লইয়া দশদিকে ঢাক বাজিতে লাগিল।

নবেন্দু এক্ষণে মরিয়া হইয়া কথায় বার্তায় শ্যালীসমাজে অত্যন্ত নির্ভীক দেশহিতৈষী হইয়া উঠিল। লাবণ্য মনে মনে হাসিয়া কহিল, "এখনও তোমার অগ্নিপরীক্ষা বাকি আছে।"

একদিন প্রাতঃকালে নবেন্দু স্নানের পূর্বে বক্ষস্থল তৈলাক্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশের দুর্গম অংশগুলিতে তৈলসঞ্চার করিবার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন এমন সময় বেহারা এক কার্ড হাতে করিয়া তাঁহাকে দিল, তাহাতে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের নাম আঁকা। লাবণ্য সহাস্যকুতূহলী চক্ষে আড়াল হইতে কৌতুক দেখিতেছিল।

তৈললাঞ্ছিত কলেবরে তো ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত-সাক্ষাৎ করা যায় না—নবেন্দু ভাজিবার পূর্বে মসলা-মাখা কই-মৎস্যের মতো বৃথা ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি চকিতের মধ্যে স্নান করিয়া কোনোমতে কাপড় পরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেহারা বলিল,

"সাহেব অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" এই আগাগোড়া মিথ্যাচরণ-পাপের কতটা অংশ বেহারার, কতটা অংশ বা লাবণ্যের, তাহা নৈতিক গণিতশাস্ত্রের একটা সূক্ষ্ম সমস্যা।

টিকটিকির কাটা লেজ যেমন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ধড়ফড় করে নবেন্দুর ক্ষুব্ধ হৃদয় ভিতরে ভিতরে তেমনি আছাড় খাইতে লাগিল। সমস্ত দিন খাইতে শুইতে আর সোয়াস্তি রহিল না।

লাবণ্য আভ্যন্তরিক হাস্যের সমস্ত আভাস মুখ হইতে সম্পূর্ণ দূর করিয়া দিয়া উদ্‌বিগ্নভাবে থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আজ তোমার কী হইয়াছে বলো দেখি! অসুখ করে নাই তো?"

নবেন্দু কায়ক্লেশে হাসিয়া কোনোমতে একটা দেশকালপাত্রোচিত উত্তর বাহির করিল; কহিল, "তোমার এলেকার মধ্যে আবার অসুখ কিসের। তুমি আমার ধন্বন্তরিনী।"

কিন্তু, মুহূর্তমধ্যেই হাসি মিলাইয়া গেল এবং সে ভাবিতে লাগিল, "একে আমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিলাম, কাগজে কড়া চিঠি লিখিলাম, তাহার উপরে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলাম, না জানি কী মনে করিতেছেন!"

"হা তাত, হা পুর্ণেন্দুশেখর! আমি যাহা নই ভাগ্যের বিপাকে গোলেমালে তাহাই প্রতিপন্ন হইলাম।"

পরদিন সাজগোজ করিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া মস্ত একটা পাগড়ি পরিয়া নবেন্দু বাহির হইল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "যাও কোথায়।"

নবেন্দু কহিল, "একটা বিশেষ কাজ আছে—"

লাবণ্য কিছু বলিল না।

সাহেবের দরজার কাছে কার্ড বাহির করিবামাত্র আরদালি কহিল, "এখন দেখা হইবে না।"

নবেন্দু পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহিব করিল। আরদালি সংক্ষিপ্ত সেলাম করিয়া কহিল; "আমরা পাঁচজন আছি।" নবেন্দু তৎক্ষণাৎ দশ টাকার এক নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সাহেবের নিকট তলব পড়িল। সাহেব তখন চটিজুতা ও মর্নিংগোন পরিয়া লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নবেন্দু একটা সেলাম করিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে বসিবার অনুমতি করিয়া কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া

কহিলেন, ‘কী বলিবার আছে বাবু।’

নবেন্দু ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে বিনীত কম্পিত স্বরে বলিল, “কাল আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু—”

সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একটা চোখ কাগজ হইতে তুলিয়া বলিলেন, “সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম! Babu, what nonsense are you talking!”

নবেন্দু “Beg your pardon! ভুল হইয়াছে, গোল হইয়াছে” করিতে করিতে ঘর্মাপ্লুত কলেবরে কোনোমতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া কোনো দূরস্বপ্নশ্রুত মন্ত্রের ন্যায় একটা বাক্য থাকিয়া থাকিয়া তাহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, “Babu, you are a howling idiot!”

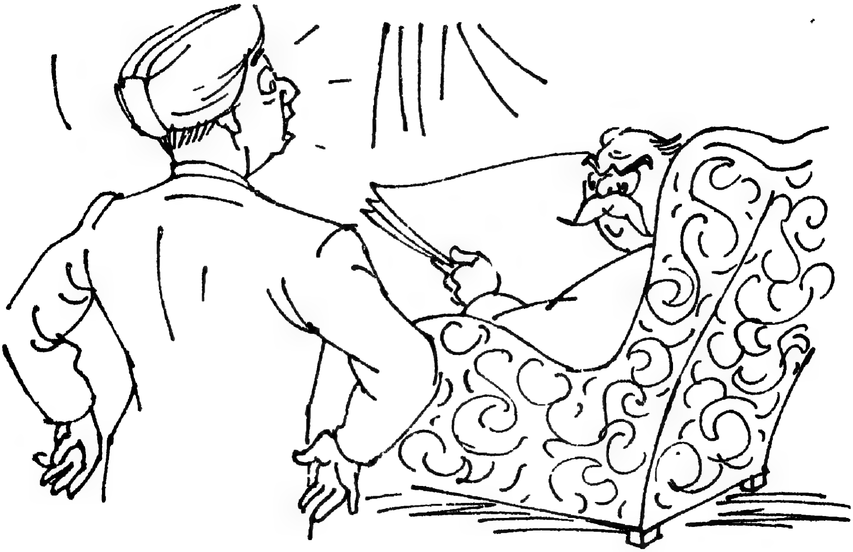

পথে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে ধারণা হইল যে, ম্যাজিস্ট্রেট যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল সে কথাটা কেবল রাগ করিয়া সে অস্বীকার করিল। মনে মনে কহিলেন, “ধরণী দ্বিধা হও!” কিন্তু ধরণী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন।

লাবণ্যকে আসিয়া কহিলেন, “দেশে পাঠাইবার জন্য গোলাপজল কিনিতে গিয়াছিলাম।”

বলিতে না বলিতে কালেক্টরের চাপরাস-পরা জনছয়েক পেয়াদা আসিয়া

উপস্থিত। সেলাম করিয়া হাস্যমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "তুমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিয়াছ বলিয়া তোমাকে গ্রেফতার করিতে আসে নাই তো?"

পেয়াদারা ছয়জনে বারো পাটি দন্তাগ্রভাগ উন্মুক্ত করিয়া কহিল, "বকশিশ, বাবুসাহেব।"

নীলরতন পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরক্তস্বরে কহিলেন, "কিসের বকশিশ!"

পেয়াদারা বিকশিতদন্তে কহিল, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাহার বকশিশ।"

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব আজকাল গোলাপজল বিক্রি ধরিয়াছেন নাকি। এমন অত্যন্ত ঠাণ্ডা ব্যবসায় তো তাঁহার পূর্বে ছিল না।"

হতভাগ্য নবেন্দু গোলাপজলের সহিত ম্যাজিস্ট্রেট-দর্শনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গিয়া কী যে আবোলতাবোল বলিল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

নীলরতন কহিল, "বকশিশের কোনো কাজ হয় নাই। বকশিশ নাহি মিলেগা।"

নবেন্দু সঙ্কুচিতভাবে পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া কহিল, "উহারা গরিব মানুষ, কিছু দিতে দোষ কি।"

নীলরতন নবেন্দুব হাত হইতে নোট টানিয়া লইয়া কহিল, "উহাদের অপেক্ষা গরিব মানুষ জগতে আছে, আমি তাহাদিগকে দিব।"

রুষ্ট মহেশ্বরের ভূতপ্রেতগণকেও কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করিবার সুযোগ না পাইয়া নবেন্দু অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পেয়াদাগণ যখন বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল, তখন নবেন্দু একান্ত করুণভাবে তাহাদিগের দিকে চাহিলেন, নীরবে নিবেদন করিলেন, "বাবাসকল, আমার কোনো দোষ নাই, তোমরা তো জানো!"

কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশন। তদুপলক্ষে নীলরতন সস্ত্রীক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। নবেন্দুও তাহাদের সঙ্গে ফিরিল।

কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্র কন্‌গ্রেসের দলবল নবেন্দুকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড তাণ্ডব শুরু করিয়া দিল। সম্মান সমাদর স্তুতিবাদের সীমা রহিল না। সকলেই বলিল, "আপনাদের মতো নায়কগণ দেশের কাজে যোগ না দিলে দেশের উপায় নাই।" কথাটার যাথার্থ্য নবেন্দু অস্বীকার করিতে পারিলেন না, এবং গোলেমালে হঠাৎ কখন দেশের একজন অধিনায়ক হইয়া

উঠিলেন। কন্‌গ্রেস-সভায় যখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতি তারস্বরে 'হিপ্ হিপ্ হুরে' শব্দে তাঁহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

যথাকালে মহারানীর জন্মদিন আসিল, নবেন্দুর রায়বাহাদুর খেতাব নিকটসমাগত মরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিল।

সেইদিন সায়াহ্নে লাবণ্যলেখা সমারোহে নবেন্দুকে নিমন্ত্রণপূর্বক তাহাকে নববস্ত্রে ভূষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার ললাটে রক্তচন্দনের তিলক এবং প্রত্যেক শ্যালী তাহার কণ্ঠে একগাছি করিয়া স্বরচিত পুষ্পমালা পরাইয়া দিল। অরুণাম্বরবসনা অরুণলেখা সেদিন হাস্যে লজ্জায় এবং অলংকারে আড়াল হইতে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। তাহার স্বেদাঙ্কিত লজ্জাশীতল হস্তে একটা গোড়েমালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে কোনোমতে বশ মানিল না এবং সেই প্রধান মাল্যখানি নবেন্দুর কণ্ঠ কামনা করিয়া জনহীন নিশীথের জন্য গোপনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। শ্যালীরা নবেন্দুকে কহিল, "আজ আমরা তোমাকে রাজা করিয়া দিলাম। ভারতবর্ষে এমন সম্মান তুমি ছাড়া আর কাহারও সম্ভব হইবে না।"

নবেন্দু ইহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাইল কি না তাহা তাহার অন্তঃকরণ আর অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মরিবার পূর্বে সে রায়বাহাদুর হইবেই এবং তাহার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer সমস্বরে শোক করিতে ছাড়িবে না। অতএব ইতিমধ্যে three cheers for বাবু পূর্ণেন্দুশেখর! হিপ্ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে!

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৬১—১৯৪৯ )

# দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি

## এক

চৌধুরী মশাই ছিলেন গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত স্থূলকায় মাতব্বর,—ছ-আনি জমিদার। বাড়ি, বাগান, পুষ্করিণী, শিবমন্দির, সটকার মাথায় অনির্বাণ বাড়বানল সবই তাঁর ছিল। আর ছিল—তাস, পাশা, অহিফেন, আর সান্ধ্য মজলিস—এই চতুর্বেদ চর্চা। অহিফেনটা তিনি আহার করতেন—সাত সের দুধে দু-ভরি আফিং সুপক্ক হলে, তার সরখানি তিনি ভোগে লাগাতেন। দুগ্ধটা পার্ষদদের মধ্যে অধিকারীমতো বণ্টন হত।

ভৃত্য নন্দার প্রধান কাজ ছিল—গো-সেবা, দুগ্ধ প্রস্তুত আর কল্‌কে বদলে দেওয়া। আর যে কাজটি ছিল, সেটি সে দুধ জ্বাল দিতে দিতেই সেরে রাখত। কথাবার্তার জবাব সে চোখ বুজেই দিত।

চৌধুরী মশাই কখনও কখনও আন্দাজে বলতেন, "নন্দা, ঝিমুচ্ছিস বুঝি? খবরদার বেটা, দোর-গোড়ায় বসে ঝিমুলে গেরস্তোর অকল্যাণ হয়, জানিস না পাজী! দূর করে দেব।"

নন্দা চোখ বুজেই বলত, "আপনি দেখলেন কখন হুজুর?"

কথাটা ঠিক। শুনে চৌধুরী মশাই খুশিই হতেন। বড়োলোকের, বিশেষ জমিদার লোকের চোখ চেয়ে থাকাটা একেবারেই ভালো নয়—লোকসেনে লক্ষণ। প্রজা বেটারা চোখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে—বাঁধি-ব্যবস্থা বিগড়ে দেয়, মতলব হাসিল করে নেয়। দুঃখ-কষ্ট মাখানো মুখ দেখিয়ে অকস্মাৎ দয়া টেনে বার করে বসে। এটা ছিল তাঁর পিতৃবাক্য। চোখ চাওয়ার তরে রয়েছে ভস্মলোচনরা—নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা।

চৌধুরী মশাইয়ের পেয়ারের নাতি ইন্দুভূষণ আজ বেজায় ব্যস্ত। সে লেখাপড়া ছেড়ে এখন লায়েক হয়েছে। একখানি নাটক লিখে ফেলেছে—"লক্ষণের শক্তিশেল।" তার রিহার্সেলও চলেছে, পুজার নবমীতে অভিনয়। ইন্দু নিজেই ম্যানেজার আর লক্ষ্মণ—দুই-ই। হনুমানের পার্ট সে খুব জমাটি করে লিখে ফেলেছে। সে বলে, কি করে যে এমন ফ্লো ( তোড় ) বেরিয়ে গেছে,

সে তা নিজেই জানে না। লেখকদের নাকি ঝোঁকের মাথায় feeling (ভাব) এসে ওরূপ অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়ে দেয়।

বীররসের কথা এলে তার ধমনীগুলো একসঙ্গে ধড়ফড় করতে থাকে, মনের ভাবগুলোকে ঠেলে বার করে দেয়। লেখাটা ভারী লাগমাফিক বেরিয়ে যাওয়ায় ইন্দুর মনে বড়ো একটা আপসোসও রয়ে গেছে,—অমন পার্টটা সে নিজে নিতে পারলে না কেবল হনুমান নামটার জন্যে। বাল্মীকি এত বড়ো কবি হয়ে একটা ভালো নামও খুঁজে পাননি!

নেপা হনুমানের পার্ট খুব উৎসাহে শখ করেই নিয়েছে, করেও ভালো। তার ওপর সে ইস্কুলের খেলায় সে-বছর Long Jump আর High Jumpএ ( লাফালাফিতে ) পদক পুরস্কার পাওয়ায়—হনুমান সাজবার দাবিও তার এসে গিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা বিঘ্ন উপস্থিত হয়ে ইন্দুকে বড়ো বিচলিত করে দিয়েছে। নেপার বিধবা পিসী খড়দায় থাকেন ; তাঁর সংকট পীড়া শুনে নেপাকে সেথায় চলে যেতে হয়েছে। আবার, তাঁর শেষ না দেখে তার ফেরবারও জো নেই, —হাবাতে মাগীর টাকা আছে। অভিনয়ের সবে আর সাতটি দিন বাকি, এর মধ্যে কি মাগী মরবে! পাকা হাড—শ্বাস টানতে পারে সাত দিন! আপদ দেখো না।

ইন্দু দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। পড়বারই কথা। উত্তরপাড়া একটি উন্নত সমাজ জায়গা,—সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত অভিজাতের বাড়িতে অভিনয়। এখনও প্রহসনের প্লটই সে ঠিক করতে পারেনি। সেই চিন্তায় মাথা ভরে রয়েছে, তার ওপর নেপার পিসীর এই ব্যবহার। তাই সে দলের মাতব্বরদের ডেকে পিসীসংকট হতে উদ্ধারের একটা উপায় স্থির করবার জন্যে মিটিং কল্ ( meeting call ) করেছে।

## দুই

চৌধুরী মশাই সপ্তাহকাল কণ্ড করে, আজ মরিয়া হয়ে গা তুলে নিকটস্থ জমিদারিতে দর্শন দিতে বেরিয়ে পড়েছেন,—প্রজাদের কাছ থেকে পুজার পার্বণী আদায়ের জন্যে। ফিরতে সন্ধ্যার পুর্বে নয়।

এই সুযোগ পেয়ে—মিটিংটা আজ তাঁর বৈঠকেই বসেছে। প্রধান উদ্দেশ্য নেপার একজন ডুপ্লিকেট্ ( মুশকিল-আসান ) ঠিক করে ফেলা। যে নেপার

অনুপস্থিতিতে তার পার্ট যোগ্যতার সহিত করতে পারে।
ভুবন পারে,—অন্তরায় কেবল ওই হনুমান নামটি।

নেপা সম্বন্ধে সন্দেহের কথা আলোচনার পর, সকলে একবাক্যে বললে, “ডুপ্লিকেট নিশ্চয়ই চাই।”

ইন্দু বললে, “চাই তো বটেই, কিন্তু ও পার্ট করবার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে ক-জনের আছে? বইখানির মধ্যে ওই পার্টটিই আমার প্রাণ ঢেলে লেখা, কারণ হনুমানের মতো অমন ভক্ত, অতবড়ো বীর, আর সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ত্রেতায় কেউ জন্মাননি। সেই মহাপুরুষের কৃপায় লেখাটাও বেরিয়ে গেছে তেমনই। নেপা সাগ্রহে লুফে নিলে, তাই তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারিনি। অবশ্য সে করেও মন্দ নয়। কিন্তু ও-পার্ট যখন অর্ধেক লেখা হয়েছে, তখন থেকেই আমার নজর ছিল ভুবনের ওপর। আমাদের মধ্যে ও-ই ছাত্রবৃত্তি পাস, আবৃত্তি করেও তেমনই, কারণ তার সঙ্গে অর্থবোধ থাকে কিনা—পাখির মতো মুখস্থ বলা তো নয়। কিন্তু নেপাকে তখন ক্ষুণ্ণ করতে পারলুম না। একথা সতীশকে privately গোপনে বলেও ছিলুম,—মনে নেই সতীশ?”

সতীশ বললে, “মনে খুবই আছে, আমি তখনই তোমাকে বলেছিলুম, এটা তোমার দুর্বলতা।”

“কি করব ভাই আমাকে তোমরা ম্যানেজার করেছ,—সব দিক দেখতে হয়। ভুবন কিছু মনে করে তো—সামান্য ইঙ্গিতেই কারণটা সে বুঝতে পারবে। দেখলে না—তাই তাকে অন্য কোনোও ছোট পার্ট দিতেই পারলুম না, prompting-এ (ধর্তায়) রাখতে হল, কারণ প্রম্‌টিংয়ের ওপরই সাফল্য নির্ভর করে। আর ওর মতন motion দিয়ে accent ঠিক করে (ঝোঁক দিয়ে সরু-মোটা খেলিয়ে) প্রম্‌ট করতে পারতই বা কে?”

নরেশ বললে, “কথা যখন ফাঁস হয়েই গেল, আজ তবে বলি,—এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কম মতভেদ হয়নি। সকলের ইচ্ছা ভুবন ও-পার্টটি করে, তা হলে একাই মাত করে দেবে, আমাদের অ্যাক্‌টিংয়ের দোষ-টোষ সব ঢাকা পড়ে যাবে। ইন্দুর লেখাটা ভুবন একাই সার্থক করে দেবে। ইন্দু হাতজোড় করে বলেও ছিল, ‘চক্ষুলজ্জায় ভুলটা যখন হয়ে গেছে ভাই—এবারটি মাপ করো। দ্বিতীয় opening থেকে ও-পার্ট ভুবনেরই রইল, এখন change করতে (বদলাতে) গেলেই একটা মনোমালিন্য ঘটাই সম্ভব।’ কথাটাও ঠিক। নেপা যেরকম মেতে রয়েছিল, ও আর এদিকে মাড়াত না।

তাই আমরা চেপে গেলুম। যাক, এখন দেখছ তো বাবা, দশের ইচ্ছা কি বিফল হয়।"

শরৎ বললে, "আর ও-সব দুশ্চিন্তা কেন বাবা,—পিসী তো পথ করে দিয়েছে, এখন তিনি গুটিগুটি দশমীতে চোখ বুজুন, আর নেপা টাকার তোড়া নিয়ে এসে জোড়া পাঁঠা ঝেড়ে আমাদের গার্ডেন পার্টি দিক—এই প্রার্থনা করি। ভুবন, লেগে যাও ভাই, তোমার তো সব পার্টই খাড়া মুখস্থ। আমাদের তো মেমরি (memory) নয়—সব শাঁক্তিগড। বাংলায় বাপের নামটাও মনে রাখতে পারি না—পেছনে prompter (তন্ত্রধারক) চাই। যাক, একেই বলে—যোগ্যপাত্রে কন্যাদান। কি বলো সব?"

সকলে সহাস্যে শরতের প্রস্তাব একবাক্যে অনুমোদন করলে। একটা আনন্দ-কলরোল পড়ে গেল। তিন পাক হুববে ঘুরে গেল। সকলেব চক্ষু ভুবনের মুখের ওপর চমকাতে লাগল।

ভুবন হাতজোড় করে সবিনয়ে বললে, "আব যা বলো সব করতে রাজী আছি ভাই, কেবল ওই কাজটি ছাড়া। কাবে পড়ে—নাপার্যমানে একজনের বদলি-খাটার বিড়ম্বনা আমার দস্তুরমতো ভোগা হয়ে গেছে। মাপ কবো দাদা, ওতে আমি আর নেই।"

শুনে সকলে সহসা যেন চোট খেয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। ইন্দু বসে পড়ল। শেষ ক্ষুব্ধ রোষে বললে, "আমি এখনই হনুমান নামটা কেটে 'মহাবীর' নাম বসিয়ে দিচ্ছি ভাই, যা হয়েছে হয়েছে, এই নাকে কানে ক্ষত—রামায়ণ যদি আর ছুঁই। এবারটি মান রক্ষা করে দাও দাদা। ও-পার্ট আর কারুর দ্বারাই ঠিক ঠিক হবে না।"

"না ইন্দু, ও-কাবণে নয় ভাই। আর নয়ই বা কেন,—গ্রামেব যে সব ছেলে,—তাদের কাছে তো চিরদিনই ওই নাম বাহাল থেকে যাবে। পরিবার থাকলে সেও মুখ পুড়িয়ে সত্যিকাব হনুমান বানিয়ে দিত। ছেলে থাকলে তার সঙ্গীরা তাকে মর্কট সাজাবার দাবি রাখত,—এক পুরুষে মিটত না। যাক, তার জন্যে বলছি না। তোমরা তো জানো, পাশেব গ্রামেই আমার মামার বাড়ি। সেইখানেই থাকতুম। সেখানেও শখের যাত্রার ভারী ধুম। দু-বছর আগেকার কথা,—তখন আমাদের রিহার্সেল খুব জোর চলেছে,—পালাটা 'সীতা-হরণ।' সীতা কি রাম লক্ষ্মণ সাজবার মতো চেহারা নয়,—গাইতেও পারি না, সুতরাং সেখানেও আমি ছিলুম প্রম্‌টার। হরি দত্ত সাজবে হরিণ। অভিনয়ের দু-দিন

আগে তার হল জ্বর, —কথাটি তো সামান্য নয়—সে যেন রাজপুত্তুরের কলেরা। অবস্থা বুঝতেই পারছ,—সকলেই মহা চিন্তিত।

"ম্যানেজার এসে আমাকে ধরে বসলেন, 'তোমাকে স্বর্ণমৃগ সাজতে হবে ভুবন।' কেউ আর তখন হরিণ বলে না,—সবাই শোনায় 'স্বর্ণমৃগ।' অর্থাৎ—খুব সম্মানের পার্ট।

"বললুম, ও-পার্ট তো যে-সে একবার ওই সোনালী বসানো খোলটায় ঢুকে করে আসতে পারে, ওতে তো আর কথাবার্তা নেই।

"সবাই চক্ষু কপালে তুলে গাঢ়স্বরে বলে উঠল, 'কি বলছ ভুবন। কথাবার্তা নেই, অথচ সে অভাবকে ভাবে ভরে দিতে হবে—সে কি যার তার কাজ, না, হরি দত্তর কাজ? তোমার ওপর তাই বরাবরই আমাদের নজর,—intelligent ( বুদ্ধিমান ) লোক না হলে ও-পার্ট ঠিক ঠিক করা কি তামাশার কথা। পারেন এক মুস্তপি সায়েব, আর পারো তুমি,—এ তোমার সামনে বলা নয়।'

"ম্যানেজার বললেন, 'হরি দত্ত দশ টাকা ঝাড়লে, বললে, তার পরিবার দেখতে আসবে, তাকে একটা কিছু সাজা চাই-ই। কি করি চক্ষুলজ্জায়ও বটে, আর হারমোনিয়মটা সারাবারও দরকার, তাই দিতে হয়েছিল।' ইত্যাদি।—শেষ হরি দত্তর খোলস আমার স্কন্ধেই চাপল। বড়োলোকের বাড়ি অভিনয়,—বনেদী ব্যবস্থা,—বিপুল আয়োজন। আলোয়, ছবিতে, ফুলের মালায় আসর হাসছে। সে পঞ্চবটী দেখলে রাজার ছেলেরও বনে যেতে শখ চাপে। আসরে আতরদান, গোলাপপাশ, রূপোর থাল ভরা পান; ট্রে ভরা বেদানা, মিছরির টুকরো, আদার কুচি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বচ প্রভৃতি। আর সুগন্ধ ছড়িয়ে সধূম চায়ের যাতায়াত, চামচের ঠুনঠান শব্দ। এতদ্বারা অভিনেতা আর গাইয়েরা গলা বজায় রাখবেন—আর বাড়িওলার সম্মান বজায় থাকবে।—

"ব্যবস্থা সবই সুন্দর, সকলে গালে দিচ্ছেনও সুন্দর। অর্থাৎ মুঠো মুঠো,—এস্তোক বনবাসী রাম লক্ষ্মণ সীতা,—মায় কনসার্ট পার্টি। অসুন্দর কেবল হরিণের সেদিকে নজর দেওয়াটা। এক টুকরো মিছরি, দুটি বেদানা, এক কুচি আদা, একটা পান কি এক চুমুক চা, তার ছোঁবার জো নেই, কারণ, সে যে হরিণ। আর ইন্টেলিজেন্ট হবার মানেই—স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখা, সেটা কেবল হরিণকেই রাখতে হবে। কিছুতে হাত বাড়ালেই, সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠে। তার কাজ কেবল—ছোটা, লাফানো, হাঁপানো, শেষ তেউড়ে পঞ্চত্ব পাওয়া। হলও তাই। হরি দত্ত জ্বর হয়ে বাঁচল,—আর নীরোগ জলজ্যান্ত

আমি তার খোলে ঢুকে সুস্থশরীরে সজ্ঞানে মলুম। Intelligent পশু সাজায় সেলাম বাবা।"

হাসির হাউই ছুটে গেল। সবাই বললে, "Bravo ভুবন, এমন বর্ণনা আর কে শোনাতে পারত। ও-পার্ট ভাই তোমাকেই করতে হবে, তা না তো প্লে একদম মাটি,—তা লিখে রেখো।"

শেষটা দলের সকলের একান্ত অনুরোধে আর ইন্দুর কাতর অনুনয়ে ভুবনকে রাজী হতে হল। ইন্দুর দুশ্চিন্তা দূর হল। হুরুরের হল্লায় সভাও ভঙ্গ হল।

## তিন

চৌধুরী মশাই আজ বেলাবেলি জমিদারি থেকে ফিরেছেন,—মেজাজ খুব খুশ। পার্বণী আদায় হয়েছে পূজাব খরচের দেড়া। তাই কাপড় না ছেড়েই সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত শৈলেশ্বরের মন্দিবে প্রণাম সেরে বৈঠকে ঢুকেছেন। নন্দা সট্‌কা ধরিয়ে চটকা ভাঙিয়ে দিয়ে গেল।

ইন্দুভূষণও পাশের কামরায় বসে প্রহসনেব প্লট ভাবছে। মাথায় বোমা মেরেও কিছু পাচ্ছে না। মাঝে আর পাঁচটি দিন মাত্র। পিসীর পাল্লা পেরিয়ে শেষ প্রহসন যে মাথায় হুতাশন জেলে দিল! অন্যমনস্কে পেনসিলটে কামড়ে কামড়ে দাঁতনে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। প্লটের কিন্তু পাত্তা লাগছে না।

চৌধুরী মশাইব আজ মেজাজ শরিফ। ইন্দু তাঁর পেয়ারের নাতি। চৌধুরী মশাইর মেজাজ মশগুল থাকলে ইন্দুকে ডেকে কিছুক্ষণ রহস্যানন্দ উপভোগ করতেন। আজও তার ডাক পড়ল।

ইন্দুকে উঠে আসতে হল,— কিন্তু বিরক্তভাবে।

চৌধুবী মশাই একবাব মুখ তুলে চেয়েই, চোখ বুজে সহাস্যে বললেন, "বিকেল-বেলা হাতে দাঁতন যে বড়ো,—রোজা রাখছিস নাকি ?"

ইন্দু তাঁর কথাটা আগে বুঝতে পারেনি, পেনসিলটায় নজর পড়তেই বুঝলে। বললে, "আপনি যখন মুক্ত-কচ্ছ হয়েছেন, তখন আমাকে তো ধর্মরক্ষা করতেই হবে!" বলাই বাহুল্য, চৌধুরী মশাই বসলেই মুক্ত-কচ্ছ হয়ে পড়তেন।

চৌধুরী মশাই উপভোগের হাসি হেসে তাড়াতাড়ি ভুলটা সেরে নিয়ে, 'জিত' বলেই বালিশের তলা থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে ইন্দুর হাতে দিলেন।

তখনকার ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘দুর্গেশনন্দিনী’র প্রথম অভিনয়-রজনী। আয়োজনের অন্ত নেই। জগৎসিংহ নাকি ঘোড়ায় চড়ে appear (হাজির) হবে। গ্রামের ত্যালে ত্যালে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, বাগানের ফটকে ফটকে—বড়ো বড়ো অক্ষরে সোনার জলে ছাপা পোস্টার—তাতে লেখা—

কে না জানে বঙ্গে রঙ্গে বঙ্কিম লেখনী,
কে না জানে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী
ইত্যাদি।

যাতায়াতের সময়ে, উঁচু-নিচু গ্রাম্য পথে গাড়ি যতবার টক্কর খেয়েছে, ততবারই চৌধুরী মশাই ‘খেলে কচুপোড়া’ বলেছেন আর চেয়েছেন। সেই সময় ঝকঝকে হরপের পোস্টারগুলোও এক-একবার নজরে পড়েছে, -এক-একটা কথা পড়েও ফেলেছেন। সবটা সাপটাতে পারেননি। তবে আন্দাজে আর বুদ্ধির জোরে ব্যাপারটা সমঝে নিয়েছেন।

ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “দুর্গেশ নন্দী লোকটা কে হে? দোকানটা কোথায়, বরানগরে বুঝি? বেজায় বেড়ে উঠেছে দেখছি। মেয়ের বিয়েতে সোনার জলে হেঁয়ালি ঝেড়েছে দেখলুম। তেল বেচে না? তা না তো এত তেল!”

ইন্দু হেসে বললে, “নন্দী কোথায় দেখলেন,—দুর্গেশনন্দিনী।”

“ঐ হল, বাংলা বুঝি না রে শা—। না হয় দুগো নন্দীর মেয়ে, এই তো?”

“না না। ও একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের নাম। বঙ্কিমবাবুর লেখা। অমন বই পড়েননি। তার একটু যদি দেখেন। নাওয়া খাওয়া ঘুরে যাবে। সবটা না দেখে ছাড়তে পারবেন না, অবাক হয়ে যাবেন।”

“থাম্ থাম্! নন্দীর মেয়ে দেখে ওঁর দাদামশাইয়ের নাওয়া-খাওয়া ঘুরে যাবে। হ্যাংলার মতো অবাক হয়ে দেখবে! ইস্টুপিড! সে বটে ‘গোলেবকালী’। আলবত, কেতাব বটে!”

“কি বলছেন দাদামশাই, বইখানা যুগান্তর এনে ফেলছে।”

“অ্যাঁ, কলি-প্রবেশ হয়ে গেছে তাহলে?”

“না দাদামশাই, অমন সুন্দর বই বাংলা ভাষায় আর বেরোয়নি। পড়বার তরে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।”

“বলিস কি! ‘মজনু’র চেয়েও ভালো?”

“কিসে আর কিসে! সে না দেখলে আপনি আইডিয়াই করতে পারবেন না। অমন একটি আয়েশা দুনিয়া ঢুঁড়ে বার করতে পারবেন না।”

"এটা কি মাস র‍্যা ?"
"কেন ?—আশ্বিন।"
"এ দুটো মাস আর বাতিক বৃদ্ধি করে মাথা খারাপ করিসনি। কটা দিন কোনোও রকমে কাটিয়ে দে ভাই। অঘ্রাণের তেরোটা দিন বাদ দিয়ে তোর মুখ বন্ধ করছি, রোস্।"
"আপনি তো শুনবেন না! কি ঘটনা-বিন্যাস, সে না শুনলে—"
"বটে! লেখকের বাড়ি কোথায়,—যাত্রার দল আছে বুঝি ?"
"না না, মস্ত বিদ্বান্। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাড়ি কাঁটালপাড়ায়।"
"বলিস কি, ডিপুটি! ওঃ, বুঝেছি, আইন-আকবরির তর্জমা করেছে! যাঃ, আর জ্যাঠামি করতে হবে না। আগে দেখ্, শোন্, শেখ্।—ওই জামতাড়া, নারকেলডাঙা, ডুমুর-দ, বেলঘরে, বেলগেছে, কলাগেছে, কাঁটালপাড়া—ওসব জায়গার লোক ফলহরি ঠাকুরের ফলোয়ার ( follower )—তারা আবার বই লিখবে! লিখলে, আমলকী কি বয়ড়া বানিয়ে বসবে। আর কি ভারতচন্দ্র আছে, এক কেতাবে খেতাব বেরিয়ে গেল,—'মেদিনী হইল মাটি,' খবর রাখিস্ ?"
শেষ বললেন, "আচ্ছা আজ সন্ধ্যের পর শোনাস্ দিকি,—সে সময় পাঁচজন পাকা সমঝদারও থাকবে, বোঝা যাবে কেমন কেতাব!"
"আপনি তো তখন ঢোলেন।"
"অজ্ঞান তো হই না রে,—একটু চেঁচিয়ে পড়িস্; আমি হুঁ দিলেই তো হল।"

সন্ধ্যার পর চৌধুরী মশাইয়ের সমঝদার-পারিষদেরা একে একে সব উপস্থিত হলেন। তাকিয়া ঠেস দিয়ে তামাক চলতে লাগল। ভৃত্য নন্দা দোরের বাইরে আসন নিলে। তার কাজও ঢোলা, আর মাঝে মাঝে কলকে বদ্‌লে দেওয়া। ইন্দু বই হাতে করে উপস্থিত হতেই, চৌধুরী মশাই বললেন, "বুঝলে বিশ্বম্ভর, ইন্দু আজ আমাদের একখানা বই শোনাবে বলে বায়না ধরেছে। কাঁটালপাড়ার কে ডিপুটি টঙ্কনাথবাবু নাকি লিখেছেন—"
"আজ্ঞে—বঙ্কিমবাবু।"
"ঐ হল,—আসল অক্ষর তো বাদ দিইনি, 'ঙ' য়ায় কয়ে তো বজায় রেখেছি রে! আচ্ছা, শুরু কর্।"
হরদেব খুড়ো তাস পেড়েছিলেন, অনিচ্ছায় তুলে রাখলেন। শম্ভু বাঁড়ুজ্যে বেজার মুখে একটা আকর্ণ-বিস্তৃত হাই তুলে, দেল ঠেস দিলেন।

ইন্দু আরম্ভ করলে, চৌধুরী মশায়েরও ঢুলুনি এল।

ইন্দু যেই বলেছে—মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ—

চৌধুরী মশাই বেশ মশগুল মেরে আসছিলেন, চোখ বুজেই বলে উঠলেন, "বাস্ করো, গলতি হ্যায়। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ কখনও হতেই পারে না। এই সব বই লেখা! মানসিংহ লোকটাই বা কে, কার পুত্র, কাদের দরোয়ান, এ পরিচয় কে দেবে? তিনি তো আর গঙ্গা গোবিন্দ সিং নন যে, সবচিন লোক, আবি কেটে দাও। লেখো—ওলসিংহের পুত্র মানসিংহ, তস্য পুত্র কচু সিংহ, তেকার পুত্র ঘেচুসিংহ, তবে না একটা ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যাবে। ও-পাড়ার মেনকা ঠান্‌দি মেয়েমানুষ হলে কি হবে—সেটা তাঁর অদৃষ্টের দোষ, তাঁরও এসব জ্ঞান আছে। নিজে মেনকা, মেয়ের নাম রেখেছেন দুর্গা, নাতনীর নাম লক্ষ্মী। খুঁট ধরলেই পটাপট তিন পুরুষ আপ্‌সে বেরিয়ে আসে। বই কি লিখলেই হল! কি বলো হরদেব!"

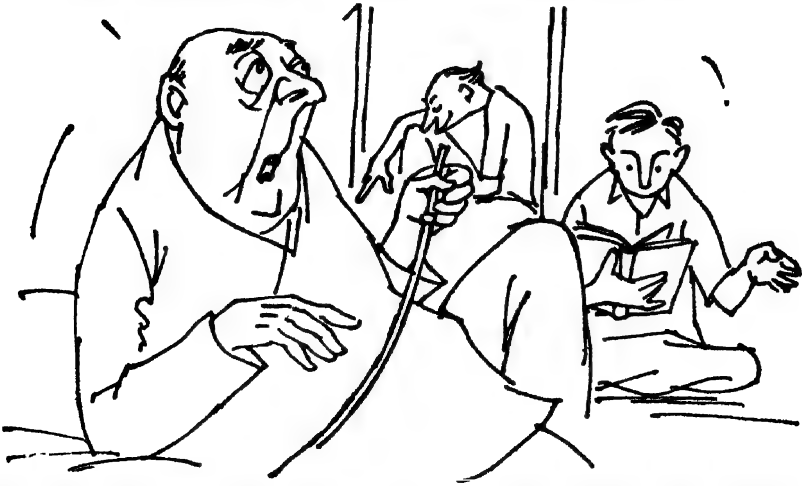

"বলব আর কি,- আর কি দেবীবর আছেন! তিনি থাকলে এসব যথেচ্ছাচার ঘটতে পেত না।" এই বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

কালীবর রায় বললেন, "ছেড়ে দাও না, ও-কথা আর বাড়িও না। আমাদের মহাদেব খুড়োর ছেলের নামকরণ হয়েছে 'মেঘনাদ'! সতী সাধ্বী বিন্দু খুড়ীর কলঙ্কটা একবার বোঝো! কার্তিক নয়, গণেশ নয়। মেঘনাদ হয় কি করে? সমাজ কি আর আছে! তিনি লজ্জায় গঙ্গাস্নান ছেড়ে দিয়েছেন। যাক্, ও পাপ-কথা ছেড়ে দাও।"

চৌধুরী মশাইর তে-ভাঁজ থুতনিটা তখন বুকে ঠেকে থেবড়ে ছিল। সেটা ঈষৎ

চাগিয়ে বললেন, "ছেড়ে দাও কি রকম? আমরা জিতা থাকতে জাতটা চোখের সামনে বর্ণসঙ্কর মেরে যাবে নাকি? কাল মহাদেবকে ডাক দাও। বুঝলে?"

যাক, ইন্দুকে অনেক করে সে ধাক্কা সামলে শুরু কবতে হল। চৌধুরী মশাইর থুতনি আবার তাঁর বুকের ওপর থেবড়ে বসল। সট্‌কার নলটা হাত থেকে খসে পড়ল। এক-একবার চমক আসে আর বলেন "হুঁ, তারপর?"

ইন্দু তখন এগিয়েছে।—"বিমলা আর তিলোত্তমা তখন শৈলেশ্বরের মন্দির মধ্যে, বাইরে ভয়ংকর ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত—"

চৌধুরী মশাই চমকে দুবার 'দুর্গা দুর্গা' উচ্চারণ করে ভৃত্যকে বলে উঠলেন, "নন্দা, ঢুলছিস বুঝি? দেখছিস না হারামজাদা, মাথার ওপর কী প্রলয়কাণ্ড! গোরুগুলো বাইরে নেই তো, শিগগির তুলে ফেল। উঠলি?"

ইন্দু থামেনি—"রমণীদ্বয় ভয়ে জড়সড।" শুনেই চৌধুরী মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোনোই ভয় নাই মা, এ ভদ্রলোকের বাড়ি। নন্দা, গিন্নীকে বল—চট করে ওদের বাড়ির মধ্যে নে যান। গেলি?" ইন্দু ছাড়েনি।—"এমন সময় জগৎসিংহ মন্দিরদ্বারে করাঘাত করে বললেন,—মন্দির মধ্যে কে আছ—দ্বার খোল—"

চৌধুরী বেজায় চটে বলে উঠলেন, "খেলে কলা-পোড়া,—মেয়েদের বলে দ্বার খুলতে! বেটার বাবার মন্দির! নন্দা, আবি গলা ধাক্কা দেকে নিকালো। গিয়েছিস্?"

ইন্দু শোনাবেই,—"দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় দমকা হাওয়া ঢুকে প্রদীপ নিবে গেল।"

"অ্যাঁ, ও বেটাও ঢুকল নাকি? কি দেখছ হে হরদেব!"

ইন্দু—"শুনুন না—জগৎসিংহের মন্দির মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকাল, অমনই তিলোত্তমার সঙ্গে তাঁর চারি চক্ষের মিলন।"

"এই মাথা খেলে" বলেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে মুক্তকচ্ছ চৌধুরীও ওঠবার উপক্রম করলেন। চিৎকার করে উঠলেন, "শিবের মন্দিরে বেলকোমো, পাহারাওলা, পাহারাওলা! আচ্ছা হরদেব, মেয়েগুলোই বা কি রকম!—এই দুর্যোগের রাতে, আমারই শিবমন্দিরে—অ্যাঁ! নন্দা, ছাতাটা দে তো! উঃ কী বিদ্যুৎ! চোখ সামলাও হরদেব, চোখে পড়তে পারে,—পড়—ল!"

এই বলে বোজা চোখ সজোরে বুজলেন।

চৌধুরী উঠে পড়েন আর কি, "ওঃ, কী দমকা!"

ইন্দু অনেক করে বুঝিয়ে বসালে। বললে, "আমি দেখছি দাদামশাই।"

"তুই কি দেখবি? তোর যাওয়া হবে না,—ওরা কাঠের পুতুল নয়। দেখলিনি পাজী, বিদ্যুতে শুভদৃষ্টি! কি হে হরদেব, কিছু বলছ না যে?"

"কি বলব বলুন? তাস খেললে আর এসব বিভ্রাট ঘটে না। অমন নিরীহ জিনিসটি আর নেই। বিবিগুলো পর্যন্ত বাড়ির চেয়ে ভালো, মুখে কথাটি নেই।"

"সে তো বুঝলুম, এখন উপায়? মন্দিরের তো দফা—বুঝলে, শিবেরও মাথা খেলে! এখন শুদ্ধির উপায় করো।"

"আজ্ঞে তারিণী পুরুতকে ডাকতে পাঠান। কাল প্রাতেই পঞ্চগব্য চড়াতে হবে। আর দ্বাদশটি—সে তো জানেনই।"

"এই নন্দা শুনলি? সারা রাতের বেবাক গোবর আর শ্রীচোনা, একরত্তি যেন নষ্ট না হয়। শোন্, সাতটা গোরুই—সবটা। ব্যাপারটা সোজা নয়, বুঝলি?··· দিন যায় তো ক্ষণ যায় না হে! হারামজাদাকে বলি, শীতল—আরতি হয়ে গেলেই তালা বন্ধ করতে; শূয়ার হরগিজ শুনবে না! দূর করে দেব।"

চৌধুরী বলেই চললেন, "হ্যাঁ কি নাম বললে, তিলের ধামা আর কি? কী বিদকুটে নাম রে বাবা! না ক্ষ্যান্তো, না লক্ষ্মী, না বিধু! ওরা কখ্‌খনো ভালো মেয়েমানুষ নয়। খবরদার ইন্দু, ওদিকে যেতে পাবিনি। ফের বিদ্যুৎ চমকাতে পারে। তোর এত ছটফটানি কেন রে রাসকেল? বস্ এখানে!"

এই বলে ইন্দুর হাত মনে করে, সটকার নলটা ধরে জোরে টান মারতেই, গড়গড়াটি উলটে পড়ে—লঙ্কাকাণ্ড! এতক্ষণে চৌধুরী মশাইর ঘুমের ঘোরটা একেবারে কেটে গেল, চোখও খুলে গেল। ইন্দু হাসি চেপে গম্ভীরভাবে বললে, "তারিণী পুরুত বললেন, আপনাকে নেড়া হয়ে প্রাচিত্তির করতে হবে।"

চৌধুরী মশাই একদম অবাক, "কেন? মুংলী মরেছে বুঝি, গলায় দড়ি ছিল?" এতক্ষণের ঘটনাটা তাঁর মাথায় ধোঁয়াটে মেরে ঘোলা ছিল। কিছু ঠিক করতে পারছিলেন না। কিন্তু কথায় যেন কুয়াশা কেটে গেল—তবে তো সত্যি! সহসা চটে উঠে, "হারামজাদ্ মশা-মাছিতে মেঘ দেখতে পায়, আর তুমি বেটা চোখ বুজে বসে আছ!" বলেই নন্দার পিঠে পটাপট চটি-প্রহার। সে হাসতে হাসতে ছুটে পালাল।

ইন্দু তাঁকে ধরে বসিয়ে বললে, "আজ্ঞে শুধু তাই নয়,—শিবের মন্দিরে ঐ যে অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক কাণ্ডটা--"

"ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা কি এখনও—"

"না তাঁরা বোধ হয় বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন। আমি দেখে আসছি দাদামশাই,

এক মিনিটও লাগবে না, এলুম বলে।”

“দাঁড়া বলছি ছুঁচো! তোর এত দেখতে যাবার মাথা-ব্যথা কেন রে ইস্টুপিড! শুনলে হরদেব, আমার নীতি-বোধ পড়া নাতি কি বললেন, ‘তাঁরা বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন! তাঁরা! ওরে গাধা, তোর দাদামশাই জানে, তারা ঘরে থাকবার নয়। নন্দা, দেখ্ দিকি, অমনই গোবরজল ছড়া দিয়ে আসবি,—আর আমার জন্যেও একটু গঙ্গাজল আনিস, কান দুটো ধুয়ে ফেলি।”

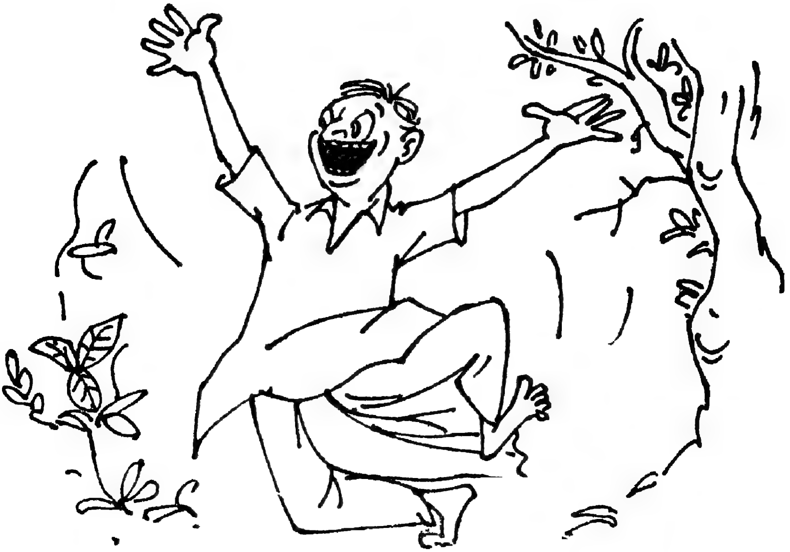

ইন্দু তখন সদর বাড়ির বাগানে আনন্দাতিশয্যে ছুটোছুটি করছে, আর আপনা-আপনি হো হো করে হাসছে। আর হাঁপাছে।

রিহার্সেল-ঘরে না পেয়ে শরৎ তাকে খুঁজতে এসে তার অবস্থা দেখে অবাক।

“কি হে, ব্যাপার কি? একা একাই সিদ্ধি চড়িয়েছ নাকি?”

ইন্দু—“সখিরে কি কহিব আনন্দ ওর। চড়াইনি লাভ করেছি।”

“কি রকম?”

“ভাই সারা বিকেলটা প্রহসনের প্লটের জন্যে মাথায় পেরেক ঠুকেও একটা প বার করতে পারিনি,—পাগল হয়ে যাচ্ছিলুম। পিসী-পর্ব পার হয়ে শেষ প্লটে ঠেকে গেলুম। এই অবস্থায়—স্বপ্নে কহি দিলা দেবী।”

“ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

“না হে,—ভূতাবিষ্ট দাদামহাশয় প্রমুখাৎ,—একদম খাঁটি স্বপ্নাদ্য।”

**প্রমথ চৌধুরী ( ১৮৬৪—১৯৪৬ )**

# নীললোহিতের স্বয়ংবর

## আদিপর্ব

সেদিন রূপেন্দ্র আমাদের নবতর-জীবন সমিতিতে মহাবক্তৃতা করছিলেন, এই কথা সকলকে বোঝাবার জন্য যে, আমাদের দেশের মামুলী বিবাহ প্রথার বদলে স্বয়ংবর-প্রথা না চালালে আমরা জাতি-গঠন কিছুতেই করতে পারব না।

রূপেন্দ্রের এবিষয়ে এত উৎসাহ হবার কারণ—প্রথমতঃ তাঁর বাপ-মা তাঁর জন্য মেয়ে খুঁজছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি দু-দিন আগে রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গ পড়েছিলেন, আর তৃতীয়তঃ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তিনি যথার্থই রূপেন্দ্র, অর্থাৎ অসাধারণ সুপুরুষ। আর আমরা যে ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁর বক্তৃতা একমনে শুনছিলুম, তার কারণ আমরা সকলেই ছিলুম অবিবাহিত অথচ বিবাহযোগ্য। কাজেই এ আলোচনায় আমরা সকলেই মনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম, চুপ করে ছিলেন শুধু নীললোহিত। তাই রসিকলাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হে, তুমি কোনো কথা কইছ না কেন ? রূপেন্দ্রের প্রস্তাবে তোমার মৌনতা কি সম্মতির লক্ষণ নাকি ?” নীললোহিত কিঞ্চিৎ বিরক্তির স্বরে বললেন, “যা হয় তা হওয়া উচিত, এরকম nonsensical কথার উপর আর কি বলব ?” একথা শুনে আমরা সকলেই কান-খাড়া করলুম, কেননা বুঝলুম এইবার নীললোহিতের কেচ্ছা শুরু হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—“বাংলার মেয়েরা আজও স্বয়ংবরা হয় না কি ?” নীললোহিত বললেন, “আলবত।” আমি আবার প্রশ্ন করলুম “তুমি কি করে জানলে ?” নীললোহিত বললেন “জানলুম কি করে ? বই কি কাগজ পড়ে নয়, শুঁড়ির দোকান কিংবা গুলির আড্ডাতে পরের মুখে শুনেও নয়, নিজের চোখে দেখে।”

“চোখে দেখে ?”

“—হ্যাঁ চোখে দেখে। আমি একটি জাঁকালো স্বয়ংবরসভায় সশরীরে উপস্থিত ছিলুম, আর আমার চোখ বলে যে একটা জিনিস আছে, তা তো তোমরা সকলেই জানো।”

ব্যাপারটা কি হয়েছিল শোনবার জন্য আমরা বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করাতে নীললোহিত তাঁর বর্ণনা শুরু করলেন :

“আমি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই একখানি চিঠি পাই, অক্ষরের ছাঁদ দেখে মনে হল মেয়ের লেখা। তার প্রতি অক্ষরটি যেন ছাপার অক্ষর, আর সেগুলি সাজানো হয়েছে সব সরল রেখায়। লেখা দেখে মনে হল পূর্বপরিচিত, কিন্তু কোথায় এ-লেখা দেখেছি, তা মনে করতে পারলুম না। শেষটা চিঠিখানি খুলে যা পড়লুম, তাতে অবাক হয়ে গেলুম। চিঠিখানি এই :

> আপনি জানেন যে বাবা হচ্ছেন সেই জাতীয় লোক, আপনারা যাকে বলেন idealist, একটা idea তাঁর মাথায় ঢুকলে, সেটিকে কার্যে পরিণত না করে তিনি থামেন না। আর অপর কেউ তাকে থামাতে পারে না, কারণ তাঁর পয়সা আছে, আর সে পয়সা তিনি অকাতরে অপব্যয় করেন। বড়ো মানুষের খোশ-খেয়ালও তো একরকম idealism।
>
> বাবা যেদিন থেকে পৈতে নিয়ে ক্ষত্রিয় হয়েছেন, সেদিন থেকেই তিনি যথাসাধ্য শাস্ত্রানুমোদিত ক্ষাত্রধর্মের চর্চা করছেন। অতঃপর তিনি মনস্থির করেছেন যে আমাকে এবার স্বয়ংবরা হতে হবে। আমাদের বাড়িতে আগামী মাঘী পূর্ণিমায় স্বয়ংবর সভা বসবে। আপনি যদি সে সভায় উপস্থিত হন, অবশ্য নিমন্ত্রিত হিসেবে নয়, দর্শক হিসেবে—তো খুশি হই। এরকম অপূর্ব নাটক আপনি কলকাতার কোনো থিয়েটারেও দেখতে পাবেন না। অবশ্য আপনাকে ছদ্মবেশে আসতে হবে। কি করে কি করতে হবে সে সব মেজদা আপনাকে জানাবেন। ইতি—
>
> মালা

চিঠিটা পড়েই বুঝলুম যে এ মালশ্রীর চিঠি।”

আমাদের ভিতর কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, “মহিলাটি কে, মাদ্রাজী না মারাঠী?” নীললোহিত উত্তর করলেন, “চিঠি শুনে কি মনে হল যে, ও চিঠি কোনো কাছাকোঁচা দেওয়া মেয়ের হাত থেকে বেরুতে পারে? দু-পাতা ইংরেজি পড়ে মাতৃভাষাও ভুলে গিয়েছ নাকি?”

—“না, তা ভুলিনি। কিন্তু কোনোও বাঙালী মেয়ের মালশ্রী নাম কখনও শুনিনি। এমন কি হালফ্যাশানের নভেল নাটকেও পড়িনি।”

—“সে নিজের নাম নিজে রাখেনি, রেখেছে তার বাপ-মা।”

—“মেয়েটি কার মেয়ে?”

—"রাজা ঋষভরঞ্জন রায়ের একমাত্র সন্তান।"

বাপের নাম শুনে আমরা অনেকেই আর হাসি রাখতে পারলুম না। আমাদের হাসি দেখে ও শুনে নীললোহিত মহা চটে বললেন—"বীরবলী ভাষা পড়ে যদি সাধুভাষা ভুলে না যেতে, তাহলে আর অমন করে হাসতে না। এ ঋষভ সঙ্গীতের ঋষভ, বাংলায় যাকে বলে রেখাব। নুরনগরের রাজ-পরিবারে ছেলে-মেয়েদের নামকরণ করা হয় সঙ্গীতাচার্যদের উপদেশমতো। মালশ্রীর পিসীদের নাম হচ্ছে জয়জয়ন্তী ও পটমঞ্জরী আর তার পিসতুতো মেজদাদার নাম হচ্ছে নটনারায়ণ, আর বড় দাদার নাম ছিল দীপক। গানবাজনার যদি ক-খ জানতে, তাহলে এগুলি যে সব বড়ো বড়ো রাগরাগিণীর নাম তা আর আমাকে তোমাদের বলে দিতে হত না। বনেদী পরিবারের ছেলের নাম কি হবে পাঁচু আর মেয়ের নাম পাঁচি?"

নীললোহিতের এ বক্তৃতা শুনে রসিকলাল জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহলে এ পরিবারে সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চা আছে?"

নীললোহিত বললেন—"রাজা ঋষভরঞ্জন পয়লা নম্বরের ধ্রুপদী। তাঁর তুল্য বাজখাঁই গলা কোনোও গাঁজাখোর ওস্তাদেরও নেই।" রসিকলাল উত্তর করলেন—"আমরা গানবাজনার ক-খ না জানি—এটা জানি যে ঋষভের গলা বাজখাঁই-ই হয়ে থাকে।" একথা শুনে আমরা কোনোমতো প্রকারে হাসি চেপে রাখলুম এই ভয়ে যে নীললোহিত আমাদের হাসি দ্বিতীয়বার আর সহ্য করতে পারবেন না। নীললোহিত বললেন: "কথায় কথায় যদি বস্তাপচা রসিকতা করো তাহলে আমি আর কথা কইব না।"

অনেক সাধ্যসাধনার পর নীললোহিত মালশ্রীর স্বয়ংবরের গল্প বলতে রাজী হলেন, on condition আমরা কেউ টুঁ শব্দ করব না। নীললোহিত আরম্ভ করলেন—"তোমাদের দেখছি আসল ঘটনার চাইতে তার সব উপসর্গ সম্বন্ধেই কৌতূহল বেশি। এ হচ্ছে বিলেতী নভেল পড়ার ফল। গল্প যাক চুলোয়, তার আশপাশের বর্ণনাই হল মূল। ছবি বাদ দিয়ে তার ফ্রেমের রূপই তোমরা দেখতে চাও। সে যাই হোক, এখন আমার গল্প শোনো:

মালশ্রীর মেজদাদা অর্থাৎ রাজাবাহাদুরের ভাগ্‌নে আমার একজন বাল্যবন্ধু। রূপেন্দ্রের বিশ্বাস তিনি বড়ো সুপুরুষ। একবার নটনারায়ণকে গিয়ে দেখে আসুন চেহারা কাকে বলে। তার উপর সে আশ্চর্য গুণী। নাচে গানে তার তুল্য গুণী, amateur-দের ভিতর আর দ্বিতীয় নেই। আর তার কথাবার্তা

শুনলে রসিকলাল বুঝতেন যথার্থ সুরসিক কাকে বলে।

রাজাবাহাদুর যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন নটনারায়ণের সুপারিশে আমি মালশ্রীর প্রাইভেট টিউটর হই। ইংরেজি সে আমার কাছেই শিখেছে। তেরো থেকে ষোলো, এই তিন বৎসর সে আমার কাছে পড়ে যেরকম ইংরেজি শিখেছে, সে ইংরেজি তোমরা কেউই জানো না। আর তাকে এত যত্ন করে পড়িয়েছিলুম কেন জানো? মেয়েটি সত্যিই ডানাকাটা পরী, তার উপর আশ্চর্য বুদ্ধিমতী। তারপর রাজাবাহাদুর আজ দু-বৎসর হল দেশে চলে গিয়েছেন—আমলাদের অত্যাচারে প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল বলে। ইতিমধ্যে তাঁদের আর কোনো খবরই পাইনি, হঠাৎ ঐ চিঠি এসে উপস্থিত। সকালে চিঠি পেলুম, বিকেলেই মেজদার সঙ্গে দেখা করলুম। মালশ্রী নটনারায়ণকেও চিঠি লিখেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম:

—মেজদা, ব্যাপার কি?

—রাজা মামার খেয়াল।

—এ খেয়ালের ফল দাঁড়াবে কি?

—প্রকাণ্ড তামাশা।

—সে তামাশা আমিও দেখতে চাই।

—সেখানে গেলেই দেখতে পাবে।

—সেখানে যাই কি করে?

—নাম রূপ ভাঁড়িয়ে

—কি সেজে?

—বর সেজে নয়।

তারপর সে পরামর্শ দিলে যে আমি দরওয়ান সেজে ও-সভায় যেতে পারি। রাজাবাহাদুরের পুরনো জমাদার রামটহল সিং জনকতক নতুন ভোজপুরী দরওয়ান সংগ্রহ করবার জন্য কলকাতায় এসেছে; তাদের দলেই আমি ঢুকে যেতে পারি।

## উদ্যোগপর্ব

তার পরদিন সকালে আমি মেজদার ওখানে হাজির হলুম। আমার নাম হল লীললাল সিং, আর নটনারায়ণ আমাকে এ-দলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলে। সবরকম ভোজপুরী দেহাতী বুলি আমি বাংলার চাইতেও অনর্গল বলতে

পারি। আর "করলবড়া'র" জায়গায় ভুলেও আমার মুখ থেকে "করলবাণী" বেরোয় না, কাজেই রামদুলাল সিং, রামঅবতার সিং, রামখেলাওয়ান সিং, রামদিন সিং, রামযশ সিং, রামরূপ সিং, রামভূপ সিং, রামদৎ সিং, রামগোলাম সিং, রামগোপাল সিং প্রভৃতি ভোজপুরী ছত্রীর দল আমাকে আর বাঙালী বলে চিনতে পারলে না। আমি জমাদার হয়েই দু-বেটা মূর্তিমান পাপকে শুধু বিদেয় করলুম। কারণ ওঙ্কারনাথ বাহ্মণ ও বৈজনাথ বাহ্মণকে দেখেই বুঝলুম যে দু-বেটাই মৃজাপুরী গুণ্ডা, দু-বেটাই খুনে। দু-পয়সার লোভে কাকে কখন চোরা-ছোরা মেরে দেবে, তার ঠিক নেই। আর ফলে আমার বদনাম হবে।

এই রামসিংদের সঙ্গে আমার দু-দণ্ডেই ভাব হয়ে গেল, আর তাদের এমন প্রিয়পাত্র হয়ে পড়লুম যে, সেই রাত্তিরে ট্রেনে রামগোলাম সিং ও রামগোপাল সিং তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করলে। আমি দুজনকেই কথা দিলুম যে, প্রথমে মুনিবের মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক —তারপর আমার বিয়ের কথা ঠিক করা যাবে। তারা বললে—"ই বাৎ ঠিক হ্যায়।" Loyalty কাকে বলে দেখতে চাও তো এদের দেখো। সেই একদিনের আলাপ, কিন্তু আজও যদি খবর দিই তো তারা সুতোপটি, ময়দাপটি, পাথুরেঘাটা, দরমাহাটা, যে যেখানে আছে সে সেখান থেকে হাতের গোড়ায় যে হাতিয়ার পায়, তাই নিয়ে ছুটে আসবে। আজও বড়োবাজারের গদিতে গদিতে ও পাথুরেঘাটার দেউড়িতে দেউড়িতে এ কথা প্রচার যে, বাংলামে কোই মরদ হ্যায় তো, হ্যায় নীললাল ব্রাহ্মণ। আমি যে ছত্রী নেই, সে-কথা তারা পরে জানতে পেরেছে, আর তার পর থেকেই আমার সঙ্গে দেখা হলে তারা বলে, "গোড় লাগি মহারাজ।"

আমি সদলবলে বিকেলে ট্রেনে উঠলুম থার্ড ক্লাসে, আর ফার্স্ট ক্লাসে উঠলেন আর একদল, কারা তা চিনিনে। ভোর হতে না হতেই পীরপুর স্টেশনে পৌঁছলুম। রাত্তিরে অবশ্য গাড়িতে ঘুম হয়নি। আমাদের মুখে যেমন সিগারেট, রামসিংদের মুখে তেমনি গাঁজার কলকে মধ্যে মধ্যে ধোঁয়া ছাড়ছে। তার উপর আবার গান। কেউ ধরেছে খেয়াল, কেউ ভজন, কেউ মোবারকবাদী, কেউ বা আবার লাউনি। ভজনই এরা গায় ভালো, কারণ ভজনে তান নেই, আছে শুধু টান। তাদের মুখে ভজনগুলোই আমার ভালো লাগছিল। "প্রভু অগুনে চিতে না ধরো" ভজনটা শুনে আমার মন ভক্তিরসে তেমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠেনি, যেমন হয়েছিল "সাহেব আল্লা করিম রহিম—" এই ইসলামী ভজন

শুনে। হিন্দু-মুসলমানের মনের গর্ভ-মন্দিরে যে একই দেবতা বিরাজ করছেন, এই সব গানের প্রসাদে সে সত্য আমরা আবিষ্কার করি। মোবারকবাদী কাকে বলে জানো? শুভকর্মের শুভলগ্নের গান। ভক্তিরস অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, তাই ওদের মধ্যে সব চেয়ে ফুর্তিওয়ালা ছোকরা রামরঙ্গিলা সিং যখন এই বিয়ের গান ধরলে ঃ

“হাস হাসকে ঘুঁঘট খোলে লালবনা।
আম্মা মেরে টীকা দেখলে ভয়া লালবনা॥”

তখন ঘরসুদ্ধ হাসির গর্‌রা পড়ে গেল। “বর আমার ঘোমটা খুলে কপালে কুলির ফোঁটা দেখে নিয়েছে”—এ কথায় হাসবার যে কি আছে তা জানিনে, কিন্তু ঐ সূত্রে যে-সব দেহাতী রসিকতা শুনলুম তা তোমাদের না শোনাই ভালো। সেই যা হোক, ঘুম না হলেও রাতটা কেটেছিল ভালো। ব্যাপার হয়েছিল একদম Musical Soiree।”

এতক্ষণ সকলে চুপ করে ছিল। অবশেষে আমাদের মধ্যে প্রধান গাইয়ে বিশ্বনাথ ওস্তাদের সাগরিদ শ্রীকণ্ঠ বলে উঠলেন—“নীললোহিত, তুমি দেখছি গান বাজনাতেও expert হয়ে উঠেছ। ভজনের সঙ্গে খেয়ালের তফাৎ কি, তাও তুমি জানো।”

তিনি উত্তর করলেন—“তিন বৎসর তো আর কানে তুলো দিয়ে মালাকে পড়াইনি। ও-বাড়িতে যে দিবারাত্র ওস্তাদি গান হয়। গানের expert গলা সাধলে হয় না, তার জন্য চাই কান-সাধা।”

—“মানলুম তাই। আর দরওয়ানরাও সব ওস্তাদী গান গায়? অবাক করলে!”

—“ভালো! দরওয়ানের সঙ্গে ওস্তাদের তফাৎটা কি? দুজনেই ডালরুটি ও গাঁজা খায়, দুজনে মুগুর ও স্বর ভাঁজে। কেন, তুমি কখনও কোনো পালোয়ানকে মৃদঙ্গের সঙ্গে তাল ঠুকে কুস্তি করতে দেখোনি? ওরা সব আজ ওস্তাদ কাল দরওয়ান, আজ দরওয়ান কাল ওস্তাদ—যখন যার যেমন পরবস্তি হয়।”

তারপর তিনি আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—“যা বললুম তার থেকে মনে ভেবো না যে, ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনোরূপ prejudice আছে কি ছিল। নিরক্ষর ও নিঃস্ব হলেও, মানুষের অন্তরে যে প্রেম ও ভক্তি আর দেহে জোর ও হিম্মত থাকতে পারে, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলে তোমরাও তা দেখতে পেতে। তোমরা তো ‘হিস্টরি’ পড়েছ। সন সাঁতাওনকে গদড় কারা করেছিল?

তোমাদের পূর্বপুরুষরা, না এদের বাপ ঠাকুরদারা ? তোমরা এদের ছাতুখোর বলে অবজ্ঞা করো, তার কারণ তোমরা জানো না ছাতুর ভিতর কি মাল আছে ! কালিদাস কি খেয়ে মেঘদূত লিখেছিলেন, ভাত না ছাতু ?"

আমি বললুম, "হয়েছে, এখন গল্প বলো।"

নীললোহিত উত্তর করলেন —"আমি তো তাই বলতে চাই, কিন্তু তোমরা বলতে দেও কই ?

গল্প শুনতে তোমরা শেখনি, শিখবেও না, কারণ তোমরা চাও নিজের নিজের বিদ্যে দেখাতে—কেউ সঙ্গীতের, কেউ সাহিত্যের। এত সমালোচকের পাল্লায় পড়লে আমি তো আমি Shakespeare-ও তাঁর গল্প বলতে পারতেন না। কেউ না কেউ Caliban-এর anthropology নিয়ে ঘোর তর্ক শুরু করত। যদি সত্যিই শুনতে চাও তো এখন শোনো—বিদ্যে গোলদীঘিতে গিয়ে জাহির করো।

পীরপুর স্টেশন থেকে নুরনগর দশ মাইল রাস্তা। আমি গাড়ি থেকে নেমেই আমাদের দলবলকে একবার drill করালুম এবং তারপর সকলকে shoulder arms করে quick march করতে হুকুম দিলুম। আর একখানি লরিতে ভাবী জামাইবাবুরা রওনা হলেন, অর্থাৎ তাঁরা যাঁরা ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে এসেছিলেন। হাজার হাজার নাকে বেসর পরা চাষার মেয়ে দু-পাশে কাতার দিয়ে আমাদের শোভাযাত্রা দেখতে লাগল। তারা বলাবলি করতে আরম্ভ করলে—"এ কিরকম হল, বরের দল চলেছে হেঁটে—আর তাদের তল্পীদাররা চেপেছে মোটর গাড়িতে,—বোধহয় মালপত্র হেপাজত করে নিয়ে যাবার জন্য ?" এ ভুল যে তাদের হয়েছিল তার কারণ আমার দলবলরাই ছিল দেখতে রাজপুত্তুরের মতো—আর যারা লরিতে ছিল তারা দেখতে তোমরা যেমন।

আমরা দু-দলই রাজবাড়িতে একসঙ্গে পৌছলুম। পাড়াগেঁয়ে কাঁচা রাস্তা, সে রাস্তায় আমাদের পায়ের সঙ্গে মোটর পাল্লা দিতে পারবে কেন ? সেখানে গিয়েই জামাইবাবুরা রাজাবাহাদুরের Guest House-এ চলে গেলেন, আর আমাদের বাসা হল দেউড়ির ডান পাশের ভোজপুরী ব্যারাকে।

বাঁ পাশের ঘরগুলোতে আস্তানা করেছিল বাঙালী লাঠিয়ালরা। গিয়ে দেখি তারা সব সিঙ্গার-পটার করছে। কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁতন করছে, কেউ বাবরি চুল আঁচড়াচ্ছে তো আঁচড়াচ্ছেই, কেউ আবার একমনে দাঁতে মিশি দিচ্ছে, সকলেরই পরনে মিহি শান্তিপুরে ধুতি, কোমরে গোট, বাজুতে দাওয়া

আর দোয়াভরা কবচ ও মাদুলী, আর কাঁধে লাল ডুরেদার গামছা। বেটারা যেন সব নবাবপুত্তুর—কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এরা পৃথিবীতে এসেছে যেন পান দোকতা খেতে আর কাজিয়ার সময় লোকের পেটে সড়কি বসিয়ে দিতে। তার পরেই নিরুদ্দেশ। বেটাদের বাড়ি হচ্ছে হয় নটিবাড়ী নয় শ্রীঘর আর যেখানেই তারা যায় সেখানেই তো এ দুই ঘরবাড়ি আছে। এইসব লাল খাঁ কালো খাঁদের বাঁয়ে রেখে, আমরা নিজের আড্ডায় গিয়ে ঢুকলুম। দিনটা কেটে গেল হাতিয়ার শানাতে। কারণ রাজবাড়ি থেকে যে সব ঢাল তলোয়ার আমাদের দেওয়া হয়েছিল— সে-সব দুশো বৎসরের মরচে ধরা। তাদের মরচে ছাড়াতেই প্রায় দিন কাবার হয়ে গেল। সেদিন আমাদের আর রান্নাবাড়া হল না, যদিচ রাজবাড়ি থেকে প্রকাণ্ড সিধে এসেছিল। আমরা সকলে জলের ছিটে দিয়ে ছাতু তাল পাকিয়ে নিয়ে গণ্ডা গণ্ডা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তা গলাধঃকরণ করলুম। সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় আমাদের ডাক পড়ল স্বয়ংবর-সভা পাহারা দেবার জন্য। ভোজপুরীদের সঙ্গে লাঠিয়ালদের তফাৎ এই যে লেঠেলরা খেতে না পেলে ডাকাত হয় আর ভোজপুরীরা পাহারাওয়ালা।

## সভাপর্ব

বিয়ের সভা বসেছিল ঠাকুরবাড়িতে, কারণ তার নাটমন্দিরে শ-পাঁচেক লোক হেলায় বসতে পারে। ঠাকুরবাড়িতে ঢোকবার আগে বাইরের উঠানে দেখি লাঠিয়ালরা সব সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ এক নতুন মূর্তি। এবার তারা সব কাপড় পরেছে, উত্তর বঙ্গের চাষার মেয়েদের মতো বুক থেকে ঝুলিয়ে, আর সে কাপড়ের ঝুল হাঁটু পর্যন্ত। সকলেরই ডান হাতে পাঁচ হাত লম্বা লাঠি, কারও কারও হাতে আবার পুঁটিমাছ ধরা ছিপের মতো সরু সরু লম্বা সড়কি, তার মুখে ইস্পাতের ফলাগুলো জিভের মতো বেরিয়ে আছে। সে তো মানুষের জিভ নয় সাপের দাঁত। আর সকলেরই বাঁ হাতে থাবা প্রমাণ বেতের ঢাল। প্রথমে এদের দেখে চিনতেই পারিনি। মাথার চুল এখন আর তাদের কাঁধের উপর ঝুলছে না, ছাতার মতো মাথা ঘিরে রয়েছে। শুনলুম মাথার চুল দিনভর ময়দা দিয়ে ঘষে ঘষে ফুলিয়েছে। এই নাকি তাদের যুদ্ধের বেশ।

ঠাকুরবাড়িতে ঢুকে দেখি নাটমন্দির লোকে লোকারণ্য। আর সুমুখের ঠাকুর-দালান খালি, শুধু দু-ধারে দু-সার চেয়ারে বরবাবুরা বসে আছেন। একধারে সাদা কাপড়ের উপর বড়ো বড়ো শালুর লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে 'কর্মবীর'

অন্য ধারে একই ধাঁচে 'জ্ঞানবীর'। ঘোর মূর্খের দলরা হচ্ছে সব 'কর্মবীর,' ইংরেজিতে যাকে বলে sportsman—তাদের কারো হাতে রয়েছে ক্রিকেট ব্যাট, কারো হাতে টেনিস র‍্যাকেট, Boxing gloves, কারো হাতে হকি স্টিক, কারো হাতে foot-ball। শুধু একজনের হাতে রয়েছে দেখলুম এক হাত লম্বা একটি খাগড়ার কলম, শুনলুম ইনি হচ্ছেন লিপিবীর। মধ্যে যেখানে চার ধাপ সিঁড়ি দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে উঠতে হয়, সেখানটা ফাঁক। তারপরে জ্ঞানবীরদের আসন। এরা সকলেই ডক্টর—শুধু কারও Dর পিছনে আছে L, কারো L. T, কারো S. C.। কে কোন্ দলের লোক তা তাদের মাথার উপরের placard না দেখলে বোঝা যায় না। দু-দলেরই রূপ এক। ব্যাং আর ফড়িং এ দলেও ছিল, ও দলেও ছিল। অথচ উভয় দলই পরস্পরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখছিলেন। রাজা বাহাদুর নাটমন্দিরে ঢুকতেই একটি উচ্চাসনে অর্থাৎ High courtএর জজের চেয়ারে বসেছিলেন। তার এক পাশে ছিল নটনারায়ণ, আর এক পাশে দেওয়ানজী। চণ্ডীমণ্ডপ ও নাটমন্দিরের মধ্যে যে গলিটা ছিল, আমি আমার দলবল নিয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সকলেরই মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে সাদা চাপকান, কোমরে তলওয়ার আর পায়ে নাগরা জুতো। শুধু আমার মাথায় পাগড়ি ছিল ডাইনে নীল, বাঁয়ে লাল আর একমাত্র আমার তলওয়ারে ছিল হাতির দাঁতের বাঁট। আমরা প্রথমে গিয়েই সব single fileএ দাঁড়িয়ে salute করলুম তারপরে, এই বলে অভিবাদন করলুম "জিয়ে মহারাজ, জিয়ে মোতিওয়ালা, দোস্ত বহাল, দুশমন পয়মাল।" শুনে রাজা খুব খুশি হলেন। তারপরে নটনারায়ণ হুকুম দিলেন—"জমাদার লীললাল সিং পাহারাকো বন্দোবস্ত করো।" আমি "জো হুকুম" বলে, ঠাকুরবাড়ির উত্তর দুয়ারে ছ-জন দক্ষিণ দুয়ারে ছ-জন পশ্চিম দুয়ারে ছ-জনকে মোতায়েন করে দিলুম। আর আমি দাঁড়ালুম চণ্ডীমণ্ডপের নিচে, যেখানে মাথার উপরে বড়ো বড়ো ইংরেজি হরপে লেখা ছিল—"None but the brave deserves the fair"। আর রামরঙ্গিলা সিংকে রাজাবাহাদুরের সুমুখে খাড়া করে দিলুম। তার কারণ সে ছোকরা ছিল বহুৎ খাবসুরৎ। মিনিট পাঁচেক পরে নটনারায়ণের হুকুমে একটা বাবরি চুলো ছোকরা ভাণ্ডারী মহাশঙ্খধ্বনি করলে, আর তৎক্ষণাৎ অন্দর মহলের দুয়ার দিয়ে মালশ্রী চণ্ডীমণ্ডপে এসে হাজির হলেন, বিয়ের কনে সেজে। দেখলুম তার বিশেষ কিছু বদল হয়নি, শুধু লম্বায় একটু বেড়েছে, আর গায়ের রং আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

সঙ্গে আছেন একটি মহিলা, যেমন বেঁটে তেমনি রোগা, যেমন কালো তেমা ফ্যাকাসে—এক কথায় শ্রীমতী মূর্তিমতী dyspepsia। তার হাতে একখা সোনার থালার উপর একটি বেলফুলের গোড়ে মালা। পরে শুনেছি ইঁ হচ্ছেন মিস বিশ্বাস, জাতিতে খ্রীষ্টান, পাস M. A.—মালার নতুন মাস্টারনী মালা এসে প্রথমে এক নজরে সভাটি দেখে নিল, তারপর মিস বিশ্বাসকে ি ইঙ্গিত করলে। আর মিস বিশ্বাস একমুখ হেসে অগ্রসর হতে শুরু করলেন।

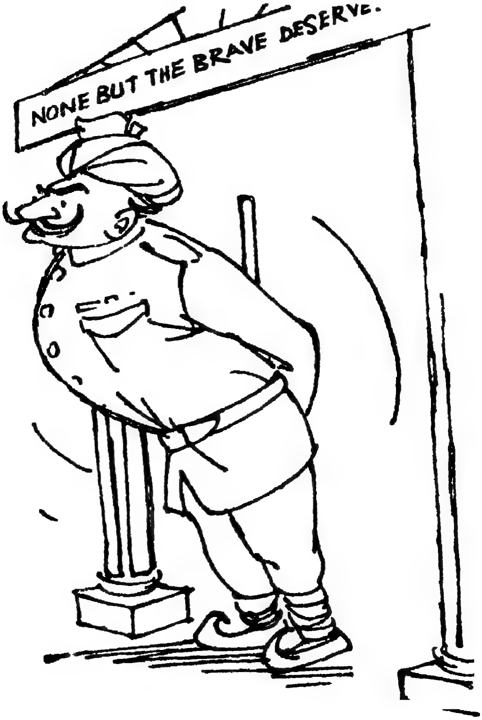
NONE BUT THE BRAVE DESERVE.

প্রথমেই তিনি, ব্যাটধারীর সমুখে দাঁড়িয়ে মালশ্রীকে সম্বোধন করে বললেন, এই বীর যুবকদের কুলশীলের পরিচয় দেবার কোনো প্রয়োজন নাই। রাজা বাহাদুর যে সমান ঘর থেকে সমান বরের আমদানী করেছেন, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এদের রূপ তুমি নিজের চোখ দিয়ে দেখো, আর গুণ আমার মুখে শোনো। ইনি হচ্ছেন স্বনামধন্য বাসু বোস ওরফে দ্বিতীয় রঞ্জি। ঐ যে হাতে ব্যাট দেখছ, ওর স্পর্শে বল অসীমে চলে যায়। তুমি যদি ওঁকে বরণ করো তো উনি তার পরদিনই নববধূ কোলে করে বিলেত চলে যাবেন—Lord's Cricket Ground-এ ম্যাচ খেলতে। আর উনি যখন century-র

পর century করবেন তখন স্বয়ং রাজা ওঁর handshake করবেন, ও রানী তোমার।

এসব শুনে মালশ্রী বললেন—Advance।

মিস বিশ্বাস অমনি দ্বিতীয় বীরের সুমুখে উপস্থিত হয়ে বললেন :

ইনি হচ্ছেন নেড়া দত্ত। এঁর তুল্য Goal-keeper ভূ-ভারতে নেই। ইনি বল ঠেকান শুধু মাথা দিয়ে। তাই এঁর মাথায় একটি চুল নেই—সব বলের ধাক্কায় ঝরে পড়েছে। যখন গোরার পায়ের লাথি খেয়ে বল ঊর্ধ্বশ্বাসে মরি বাঁচি করে ছোটে তখন এর মাথার গুঁতোয় তা চৌচির হয়ে যায়—অন্যের হলে মাথা

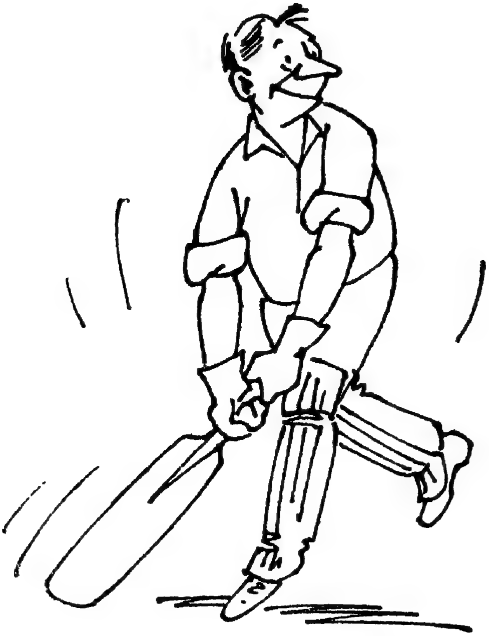

চৌচির হয়ে যেত। তুমি যদি এঁকে বরণ করো তো ইনি তোমাকে ঐ অপূর্ব ও অমূল্য মাথায় করে রাখবেন।

মালা আবার বললেন—Advance।

মিস বিশ্বাস তৃতীয় বীরের কাছে উপস্থিত হয়ে শুরু করলেন—ইনি হচ্ছেন ঘুষি ঘোষ। ঐ যে ওর দু-হাত জোড়া দুটো পাঁউরুটি রয়েছে ও bread নয়—stone। ও রুটি যার মুখে পড়ে, তার একসঙ্গে দাঁত ভাঙে আর দাঁতকপাটি লাগে। তুমি যদি এঁকে বরণ করো তাহলে ঐ রুটির অন্তরে যে রক্তমাংসের হাত আছে সেই হাত দিয়ে তোমার পাণিগ্রহণ করবেন।

আবার শোনা গেল—Advance।

মিস বিশ্বাস চতুর্থ বীরের সুমুখে দাঁড়িয়ে বললেন—উনি হচ্ছেন নগা নাগ, the world-hockey-champion, আর তার লক্ষণ সব ওঁর দেহেই রয়েছে। ওঁর শরীর যে কাঠ হয়ে গিয়েছে সে শুধু দৌড়ে দৌড়ে, আর ওঁর বর্ণ যে মলিন শ্যাম সে কতকটা রোদে পুড়ে আর অনেকটা রাঁচির কোল জাতীয় হকি খেলোয়াড়দের ছোঁয়াচ লেগে। মহাবীরের রূপ এইরকমই হয়। তাদের দেহের গুণ রূপকে ছাপিয়ে ওঠে।

জোরগলায় হুকুম এল—Advance।

মিস বিশ্বাস পঞ্চম বীরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, এঁর নাম খঞ্জন মিত্তির। Tennis ground-এ ইনি খঞ্জনের মতো লাফিয়ে বেড়ান বলে, লোকে এঁর পিতৃদত্ত নাম রঞ্জন খণ্ডে খঞ্জন করেছে। এঁর চেহারাটা যে একটু মেয়েলী গোছের তার কারণ টেনিস খেলায় ভীমের মতো বলের দরকাব নেই, কৃষ্ণের মতো ছলই যথেষ্ট। এ খেলায় muscle চাইনে, চাই শুধু nerve।

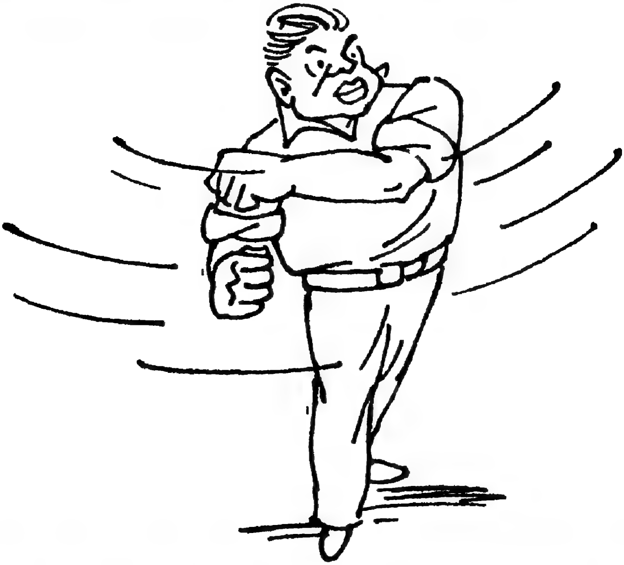

মালা বললে—Advance।

অতঃপর মিস বিশ্বাস লিপিবীরেব সুমুখে উপস্থিত হয়ে বললেন: ইনি হচ্ছেন বীর নৃসিংহ ভঞ্জ, প্রসিদ্ধ "তেজপত্রের" সম্পাদক। প্রথমে ইনি ছিলেন গত সবুজপত্রের সহকারী সম্পাদক, সে কাগজে বীরবলের ব্যঙ্গের ভয়ে ইনি মন খুলে হাত ঝেড়ে লিখতে পারেননি। সে পত্র যে কতদূর তেজপূর্ণ তা তো

তুমি জানো কারণ তুমি তা পড়েছ। তার দু-ছত্র পড়লেই পাঠকের শিরায় উপশিরায় ধমনীতে উপধমনীতে রক্তের স্রোত উজান বইতে বইতে তার মাথায় চড়ে যায়। তখন পাঠকের অন্তরে আর ধৈর্য থাকে না, উথলে ওঠে শুধু বীর্য। The pen is mightier than the sword, এ কথা যে সত্য—তা হাতে কলমে প্রমাণ করেছে ওঁর হাতের ঐ কলমটি।

মালা হুকুম করলে—Forward।

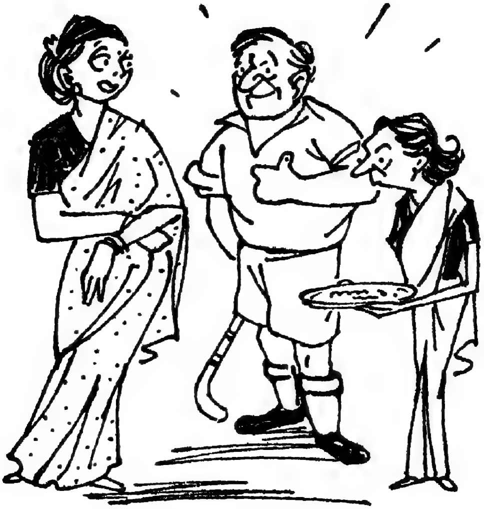

মিস বিশ্বাস হাতে সোনার থালা ও ফুলের মালা নিয়ে শেষ কর্মবীর ও প্রথম জ্ঞানবীরের মধ্যে যে হাত দশেক ব্যবধান ছিল, ধীরে ধীরে তা অতিক্রম করতে লাগলেন. এদিকে মালশ্রী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে নিজের গলার মুক্তোর হার খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। তারপর আমার বাঁ পাশে এসে আমার বাঁ হাত ধরে দাঁড়ালে। আর আমি আমার অসি খাপমুক্ত করতে বাধ্য হলুম। এ ব্যাপার দেখে সভাসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল। কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। তারপর হঠাৎ রামরঙ্গিলা ছোকরা চিৎকার করে তার ভাই বন্দন্নীকে জানালে, "মালা হামলোককা মিল গিয়া, আর এইসা তেইসা মালা নেই—একদম মোতিকে মালা।" অমনি রামসিংদের দল সমস্বরে চিৎকার করে উঠল "জয় লীললাল সিংকো জয়।"

রাজা বাহাদুর এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। আমার দলবলের এই ক্ষত্রিয়োচিত

জয়জয়কার শুনে তিনি বললেন :

“ই বাত হো নেই সেক্‌তা।”

রামবঙ্গিলা অমনি বললে, “আগর হো নেই সেক্‌তা তো হুয়া কৈসে ?”

আমি তখন তার দিকে তাকিয়ে বললুম, “তোম চুপ রহো।” আর রাজা সাহেবকে সম্বোধন করে বললুম–“হুজুর ইনকো লেড়কপন্‌কা চঞ্চলতা মাপ কিজিয়ে।” অমনি আবার সব চুপ হয়ে গেল।

তখন রাজা বাহাদুর বীরের দলকে সম্বোধন করে বললেন, “হে বীরগণ, এখন তোমাদের কর্তব্য করো। এই দরওয়ান বেটার হাত থেকে মালাকে ছিনিয়ে নেও।”

একথা শুনে কর্মবীররা চুপ করে রইলেন কিন্তু জ্ঞানবীরদের মধ্যে একজন উঠে বললেন :

“মহাশয় এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনোই কর্তব্য নেই। আপনার মেয়ে তো আমাদের প্রত্যাখ্যান করেনি, করেছে কর্মবীরদের। ওরাই এখন যথাবিহিত করুন।”

কর্মবীররাও নডবার চডবাব কোনোও লক্ষণ দেখালে না। শুধু লিপিবীর বাঁ হাত দিয়ে মিস বিশ্বাসের অঞ্চল ধরে পাশের বীরকে ঠেলতে লাগলেন। লিপিবীরের ঠেলাতে অস্থির হয়ে খঞ্জন মিত্তিব উঠে বললেন—“রাজা বাহাদুর এ তো playground নয়—battle-field। আমবা নিরস্ত্র, ওরা সশস্ত্র, আমাদের হাতে আছে শুধু ব্যাটবল, আব ওদেব হাতে আছে তলওয়ার। এ অবস্থায় আমরা যুদ্ধং দেহি বলতে পারিনে।”

“এই দু-মিনিট আগে শুনলুন—pen is mightier than the sword—তা যদি হয় তো তেজপত্রের সম্পাদক কলম হাতে নিয়ে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।”

ঐ প্রস্তাবে লিপিবীর মিস বিশ্বাসের পিছনে আশ্রয় নিলেন। এইসব ব্যাপার দেখে শুনে মালা আমার কানে কানে বললে—“দেখলে বাবার ফরমায়েসী বীবের দল ?”

তারপর রাজা বাহাদুব বললেন, “দেখছি তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না। আমার মেয়ে আমিই উদ্ধার করব।”

এর পর তিনি নটনারায়ণের কানে কানে কি বললেন। সে অমনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর মিনিট খানেকের মধ্যে লেঠেলের সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে

এল। রাজা বাহাদুর বললেন, "যাও সরিতুল্লা, যাও। তোমরা গিয়ে ডাক ছাড়ো, তারপর যেমন যেমন দরকার হবে তেমনি হুকুম দেব।" সরিতুল্লা "হুজুর মালিক" বলে রাজাবাহাদুরের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়ে চলে গেল। সে বেরিয়ে যাবামাত্র লেঠেলরা সকলে গলা মিলিয়ে "লা আল্লা ইল আল্লা মহম্মদ রসুল-উউ-উউ-ল" বলে ভীষণ জিগির ছাড়লে—যেন মনে হল এইবার সভায় ডাকাত পড়বে। আর তাই শুনে রামসিংদের দল "সীতাপতি রামচন্দ্রজিকো জয়" বলে হুংকার দিয়ে উঠল। মনে হল এইবার দুই দলে বুঝি যুদ্ধ বাধে।

জ্ঞানবীরদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে কাঁপতে কাঁপতে রাজাবাহাদুরকে বললেন—"মহাশয় করছেন কি, একটা হিন্দু মুসলমানের riot বাধাবেন নাকি? এমন জানলে তো এখানে কখনো আসতুম না, এখন বেরতে পারলে বাঁচি। যা করতে হয় করুন, কিন্তু non-violent উপায়ে।"

রাজাবাহাদুর উত্তর করলেন—"শান্ত উপায় অবলম্বন করতে আমি সদাই প্রস্তুত, অবশ্য তা যদি ক্ষাত্রধর্মের অবিরোধী হয়।"

আমি দেখলুম আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা কিছু নয়। অমনি আমার দলবলকে হুকুম দিলুম বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে, যেই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, অমনি আমি আমার মাথার পাগড়ি ও কোমরের বেল্‌ট খুলে ফেললুম। রাজাবাহাদুর আমার দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "কে, নীললোহিত নাকি?"

আমি বললুম, "আজ্ঞে আমি নীললোহিত শর্মা।" আমার পরিচয় পেয়েই বাসু বোস, ঘুষি ঘোষ, নেড়া দত্ত, নগা নাগ ও খঞ্জন মিত্র সমস্বরে চিৎকার করে উঠল—"Three cheers for the conquering hero," তারপর হুরে হুরে শব্দে সভাগৃহ কেঁপে উঠল। দেখলুম এরা সত্য সত্যই sportsmen বটে। এদের মধ্যে একমাত্র লিপিবীর ক্রোধকম্পান্বিত কলেবর হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—"এ মূর্খের দলে আমার ঢোকাই ভুল হয়েছিল। রাজা বাহাদুরের মতো বাঙালীদের আজও এ জ্ঞান হয়নি যে গোঁয়ার ও বীর এক জিনিস নয়। যাই একবার কলকাতায় ফিরে, এবিষয়ে একটি চুটিয়ে আর্টিকেল লিখব।" তিনি মনের আক্ষেপ এই কটি কথায় প্রকাশ করে দ্রুতপদে জ্ঞানবীরদের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে তাঁদের কানে কি মন্ত্র দিতে লাগলেন।

একটু পরে রাজাবাহাদুর অতি ধীর গম্ভীর বুনিয়াদি গলায় বললেন:

"আমার মেয়ে যখন স্বেচ্ছায় স্বয়ং তোমাকে বরণ করেছে তখন এ বিবাহে

আমার কোনো ন্যায্য আপত্তি থাকতে পারে না। আমি শুধু ভাবছি, তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান আর মালশ্রী ক্ষত্রিয় কন্যা; সুতরাং এ বিবাহ কি শাস্ত্রসঙ্গত হবে ?”

আমি বললুম :

“পণে জাতি কেবা চায়—পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ॥
—দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ—দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ, তথা তথা এই রঙ্গ ॥”

এ কথা শুনে জ্ঞানবীরের দলের একজন দোজবরে D. L. দাঁড়িয়ে উঠে বললেন :

“এ বিয়ে দিতে চান দিন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এইটুকু শুধু জেনে রাখবেন যে তা সম্পূর্ণ illegal হবে। মনুর মতেও তাই, মিতাক্ষরা মতেও তাই। উদ্বাহতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র authority নন, কারণ বিদ্যাসুন্দরকে কোনোমতেই ধর্মশাস্ত্র বলা যায় না। যদি এ বিষয়ে শেষ কথা আর সার কথা জানতে চান তো Sir Gurudas-এর Marriage and Stridhan পড়ুন আর ও বই পড়া আপনার নিতান্ত দরকার, কারণ এক্ষেত্রে শুধু marriage নয় স্ত্রীধনের কথা রয়েছে।”

আমি জবাব দিলুম, “শাস্ত্রফাস্ত্র জানিওনে মানিওনে। কারণ,

আমি যে হই সে হই, আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে মালা ছাড়িবার নই ॥
মোর মালা মোরে দেহ, মোর মালা মোরে দেহ,
জাতি লয়ে থাকো তুমি, আমি যাই গেহ ॥”

রাজাবাহাদুর আমার কথা শুনে থ হয়ে রইলেন। এর পরে প্রমাণ পেলুম যে পটলডাঙার পণ্ডিতরা ঘোর পণ্ডিত হতে পারেন কিন্তু গড়ের মাঠের খেলোয়াড়রা ঘোর মূর্খ নয়। শাস্ত্রজ্ঞান উভয়েরই প্রায় তুল্যমূল্য আর শাস্ত্রের প্যাঁচ কাটাতে জানে কর্মবীররা, আর জানে না জ্ঞানবীররা।

রাজাবাহাদুর উভয় সংকটে পড়েছেন দেখে খঞ্জন মিত্তির চেঁচিয়ে বললেন :

“অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। সুতরাং, এ বিবাহ দিলে আপনার পণও রক্ষা হবে, জাতও রক্ষা হবে।”

রাজাবাহাদুর এই সুসংবাদ শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। D.L.-টি কিন্তু

ছাড়বার পাত্র নন। তিনি আইনের আর এক ফেঁকড়া তুললেন। তিনি বললেন :

"যদিচ ওরকম বিবাহ লোকাচার-বিরুদ্ধ, তবুও তা শাস্ত্রসঙ্গত হতে পারে, যদি ওঁর পুর্ববিবাহিত স্ত্রী ব্রাহ্মণী হন।"

রাজাবাহাদুর অমনি আমার দিকে চাইলেন। আমি বললুম, "আজ্ঞে আমার প্রথম স্ত্রী তো আমি স্বয়ংবর সভা থেকে সংগ্রহ করিনি। সে শুধু ব্রাহ্মণী নয়, উপরন্তু কুলীন কন্যা, লক্ষ্মীপাশার মেয়ে সুতরাং সপত্নীতে আর আপত্তি নেই।"

যেই ওকথা বলা, অমনি মালশ্রী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে বাপের কাছে ছুটে গিয়ে বললে :

"এ বিবাহ আমি কিছুতেই করব না, প্রাণ গেলেও না। স্বামী নিয়ে partnership business !"

আমি বললুম—"মালশ্রী, আমি বিপদে পড়ে মিথ্যে কথা বলেছি। আমি যে কাতিক ছিলুম, সেই কাতিকই আছি।"

মালশ্রী উত্তর করলে :

"তা হলে সেই কার্তিকই থাকো। মিথ্যাবাদীকে আমি কিছুতেই বিবাহ করব না। প্রাণ গেলেও নয়।"

আমি বললুম,—"তাই সই, আমি চিরকুমারই থাকব। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।"

মালশ্রী ইতিমধ্যে দেখি রণচণ্ডী হয়ে উঠেছে। সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বললে—"আমিও চিরকুমারী হয়ে থাকব।" এরপর আমি পুরুষ বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে নারী আন্দোলনে যোগ দেব।"

এই কথা বলেই সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

এর পর আমি সটান স্টেশনে চলে গেলুম, একলা হেঁটে নয়, মোটর গাড়িতে নটনারায়ণের সঙ্গে।"

রূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "মালার কি হল ?" নীললোহিত উত্তর করলেন—"সে খোঁজ তুমি করোগে, আমি ঘটক নই।" এরপর রসিকলাল জিজ্ঞাসা করলেন—"আর মোতির মালাটা ?" নীললোহিত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন :

"সেটি তোমার চাই নাকি ? তুমি দেখছি রামরঙ্গিলারও মাসতুতো ভাই। মালা গেল তাতে দুঃখ নেই, মোতির মালা হারালো এইটিই হচ্ছে জব্বর

ট্রাজেড়ি ; বাঙালী জাতটে হাড়ে ছিবলে, কোনোও serious জিনিস তোমরা ভাবতেও পারো না, বুঝতেও পারো না। তোমাদের উপযুক্ত সাহিত্য হচ্ছে প্রহসন। যাও সকলে মিলে পড়ো গিয়ে 'বিবাহ বিভ্রাট'।"

এই শেষ কথা বলে নীললোহিত কপালে হাত দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, মাথার ঘাম কি চোখের জল মুছতে মুছতে, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমরা সকলে হো হো করে হেসে উঠলুম। কারণ নীললোহিতের ধমক সত্ত্বেও ব্যাপারটাকে ট্রাজেড়ি বলে আমরা বুঝতে পারলুম না। আমাদের মনে হল ওটি একটি 'roaring farce'।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (—১৯৩১)

# দুই বন্ধু

## এক

বিপিনচন্দ্র এবং বিহারীলাল যখন ২২নং এবং ২৪নং—স্ট্রীটের বাটী ভাড়া করিয়াছিল, তখন ২৩নং নং বাটী খালি পড়িয়াছিল।

উভয়েরই ২৩নং বাটী পছন্দ হয়; কেননা ভাড়া কম এবং উভয় বন্ধুরই মতিগতি একপ্রকার। বাল্যাবধি উভয়ে দৃঢ় প্রণয়াবদ্ধ। সুতরাং একজনকে অসুবিধায় ফেলিয়া কেহই ২৩নং লইতে স্বীকৃত হইল না।

কাজেই ২৩নং খালি পড়িয়া রহিল।

জগতে এরূপ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও নূতন নহে। যদি উভয় বন্ধু একত্র ২৩নং ভাড়া লইত, তবে সম্ভবতঃ গোলযোগ মিটিয়া যাইত। কিন্তু তাহাতে অনেক বাধা ছিল। প্রথমতঃ বিপিন নিরামিষাহারী, কিন্তু মদ্যপায়ী, এবং বিহারী মাংসাশী, তামাক পর্যন্ত খায় না। দ্বিতীয়তঃ, বিহারী প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া গ্রন্থ পাঠ করে, এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা লেখে। বিপিন আপিস হইতে আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে।

বিহারী আবগারীর দারোগা। বিপিন মার্চেণ্ট আপিসের অ্যাকটিং হেডবাবু। উভয়েই যুবক, এবং দেখিতে একরকম। উভয়ে চাঁদনীতে একই দোকানে বস্ত্রাদি এবং ক্রেটিবাজারে একই দোকানে জুতা কিনিত। উভয়েরই সুখ-দুঃখের কথা প্রায় একরকম, এবং একই কথায় উভয়ে হাসিত, কাঁদিত। কোনো হাসির কথা থাকিলে বিহারী বিপিনকে না বলিয়া হাসিত না, এবং কোনোও কান্নার কথা থাকিলে বিপিন বিহারীকে না বলিয়া কাঁদিত না।

বিহারী আবগারীর দোকান প্রভৃতি বন্দোবস্তের সময় উপরি রোজগার করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল, বিপিনের সঞ্চিত ধন প্রায় তাহারই সমান। সুতরাং পরস্পরের প্রতি কাহারও কখনও লেশমাত্র হিংসার উদ্রেক হয় নাই।

উভয়েই অবিবাহিত এবং একান্নবর্তী পরিবারের ভার কাহাকেও বহন করিতে হয় নাই।

বিপিনের মদ্যপান করিয়া ঘুমাইয়া যতখানি সুখ হইত, বিহারীর সারারাত্রি জাগিয়া কবিতা-লিখনে তাহাই হইত। উভয়েই সুখী এবং হরিহর-আত্মা।

প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া হয় বিহারী বিপিনের বাটীতে যায়, নয় তো বিপিন বিহারীর বাটীতে আসে। তখন উভয় বন্ধু সেই জনাকীর্ণ মহানগরীর ছোট-বড়ো কথা পরস্পরের মুখ চাহিয়া কহে। বুয়র যুদ্ধ, আফগানিস্থানের সম্ভাবিত রাষ্ট্র-বিপ্লব, দিল্লীব দরবার, আগামী কংগ্রেস, গীতার দ্বৈতভাবার্থক টীকা, স্টার থিয়েটারের 'সাবিত্রী' অভিনয়ের পারিপাট্য ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া সমালোচনা করিয়া উভয়ে কলের জলে সর্বাঙ্গ বিধৌত করিয়া মস্তিষ্ক শীতল কবিত।

বিহারী বলিত, "বিপিন, মদটা ছাড়ো, আর যদি মদটাই খাইলে, তবে মাংসটা খাইতে দোষ কি?"

বিপিন (ঈষৎহাস্যপূর্বক), "বিহারী, তোমার কল্যাণে দেশীর দরে বিলাতী খাইতেছি, তাহার উপর জীবহিংসা করাটা কি উচিত?"

যখন বিহারী নিরলসভাবে সুদীর্ঘ শীতকালেব রাত্রিতে মানবজীবনের বিচিত্র অসারতা কাব্যের ছন্দোবন্ধে পিটিয়া গড়িয়া সূক্ষ্ম করিত, তখন বিপিনের সূক্ষ্মদেহ স্বপ্নক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বিহারীর আত্মার সহিত সদ্ভাবস্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত।

আহা! সে জগতে কেই বা বিহারী, আর কেই বা বিপিন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? স্থূলদেহেব সংস্কার প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইলে জীবাত্মা স্বতঃই পরস্পরের সহিত মিলনে ব্যস্ত হয়। এইরূপে অলক্ষ্যে ও অভাবনীয়রূপে বিহারীর সহিত বিপিনের মৈত্রী ক্রমেই উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল।

উভয় বন্ধুরই দারপরিগ্রহ সম্বন্ধে কোনোও আসন্ন উদ্বেগ ছিল না।

আর একটা বিশেষ কথা। উভয়ের চরিত্র সম্বন্ধে এ পযন্ত উভয় কিংবা উভয়ের বন্ধু ও প্রতিবাসীগণ কেহই কোনোও দোষারোপ করিতে সক্ষম হয় নাই। যাহারা মদ ও মাংস খায়, তাহাদের মধ্যে এরূপ নৈতিক নিষ্কলঙ্কতার দৃষ্টান্ত প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় না।

যাহারা জ্ঞানী, তাহারা বলিত, উভয় বন্ধু যোগভ্রষ্ট। কেবল পুর্বজন্মের সংস্কারটার জন্য, অর্থাৎ কর্মফলের দৃঢ় নিয়ম বজায় রাখিবার জন্য, দিনকতক মদ্য-মাংস এবং নিরামিষ চলিতেছে।

## দুই

হেনকালে ২৩নং বাটী ভাড়া হইয়া গেল।

পশ্চিম হইতে কোনোও বৃদ্ধ ভদ্রলোক রুগ্না স্ত্রী ও অরুগ্নদেহা বিধবা যুবতী কন্যা লইয়া চিকিৎসার জন্য নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়াও কোনো ফল না পাইয়া অবশেষে কলিকাতায় আসিলেন, এবং অনেক বাসাবাটী পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ২৩নংই পছন্দ করিলেন।

সামান্য কারণে ব্রহ্মাণ্ডে বিপ্লব ঘটে। শুনা যায়, ব্রীহি, যব, গোধূম প্রভৃতি অন্নের মধ্য দিয়া স্বর্গচ্যুত জীবগণ আবার ইহলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। টীকাকার বলেন, ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই ; কেননা খাদ্যের উপরই জীবন নির্ভর করে! জীব ইচ্ছা করিলে জগতের সমুদয় পথ রুদ্ধ করিতে পারে, কেবল অন্ননালীর পথ পারে না ; কার্যগতিকে অন্ন ভিন্ন জীবাত্মার মানবের দেহকোষে সঞ্চারিত হইবার আর কোনোও প্রশস্ত পথ নাই।

সেইরূপ সামান্য কারণেই উভয় বন্ধুর জীবনে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। প্রথমতঃ ২৩নং বাটীতে জনসমাগমবশতঃ উভয়ের প্রাত্যুষিক কথোপকথনের মধ্যে একটা নূতন বিষয় আসিয়া পড়িল।

বিপিন। "লোকটা একটু ব্রাহ্ম ধরনের।"

বিহারী। "বড়ো ভদ্রলোক এবং অমায়িক।"

বিপিন। "আমি তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য নীলরতন ডাক্তারকে আনিবার পরামর্শ দিয়াছি।"

বিহারী। "আমি কেদার ডাক্তারকে ডাকিতে বলিয়াছি।"

উভয়েই কিঞ্চিত বিস্মিত হইল। যখন কোনোও কথাই পূর্বে পরামর্শ না করিয়া বন্ধুদ্বয় ইতিপূর্বে প্রচার করে নাই, তখন এবার সেই নিয়ম কেন লঙ্ঘিত হইল, তাহা বিহারী ও বিপিন কেহই বুঝিল না। তবে উভয়েই ইহা বুঝিল যে, উভয়ের পরস্পরকে না বলিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিকট সহানুভূতি প্রকাশ একটু নূতন ধরনের হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং যখন ২৩নং বাটীর শ্যামা ঝি ২২নং বাটীতে বিপিনকে না পাইয়া ২৪নং বাটীতে বিহারীকে ডাকিতে গেল, তখন উভয়েই একটু সঙ্কুচিত হইল।

বৃদ্ধ নবীনবাবু বিপিন ও বিহারীর ন্যায় সদ্বংশজাত কায়স্থ এবং করুণাবাৎসল্যে ভরা হৃদয়। কোন্ ডাক্তারকে দেখাইলে ভালো হয়, তাহারই পুনঃ পরামর্শের নিমিত্ত বন্ধুদ্বয়কে ডাকিয়াছিলেন।

বিহারী বলিল, "বিপিন! তুমি যাও।"

বিপিন বলিল, "তুমি যাও।"

শ্যামা বলিল, "আপনারা আসিয়া একটা স্থির করিয়া বলুন, আমি যাই।"

আবার যখন পুরাতন স্নেহ আসিয়া উভয় বন্ধুর হৃদয় আপ্লুত করিল, তখন উভয়েই একজন ডাক্তার মনোনীত করিয়া নবীনবাবুকে জ্ঞাত করাইল। কিন্তু দুইজনের মধ্যে কেহই ২৩নং বাটীতে গেল না।

বিপিন। "এও একটা আপদ। পরের জন্য এত মাথাব্যথা অনেক সময় অসহ্য হইয়া পড়ে।"

বিহারী। "ঠিক তাই, দুই বাটীব মধ্যে একটা রুগী আসিয়া পড়িলে কার্যগতিকে জঞ্জাল বাধে।"

বিপিন। "ভদ্রলোকের মেয়েছেলে, এখন তখন ছাতে ওঠে, তাই আমাকে পুর্বদিকের জানালা বন্ধ কবিতে হইয়াছে।"

বিহারী। "আমিও পশ্চিম দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়াছি। তখন যদি তুমি ২৩নং বাটীটা লইতে, তবে এ অসুবিধা ঘটিত না।"

বিপিন। "একজনের তো হইত। এখন না হয় দুইজনের হইয়াছে।"

দুইজনেরই ভাগ কার্যগতিকে সমান দাঁড়াইয়া গেল। ইহাতে উভয়েরই অবস্থা উভয়ে পযালোচনা করিয়া আবার পুর্বের ন্যায মদ্য, মাংস নিরামিষ খাইতে লাগিল।

## তিন

সুলোচনা বিধবা হইলেও বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবার বিশেষ আধ্যাত্মিক লালসা ছিল না। সত্য, সুলোচনা বিষাদচিহ্নস্বরূপ কালোপেড়ে শাড়ি পরিধান করিত। দারুণ স্বামিশূন্যতা অনুভব করিয়া মধ্যে মধ্যে চোখে জল আনিয়া ফেলিত তাহাও সত্য। কিন্তু সুলোচনা হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। সকলেই জানিত, সুলোচনার পুর্বাপেক্ষাও সুন্দর বর জুটিবে। এরূপ সুখ-ঘটনার কালবিলম্বের কারণ কেবল তাহার জননীর অসুস্থতা।

ঈশ্বরের কৃপায় ও ডাক্তারের সাহায্যে জননী সারিয়া উঠিলেন, এবং এই শুভসংবাদ প্রচারার্থ সুলোচনা তাহার কাবুলী বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিল।

সুলোচনার কাবুলী বিড়াল তাহার পরলোকগত স্বামীর প্রদত্ত স্মৃতিচিহ্ন।

বিড়ালটি বড়ো সাধের, এবং অনেকটা উল্লিখিত স্বামীর স্থান অধিকার করিয়া ছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর সুলোচনাকে নিজের জন্য একজন ঝি রাখিতে হইয়াছিল। জ্যাকেট আঁটিয়া দিতে, চুলে কাঁটা পরাইয়া দিতে, সময়ে অসময়ে রূপের বাহবা দিতে, ক্রন্দনের সময় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, এবং অন্যান্য ছোটবড়ো কার্যে সাহায্য করিতে কিংবা বাধা দিতে, পূর্বে সুলোচনার স্বামী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। সুতরাং সেই কর্মগুলির ভার যথাযোগ্যভাবে বিড়াল, শ্যামা ঝি এবং অন্যান্য ব্যক্তির উপর স্থাপন করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

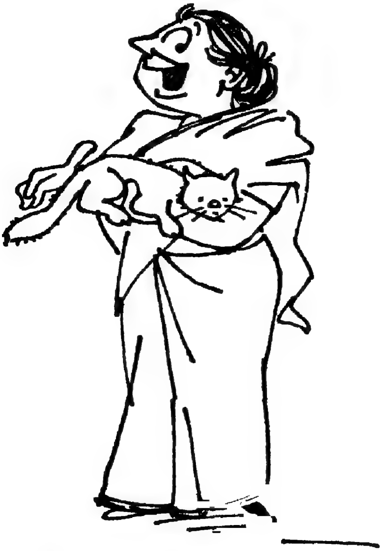

কাবুলী বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার পূর্বে বিপিন ও বিহারী তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না। সুতরাং যখনি টুং টুং শব্দে ভ্রাম্যমান বিড়াল ছাতের উপর একবার পূর্বদিকে এবং অন্যবার পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল, তখন বিপিন ও বিহারী উভয়েই স্ব স্ব গবাক্ষ ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া এই অভিনব শব্দের কারণ নির্দিষ্ট করিয়া লইল।

উভয়েই ইহাও জানিল যে, যখন বিড়াল ছাতে আসে, তখন সুলোচনাও বিড়ালকে ছাত হইতে ধরিয়া লইয়া যায়।

পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।

পশুর বুদ্ধি হইতে মানববুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বোধহয় কাহারও সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণে আরও বলা যাইতে পারে যে, বিহারী প্রত্যহ প্রাতঃকালে

একটা গোটা গলদা চিংড়ি ভাজিয়া স্বীয় অর্ধোন্মুক্ত বাতায়নপথে রাখিয়া দিত। তদবধি বিড়াল যথাসময়ে উক্ত চিংড়ি সম্মুখের পদনখর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বাহিরে টানিয়া লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিত।

বিপিন যখন উঁকি মারিয়া এই ব্যাপার দেখিল, তখন তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না।

অতএব বিহারীকে টেক্কা দিয়া বিপিন একটি ছোট খুরি দুগ্ধ-পূর্ণ করিয়া নিজের বাতায়নপথে বিকালে সাবধানে রাখিয়া দিল।

আমিষ আহার করিতে যেমন বিড়ালের পক্ষে সুবিধা হইয়াছিল, নিরামিষ আহার তেমন সোজা হইল না। কাজেই বিড়ালের গলা বাড়াইয়া দুগ্ধ পান করিতে কিঞ্চিৎ অধিক সময় লাগিত।

সুতরাং সুলোচনা একদিন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং বাতায়ন-পার্শ্বে আসিয়া গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতে দুগ্ধ সম্বন্ধে সাবধান হইতে পরামর্শ দিল।

বিপিন ( গবাক্ষপার্শ্ব হইতে ) —"বড়ো সুন্দর বিড়াল। খাউক না। অমন বিড়াল দুধ খাইয়া যায়, সে তো আমার সৌভাগ্যের কথা।"

সুলোচনা (সলজ্জভাবে) --"না—না, সে কি ! " ইহা বলিয়াই কোমল মুষ্টিপ্রহার করিয়াই বিড়ালকে লইয়া গেল। বিপিনের হৃদয়ও সেই বিড়ালের সঙ্গে গেল।

বিহারী হতাশভাবে পশ্চিমদিকের জানালা হইতে এই অভিনয় নিরীক্ষণ করিল। ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

তৎপরদিন প্রত্যুষে যখন বিহারী ও বিপিন পরস্পরের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কাহারও কথা জুটিল না; কাজেই বিপিন তামাকু খাইয়া চলিয়া আসিল, এবং বিহারী গত নিশির অর্ধসমাপ্ত কবিতা সমাপ্ত করিল।

## চার

নিরামিষভোজী হইলেও বিপিনের ভালবাসার মাত্রা বিহারী অপেক্ষা কম নয়। এই নূতন মদিরার আস্বাদন পাইয়া বিপিন পুরাতন মদিরা ত্যাগ করিল। বিপিনের নিদ্রার ভাগটাও কমিয়া গেল এবং সময় কাটাইবার উপায় না পাইয়া দুই একটা কই মৎস্য ও হাঁসের ডিম খাইতে লাগিল। ইহার কারণে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, কাবুলী বিড়ালের কীটাণু (bacilli) বিপিনের দেহে

সংক্রান্ত হইয়াছিল। নবীন প্রেম সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। বিজ্ঞান যেমন এ সব কথার রহস্য শীঘ্র বুঝাইয়া দিতে পারে, দর্শন তাহা পারে না।

বিহারীর সম্বন্ধে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ঈর্ষাপ্রযুক্ত তাহার শরীরের অনেক কীটাণু বাহির হইয়া গেল। কামনা হইতে ঈর্ষা এবং ঈর্ষা হইতে ক্রোধ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং একদিন প্রাতঃকালে যখন বিড়ালশ্রেষ্ঠ বাতায়নপথে মৎস্য না পাইয়া স্বভাবসুলভ ধ্বনি করিতেছিল, তখন বিহারী তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া গোটাকতক বজ্রমুষ্টি প্রহার করিল।

সুলোচনা ছাতের উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জানালার নিকট গেল।

সুলোচনা। "আপনি কেমন লোক মহাশয়? বিড়ালকে অত মাচ্ছেন কেন?"

বিহারী। "আপনি যদি বিডালকে না সামলান, তবে আমি মারিয়া ফেলিব।"

সুলোচনা। "ও কি দোষ করিয়াছে?"

বিহারী। "ঘণ্টার শব্দে আমার ঘুম হয় না, আর যতক্ষণ জাগিয়া থাকি—আপনি জানেন তো -আমি রাত্রি জাগিয়া কবিতা লিখি—ততক্ষণ উহার টুংটুং শব্দে আমার মাথা ঠিক থাকে না।"

সুলোচনা। "আপনি কবিতা লেখেন, তাহা আমি জানিতাম না। আমি কবিতা বড়ো ভালবাসি। আপনার কবিতা আমাকে দেখাইবেন কি?"

বিহাবীর ক্রোধ কতকটা প্রশমিত হইয়া অনুতাপের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্য সত্যই সুলোচনা তাহার বিড়ালের উপর বিহারীর অন্যায় অত্যাচারে কাঁদিয়া ফেলিল।

বিহারী ভাবিল, "আমি কি কাপুরুষ"—

বিহারী। "আপনি কাঁদিবেন না;—আমার অপরাধ হইয়াছে, মার্জনা করিবেন।"

তখন বিহারী সহৃদয়তা জানাইবার জন্য মার্জারকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল, "পুস্ পুস্ —আয়, আয়!"

বিড়াল লাঙ্গুল নাড়িয়া স্নেহ জানাইল। পশুদিগের কৃতজ্ঞতা স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হয়। সুলোচনা ধীরে ধীরে বিড়ালটি লইয়া বিহারীর হাতে দিল।

সুলোচনা। "আপনি বড়ো নিষ্ঠুর। এমন কোমল শরীরে অত মারিলে বাঁচিবে কেন?"

বিহারী। "আর আমার হৃদয়টা কী পাষাণ?"

সুলোচনার কোমল করস্পর্শে বিহারীতেও কীটাণু সংক্রান্ত হইয়াছিল ; কারণ পূর্বোক্ত হিংসা প্রভৃতির কীটাণুর স্থলে এখন অন্য প্রকারের কীটাণু আসিয়া বিহারীর হৃদয়ে একটা মনোহর আন্দোলন উপস্থিত করিল। বিহারী নিজের বাছা বাছা কবিতা লইয়া সুলোচনাকে দিল, এবং সুলোচনাও একে একে তাহা দেখিয়া শুনিয়া লইল। শেষে একটা কবিতা দেখাইয়া বিহারী বলিল, "এটা কোনোও বিশেষ লোকের জন্য রচিত হইয়াছে।"

সুলোচনা। "কে লোক বলো না—"

বিহারীর হৃদয় ঐ মধুর "বলো না" শুনিয়া অনিশ্চিত জগতে একটা লাফ দিল!

বিহারী। "ও কবিতা তোমারই জন্য—"

সুলোচনা অদৃশ্য হইল, কিন্তু স্বীয় গবাক্ষপার্শ্বে বিপিন মাথায় হাত দিয়া বসিল।

## পাঁচ

যদিও উভয় বন্ধুর আপাতত অবস্থা সমান, কিন্তু পূর্বের ন্যায় তাহারা সুখী নহে। বিপিন আর মোটেই বিহারীর বাটী যায় না, এবং বিহারীও বিপিনের বাটীতে আসে না। তজ্জন্য কেহই বড়ো দুঃখিত নহে। উভয়ের মতিগতি, খাদ্যাখাদ্যেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এবং খরচপত্রের তালিকা সম্বন্ধেও উভয়ের পূর্বাপর দৃষ্টি নাই। বৃদ্ধ নবীনবাবু স্ত্রীর আরোগ্যাবধি উভয়কেই পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন এবং নবীনবাবুর স্ত্রীও বিপিন ও বিহারীর পরামর্শ না লইয়া কোনোও কাজ করিতেন না।

কিন্তু বিপিন ও বিহারীর অদৃষ্টে শান্তি হইল না। সেই কবিতা অর্পণকাল হইতে আর সুলোচনা ছাতে যাইত না এবং বিড়ালের খাদ্য সংগ্রহ বন্ধ হইয়া গেল। সুলোচনার ও তাহার বিড়ালের আভ্যন্তরীণ ভাবটা যে কি, তাহা উভয় বন্ধু কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। বিপিন বিহারীর মুখ দেখিতে এবং বিহারী বিপিনের মুখ দেখিতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিত।

যদি সুলোচনা বলিত, "বিহারী! তোমাকেই আমি ভালবাসি," কিংবা "বিপিন! তোমাকেই আমি ভালবাসি," তবে যাহা হউক একটা মীমাংসা হইয়া যাইত। কিন্তু সুলোচনার হঠাৎ রঙ্গস্থল হইতে অন্তর্ধানে উভয় বন্ধুই মনে করিল যে, সুলোচনা চটিয়া গিয়াছে ; অথচ উভয়েরই ধারণা যে, সুলোচনা তাহাকেই ভালবাসে। এরূপস্থলে যাহা ঘটিতে হয়, তাহাই ঘটিল ; অর্থাৎ উভয়েই পূর্বসংস্কার ইত্যাদি বর্জনপূর্বক কেবল দেশী মদ খাইতে লাগিল।

বিলাতীর খরচ আর কুলাইল না।

বৃদ্ধ নবীনবাবুর মনে একটা সাধ ছিল যে, বিহারী ও বিপিনের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইয়া সুলোচনার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। কিন্তু বিহারী ও বিপিনের মদ্যপানের ঘটা দেখিয়া, উভয়েরই উপর তাঁহার ঘৃণা হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে একটা সঙ্গীন ঘটনা উপস্থিত হইল। একদিন রাত্রিকালে বিহারীর ঘরে সুলোচনার কাবুলী বিড়াল কোনোক্রমে প্রবেশ করে; বিহারী তাহাকে বাঁধিয়া রাখিল।

প্রত্যুষে বিড়ালের সন্ধান না পাইয়া সুলোচনা ছাতে গেল। দেখিল বদ্ধ বিড়াল নির্জীবপ্রায় হইয়া বিহারীর ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

তখন বিপিন বাতায়নপথে উদিত হইলে সুলোচনা মুখ ভার করিয়া একবার বলিল, “দেখুন তো কী অন্যায়।”

বিপিন বুঝিতে পারিল। তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া বহির্দ্বারে গেল, এবং তদ্দণ্ডে বিহারীর ঘরে গিয়া বিড়ালকে বন্ধনমুক্ত করিয়া কোলে তুলিয়া লইল।

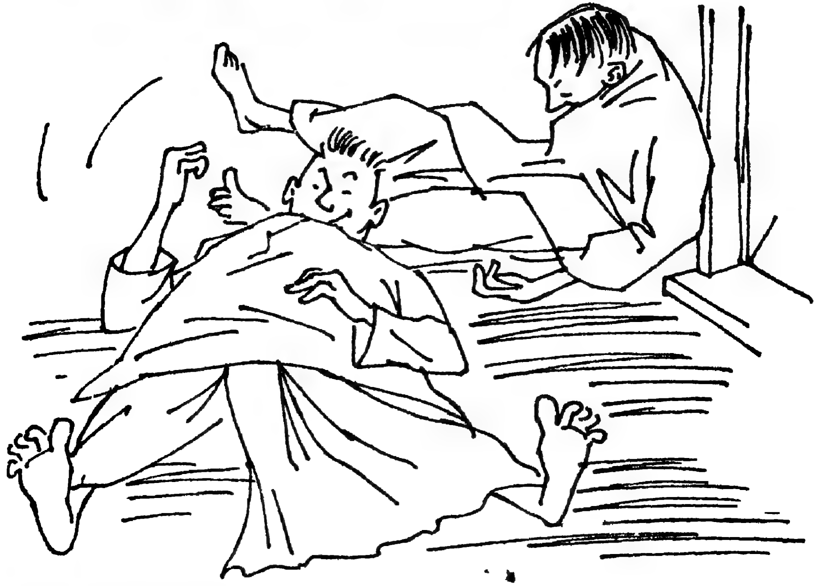

উভয়েরই চক্ষু রক্তবর্ণ।

বিহারী বলিল, “শীঘ্র রাখো।”

বিপিন অবজ্ঞাসূচক হাসি হাসিয়া একবার উন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া সুলোচনার দিকে চাহিল।

বিহারীও দেখিল। তৎপরেই উভয় বন্ধু আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পরকে

আক্রমণ করিল।

এই মল্লযুদ্ধের বর্ণনা অনাবশ্যক; তবে এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধের বিড়ালটি উভয়ের দেহ চাপা পড়িয়া এবং উভয়ের টানাটানিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

রুধিরাক্ত কলেবর বিপিন ও বিহারী সারাদিন সেই ঘরে মাতাল অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

## ছয়

সুলোচনার যে মূর্ছা হইয়াছিল, তাহা প্রথমে কেহ দেখে নাই। সন্ধ্যার সময় সুলোচনা শয্যায় শুইয়া স্থিরনেত্রে সন্ধ্যাতারকা দেখিতেছে।

বিড়ালের ইহজগৎ ছাড়িবার সহিত, সুলোচনারও সংসারের সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে।

সুলোচনা কাহাকেও ভালবাসে নাই। সেই মার্জারই তাহার প্রথম ভালবাসা এবং শেষ ভালবাসা। বাস্তবিক, একেবারে অধিক ভালবাসা কখনও স্বাভাবিক হইতে পারে না।

সুলোচনার বিড়ালের সহিত তাহাব একমাত্র স্বামীর স্মৃতি সন্ধ্যাবায়ু জাগাইয়া তুলিয়াছে। সুলোচনার কোমল হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে পাষাণে তাহার একমাত্র স্বামীব দেবমূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা ইহজন্মে মুছিবার নয়।

সুলোচনা ধীরে ধীবে উঠিয়া মস্তকের কেশগুলি কর্তন করিয়া ফেলিল, কালো-পেড়ে শাড়ি ফেলিয়া সাদা শাড়ি পরিধান করিল। কাগজপত্র, কবিতা, সিঁদুর, সাজসজ্জা—সব দূরে ফেলিয়া দিল।

সুলোচনার মূর্তি স্থির হইয়া আসিল। সে শ্যামা ঝিকে বলিল, "মৃত বিড়াল-টিকে আন্।"

জনক-জননী কত বুঝাইলেন, কিন্তু সুলোচনার জীবন যে গভীর স্তরে পড়িয়া গিয়াছে, সেখানে পাথিব আশ্বাসবাণী পৌছিল না।

কাজেই নবীনবাবু ও তাঁহার সহধর্মিণী সম্পূর্ণ বিধবার মূর্তি দেখিয়া, কন্যাসহ সেই রাত্রিকালেই দেশে যাত্রা করিলেন। তারপর আর তাঁহাদের কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না।

রাত্রি দশটার পর বিহারীর নেশা ভঙ্গ হইল। বিহারী দেখিল, বিপিন পড়িয়া

আছে। বিহারীর স্মৃতিপথে মল্লযুদ্ধের কথা আসিতে সে একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া ২৩নং বাটীতে গেল। দেখিল, বাটী জনশূন্য। বিহারী শুনিল যে, নবীনবাবু সপরিবারে চলিয়া গিয়াছেন। বিহারী ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, “বিপিন।”

বিপিন। “হুম্—”

বিহারী। “তাহারা চলিয়া গিয়াছে।”

বিপিন। “হুম্—”

বিহারী সারারাত্রি বসিয়া বিপিনের গাত্র টিপিয়া, ঔষধ খাওয়াইয়া, গোলাপজলে মাথা ধৌত করিয়া, প্রাতঃকালে দেখিল, বিপিন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

বাস্তবিক, দশটার সময় হুঁশ হইয়াছিল, কিন্তু বন্ধুর পুরাতন কোমল করের সস্নেহ আভাস পাইয়া সে আরাম করিয়া পুর্বসংস্কারবশতঃ ঘুমাইয়াছিল।

যখন সূর্য উঠিতেছিল, তখন বিপিন বলিল, “দেখো বিহারী, পুর্বেই আমাদিগের একটা ভুল হইয়াছে।”

বিহারী। “কী?”

বিপিন। “ঐ ২৩নং বাটী খালি থাকিতে দেওয়া উচিত হয় নাই।”

বিহারী। “আমারও তাহাই মত।”

অতঃপর সেই দিনই উভয়ে উঠিয়া ২৩ নং বাটীতে একত্র গেল, এবং ইহাও আশ্চর্য বলিতে হইবে যে, উভয়ের খাদ্যাখাদ্যের বিভিন্নতা আর রহিল না, কেননা, উভয়েই সাবধানে মদ্য, মাংস, নিরামিষ প্রভৃতি সমান অংশে খাইতে লাগিল, এবং উভয়েরই খরচ এক সমান দুই অংশে বিভক্ত হওয়াতে আর কোনোও ক্ষোভের কারণ রহিল না।

উভয়ের অবস্থা এখন এক প্রকার, অতএব উভয়েই সম্পূর্ণ হরিহরাত্মা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ( ১৮৭৩—১৯৩২ )

# বিবাহের বিজ্ঞাপন

---

## প্রথম পরিচ্ছেদ

শহর গাজীপুর, মহল্লা গোরাবাজারে, রাম অওতার নামক একটি লালা জাতীয় যুবক বাস করে। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজি লেখাপড়া জানা আছে। কয়েকবার উপর্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া, এখন সে ঘরে বসিয়া আছে।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর এখন সন্ধ্যাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হস্তিদন্তের বোলাযুক্ত একজোড়া খড়ম পায়ে দিয়া নগ্নগাত্রে, রাম অওতার তাহাদের সদর বাড়ির বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য একটি চেয়ার আনিয়া দিল। রাম অওতার উপবেশন করিয়া বলিল, "চতুরী, ভাঙ তৈয়ারী হইয়াছে? লইয়া আয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরী ওরফে চতুর্ভুজ, একটি রূপার গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি আনিয়া দিল। বাম অওতার অবস্থাপন্ন লোক।

বাড়িটি ঠিক সদর রাস্তার উপর। স্থানটা বাজার হইতে কিছু দূরে, সুতরাং কিছু নিরিবিলি। পথচারী লোক বেশি নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা এক্কা ঝম ঝম শব্দ করিয়া যাইতেছে। রাস্তার মোড়ে একটি শিরীষ গাছ—তাহাতে অজস্র কোমল ফুল ধরিয়াছে। অপর পার্শ্বে মিউনিসিপালিটির একটি লণ্ঠন ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

রাম অওতার বসিয়া আরাম করিয়া সিদ্ধি পান করিতে লাগিল। সহসা অদূরে চাঁচা গলায় শব্দ উত্থিত হইল—"গুলাব-ছড়ি—"

গুলাব-ছড়ি-ওয়ালা তীব্র কেরোসিনের আলোকসহ পসরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ির সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল—ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ি

যো খাওয়ে মজা পাওয়ে;
যো চাখ্‌খে ইয়াদ্‌ রাখ্‌খে;
গুলাব-ছড়ি!

বাটীর মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক বাহির হইয়া আসিল। রাম অওতারের কাছে আসিয়া বাহানা ধরিল, "ভাইয়া, আমি গুলাব-ছড়ি খাইব।"

একথা শুনিবামাত্র ফেরিওয়ালা রাস্তায় দাঁড়াইয়া, বারান্দার উপর তাহার পসরা নামাইল। বালক মোহনলালের প্রতি চাহিয়া বলিল, "গুলাব-ছড়ি, নান খাটাই, মোহন হালুয়া,—কি লইবে বলো?"

বালক গুলাব-ছড়িরই বেশি পক্ষপাতী—তাহাই কয়েকটা ক্রয় করিল। ফিরিওয়ালা স্বীয় কক্ষতল হইতে একখানা হিন্দী সংবাদপত্র বাহির করিয়া, তাহার কিয়দংশ ছিন্ন কবিয়া, গুলাব-ছডিগুলি জডাইয়া মোহনলালের হাতে দিল। তাহার পর পসরা উঠাইয়া লইয়া, পুর্ববৎ কড়িমধ্যম স্বরে 'গুলাব-ছড়ি' হাঁকিতে হাঁকিতে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতার কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাইয়া বলিল, "দেখো ভাইয়া, একটা হাঁথির তসবীর।"

রাম অওতার কাগজখানা হাতে লইয়া দেখিল, একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহার পার্শ্বে যাহা দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌতুহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে—'বিবাহের বিজ্ঞাপন'। বাম হস্তে সিদ্ধির গেলাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজখানি লইয়া রাম অওতার বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ কবিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পডিল—

## বিবাহের বিজ্ঞাপন

> প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। বিবাহান্তে যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পুর্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা অভিভাবক আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।
>
> লালা মুরলীধর লাল
> মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদার ঘাট
> বেনারস সিটি

রাম অওতার বিজ্ঞাপনটি দুইবার পাঠ করিল। পাঠান্তে তাহার মুখে কিঞ্চিৎ

হাসি দেখা দিল। বারান্দায় ফিরিয়া গিয়া, চেয়ারে বসিয়া সিদ্ধি পান করিতে করিতে সে নানা প্রকার ভাবিতে লাগিল।

ভাবিল, ইহা তো বড়ো মজার বিজ্ঞাপন! তাহার যে বাল্যকালেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—নহিলে এই একটা বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা —না জানি দেখিতে কি রকম। 'প্রার্থনাসমাজী'র কন্যা। বাঙ্গালা দেশে যে 'ব্রহ্মসমাজী'রা আছে—'প্রার্থনাসমাজী'রাও সেইরূপ, তাহা রাম অওতার শুনিয়াছে। এতদিন অবধি যখন সে কন্যা অবিবাহিতা আছে, তখন নিশ্চয়ই শিক্ষিতা এবং গাহিতে বাজাইতে জানে। এই প্রকার মহিলাগণের সম্বন্ধে রাম অওতারের মনে বহুদিন হইতে অনন্ত কৌতূহল সঞ্চিত ছিল।

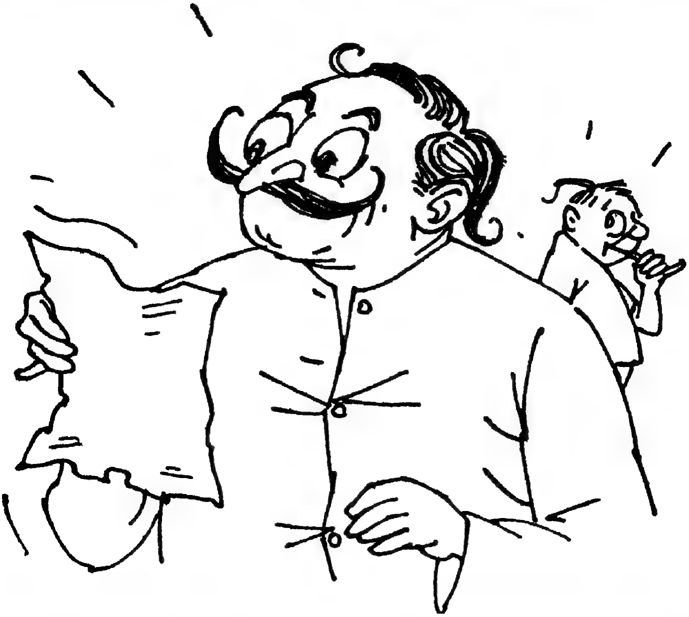

সিদ্ধিপান শেষ হইলে গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া রাম অওতার ভাবিল, "একটা কাজ করা হউক। উহাদিগকে পত্র লিখিয়া, গিয়া দেখা করি। কিছুদিন উহাদের বাড়ি যাতায়াত করিয়া, মজাটাই দেখা যাউক না কেন। তাহার পর সট্‌কাইলেই হইবে।"

সিদ্ধির নেশায় এই মজার মতলব মনে আঁটিতে আঁটিতে রাম অওতারের অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। তাহার বিবাহ যে হইয়াছে, তাহা উহারা জানিবে কেমন করিয়া? কিছুদিন কোর্টশিপ করিয়া তাহার পর চম্পট। রাম অওতার হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিল আর বিলম্ব করা নয়। চিঠিটা এখনই লিখিতে হইবে। রাম অওতার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তক্তপোশে বসিয়া বাক্স সম্মুখে লইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। অভ্যাসমতে প্রথমে লিখিল—'শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।' তাহার পর মনে হইল, ইহারা 'প্রার্থনা সমাজের' লোক, হিন্দু দেবদেবীর নাম শুনিলে তো চটিয়া যাইতে পারে। তাহাকে তো নিতান্ত অসভ্য পৌত্তলিক মনে করিতে পারে। সুতরাং আর একখানা কাগজে 'শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি' বলিয়া আরম্ভ করিল। প্রবেশিকায় ফেল শুনিলে পাছে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষিত বলিয়া মনে না করে, তাই লিখিয়া দিল সে বি-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। নিজের সচ্চরিত্রতার কথা লিখিবার সময় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। কলম রাখিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া হাসিল। পরে লিখিল, সে জাতিভেদ মানে না, বিলাত যাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কুমারীর একখানি ফটোগ্রাফ যদি থাকে, তাহা প্রার্থনা করিয়া পত্র শেষ করিল।

সেদিন রাত্রে রাম অওতারের ভালো করিয়া নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে যতই সে কল্পনা করে, ততই তাহার হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া ওঠে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাশীর কেদার ঘাটের নিকট, একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ত্রিতল অট্টালিকা। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহার একটি কক্ষে, মেঝেতে সতরঞ্চ বিছাইয়া, দুই ব্যক্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছিল। একজনের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল, গৌরবর্ণ পুরুষ। অপরটিরও দেহ ক্ষীণ হইলেও শারীরিক বলের পরিচয় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৃশ্যমান। এই দুই ব্যক্তি কাশীর দুইজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। প্রথম বর্ণিত ব্যক্তির নাম মহাদেও মিশ্র—সে এই বাড়ির অধিকারী। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কাহ্নাইয়ালাল –সে মহাদেও মিশ্রের একজন প্রিয় সাকিরদ।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। তাহার পর নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, "চিঠি আসিয়াছে।"

কাহ্নাইয়ালাল চিঠি লইয়া ঠিকানা পড়িল—"লালা মুরলীধর লাল, মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদার ঘাট, বেনারস সিটি।" পড়িয়া কাহ্নাইয়ালাল বলিল—"লালা মুরলীধর! তোমার ভাড়াটিয়া লালা মুরলীধর তো দুই তিন বছর হইল এ বাড়ি ছাড়িয়া গিয়াছে।"

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল, “লালা মুরলীধর তো নকুলে বদলি হইয়া গিয়াছে। চিঠি খোল, দেখ কি সমাচার।”

কাহ্নাইয়া বলিল, “মুরলীধরকে ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইবে না?”

মহাদেও বলিল, “আরে—কি সমাচার সে তো আগে দেখিতে হইবে। খোল, পড়্।”

কাহ্নাইয়ালাল গুরুজীর আদেশমতো পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

মহাশয়,

সংবাদপত্রে আপনার কন্যার বিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি। আমি একজন সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবক। আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি এলাহাবাদ কলেজে বি-এ শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে পীড়াক্রান্ত হওয়ায় পাস করিতে পারি নাই। আমি জাতিভেদ মানি না। বিলাত যাইবার জন্য আমার বাল্যকাল হইতেই বাসনা। যদি মহাশয় আমাকে আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন, তবে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি বাল্য বিবাহের বিরোধী, একারণে অদ্যাপি বিবাহ করি নাই। আমি সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী। আজ্ঞা পাইলে আমি মহাশয়ের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করি। যদি কুমারীর একখানি ফটোগ্রাফ থাকে তো পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

লালা রাম অওতার লাল
মহল্লা গোরাবাজার, শহর গাজীপুর

পত্র শুনিয়া মহাদেও মিশ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, “এ তো বড়ো তামাশা! সে মেয়ের তো কবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।”

“বলিতেছে যে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। সে কি?”

মহাদেও বলিল, “জানো না? লালা মুরলীধর আখবরে লুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল কিনা। উহারা বরম্‌সমাজী লোক,—উহাদের সঙ্গে তো ভালো কায়েথ কিরিয়া করম করিবে না। তাই লুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল।”

“আমি তো শুনিয়াছি, কায়েথের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছে।”

“হাঁ, হাঁ,—কায়েথ বটে, কিন্তু বিলাতে গিয়া বালিস্টর হইয়া আসিয়াছিল—কায়েথ বটে, বড়ো ঘরানাও বটে। লুটিস্ পড়িয়া সে সময়ে আরও অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু লালা মুরলীধর বলিল, আমি বালিস্টরী পাস করা জামাই পাইতেছি তখন আর কাহাকেও দিব না। এ বাড়িতেই তো বিবাহ

হইল। সে আজ তিন বৎসরের কথা।”

কাহ্নাইয়ালাল ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল, “ঠিক ঠিক।” কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, “ওই যে লিখিয়াছে ফোটুগিরাফ পাঠাইতে, সে কি ?”

মিশ্র বলিল, “জানো না ? ঐ যে তস্‌বীর হয় ; একটা বাক্স থাকে, তাতে একটা সিসা লাগানো থাকে ; মানুষকে দাঁড় করাইয়া দেয় আর ভিতরে তস্‌বীর উঠে ; তাহাকেই ফোটুগিরাফ বলে।”

কাহ্নাইয়ালাল শুনিয়া বলিল, “ও হো, ঠিক ঠিক। এইবার মালুম হইয়াছে। তবে একটা ভালো শিকার জুটিয়াছে। উহাকে একটা চিঠি লিখিয়া আনানো হউক।”

মহাদেও মিশ্র বলিল, “তাহার কাছে আর কি মিলিবে ? দু-চার দশ টাকা মিলিবে কিনা সন্দেহ !”

কাহ্নাইয়ালাল বলিল, ‘না, সে যখন সাদি করিবে বলিয়া আসিবে, তখন নিশ্চয়ই সোনার ঘড়ি, চেন, আংটি লাগাইয়া আসিবে। নিজের না থাকিলে অন্যের চাহিয়া লইয়া আসিবে। তাহাকে আসিতে লিখি। কেবল ফোটুগিরাফটার কি করি ?”

মহাদেও বলিল, “সে জন্য ভাবনা কি ? ফোটুগিরাফ বাজারে অনেক মিলিবে। চৌকে যে মহম্মদ খানের দোকান আছে কিনা সেখানে পার্সী থিয়েটার দলের অনেক খাপসুরৎ খাপসুরৎ আউরতের তস্‌বীর আছে। সেই একখানা কিনিয়া পাঠাইলেই হইবে।”

পরামর্শ তখনই স্থির হইয়া গেল। ইহাও স্থির হইল যে, এ বাড়িতে আনা হইবে না, তাহা হইলে পরে পুলিসে সন্ধান পাইতে পারে। অন্য একটা বাড়ি সাজাইয়া, সেইখানে লইয়া গিয়া, কার্য সমাধা করিতে হইবে। এক পেয়ালা ভাঙ, তাহার সঙ্গে একটু ধুতরার রস—আর কিছুই করিতে হইবে না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণকাল। গোরাবাজারের সেই বৈঠকখানাটিতে অর্ধশয়ান অবস্থায় রাম অওতার ধূমপান করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে রাজপথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছে। ডাকওয়ালার আর আসিবার বিলম্ব নাই। আজ দুই দিন হইতে রাম অওতার এই প্রকার সপ্রতীক্ষ কারণ এখনও পত্রের উত্তর আসে নাই।

ডাকওয়ালা আসিয়া একখানি পত্র এবং একটি প্যাকেট দিয়া গেল। হস্তাক্ষর অপরিচিত। বেনারস সিটির মোহর রহিয়াছে।

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রাম অওতার তক্তপোশের উপর উঠিয়া বসিল। প্রথমেই প্যাকেটটি উন্মুক্ত করিল। ফটোগ্রাফ—সুন্দরী যুবতীর মনোজ্ঞ সুন্দর ছবি। সতৃষ্ণ নয়নে রাম অওতার ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। পার্সী মহিলাদের ধরনে শাড়িখানি পরিহিত। বরমসমাজীদেব স্ত্রী-কন্যারা এইরূপ ধরনেই শাড়ি পরিধান করে বটে—তাহা সে রেলে যাতায়াতের সময় অনেকবার দেখিয়াছে। মুখ চক্ষুর গঠন কী সুন্দর। রাম অওতাব মনে মনে বলিতে লাগিল—'বাহবা কি বাহবা। বাহ্ রে বাহ্।'

ছবিখানি রাখিয়া সে পত্রখানি খুলিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল -

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী শনিবার সন্ধ্যার গাডিতে যদি আপনি আসেন, তবে উত্তম হয়। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্তা হইবে। আমি সম্প্রতি বাডি বদল করিয়াছি, সুতরাং কেদার ঘাটের বাডিতে আসিবেন না। আমি স্টেশনে লোক পাঠাইয়া দিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। ঐদিন সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আপনি ভোজন করিলে অত্যন্ত সুখী হইব। ফটোগ্রাফ পাঠাইলাম।

লালা মুরলীধর লাল

পত্র রাখিয়া আবার ফটোগ্রাফখানি লইয়া রাম অওতাব দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্শ্বদেশে লম্বিত, অপরটি অর্ধোত্থিতভাবে শাডিখানির এক অংশ ধরিয়া আছে। চক্ষুযুগল যেন হাস্যপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল ইহার সহিত আলাপ হইলে কী মজাদারই হইবে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাম অওতার ভাবিল,—লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাডিতে যাইতে। সে আর দুইদিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন? যাহা হউক, এই দুইদিনে ভালো করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার বাড়িতে বলিল—"একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি।" বলিয়া নিজের বেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপ ভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথম দর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ভালো রেশমী চাপকান বাহির করিয়া রাম আওতার সযত্নে পরিধান করিল। জরীর কাজ করা সুন্দর মখমলের টুপি লইয়া মাথায় দিল।

দিল্লী হইতে আনীত সুকোমল রঙীন জুতায় স্বীয় পদদ্বয়ের শোভা বৃদ্ধি করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, নিজের গুম্ফে ও ভ্রূযুগলেও কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিল। কয়দিন কাশীতে থাকিতে হইবে স্থিরতা নাই—খরচপত্র একটু ভালো করিয়াই করিতে হইবে,—তাই দুইশত টাকাও নিজের সঙ্গে লইল। সোনার ঘড়ি, সোনার চেন এবং হীরকের অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া, স্টেশন অভিমুখে রওনা হইল।

রেলগাড়িতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যুবতীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে কি প্রকারে সম্ভাষণ করিতে হইবে। ইংরেজি ধরনে একপ্রকার 'কোর্টশিপ' হয়, তাহা সে অবগত ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রণালীর বিষয় কিছুই জানিত না। ইংরাজি উপন্যাসাদি সে কখনও পাঠ করে নাই। তবে "লাল-হীরাকী কথা" "লয়লা মজনু" "গুল-ই-বকাওলী" প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল তত্তৎ গ্রন্থে বর্ণিত প্রথা অবলম্বন করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেবল প্রথম প্রথম একটু আত্মসংযম দেখানোই ভালো। প্রথমে আমাদের "তু" না বলিয়া সম্মানের "আপ্" বলাই সমীচীন হইবে,—কারণ এসকল মহিলা শিক্ষিতা এবং সভ্যতাপ্রাপ্তা কিনা। কথাটা হইতেছে,—এরূপ কোনো সম্ভাষণ না করা হয় যাহাতে সে বিরক্ত হয়। দুই চারিদিন যাতায়াতের পর, একদিন নির্জনে "পিয়ারী" বলিয়া সম্ভাষণ কারিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

রাম অওতার মনে মনে এইরূপ পর্যালোচনা ও ভবিষ্যসুখ কল্পনা করিতেছে, ক্রমে গাড়ি আসিয়া রাজঘাট স্টেশনে পৌছিল।

রাম অওতার নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকটির উত্তরীয় ও পাঞ্জাবী কামিজ আবীরের রঙে রঞ্জিত।

যুবকটি আসিয়া বলিল, "আপনার নাম কি লালা রাম অওতার লাল?"

"হ্যাঁ, আপনার নাম কি?"

"কিষুনপ্রসাদ। আমি লালা মুরলীধর লালের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।"—বলিয়া সমাদর করিয়া সে রাম অওতারকে বাহিরে লইয়া গেল।

সেখানে একখানা গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল। গাড়িতে উঠিয়া কিষুনপ্রসাদ বলিল, "জানালাগুলা বন্ধ করিয়া দিব কি? আজ বৈশাখী পুর্ণিমা বলিয়া কাশীতে ছোট দোল। দেখুন না, আমার এই পোশাকে আসিবার সময় দুষ্ট লোকে

পিঁচকারী দিয়াছে।”

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল, “বন্ধ করিয়া দিন—বন্ধ করিয়া দিন।” তাহার ভয় হইল পাছে তাহার রেশমী পোশাক কেহ পিচকারী দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। দুইজনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ি গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌঁছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার দেখিল, একটি প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকা। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়াই কিষুনপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার। তাহার পর একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেখানে বাতি জ্বলিতেছে। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া রাম অওতার একটি বৃহৎ কক্ষে নীত হইল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, ইহারা যখন নব্যতন্ত্রের লোক তখন গৃহসজ্জাদি সাহেবী ধরনের হইবে। দেখিল, তাহা নহে। কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া রক্ষিত। মধ্যস্থলে বসিয়া একটি স্থূলকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবোলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত।

কিষুনপ্রসাদ ওরফে কাহ্নাইয়ালাল পৌঁছিয়া বলিল, “চাচাজী, এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন।”-–‘চাচাজী’ আর কেহই নহেন—স্বয়ং মহাদেও মিশ্র। মহাদেও অভ্যর্থনা করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, কাহ্নাইয়ালালকে ডাকিয়া বলিল, “কিষুন,—তবে আমি বাড়ির ভিতর যাইয়া উঁহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ ইহাকে জলযোগ করাও।”

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কাহ্নাইয়ালাল সেখানে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল।

কিষুনপ্রসাদ বলিল, “আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাই এক পেয়ালা সিদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছি। আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড়ো ভক্ত। ক্লান্তি দূর করিতে সিদ্ধির মতো পানীয় আর নাই।”

রাম অওতার অনুরোধক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি আটটা বাজে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

কাহ্নাইয়ালাল বলিল, “আপনি গীতবাদ্য জানেন কি? আমাদের বাড়ির

মহিলারা অত্যন্ত গীতবাদ্যপ্রিয়।"

রাম অওতার বলিল, "গীত? গীত?—জানি বৈকি! শুনিবে একটা?"

তখন নেশায় তাহার মস্তিষ্ক চন্‌ চন্‌ করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল—যেন চতুর্দিকে বহুসংখ্যক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে; বহুলোকে যেন তাহাকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া সারেং, বেহালা, বীণ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ক্রমে তাহারা যেন সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাম অওতার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "গীত? শুনিবে একটা?"—বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরম্ভ করিল—

"বতা দে সখি, কৌন গলি গয়ে মেরে শ্যাম
গোকুল ঢুঁড়ি
বৃন্দাবন ঢুঁ—"

আর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। ঢুঁ—ঢুঁ—ঢুঁ—কয়েকবার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

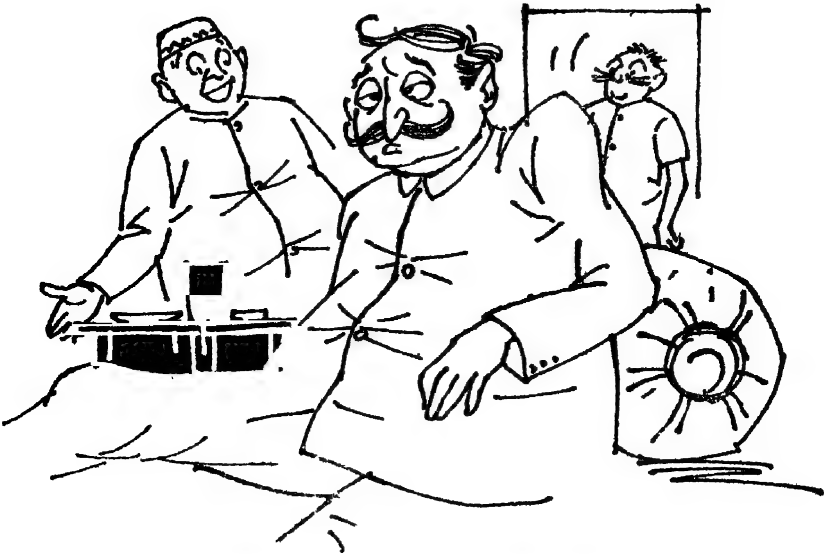

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল—'কি রে কাহ্নাইয়া, ঔষধ ধরিয়াছে?"

কাহ্নাইয়া হাসিয়া বলিল, "ধরিয়াছে বৈকি। যায় কোথা?"

মহাদেও বলিল, "দেখ্‌ তো কি আছে?"

কাহ্নাইয়ালাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটি, নগদ দুই শত টাকা, রৌপ্যনির্মিত পানের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল।

মহাদেও টাকাগুলা গুনিতে গুনিতে বলিল, "পোশাক খোল্, দামী পোশাক।" গুরুজীর আদেশমতো কাহ্নাইয়ালাল সেই টুপি, জুতা, রেশমী পোশাক সমস্ত খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্নবস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল, "না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কাল সকালে নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপিন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে। একটা চিমটা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসীবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।"

কাহ্নাইয়ালাল সমস্তই ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটা কতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল,—"দে,—এই পয়সা কটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টা দুই এখানেই পড়িয়া থাকুক। তাহার পরে অন্ধকার গলি দিয়া লইয়া গিয়া, মানমন্দিরের দেউড়ীতে শোয়াইয়া দিয়া আসিস। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভালো। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।"

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম অওতার ধনসম্পদ পরিত্যাগপুর্বক সংসার বিবাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল; সৌভাগ্যবশতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় তদবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া, অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

পরশুরাম ( ১৮৮০ — )

# জাবালি

ভরতের সঙ্গে বশিষ্ঠাদি যে-সকল ঋষিগণ মহিষীগণ ও কুলপতিগণ চিত্রকূট পর্বতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ রাম অটল রহিলেন। অবশেষে মহর্ষি জাবালি বলিলেন—

*'রাম, তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব মাতা-পিতা বলিয়া যাহার স্নেহাসক্তি হইয়া থাকে সে উন্মত্ত।...পিতার অনুরোধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম সংকটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সেই সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন; তিনি অন্য, তুমিও অন্য।...বৎস, তুমি স্ববুদ্ধিদোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ, কে কোথায় শুনিয়াছে যে মৃতব্যক্তি আহার করিতে পারে?...যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা যজ্ঞ তপস্যা দান প্রভৃতি কার্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব, রাম, পরলোকসাধন ধর্ম নামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।'

জাবালির কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ধর্মবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক কহিলেন—'তপোধন,

---

* বাল্মীকি রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত অনুবাদ।

কাহ্নাইয়ালাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটি, নগদ দুই শত টাকা, রৌপ্যনির্মিত পানের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল।

মহাদেও টাকাগুলা গুনিতে গুনিতে বলিল, "পোশাক খোল্‌, দামী পোশাক।" গুরুজীর আদেশমতো কাহ্নাইয়ালাল সেই টুপি, জুতা, রেশমী পোশাক সমস্ত খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্নবস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল, "না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কাল সকালে নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপিন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে। একটা চিমটা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসীবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।"

কাহ্নাইয়ালাল সমস্তই ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটা কতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল,—"দে,—এই পয়সা কটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টা দুই এখানেই পড়িয়া থাকুক। তাহার পরে অন্ধকার গলি দিয়া লইয়া গিয়া, মানমন্দিরের দেউড়ীতে শোয়াইয়া দিয়া আসিস। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভালো। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।"

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম অওতার ধনসম্পদ পরিত্যাগপূর্বক সংসার বিরাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল; সৌভাগ্যবশতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় তদবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া, অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

**পরশুরাম ( ১৮৮০ — )**

# জাবালি

ভরতের সঙ্গে বশিষ্ঠাদি যে-সকল ঋষিগণ মহিষীগণ ও কুলপতিগণ চিত্রকূট পর্বতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ রাম অটল রহিলেন। অবশেষে মহর্ষি জাবালি বলিলেন—

*'রাম, তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব মাতা-পিতা বলিয়া যাহার স্নেহাসক্তি হইয়া থাকে সে উন্মত্ত।...পিতার অনুরোধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম সংকটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সেই সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন; তিনি অন্য, তুমিও অন্য।...বৎস, তুমি স্ববুদ্ধিদোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ, কে কোথায় শুনিয়াছে যে মৃতব্যক্তি আহার করিতে পারে?...যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা যজ্ঞ তপস্যা দান প্রভৃতি কার্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব, রাম, পরলোকসাধন ধর্ম নামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।'

জাবালির কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ধর্মবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক কহিলেন—'তপোধন,

---

* বাল্মীকি রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত অনুবাদ।

আপনি আমার হিতকামনায় যাহা কহিলেন তাহা বস্তুতঃ অকার্য, কিন্তু কর্তব্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আপনার বুদ্ধি বেদবিরোধিনী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক। আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন আমি তাহার এই কার্যকে যথোচিত নিন্দা করি। বৌদ্ধ যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে। অতএব যাহাকে বেদবহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সঙ্গে সম্ভাষণও করিবে না।…'

জাবালি তখন বিনয়বচনে কহিলেন—'রাম, আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছু নাই তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া নাস্তিক হই, আবার অবসরক্রমে আস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল উপস্থিত। এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন কবিবার নিমিত্ত এইরূপ কহিলাম, এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবাব তাহা প্রত্যাহার করিতেছি।'

জাবালিব কথা রামায়ণে এই পর্যন্ত আছে। যাহা নাই তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

মহর্ষি জাবালি ক্লান্তদেহে বিষণ্ণচিত্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমস্ত পথ তাঁহাকে নীরবে অতিক্রম কবিতে হইয়াছে, কারণ অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার সংস্রব প্রায় বর্জন কবিয়াই চলিয়াছিলেন। খর্বট খল্লাট খালিত প্রভৃতি কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে দূর হইতে নির্দেশ করিয়া বিদ্রূপ কবিতেও ত্রুটি করেন নাই।

অযোধ্যাব বিপ্রগণ কেহই জাবালিকে শ্রদ্ধা কবিতেন না। স্বয়ং রাজা দশরথ তাহার প্রতি অনুবক্ত ছিলেন বলিয়া এ পর্যন্ত তাঁহাকে কোন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু এখন রামচন্দ্র কর্তৃক জাবালির প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে। সহযাত্রী বিপ্রগণের ব্যবহার দেখিয়া জাবালি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তপ্ত তৈলমধ্যে মৎস্যের ন্যায় তাঁহার অযোধ্যায় বাস করা অসম্ভব হইবে।

রামচন্দ্রের উপর জাবালির কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, পরন্তু তিনি রামের ভবিষ্যতের জন্য কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়াছেন। ছোকরার বয়স মাত্র সাতাশ বৎসর, সাংসারিক অভিজ্ঞতা এখনও কিছুমাত্র জন্মে নাই। শাস্ত্রজীবী সভাপণ্ডিতগণ এবং মুনিপুংগব বিশ্বামিত্র—যিনি এককালে অনেক কীর্তি করিয়াছেন,—ইহারা যেরূপ ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন, সরলস্বভাব রামচন্দ্র তাহাই চরম পুরুষার্থ বোধে গ্রহণ

করিয়াছেন। বেচারাকে এরপর কষ্ট পাইতে হইবে এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে জাবালি অযোধ্যায় নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

নগরের উপকণ্ঠে সরযূতীরে জাবালির পর্ণকুটির। বেলা অবসান হইয়াছে। গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন অঙ্গনের একপার্শ্বে পনসবৃক্ষতলে জাবালিপত্নী হিন্দ্রলিনী রাত্রের জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিতেছেন। নদীর পরপারবাসী নিষাদগণ যে মৃগমাংস পাঠাইয়াছিল তাহা সুপক্ব হইয়াছে, এখন খানকয়েক মোটা মোটা পুরোডাশ সেঁকিলেই রন্ধন শেষ হয়। হিন্দ্রলিনী যবপিণ্ড থাসিতে থাসিতে নানাপ্রকার সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁর এতখানি বয়স হইল, কিন্তু এ পর্যন্ত পুত্রমুখ দেখিলেন না। স্বামীর পুন্নাম নরকের ভয় নাই, পরলোকে পিণ্ডের ভাবনা নাই,—ইহলোকে দু-বেলা নিয়মমতো পিণ্ড পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট। পোষ্যপুত্রের কথা তুলিলে বলেন—পুত্রের অভাব কি, যখন যাকে ইচ্ছা পুত্র মনে করিলেই হয়। কিবা কথার শ্রী! স্বামী যদি মানুষের মতো মানুষ হইতেন তাহা লইলে হিন্দ্রলিনীর অত খেদ থাকিত না। কিন্তু তিনি একটি সৃষ্টিবহির্ভূত লোক, কাহারও সহিত বনাইয়া চলিতে পারিলেন না। সাধে কি লোকে তাঁকে আড়ালে পাষণ্ড বলে! ত্রিসন্ধ্যা নাই, জপতপ নাই, অগ্নিহোত্র নাই, কেবল তর্ক করিয়া লোক চটাইতে পারেন। অমন যে রামচন্দ্র, ব্রাহ্মণ তাঁকেও চটাইয়াছেন। যতদিন দশরথ ছিলেন, অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নাই। বৃদ্ধ রাজা স্ত্রৈণ ছিলেন বটে, কিন্তু নজরটা তাঁর উচ্চ ছিল। এখন কি হইবে ভবিতব্যতাই জানেন। ভরত তো নন্দিগ্রামে পাদুকাপুজা লইয়া বিব্রত। সচিব সুমন্ত্র এখন রাজকার্য দেখিতেছেন; কিন্তু সে অত্যন্ত কৃপণ, ঘোড়ার বল্গা টানিয়া তার সকল বিষয়েই টানাটানি করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। রাজবাটী হইতে যে সামান্য বৃত্তি পাওয়া যায় তাতে এই দুর্মূল্যের দিনে সংসার চলে না। হিন্দ্রলিনী তাঁর বাবার কাছে শুনিয়াছিলেন, সত্যযুগে এক কপর্দকে সাত কলস খাঁটি হৈয়ঙ্গবীন মিলিত, কিন্তু এই দগ্ধ ত্রেতাযুগে তিন কলস মাত্র পাওয়া যায় তাও ভঁয়ষা। ঘৃতের জন্য জাবালির কিছু ঋণ হইয়াছে, কিন্তু শোধ করার ক্ষমতা নাই। নীবার ধান্য যা সঞ্চিত ছিল ফুরাইয়া আসিয়াছে, পরিধেয় জীর্ণ হইয়াছে, গৃহে অর্থাগম নাই, এদিকে জাবালি শত্রুসংখ্যা বাড়াইতেছেন। স্বামীর সংসর্গদোষে হিন্দ্রলিনীও অনাচারে অভ্যস্তা হইয়াছেন। অযোধ্যার নিষ্ঠাবতীগণ তাঁকে দেখিলে শূকরীর ন্যায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত

করে। হিন্দ্রলিনী আর সহ্য করতে পারেন না, আজ তিনি আহারান্তে স্বামীকে কিছু কটুবাক্য শুনাইবেন।

অঙ্গনের বাহিরে হুংকার করিয়া কে বলিল—'হংহো জাবালে, হংহো!' হিন্দ্রলিনী ত্রস্তা হইয়া দেখিলেন দশ বারোজন ক্ষুদ্রকায় ঋষি কুটিরদ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের খর্ব বপু বিরল শ্মশ্রু ও স্ফীত উদর দেখিয়া হিন্দ্রলিনী বুঝিলেন তাঁহারা বালখিল্য মুনি।

হিন্দ্রলিনী কহিলেন—'হে মহাতপা মুনিগণ, আমার স্বামী সরযুতটে ধ্যানস্থ আছেন। তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, আপনারা ততক্ষণ ঐ কুটির অলিন্দে আসন গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করুন।'

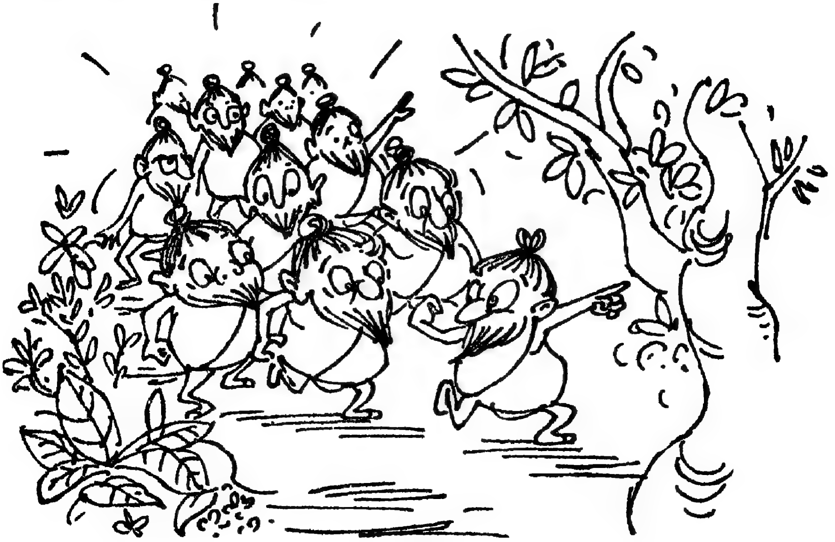

বালখিল্যগণের অগ্রণী মহামুনি খর্বট কহিলেন- 'ভদ্রে, তোমার ঐ অলিন্দ ভূমি হইতে বিতস্তিত্রয় উচ্চ, আমরা নাগাল পাইব না। অতএব এই প্রাঙ্গণেই আসন পরিগ্রহ করিলাম, তুমি ব্যস্ত হইও না।'

জাবালি তখন সরযুতীরে জম্বুবৃক্ষতলে আসীন হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন—এই অম্লজলাবলম্বী মানবশরীরে পঞ্চভূতে কিংবিধ সংস্থান হইলে সুবুদ্ধির উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই বা মূর্খতা জন্মে। অপরন্তু, লাঠ্যৌষধিদ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূত প্রমম্পিত করিলে মূর্খতা অপগত হইয়া যে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা স্থায়ী কিনা। এই জটিল তত্ত্বের মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া অবশেষে জাবালি উঠিয়া পড়িলেন এবং আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

জাবালি বালখিল্যগণকে কহিলেন—'অহো, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে খর্বট খালিত প্রভৃতি মহামুনিগণ আমার এই আশ্রমে সমাগত। হে মুনিবৃন্দ, তোমাদের তো সর্বাঙ্গীণ কুশল? যাগযজ্ঞাদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে তো? ঋষিভুক্ রাক্ষসগণ তোমাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করে না তো? সেই কপিলা গাভীটির বাচ্চা হইয়াছে? রাজগুরু বশিষ্ঠ তোমাদের জন্য যথেষ্ট গব্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন তো?'

মহামুনি খর্বট দর্দুরধ্বনিবৎ গম্ভীর-নাদে কহিলেন—'জাবালে, ক্ষান্ত হও। আপ্যায়নের জন্য আমরা আসি নাই। তুমি পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া আছ, আমরা তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। প্রায়োপবেশন চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা তোমার কিছু হইবে না। আমরা অথর্বোক্ত পদ্ধতিতে তোমাকে অগ্নিশুদ্ধ করিব, তাহাতে তুমি অন্তে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। তুষানল প্রস্তুত, তুমি আমাদের অনুগমন কর।'

জাবালি বলিলেন—'হে খর্বট, তোমাদিগকে কে পাঠাইয়াছেন? রাজপ্রতিভূ ভরত না রাজগুরু বশিষ্ঠ? আমার উদ্ধার সাধনের জন্য তোমরাই বা অত ব্যগ্র কেন? আমি অতি নিরীহ বানপ্রস্থাবলম্বী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, কখনও কাহারও অনিষ্ট করি নাই, তোমাদের প্রাপ্য দক্ষিণারও অংশভাক্ হই নাই। তোমরা আমার পরকালের জন্য ব্যস্ত না হইয়া নিজ নিজ ইহকালের জন্য যত্নবান হও।'

তখন অতি কোপনস্বভাব খল্লাট ঋষি অশ্বধ্বনিবৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—'রে তপোধন, তুমি অতি দুরাচার ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক। তোমার বাসহেতু এই অযোধ্যাপুরী অশুচি হইয়াছে, ধর্মাত্মা বিপ্রগণ অতিষ্ঠ হইয়াছেন। আমরা ভরত বা বশিষ্ঠ কাহারও আজ্ঞাবাহী নহি। ব্রাহ্মণ্যের রক্ষাহেতু আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি। তুমি আর বাক্যব্যয় করিও না, প্রস্তুত হও।'

জাবালি বলিলেন—'হে বালখিল্যগণ, আমি স্বেচ্ছায় যাইব না। তোমরা আমাকে ব্রহ্মতেজবলে উত্তোলন কর।'

জাবালির শালপ্রাংশু বিরাট বপু দেখিয়া বালখিল্যগণ কিয়ৎক্ষণ নিম্নকণ্ঠে জল্পনা করিলেন। অবশেষে গলিতদন্ত খালিত মুনি স্খলিতস্বরে কহিলেন—'হে জাবালে, যদি তুমি অগ্নিপ্রবেশ করিতে নিতান্তই ভীত হইয়া থাকো তবে প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ক্রয়স্বরূপ তিন শূর্প তিল ও শতনিষ্ক কাঞ্চন প্রদান কর। আমরা যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে পাপমুক্ত করিব।'

জাবালি কহিলেন—'আমার এক কপর্দকও নাই, থাকিলেও দিতাম না।'

তখন খর্বট খল্লাট খালিতাদি মুনিগণ সমস্বরে কহিলেন—‘রে নরাধম, তবে আমরা অভিসম্পাত করিতেছি শ্রবণ কর। সাক্ষী চন্দ্র সূর্য তারা, সাক্ষী দেবগণ পিতৃগণ দিক্‌পালগণ বষটকারগণ –’

জাবালি বলিলেন—‘শৌণ্ডিকের সাক্ষী মত্তপ, তস্করের সাক্ষী গ্রন্থিচ্ছেদক। হে বালখিল্যগণ, বৃথা দেবতাগণকে আহ্বান করিতেছ, তাহারা আসিবেন না। বরং তোমরা জুজুগণ ও কর্ণকর্তকগণকে স্মরণ কর।’

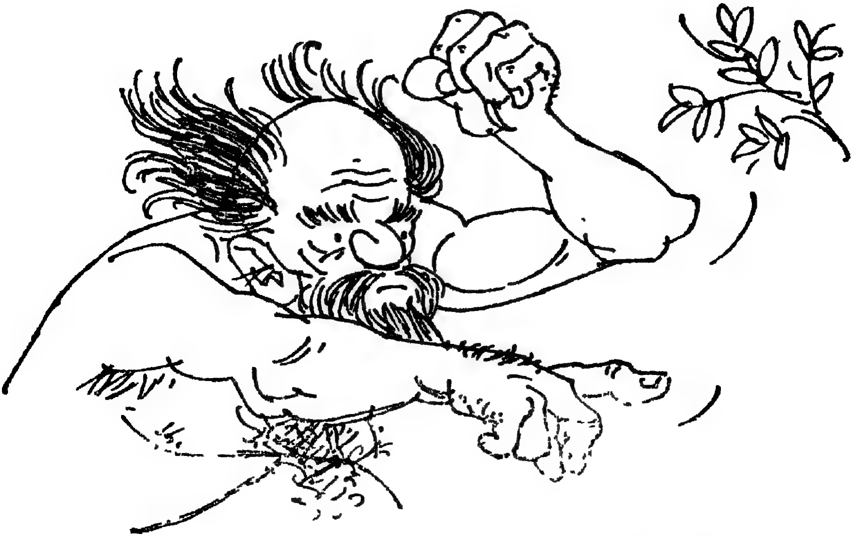

হিন্দ্রলিনী বলিলেন----‘হে আর্যপুত্র, তুমি কেন এই অল্পায়ু অপোগণ্ড, অকালপক্ক কুষ্মাণ্ডগণের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছ, উহাদিগকে খেদাইয়া দাও।’

বালখিল্যগণ কহিলেন –‘রে রে রে রে—’

জাবালি তখন তাঁহার বিশাল ভুজদ্বয়ে বালখিল্যগণকে একে একে তুলিয়া ধরিয়া প্রাঙ্গণবেষ্টনীর পরপারে ঝুপ ঝুপ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।

বাল্যখিলাগণ প্রস্থান করিলে জাবালি বলিলেন –‘প্রিয়ে আমাদের আর অযোধ্যায় বাস করা চলিবে না, কখন কোন্ দিক হইতে উৎপাত আসিবে তার স্থিরতা নাই। অতএব কল্য প্রত্যূষেই আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে কোনোও নিরুপদ্রব স্থানে যাত্রা করিব।’

পরদিন উষাকালে সস্ত্রীক জাবালি অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন। কয়েকজন অনুগত নিষাদ তাহাদের সামান্য গৃহোপকরণ বহন করিয়া অগ্রে অগ্রে পথপ্রদর্শন-

পুর্বক চলিল। মাসাধিক কাল তাহারা নানা জনপদ গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিমালয়ের সানুদেশে শতদ্রুতীরে এক রমণীয় উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। জাবালি তথায় পর্ণকুটির রচনা করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পর্বতবাসী কিরাতগণ তাঁহার বিশাল দেহ, নিবিড় শ্মশ্রু ও মধুর সদয় ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং নানাপ্রকার উপঢৌকন দ্বারা সংবর্ধনা করিল। জাবালি তথায় বিবিধ দুরূহ তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধানে নিবিষ্ট রহিলেন এবং অবসরকালে শতদ্রু নদীতে মৎস্য ধরিয়া চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।

দেবতাগণের খ্যাতি আছে—তাহারা অন্তর্যামী, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদিগকেও সাধারণ মানুষের ন্যায় গুজবের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয় এবং তাহার ফলে জগতে অনেক অবিচার ঘটিয়া থাকে। অচিরে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট সমাচার আসিল যে মহাতেজা জাবালি মুনি শতদ্রু তীরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন,--তাহার অভিসন্ধি কি তাহা এখনও সম্যক অবধারিত হয় নাই, তবে সম্ভবতঃ তিনি ইন্দ্রত্ব বিষ্ণুত্ব কিংবা ঐরূপ কোনোও একটা পরমপদ আয়ত্ত না করিয়া ছাড়িবেন না। দেবরাজ চিন্তিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন—'উর্বশীকে ডাকো।'

মাতলি আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—'হে দেবেন্দ্র, উর্বশী আর মর্তলোকে অবতীর্ণ হইতে চাহে না –'

ইন্দ্র কহিলেন –'হুঁ, তার ভারী তেজ হইয়াছে।'

দেবর্ষি নারদ কহিলেন -'মর্তের কবিগণই স্তুতি করিয়া তাহার মস্তকটি ভক্ষণ করিয়াছে। এখন কিছুকাল তাকে বিরাম দাও, দিনকতক অমরাবতীতে আবদ্ধ থাকিলে আপনিই সে মর্তলোকে যাইবার জন্য আবদার ধরিবে। জাবালির জন্য অন্য কোনোও অপ্সরা পাঠাও।'

মাতলি বলিলেন—'মেনকা তার কন্যাকে দেখিতে গিয়াছে। তিলোত্তমাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এখনও তিন মাস বাহির হইতে দিবেন না। অলম্বুষার পা মচকাইয়াছে, নাচিতে পারিবে না। অষ্টাবক্র মুনি দেবগণের উপর বিমুখ হইয়া বাঁকিয়া বসিয়াছেন, রম্ভা তাহাকে সিধা করিতে গিয়াছে। নাগদত্তা, হেমা, সোমা প্রভৃতি তিন শত অপ্সরাকে লঙ্কেশ্বর রাবণ অপহরণ করিয়াছেন। বাকি আছে কেবল মিশ্রকেশী ও ঘৃতাচী।'

ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন —'আমাকে না জানাইয়া কেন অপ্সরাগণকে যত্রতত্র পাঠানো হয়? মিশ্রকেশী ঘৃতাচীর বয়স হইয়াছে, তাদের দ্বারা কিছু হইবে না।'

নারদ বলিলেন —'হে ইন্দ্র, সে জন্য চিন্তা করিও না। জাবালিও যুবা নহেন। একটু গৃহিণী-বাহিনী-জাতীয়া অপ্সরাই তাঁকে ভালরকম বশ করিতে পারিবে।'

ইন্দ্র বলিলেন —'মিশ্রকেশীর চুল পাকিয়াছে, সে থাক। ঘৃতাচীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর। তাকে একপ্রস্থ সূক্ষ্ম চীনাংশুক ও যথোপযুক্ত অলংকারাদি দাও। বায়ু, তুমি মৃদুমন্দ বহিবে। শশধর, তুমি মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া উজ্জ্বল হইয়া লও। কন্দর্প, তুমি সেই অভ্রের পোশাকটা পরিয়া যাইবে। আবার যাতে ভস্ম না হও। বসন্ত, তুমি সঙ্গে একশত কোকিল লইবে।'

নারদ বলিলেন—'আর এক শত বন্য কুক্কুট। ঋষি বড়োই মাংসাশী।'

ইন্দ্র বলিলেন —'আচ্ছা, তাহাও লইবে। আর দশ কুম্ভ ঘৃত, দশ স্থালী দধি, দশ দ্রোণী গুড় এবং অন্যান্য ভোজ্য সম্ভার। যেমন করিয়া হোক জাবালির ধ্যান ভঙ্গ করা চাই।'

সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে ঘৃতাচী জাবালিবিজয়ে যাত্রা করিলেন।

জাবালির তপোবনে তখন ঘোর বর্ষা। মেঘে পর্বতে একাকার হইয়া দিগন্তে নিবিড় প্রাচীর রচনা করিয়াছে। শতদ্রুর গৈরিক বর্ণ জলে পালে পালে মৎস্য বিচরণ করিতেছে। বনে ভেকবংশের চতুর্প্রহরব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ঘৃতাচী অনুচরবর্গসহ জাবালির আশ্রমে পৌঁছিলেন। আক্রমণের উদ্‌যোগ করিতে তাহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, কারণ বহুবার এইরূপ অভিযান করিয়া তাহারা পরিপক্ক হইয়াছেন। নিমেষের মধ্যে মেঘ দূরীভূত হইল, মলয়ানিল বহিতে লাগিল, শতদ্রুর স্রোত মন্দীভূত হইল, নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিল, পাদপসকল পুষ্পস্তবকে ভূষিত হইল, অলিকুল গুঞ্জরিতে লাগিল, ভেকগণ নীরব হইয়া পল্বলে লুকাইল।

জাবালি শতদ্রুতীরে ছিপহস্তে নিবিষ্ট মনে মাছ ধরিতে ছিলেন। আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তিনি বিচলিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। সহসা ঋতুরাজ বসন্তের খোঁচা খাইয়া নিদ্রাতুর কোকিলকুল আকুল চিৎকার করিয়া উঠিল। জাবালি চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন এক অপূর্ব

রূপলাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা কটিতটে বামকর, চিবুকে দক্ষিণকর নিবদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতেছে।

ধীমান জাবালি সমস্ত ব্যাপারটি চট করিয়া হৃদয়ংগম করিলেন। ঈষৎ হাস্যে বলিলেন—'অয়ি বরাঙ্গনে, তুমি কে, কি নিমিত্তই বা তুমি এই দুর্গম জনশূন্য উপত্যকায় আসিয়াছ? তুমি নৃত্য সংবরণ কর। এই সৈকতভূমি অতিশয় পিচ্ছিল ও উপলবিষম। যদি আছাড় খাও তবে তোমার ঐ কোমল অস্থি আস্তো থাকিবে না।'

অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ স্ফুরিত করিয়া ঘৃতাচী কহিলেন—'হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি ঘৃতাচী স্বর্গাঙ্গনা, তোমাকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। এই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার তোমারই, এই ঘৃতকুম্ভ দধিস্থালী গুড়দ্রোণী—সকলই তোমার। আমিও তোমার। আমার যা কিছু আছে—নাঃ থাক।'—এই পর্যন্ত বলিয়া লজ্জাবতী ঘৃতাচী ঘাড় নিচু করিলেন।

জাবালি বলিলেন—'অয়ি কল্যাণি, আমি দীনহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। গৃহিণীও বর্তমানা। তোমার তুষ্টি বিধান করা আমার সাধ্যের অতীত। অতএব তুমি ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া যাও, অথবা যদি তোমার নিতান্তই মুনিঋষির প্রতি ঝোঁক হইয়া থাকে তবে অযোধ্যায় গমন কর। তথায় খর্বট খল্লাট খালিতাদি মুনিগণ আছেন, তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এবং যতগুলিকে ইচ্ছা তুমি হেলায় তর্জনীহেলনে নাচাইতে পারিবে। আর যদি তোমার অধিকতর উচ্চাভিলাষ থাকে তবে ভার্গব দুর্বাসা কৌশিক প্রভৃতি অনলসংকাশ উগ্রতেজা মহর্ষিগণকে জব্দ করিয়া যশস্বিনী হও, আমাকে ক্ষমা দাও।'

ঘৃতাচী কহিলেন—'হে জাবালে, তুমি নিতান্তই নীরস। তোমার ঐ বিপুল দেহ কি বিধাতা শুষ্ক কাষ্ঠে নির্মাণ করিয়াছেন? তুমি দীনহীন তাতে ক্ষতি কি, আমি তোমাকে কুবেরের ঐশ্বর্য আনিয়া দিব। তোমার ব্রাহ্মণীকে বারানসী প্রেরণ কর। তিনি নিশ্চয়ই লোলাঙ্গী বিগতযৌবনা। আর আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর—চিরযৌবনা, নিটোলা, নিখুঁতা। উর্বশী মেনকা পর্যন্ত আমাকে দেখিয়া ঈর্ষায় ছটফট করে।'

জাবালি সহাস্যে কহিলেন—'হে সুন্দরি, কিছু মনে করিও না। তুমিও নিতান্ত খুকীটি নহ, তোমার মুখের লোধ্ররেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্তপংক্তিতে ও কিসের ফাঁক?'

ঘৃতাচী সরোষে কহিলেন—'হে মূর্খ, তুমি নিশ্চয়ই রাত্র্যন্ধ, তাই এমন কথা বলিতেছ। পথশ্রমে ক্লান্তিহেতু আমার লাবণ্য এখন সম্যক স্ফূর্তি পাইতেছে না। আগে সকাল হোক, আমি দুধের সর মাখিয়া চান করি, তখন দেখিও, মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবে।' - এই বলিয়া ঘৃতাচী আবার নৃত্য শুরু করিলেন।

অদূরবর্তী দেবদারুবৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া জাবালি পত্নী সমস্ত দেখিতেছিলেন। ঘৃতাচীর দ্বিতীয়বার নৃত্যারম্ভে তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, সম্মার্জনী হস্তে ছুটিয়া আসিয়া ঘৃতাচীর পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।

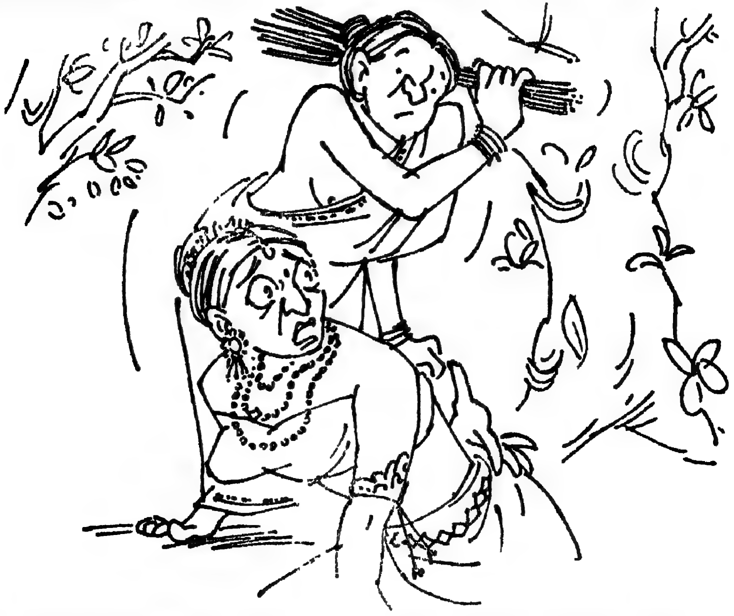

তখন কন্দর্প বসন্ত শশধর মলয়ানিল সকলেই মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া বেগে পলায়ন করিলেন। আকাশ আবার জলদজালে আচ্ছন্ন হইল, দিঙমণ্ডল তিমিরাবৃত হইল, কোকিলকুল ঢুলিতে লাগিল, মধুকরনিকর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিল, শতদ্রু স্ফীত হইল, ভেককুল মহাউল্লাসে বিকট কোলাহল করিয়া উঠিল।

জাবালি পত্নীকে কহিলেন—'প্রিয়ে, স্থিরা ভব। ইনি স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী, ইন্দ্রের আদেশে এখানে আসিয়াছেন,—ইঁহার অপরাধ নাই।'

হিন্দ্রলিনী কহিলেন—'হলা দগ্ধানলে নির্লজ্জে ঘেঁচী, তোর আস্পর্ধা কম নয় যে আমার স্বামীকে বোকা পাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছিস! আর, ভো অজ্জউত্ত, তোমারই বা কি প্রকার আক্কেল যে এই উৎকপালী বিড়ালাক্ষী মায়াবিনীর

সহিত বিজনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলে !’

জাবালি তখন সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিয়া অতি কষ্টে পত্নীকে প্রসন্না করিলেন এবং রোরুদ্যমানা ঘৃতাচীকে বলিলেন—‘বৎসে তুমি শান্ত হও। হিঙ্গুলিনী তোমার পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ ইঙ্গুদীতৈল মর্দন করিয়া দিলেই ব্যথায় উপশম হইবে, তুমি আজ রাত্রে আমার কুটিরেই বিশ্রাম কর। কল্য অমরাবতীতে ফিরিয়া গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ এবং ঘৃতদধিগুড়াদির জন্য বহু ধন্যবাদ জানাইও।’

ঘৃতাচী কহিলেন—‘তিনি আমার মুখদর্শন করিবেন না। হা, এমন দুর্দশা আমার কখনও হয় নাই।’

জাবালি বলিলেন—‘তোমার কোনোও ভয় নাই। তুমি দেবেন্দ্রকে জানাইও যে ইন্দ্রত্বের উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতে থাকুন।’

ঘৃতাচীর পরাভব শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে কহিলেন—‘হে দেবর্ষে, এখন কি করা যায়? জাবালি ইন্দ্রত্ব চাহেন না জানিয়াও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। জনরব শুনিতেছি যে ঐ দুর্দান্ত ঋষি সমস্ত দেবতাকেই উড়াইয়া দিতে চায়।’

নারদ কহিলেন—‘পুরন্দর, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি।’

নৈমিষারণ্যে সনকাদি ঋষিগণের সকাশে দেবর্ষি নারদ আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—‘হে মুনিগণ শাস্ত্রে উক্ত আছে, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ, পাপ নাস্তি। কিন্তু এই ত্রেতাযুগে পুণ্য ত্রিপাদ মাত্র এবং একপাদ পাপও দেখা গিয়াছে। ইহার হেতু কি তোমরা তা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?’

মুনিগণ বলিলেন—‘আশ্চর্য, ইহা আমরা কেহই ভাবিয়া দেখি নাই।’

নারদ বলিলেন -‘তবে তোমাদের যাগযজ্ঞ জপতপ সমস্তই বৃথা।’ ইহা কহিয়া তিনি তাঁহার কাষ্ঠ বাহনে আরোহণপূর্বক ব্রহ্মার নিকট অপর এক ষড়যন্ত্র করিতে প্রস্থান করিলেন।

মুনিগণ নারদীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলীপ্রবাদি সপ্ত দ্বীপ হইতে বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্রগণ

নৈমিষারণ্যে সমবেত হইলেন। মহর্ষি জাবালিও আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। অনন্তর সকলে আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'ভো পণ্ডিতবর্গ, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ ছিল, এখন তাহা ত্রিপাদ হইয়াছে। কেন এমন হইল এবং ইহার প্রতিকার কি, যদি তোমরা কেহ অবগত থাক তবে প্রকাশ করিয়া বলো।'

তখন জ্বলন্ত পাবকতুল্য তেজস্বী জামদগ্ন্য মুনি কহিলেন—'হে প্রজাপতে, এই পাপাত্মা জাবালিই সমস্ত অনিষ্টের মূল। উহার সংস্পর্শে বসুন্ধরা ভারগ্রস্তা হইয়াছেন।'

সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলেন—'ঠিক, ঠিক, আমরা তাহা অনেকদিন হইতেই জানি।'

জামদগ্ন্য কহিলেন —'এই জাবালি ভ্রষ্টাচার উন্মার্গগামী নাস্তিক। ইহার শাস্ত্র নাই, মার্গ নাই, রামচন্দ্রকে এই পাষণ্ডই স্বধর্মচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বালখিল্যগণকে এই দুরাত্মাই নির্যাতিত করিয়াছে। দেবরাজ পুরন্দরকেও এই পাপিষ্ঠ হাস্যাস্পদ করিয়াছে। ইহাকে বধ না করিলে পুণ্যের নষ্টপাদ উদ্ধার হইবে না।'

পণ্ডিতগণ কহিলেন —'আমরাও ঠিক তাহাই ভাবিতেছিলাম।'

দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'হে জাবালি, সত্য করিয়া কহ তুমি নাস্তিক কি না। তোমার মার্গ কি, শাস্ত্রই বা কি।'

জাবালি বলিলেন—'হে সুধীবৃন্দ, আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি, আমার তুচ্ছ অভাব অভিযোগ জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহারই বলে কোনোও প্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্রতত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষের পরিবর্তনসহ।'

দক্ষ কহিলেন —'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিলাম না।'

জাবালি বলিলেন—'হে ছাগমুণ্ড দক্ষ, তুমি বুঝিবার বৃথা চেষ্টা করিও না। আমি এখন চলিলাম, বিপ্রগণ তোমাদের জয় হউক।'

তখন সভায় ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল এবং ধর্মপ্রাণ বিপ্রগণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কয়েকজন জাবালিকে ধরিয়া ফেলিলেন। জামদগ্ন্য তাহার তীক্ষ্ণ কুঠার উদ্যত করিয়া কহিলেন—'আমি একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষ করিয়াছি, এইবার এই নাস্তিককে সাবাড় করিব।'

স্থিরপ্রাজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—'হাঁ হাঁ কর কি, ব্রাহ্মণের দেহে অস্ত্রাঘাত ! ছি ছি মনু কি মনে করিবেন। বরং উহাকে হলাহল প্রয়োগে বধ কর।'

দেবর্ষি নারদ এতক্ষণ অলক্ষ্যে বসিয়াছিলেন। এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া কহিলেন—'আমার কাছে বিশুদ্ধ চৈনিক হলাহল আছে। তাহা সর্ষপপ্রমাণ সেবনে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, দুই সর্ষপে বুদ্ধিভ্রংশ, চতুর্মাত্রায় নরকভোগ এবং অষ্টমমাত্রায় মোক্ষলাভ হয়। জাবালিকে চতুর্মাত্রা সেবন করাও ; সাবধান, যেন অধিক না হয়।'

মহাচীন হইতে আনীত কৃষ্ণবর্ণ হলাহল জলে গুলিয়া জাবালিকে জোর করিয়া খাওয়ানো হইল। তাহার পর তাঁহাকে গভীর অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিলোকদর্শী পণ্ডিতগণ কহিলেন—'পাষণ্ড এতক্ষণে কুম্ভীপাকে পৌঁছিয়াছে।'

চৈনিক হলাহল জাবালির মস্তকে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। জাবালি যজ্ঞের নিমন্ত্রণে বহুবার সোমরস পান করিয়াছেন ; প্রথম যৌবনে বয়স্য ক্ষত্রিয়কুমারগণের পাল্লায় পড়িয়া গৌড়ী মাধ্বী পৈষ্টী প্রভৃতি আসবও চাখিয়া দেখিয়াছেন, ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে একবার ভৃগু মামার সঙ্গে চুরি করিয়া ফেনিল তালরসও খাইয়াছিলেন,—কিন্তু এমন প্রচণ্ড নেশা পূর্বে তাহার কখনও হয় নাই। জাবালির সকল অঙ্গ নিশ্চল হইয়া আসিল, তালু শুষ্ক হইল, চক্ষু ঊর্ধ্বে উঠিল, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল।

সহসা জাবালি অনুভব করিলেন—তিনি রক্তচন্দনে চর্চিত হইয়া রক্তমাল্যধারণপূর্বক গর্দভযোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে নীয়মান হইতেছেন, রক্তবসনা পিঙ্গলবর্ণা কামিনী তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং বিকৃতবদনা রাক্ষসী তাঁহার রথ আকর্ষণ করিতেছে। ক্রমে বৈতরণী পার হইয়া তিনি যমপুরীর দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় যমকিংকরগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ধর্মরাজের সকাশে লইয়া গেল।

যম কহিলেন—'জাবালে, স্বাগতোসি, আমি বহুদিন যাবৎ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তোমার পারলৌকিক ব্যবস্থা আমি যথোচিত করিয়া রাখিয়াছি, এখন আমার অনুগমন কর। দূরে ঐ যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গবাক্ষহীন অগ্ন্যুদগারী সৌধমালা দেখিতেছ, উহাই রৌরব ; ইতরপ্রকৃতি পাপিগণ তথায় বাস করে। আর সম্মুখে এই যে গগনচুম্বী তাম্রচূড় রক্তবর্ণ অলিন্দ পরিবেষ্টিত আয়তন, ইহাই কুম্ভীপাক ; সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এখানে অবস্থান করেন।

তোমার স্থান এখানেই নির্দিষ্ট হইয়াছে, ভিতরে চল।’

অনন্তর ধর্মরাজ যম জাবালিকে কুম্ভীপাকের গর্ভমণ্ডপে লইয়া গেলেন। এই মণ্ডপ বহুযোজনবিস্তৃত, উচ্চছাদ, বাষ্পসমাকুল, গম্ভীর আরাবে বিধূনিত। উভয়পার্শ্বে জ্বলন্ত চুল্লীর উপর শ্রেণীবদ্ধ অতিকায় কুম্ভসকল সজ্জিত আছে। তাহা হইতে নিরন্তর শ্বেতবর্ণ বাষ্প ও আর্তনাদ উত্থিত হইতেছে। নীলবর্ণ যমকিংকরগণ ইন্ধননিক্ষেপের জন্য মধ্যে মধ্যে চুল্লীদ্বার খুলিতেছে, জ্বলন্ত অনলচ্ছটায় তাহাদের মুখ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছে।

কৃতান্ত কহিলেন—‘হে মহর্ষে, এই যে রজতনির্মিত কিংকিনীজালমণ্ডিত সুবৃহৎ কুম্ভ দেখিতেছ, ইহাতে নহুষ, যযাতি, দুষ্মন্ত প্রভৃতি মহাযশা মহীপালগণ পরিপক্ক হইতেছেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই সংশোধিত হইয়া গিয়াছেন, কেবল যযাতির কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আর এক প্রহরের মধ্যে সকলেই বিগতপাপ হইয়া অমরাবতীতে গমন করিবেন। ঐ যে বৈদূর্যখচিত হিরণ্ময় কুম্ভ দেখিতেছ, উহার তপ্ত তৈলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকেন। গৌতমের অভিশাপের পরে সহস্রাক্ষ পুরন্দরকে বহুকাল এই কুম্ভ মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিপ্রয়োগে ইহার তলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে রুদ্রাক্ষমালাবেষ্টিত গৈরিকবর্ণ প্রকাণ্ড কুম্ভ দেখিতেছ ইহার অভ্যন্তরে ভার্গব, দুর্বাশা, কৌশিক প্রভৃতি উগ্রতপা মহর্ষিগণ সিদ্ধ হইতেছেন।’

জাবালি কৌতূহলপরবশ হইয়া বলিলেন—‘হে ধর্মরাজ, কুম্ভের ভিতরে কি হইতেছে দয়া করিয়া আমাকে দেখাও।’

ধর্মরাজের আজ্ঞা পাইয়া জনৈক যমকিংকর কুম্ভের আবরণী উন্মুক্ত করিল। যম তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ দারুময় দর্বী নিমজ্জিত করিয়া সন্তর্পণে উত্তোলিত করিলেন, সিক্ত জটাজুট ধূমায়িত কলেবর কয়েকজন ঋষি দর্বীতে সংলগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত আরম্ভ করিলেন—‘রে নারকী যমরাজ, যদি আমাদের কিঞ্চিদপি তপঃপ্রভাব থাকে—’

দর্বী উলটাইয়া কুম্ভের ঢাকনি ঝটিতি বন্ধ করিয়া যম কহিলেন—‘হে জাবালে, ঐ কোপনস্বভাব ঋষিগণের কাঠিন্য দূর হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে, ইহারা আরও অষ্টাহকাল পরিসিদ্ধ হইতে থাকুন।’

এমন সময় কয়েকজন যমদূতের সহিত থর্বট থল্লাট থালিত বিষণ্ণবদনে কুম্ভীপাকের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন।

জাবালি কহিলেন—‘হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানে কেন, ব্রহ্মলোকে কি

স্থানাভাব ঘটিয়াছে?'

খর্বট উত্তর দিলেন—'জাবালে, তুমি বিরক্ত করিও না, আমরা এখানে তদারক করিতে আসিয়াছি।'

যমরাজের ইঙ্গিতে কিংকরগণ বালখিল্যত্রয়কে একত্র বাঁধিয়া উত্তপ্ত পঞ্চগব্যপূর্ণ এক ক্ষুদ্রকায় কুম্ভে নিক্ষেপ করিল। কুম্ভ হইতে তীব্র চিৎকার উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতান্তের বাপান্তকর বাক্যসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। ধর্মরাজ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন—'হে মহর্ষে, এই নরকের অনুষ্ঠান সকল অতিশয় অপ্রীতিকর, কেবল বিপন্না ধরিত্রীর রক্ষা হেতুই আমাকে সম্পন্ন করিতে হয়। যাহা হউক, আমি আর তোমার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিব না, এখন তোমার প্রতি আমার যাহা কর্তব্য তাহাই পালন করিব। দেখো, যে পাপ মনের গোচর, তাহা আমি সহজেই দূর করিতে পারি। কিন্তু যাহা মনের অগোচর, তাহা জন্মজন্মান্তরেও সংক্রমিত হয়, এবং তাহা শোধন করিতে হইলে কুম্ভীপাকে বার বার নিষ্কাশন আবশ্যক। তোমার যাহা কিছু দুষ্কৃত আছে তাহা তুমি জানিয়া শুনিয়াই দৌর্বল্যবশাৎ করিয়া ফেলিয়াছ, কদাপি আত্মপ্রবঞ্চনা কর নাই। সুতরাং আমি তোমাকে সহজেই পাপমুক্ত করিতে পারিব, অধিক যন্ত্রণা দিব না।'

এই বলিয়া কৃতান্ত জাবালিকে সুবৃহৎ লৌহসংদংশে বেষ্টিত করিয়া একটি তপ্ত তৈলপূর্ণ কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ছ্যাঁক করিয়া শব্দ হইল।……

সহস্র বিহগকাকলিতে বনভূমি সহসা ঝংকৃত হইয়া উঠিল। প্রাচীদিক্ নবারুণ-কিরণে আরক্ত হইয়াছে। জাবালি চৈতন্য লাভ করিয়া সাধ্বী হিন্দ্রলিনীর অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্নবদনে মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন।

ব্রহ্মা বলিলেন—'বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।

জাবালি বলিলেন—'হে চতুরানন ঢের হইয়াছে। আর বরে কাজ নাই। আপনি সরিয়া পড়ুন, আর ভেংচাইবেন না।'

ব্রহ্মা তাঁহার ভূর্জপত্ররচিত ছদ্মমুখ মোচন করিয়া কহিলেন—'জাবালে, অভিমান সংবরণ কর। তুমি বর না চাহিলেও আমি ছাড়িব কেন? আমিও প্রার্থী। হে স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন

করিও না, লোকসমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন কর। তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিবে না, অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন্, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাকো।'

জাবালি বলিলেন --'তথাস্তু।'

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ( ১৮৮২— )

# অকিঞ্চনের দায়।

## এক

গ্রামে বারোয়ারী হইবে।

তাহারই সম্বন্ধে অন্য পাণ্ডাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বেলা প্রায় দেড প্রহরের সময় অকিঞ্চন বাহির হইতে বাড়ি ফিরিলেন। স্ত্রী ক্ষান্তমণি রান্নাঘরের ভাতের হাঁড়ির কাছ হইতে উঠিয়া, মুখখানাকে ভাতের হাঁড়িরই মতো করিয়া বলিয়া উঠিল,—'যার রাজ্যিসুদ্ধ দেনা সে যেন চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতেই বসে থাকে। কেননা, পাঁচজনে তাগাদা করতে এসে তাকে পাবে না দেখতে, আর আমায় যে দশটা কথা শুনিয়ে যাবে, সে আমি সইতে পারব না।'

অকিঞ্চন হুঁকার মাথা হইতে কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে কহিল,—'তাগাদা করতে এসে কে তোমায় দশটা কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল, শুনি?'

'গাঁ সুদ্ধ পাওনাদার, ক-জনের নাম করব? আর তাদেরই বা দোষ কি? তারা দিয়ে রেখেছে, আর চাইতে আসবে না? তবে, তোমায় আমি বলে রাখছি, আমার কাছে কেউ যেন এসে মুখ-নাড়া দিয়ে দশ কথা না বলে যায়। নেবার সময় সব নিয়ে রেখেছ, আর এখন দেবার বেলা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে তো হবে না। সকালবেলা বিনে জেলের মা কী মুখ-নাড়াটাই না আমায় দিয়ে গেল।'

বৎসর দুই আগেও অকিঞ্চন প্রত্যহ স্নানান্তে গীতা পাঠ করিত, মিথ্যা কথা কহিত না এবং ফেলী নাপতিনীর গচ্ছিত গহনা ও টাকা, তাহার গয়া-কাশী হইতে ফিরিয়া আসার পর কড়ায়-গণ্ডায় তাহাকে বুঝাইয়া ফেরত দিয়াছিল।

অকিঞ্চন কি একটা বলিতে যাইতেছিল। সহসা মুক্ত সদর দরজার বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় তৎক্ষণাৎ সেইখানেই সে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। কাঁধের গামছাখানি মাথায় দুই তিন পাক জড়াইল এবং সাজা তামাক ও টীকা মাটিতে ঢালিয়া ফেলিয়া হুঁকা উল্টাইয়া তাহারই খানিকটা জল তাহাতে ঢালিয়া একটা প্রলেপের মতো করিয়া কপালে ও ঘাড়ে বেশ করিয়া মাখাইয়া, শুইয়া শুইয়া গোঙাইতে লাগিল।

মুহূর্ত পরেই সদর দরজায় লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল এবং অকিঞ্চনেরই ঠাকুর-মশাই, ও-পাড়ার রাজু ঘোষাল ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ ঘোষাল মশাই চোখে একটু কম দেখেন। লাঠিগাছটি পৈঠার পাশে ঠেসাইয়া রাখিয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিতেই, ঘরের ভিতর হইতে ক্ষান্তমণি একখানা কম্বলের আসন হাতে করিয়া বাহিরে আসিল এবং সেখানি সেইখানে পাতিয়া দিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ঢিপ কবিয়া প্রণাম করিল। অকিঞ্চন কহিল,—'ঠাকুর মশাই, সরে এসে পা-টা একটু এগিয়ে দিন, আমার আর মাথা তোলবার ক্ষমতা নেই।'

ঘোষাল মশাই তাহার কাছে আগাইয়া আসিলেন এবং ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাহার মাথার দিকে দেখিয়া কহিলেন, 'কি হয়েছে বাবা, পডে টডে গেছিস নাকি ?'

'পড়ে যাইনি ঠাকুরমশাই, লাঠির চোট। আপনার আশীর্বাদে যে ফিরে এসেছি, এই যথেষ্ট।'

সপ্তাহ খানেক আগে অকিঞ্চন ঘোষাল-মশাইয়ের বাড়ি গিয়া কথায় কথায় তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, সে দুই একদিনের মধ্যেই কোনো একটা বিশেষ দরকাবে একবার কলকাতায় যাইবে। ঘোষালমশাই ইহা শুনিয়াই তাঁহার দুই নাতনীর জন্য দুইখানি ভালো দেখিয়া আল্‌পাকার ছাপা শাড়ি আনিয়া দিবার জন্য, শিষ্য অকিঞ্চনের হাতে তখনি দশটি টাকা গছাইয়াছিলেন। কয়দিনের পর আজ তাহারই খোঁজ লইতে বৃদ্ধ প্রায় অর্ধ-ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গ্রামের পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে শিষ্যের কাছে আসিয়াছেন।

অতঃপর লাঠির চোটের কাহিনী বলিতে গিয়া অকিঞ্চন কহিল, –'আয়ু ছিল, তাই ফিরে এসেছি, নইলে ঠিক সন্ধ্যেটি সবে হয়েছে, আপনার টাকা দশটা পকেটে নিয়ে কাপড দুখানা কেনবার জন্য বেরুলুম। আমাদের রামবাগানের গলির ভেতরটায় তখনও গ্যাস জ্বালা হয়নি, খুবই অন্ধকার। গলি থেকে বডো রাস্তায় পড়ব, এমন সময় পেছন থেকে মাথার উপর এক লাঠি। তখুনি ঘুরে পডলুম। কিন্তু টাকা দশটা তবুও ছাড়িনি. পকেটসুদ্ধ প্রাণপণে মুঠো কবে ধরেছিলুম। তাবপর হাতের উপর আর এক লাঠি। তারপর—ব্যস্!'

'বলিস্ কি রে ?'

'সেইখানেই শুয়ে পড়ে ভাবলুম যে, ঠাকুরমশাইয়ের টাকা ; যেমন করে হোক কোনো সময়ে তাঁকে এ ফিরিয়ে দিতেই হবে, নইলে মহাপাতকী হতে হবে।'

'সে টাকা আর তোকে দিতে হবে না। ধরতে গেলে আমারই জন্য এতবড়ো

এই বিপদটা তোর ঘটলো। সে টাকা আবার আমি তোর কাছ থেকে গচ্ছা নেব! হাঁ বাবা মাথা ফেটে রক্ত-টক্ত বেরোয়নি তো?'

'বোধ হয়, তাও বেরিয়েছিল, অন্ধকারে আর অতটা ঠাওর করতে পারিনি। এখন আশীর্বাদ করুন, শিগগির যেন ভালো হয়ে উঠি'—বলিয়া আর একবার অকিঞ্চন তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

তারপর উভয়ে আরও দুই চারিটি কথা হইল। ঠাকুরমশাই তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন, ভাবনা করিতে নিষেধ করিলেন এবং টাকা দশটি যে তিনি কিছুতেই তাহার কাছ হইতে লইবেন না, বারবার সে কথা জানাইলেন এবং তৎপরে লাঠিগাছটি তুলিয়া লইয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে প্রাঙ্গণ পার হইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ক্ষান্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল,—'গুরুর কড়ি ফাঁকি দিয়ে খেলে, পাপের আর সীমে পরিসীমে নেই। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, ঘর থেকে ছুটে এসে বলি যে, ঠাকুরমশাই, সব মিছে কথা। উঃ! কি হলে গো তুমি?'

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া অকিঞ্চন বলিল,—'এক ঘটি জল নিয়ে এসো আগে, মুখটা ভালো করে ধুয়ে ফেলি। পাপের যে সীমে পরিসীমে নেই, তা একবার নয়, লাখোবার সে কথা সত্যি। দুর্ভোগ কি কম! তামাক আর হুঁকোর জলের পচা গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসবার যোগাড় হচ্ছে!'

বেশ করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিয়া অকিঞ্চন পুনরায় কলিকা লইয়া তামাক সাজিল এবং হুঁকাটি লইয়া সদরের দরজার বাহিরে আসিয়া বসিল।

কাপড়ের দোকানের শরৎ নন্দী স্নান করিয়া ফিরিতেছিল, কহিল,—'পালের পো, গামছার দরুন ক-গণ্ডা পয়সা অনেকদিন থেকে বাকি পড়ে রয়েছে, ওটা দিয়ে দিলেই ভালো হয়।'

অকিঞ্চন হুঁকায় একটা টান দিয়া কহিল,—'খুচরো বলেই আর মনে থাকে না। ওর জন্যে ভয় বা তাগাদার কোনো দরকার নেই। পাঁচ আনা বুঝি?'

'পাঁচ আনা কি হে? দুখানা চার হাতি গামছা—সাড়ে দশ আনা। তা, খুচরোটা আর বেশি দিন ফেলে রেখো না হে, দিয়ে দিও। বাঁড়ুজ্যের কাছে তোমার বড়ো দেনার কি হল? শুনলুম, সুদ নাকি আসল ছাপিয়ে উঠেছে?'

অকিঞ্চন নীরব থাকিয়া তামাক টানিয়া যাইতে লাগিল। নন্দী চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে কহিল,—'যতই হোক; সুদে আসলে শ-চারেক হয়েছে। চার-শ টাকা দেনা আবার দেনা? কলকাতা গিয়ে চার মাস থাকতে পারলেই

শোধ করে দেবো। কিন্তু বেরুতেই পারছি না, সেই হয়েছে মুশ্‌কিল।'

সদর দরজার কপাট বন্ধ করিয়া অকিঞ্চন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই দেখিল, স্বয়ং মহাজন কালী বাঁড়ুজ্যে মহাশয় একহাতে একটি লাউ ঝুলাইয়া খিড়কি দিয়া বাটী ঢুকিতেছেন। অকিঞ্চনকে দেখিয়া কহিলেন—'কি রে বাপু, বলে বলে তো হার মানলুম। দু-শ টাকার তো আডাইশ টাকা সুদই হয়ে গেল। নালিশটা ঠুকে দিলে হাকিমই বলবে কি, আমিই বা বলব কি? আর তুই দিবিই বা কোত্থেকে! তাই তো বলি যে অনর্থক সুদ না বাডিয়ে, জমিটা না হয় রেজেস্ট্রী করেই দিয়ে দে, বিশ-পঁচিশ টাকা ওর উপর না হয় আরও দিয়ে দেব এখন।'

জোডহাত কপালে ঠেকাইয়া অকিঞ্চন কহিল,—'কি বলছেন, খুড়ো ঠাকুর! পনের বিঘের জমিটা ঐ টাকাতে—'

মুখের কথা চাপা দিয়া বাঁড়ুজ্যে মহাশয় কহিলেন,– 'শুনতে ঐ যা পনের বিঘে, কিন্তু জমিটার ভেতর আছে কি বাপু? একেবারে ফোঁপরা জমি। ধানের তো মুখ দেখবার জো নেই, যা দু-চার আঁটি হয় খড। তাই বা তোর দেখবার আবিশ্যকটা কি আছে। টাকা কিন্তু আমি আর ফেলে রাখতে পারব না,

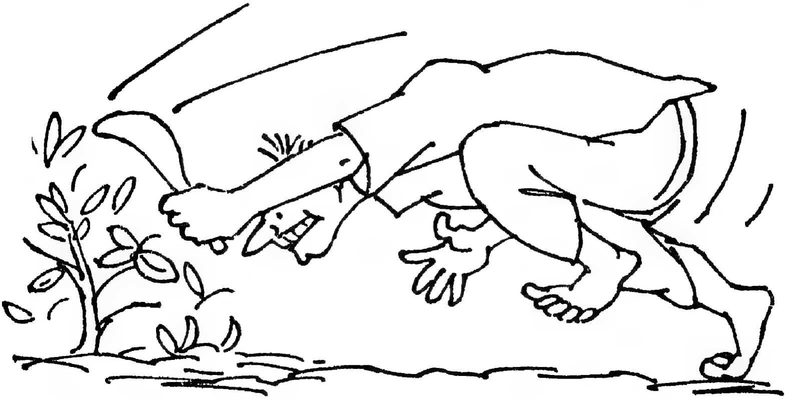

এই আষাঢ় কিস্তির ভেতরেই বেবাক টাকা সব আমায় চুকিয়ে দিয়ে দিতে হবে, নইলে—'

উঠানের একটি চারা আমগাছ হইতে গোটা দুই চারি পাতা ছিঁড়িয়া হইয়া অকিঞ্চন কহিল,—'বোশেখ মাসের এই রোদ্দুরে আর মাথা গরম করবেন না, খুড়ো ঠাকুর, আসুন, তামাক খান। লাঠিটি বাগালেন কোত্থেকে?'

প্রশ্ন বাঁড়ুজ্যে মশাই কানে তুলিলেন না। অকিঞ্চনের পিছন পিছন তিনি দাওয়ার উপর উঠিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া আম পাতার নল পাকাইতে

মনোযোগী হইলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর বাঁড়ুজ্যের এই দেনা লইয়া অকিঞ্চনের সহিত ক্ষান্তর খুব এক চোট ঝগড়া হইয়া গেল এবং অকিঞ্চন রাগের মাথায় প্রদীপ, পিলসুজ, জলের ঘড়া, তেলের ভাঁড়, লক্ষ্মীর হাঁড়ি, হুঁকা, কলিকা, লণ্ঠন, বাল্‌তি আছাড় দিয়া ভাঙিল, আম-কাঠের সিন্দুকের উপর শাবলের ঘা মারিল, দা দিয়া ক্ষান্তকে কাটিতে যাইয়া উঠানের সেই চারা আমগাছটির উপরই দুই চারি কোপ বসাইয়া দিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে যদি যথার্থই ছিমন্ত পালের ছেলে হয় তো কালই সে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইবে এবং দেনার টাকা হাতে না করিয়া আর কখনও বাড়ি ফিরিবে না!

## দুই

কিন্তু কালই তাহার যাওয়া হইল না।

পরের দিন সমস্ত সকালটা অকিঞ্চনকে ঘরে দেখা গেল না। গাঁয়েতে সে ছিল না। বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় পাশের গ্রাম হইতে সে ফিরিতেছিল।

কলিকাতা যাইতে হইলে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক টাকা তাহার দরকার এবং এ টাকা সে গাঁয়ের কাহারও কাছে হাত পাতিলে যে পাইবে না, তাহা সে ভালো রূপেই জানিত, তাই প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই সে মামুদপুর গিয়াছিল। কিন্তু যাহার কাছে সে গিয়াছিল, সেখান হইতেও তাহাকে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে।

নদীর ঘাটে আসিয়া অকিঞ্চন দেখিল যে, দুইটি লোক বটগাছের ছায়ায় বসিয়া জলপান খাইতেছে। তাহাদের সহিত দুই একটি কথায় সে জানিতে পারিল যে, তাহারা ছাগলের পাইকার। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া ছাগল কিনিয়া তাহারা চালান দেয়। অকিঞ্চন তাহাদের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহাদের জলপান খাওয়া শেষ হইলে, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধার দিয়া আসিতে আসিতে একস্থলে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল,—'ঐটি।'

পাইকার দুইটি সেইখানে একটি গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। অকিঞ্চন যাহাকে দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'ঐটি', এক্ষণে কৌশলে সেই খাসী ছাগলটিকে ধরিয়া পাইকারদের কাছে টানিয়া আনিল। তাহারা তাহার মাজা টিপিয়া, সর্বাঙ্গ ভালো করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া, দর-দস্তুর করিয়া শেষে পাঁচ টাকায় তাহার

মূল্য রফা করিল, এবং কোমরের গেঁজে হইতে একজন পাঁচটি টাকা অকিঞ্চনের হাতে গণিয়া দিয়া খাসীটির গলায় একগাছি দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে উভয়ে মামুদপুরের দিকে অগ্রসর হইল।

সে দিন অকিঞ্চন গৃহ হইতে বাহির হইল না। সন্ধ্যার সময় ঘরে বসিয়াই শুনিল, ফকির হাড়ির বড়ো ছাগলটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

পরদিন পাঁচটি টাকা, দুইখানি কাপড় ও একখানি গামছা সম্বল করিয়া অকিঞ্চন আড়াই ক্রোশ দূরবর্তী বর্ধমানের স্টেশনে আসিয়া প্রথম ট্রেন ধরিবার জন্য অতি প্রত্যুষে গৃহ হইতে যাত্রা করিল। ক্ষান্ত জিজ্ঞাসা করিল,—'রাগ করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি ?' প্রত্যুত্তরে অকিঞ্চন সদর্পে ও সলম্ফে দাওয়া হইতে প্রাঙ্গণে পড়িল এবং সশব্দে সদরের দরজা খুলিয়া নিশা-শেষের অল্পান্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

স্টেশনে পৌঁছিয়া গামছা-জড়ানো কাপড়খানির খুঁটে বাধা পাঁচটি টাকা হইতে একটি টাকা খুলিয়া লইয়া অকিঞ্চন কলিকাতার টিকিট কিনিল। পনের আনা এক পয়সা টিকিটের দাম বাদে তিনটি পয়সা যাহা ফেরত পাইল, তাহা জামার পকেটে রাখিয়া বেঞ্চের উপর বসিতেই গাড়ির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

বর্ধমানে দশ মিনিট গাড়ি থামিয়া থাকে।

গাড়ি আসিলে অকিঞ্চন গাড়ির ভিতর আসিয়া বসিয়া চা-ওয়ালাকে ডাকিল এবং কাপের শেষ বিন্দুটুকু পরম তৃপ্তিতে পান করিয়া বিকৃত মুখে চা-ওয়ালাকে পকেটের সেই তিনটি পয়সা দিয়া কহিল, –'এক্কেবারে ঠাণ্ডা আর তেতো, এসা মাফিক চা আর কারুকে মৎ দেও, পুলিসমে দেগা।' অকিঞ্চন কটমট্ করিয়া তাহার দিকে এমন ভাবে চাহিয়া রহিল যে, সে চায়ের বাকি একটি পয়সার কথা আর উত্থাপন করিতেই অবসর পাইল না এবং নীরবে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

চায়ের পর পান এবং বিড়িও আবশ্যক। কিন্তু অকিঞ্চনের পকেটে এই অত্যাবশ্যক ব্যয়ের জন্য খুচরা পয়সা আর ছিল না। দুইটা পয়সার জন্য টাকা ভাঙাইতেও সে পারে না। সুতরাং সম্মুখ দিয়া অসংখ্য পান-বিড়িওয়ালা যাইলেও সে ডাকিল না। গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা এবং গার্ডের বাঁশি বাজিয়া ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, গাড়ি যখন অল্প অল্প চলিতে শুরু করিল, তখন অকিঞ্চন মুখ বাড়াইয়া একজন পান-বিড়িওয়ালাকে ডাকিল। এক পয়সার পান ও এক পয়সার বিড়ি লইয়া, দুই দিককার পকেটে অকিঞ্চনের পয়সা খুঁজিতে

খুঁজিতেই পানওয়ালা ও গাড়ি এক সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে প্ল্যাটফর্মের সীমান্তে আসিয়া পড়িল এবং গাড়ির ভোঁস-ভোঁসের সঙ্গে পানওয়ালার ফোঁস্-ফোঁস্ বৃথাই বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গেল।

সকাল বেলাকার গাড়ি, প্যাসেঞ্জারের তত ভিড় ছিল না। মগরাতে দুই একজন লোক অকিঞ্চনের কামরায় আসিয়া উঠিল এবং গাড়ি ছাড়িবার ঠিক পূর্বক্ষণে একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দরজা ঠেলিয়া এই কামরাটিতে উঠিয়া অকিঞ্চনের বেঞ্চের একধারে আসিয়া বসিল।

স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা, দোহারা, মুখখানি ঢল-ঢল, চোখ দুটি আয়ত, দৃষ্টি উজ্জ্বল। পরনে একখানি দেশী তাঁতের তাবিজ-পাড় শাড়ি, নাকে ওপ্যালের নাকছাবি, কানে কান-ফুল, কপালে উল্কি, মুখে দোক্তা-দেওয়া পান এবং তারই রসে ঠোঁট দুইটি টুকটুকে। মাথায় একটুখানি যে ঘোমটা ছিল, বসিতে গিয়া সেটুকু খসিয়া পড়িয়া ছিল। তাহাই আবার তুলিয়া দিবার সময় অকিঞ্চন দেখিল, তাহার হাতে উল্কিতে লেখা রহিয়াছে—'পটল—হরিনাম সত্য।'

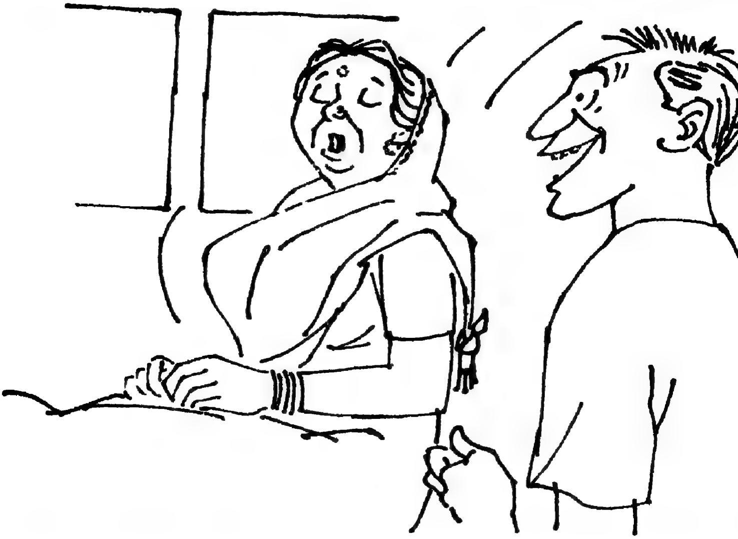

অকিঞ্চন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—'মেয়েদের গাড়িতে উঠলে না কেন বাছা? কোথায় নামবে?'

'হাওড়ায়। আপনি?'

'আমিও হাওড়ায়।'

স্ত্রীলোকটি লজ্জা ও সংকোচশূন্য হইলেও খুবই স্বল্পভাষী। কিন্তু একটি দুইটি

করিয়া অকিঞ্চন অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত অনেক কথারই আলাপ করিল। তাহার ফলে জানিতে পারিল যে পটল শুষ্ক কিংবা লাস্যহীন নহে, তাহা যথেষ্ট সারবান এবং সরস, অর্থাৎ টাকা-কড়ি গহনা-পত্র তাহার যথেষ্ট। আত্মীয়-স্বজন তাহার কেহ নাই, এক দূর সম্পর্কীয় বোন-পোকে আনিয়া কিছুদিন নিজের কাছে রাখিয়াছিল, কিন্তু সে নেশা-টেশা করিতে শেখায় তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

অকিঞ্চন কহিল,--'তোমার কোনো ভয় নেই বাছা, হাওড়ায় নেমে তোমার বাসায় আমি পৌছে দিয়ে না হয় যাবখন। তুমি স্ত্রীলোক, এটুকু উপ্‌গারও যদি না করি—'

গাড়ি লিলুয়াতে আসিয়া থামিল।

কিছু পরেই টিকিট-কালেক্টার বাবু গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া সকলের টিকিট চাহিয়া লইল। যাইবার সময় দেখিল, পায়খানার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া দরজায় তুইটি ধাক্কা দিল। অকিঞ্চন কহিল,—'একটি মেয়েলোক আছে।' আরও কয় সেকেণ্ড দাঁড়াইয়া থাকিয়া টিকিটবাবু অকিঞ্চনের দিকে চাহিয়া বলিল,—'পাশের গাড়িতে আমি থাকলুম, টিকিটখানা বার করে রাখতে বলবেন, আমি আসছি।'

কিন্তু পুনরায় তাহার আসিবার পূর্বেই ঘণ্টা দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল এবং পটল আসিয়া তাহার আসনে বসিল। অকিঞ্চন টিকিটের কথা বলিলে বলিল,— 'টিকিট আমাদের থাকে না, পাস আছে।'

হাওড়ায় নামিয়া অকিঞ্চন জিজ্ঞাসা করিল,—'তা হলে সঙ্গে যেতে হবে কি ?'

একটুখানি হাসিয়া পটল কহিল,—'যেতেও পারেন, না গেলেও কোনো ক্ষতি হবে না।। একখানা গাড়ি করলেই হবেখন। তবে আমার এই গামছাখানা দয়া করে একটু ভিজিয়ে এনে দিন। সেই ওদিকে বোধ হয় কল আছে।'

পটল তত্রত্য একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। অকিঞ্চন তাহার কাপড়ের পোঁট্‌লাটা তাহার পার্শ্বে রাখিয়া গামছা ভিজাইতে চলিয়া গেল এবং মিনিট পাঁচ-সাত পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তথায় পটল কিংবা পোঁটলা তুইটির কোনোটিই নাই। সেইখানে দাঁড়াইয়া অকিঞ্চন চারিদিকে একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোনোখানেই পটলকে দেখিতে পাইল না। নিমেষে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহার কাছে যে আর একটি পয়সাও নাই।

এই বিদেশে একেবারে রিক্ত হস্তে—পটলের ভিজা গামছাখানি উত্তপ্ত মস্তকে দিয়া অকিঞ্চন তখন চারিদিকে ঘুরিয়া তাহার সন্ধান করিতে লাগিল।

## তিন

হাটখোলার ডালপট্টি ছাড়াইয়া একটু উত্তরে রাস্তার উপর একখানি টিনের মাঠগুদাম—দোতালা। তাহারই নিচে বারান্দার একাংশে কেহ পুণ্য-সঞ্চয়োদ্দেশে এই বৈশাখে জল-সত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিল। অকিঞ্চন ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং চারিটি ভিজা ছোলা ও এক রত্তি গুড় হাত পাতিয়া লইয়া, তাহাই চিবাইয়া এক পেট জল পান করিবার পর একটু বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে সেই বারান্দারই একপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

ভিতরের ঘরখানির একধারে একখানি তক্তপোশ পাতা ছিল। তদুপরি গৃহের অধিকারী দে-মহাশয় একটি কাঠের বড়ো বাক্স সম্মুখে লইয়া, দেয়াল ঠেস দিয়া বসিযাছিলেন। তাঁহার খর্ব দেহের উপরকার ক্ষুদ্র মস্তকটি ক্ষুর দিয়া মণ্ডিত, কণ্ঠে তিন হালি তুলসীর মালা, নাসাগ্রে তিলক, বক্ষে ও কপালে গঙ্গা-মৃত্তিকার ছাপ।

দে-মহাশয়ের সদর নিচের তলার এই ঘরখানি, অন্দর দ্বিতলে। তথায় তাহার নিঃসন্তান গৃহিণী কর্ত্রীরূপে সর্বদা বিরাজ করেন।

বহুদিন পাটের আড়তে কয়ালের কার্য করিয়া দে-মহাশয় বেশ দু-পয়সা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রৌঢ় বয়সে অর্থ সঞ্চয়ের বাসনা ত্যাগ করিয়া পুণ্য-সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগী হইয়াছেন। প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করেন, সকাল-সন্ধ্যায় নাম জপ করেন, বৎসর বৎসর জল-সত্র দেন এবং প্রতিবাসী কুলি, মজুর কারিগর, গাড়োয়ান, ফেরিওয়ালা, দোকানদার প্রভৃতিকে চোটায় ও খতে টাকা কর্জ দিয়া, একদিকে তাহাদের সাহায্য করেন ও অপর দিকে নিজের সময় কাটান। বন্ধকী কারবারও কিছু কিছু তাঁহার আছে।

প্রায় মিনিট পনের বসিয়া থাকিবার পর অকিঞ্চন উঠিয়া দরজার পাশ হইতে উঁকি দিয়া দেখিতেই, দে-মহাশয় তাহাকে ভিতরে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কোথায় থাকো, বাপু?'

অকিঞ্চন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—'একটু থাকবার স্থানই খুঁজে বেড়াচ্ছি। দেশ থেকে আজই এখানে এসেছি। গাড়িতে এক মেয়ে জোচ্চোরের

পাল্লায় পড়ে পোঁটলা শুদ্ধ টাকা-কড়ি সব খুইয়ে বসেছি। তাই ঘুরে ঘুরে খিদেও যেমন পেয়েছে, তেষ্টাও তেমনই লেগেছে।'

অকিঞ্চন দে-মহাশয়ের কাছে তাহার অদ্যকার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণন করিল। সমস্ত শুনিয়া দে-মহাশয় কহিলেন,—'এইখানেই থেকে যাও, বাপু। এ শুনে কি করে আর মুখটি বুজে থাকি বলো। নিজের দিকে তো কখনই চাই না, পরের দিকে কিন্তু না চেয়ে থাকতে পারি না। কারুর কষ্ট বিপদের কথা শুনলেই মনটা অমনি ধডফড করে ওঠে।'

অকিঞ্চন তক্তপোশের একধারে বসিয়া পড়িল। দে-মহাশয়ের সহিত তাহার অনেক কথা হইল এবং সেই দিন হইতে তাঁহার আশ্রয়ে নিঃসম্বল নিরাশ্রয় অকিঞ্চনের স্থান লাভ হইল।

দে-মহাশয় কহিলেন, 'ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি, শূদ্রস্য শূদ্রণং গতি। কে কারে খাওয়ায় বাপু, নারায়ণই সব করেন, করান।'

অকিঞ্চন দুর্ভাবনার হাত হইতে কিয়ৎপরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

সন্ধ্যার পর অকিঞ্চন দেখিল, দে-মহাশয়ের চোটার কারবারটি নেহাত সামান্য নহে। অনেক টাকাই তাঁহার এই কারবারে আসিতেছে, যাইতেছে। একটি টাকা কেহ চোটায় ধার করিলে দে-মহাশয়কে প্রত্যহ একটি করিয়া পয়সা দিয়া যাইতে হয়। এইরূপ দুই মাস পনের দিন দিলে ঐ টাকাটি উসুল যায়। এক টাকা লইলে যেমন প্রত্যহ এক পয়সা, তেমনই পাঁচ টাকা লইলে প্রত্যহ পাঁচ পয়সা, পঁচিশ টাকা লইলে প্রত্যহ পঁচিশ পয়সা, এই হিসাবে দেবার রীতি। কিন্তু সময় দুই মাস পনের দিন। যে যত টাকা লউক না কেন, তত পয়সা হিসাবে তাহাকে ঐ দুই মাস পনের দিনে দিয়া যাইতে হইবে। তবে দে-মহাশয়ের আর একটি নিয়ম আছে। টাকা কর্জের সময়, গৃহীত টাকা হইতে সিকি অংশ অর্থাৎ টাকা প্রতি চার আনা দে-মহাশয়কে তখনি দিয়া দিতে হয়। দে-মহাশয় বলেন,—'ঐ চারি আনার মধ্যে দু-পাই দালালী, ছ-পাই বারোয়ারী, দু-পাই বৃত্তি, দেড় পাই আপিস খরচ, আর বাকি পয়সাটা দরিদ্র ভাণ্ডার'—অর্থাৎ দে-মহাশয়ের ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো, পয়সা ফেলিবার ছিদ্রযুক্ত, চাবি তালা-লাগানো একটি ক্ষুদ্র টিনের বাক্স। টাকা কর্জ দিবার সময়, খাতকের নিজ হাত দিয়াই দে-মহাশয় নির্দিষ্ট পয়সা উহার মধ্যে ফেলাইয়া দেন, নিজে তাহা স্পর্শ করেন না। কানা-খোঁড়াকে দান, ভিখারীদের মুষ্টি-ভিক্ষা, বৈশাখ মাসের

জলসত্র প্রভৃতি ইহা হইতেই হয়।

যাহা হউক, দে-মহাশয়ের আশ্রয়ে প্রথমদিন অকিঞ্চনের একরূপ কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিনে সে একটু নাকমুখ সিঁটকাইল। তৃতীয় দিনে বুঝিল যে, এখানে তাহার থাকা চলিবে না। পাঁচ-সাত দিন পরে সে একেবারেই অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। এই কয় দিনেই দে-মহাশয় তাহাকে যে-যে কাজের ভার দিয়াছিলেন, তাহা এই :—অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সর্বাগ্রে তাহাকে গঙ্গা হইতে বড়ো এক ঘড়া গঙ্গাজল আনিতে হয়। কারণ, রৌদ্রাধিক্য বশতঃ দে-মহাশয় হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে পারেন না, বাড়িতেই গঙ্গাজলে প্রাতঃস্নান করেন। গঙ্গাজল আনিয়া দিয়াই অকিঞ্চনকে রাস্তার কল হইতে জল তুলিয়া জল-সত্রের বড়ো বড়ো জালা দুইটি ভরিতে হয়। তাহার পর আপিস ঘর, বারান্দা, অন্দর, সদর সর্বত্র ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করা, বাজার যাওয়া ও বাজারের হিসাব বুঝাইয়া দেওয়া। বাজার করা অপেক্ষা, দে-মহাশয়ের কাছে বাজারের হিসাব দেওয়াই কঠিন কার্য। একটি করিয়া সিকি তাঁহার বাঁধা বাজার খরচ ছিল। এই এক সিকির হিসাব দিতেই অকিঞ্চন বাহিরে যেমন ঘামিয়া উঠিত, ভিতরে তেমনই ফুলিয়া উঠিত। যাহা হউক, বাজারের হিসাব দিবার পরই তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সেই বাজার হাতে লইয়া তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে হয়। কারণ, তাহার আসিবার পর হইতেই দে-গৃহিণী সকাল বেলাটায় আর আগুনের তাতে যান না। কারণ দু-বেলা আগুনের তাত তাঁহার সহ্য হয় না। সুতরাং রন্ধন শেষ করিয়া কর্তা-গৃহিণীর আহারের পর তাহার খাইতে প্রত্যহই বেলা দুইটা আড়াইটা বাজিয়া যায়। তাহার পর, কোনো দিন মশারি, কোনোদিন বালিশের ওয়াড়, কোনোদিন বিছানার চাদর, কোনোদিন বা দে-গৃহিণীর পরনের শাড়ি কিংবা দে-মহাশয়ের আট হাত ধুতি বা ফতুয়া এবং তৎসহ ছুঁচ ও সুতা তাহার কাছে আসিয়া পড়ে। দে-মহাশয় তাহাকে বলেন,—'কাজকে ভয় করতে নেই হে, কাজই হচ্ছে লক্ষ্মী। আমি তোমায় আলসে হয়ে বসে থাকতে কখনই দিচ্ছি না; পর বলে তো তোমাকে আমি মনে করি না।' তাহার পর সন্ধ্যা হইলেই, দে-মহাশয়কে তাঁহার বাক্স এবং টাকা-পয়সা, চোটা, দালালী, বারোযারী, ৺বৃত্তি প্রভৃতি হইয়া এবং অকিঞ্চনকে হিসাবের খাতা-পত্র দোয়াত-কলম হইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়।

লেখা-পড়া, হিসাব-পত্রের কাজ এখন সমস্তই অকিঞ্চনের উপর পড়িয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে শুরু করিয়া টাকার লেন-দেন জমা-খরচ বকা-বকি প্রভৃতি

যখন শেষ হয়, তখন ঘড়ির বড়ো বড়ো ঘণ্টাগুলি সবই বাজিয়া যায়। তাহার পর দে-মহাশয়ের পিছন পিছন, তাঁহার সেই প্রকাণ্ড বাক্সটি মাথায় করিয়া দ্বিতলে তাঁহার ঘরে পৌছাইয়া দিয়া আসিবার পর তবে অকিঞ্চন অব্যাহতি পায়। রাত্রিতে শুধু দুটি ভাত দে-গৃহিণী নিজেই রাঁধিয়া লয়। তরকারি সকালেরই থাকে, শুধু তাহা গরম করিয়া লওয়া হয় মাত্র।

সে দিন ঠিক সন্ধ্যার পরই একটি প্রৌঢ় বয়সের স্ত্রীলোক ঘোমটা দিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দে-মহাশয় তাহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—

'কালীর মা বুঝি, কিছু খবর আছে গা?'

স্ত্রীলোকটি দরজার ধারে একটু সরিয়া আসিয়া কহিল,—'হ্যাঁ বাবা। গয়নাগুলো দিতে হবে, নিয়ে যাব।'

এক-পা এক-পা করিয়া কালীর মা ভিতরে যাইয়া দাঁড়াইল। দে-মহাশয় তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—'টাকা সব হিসেব করে এনেছ?'

'হিসেব আপনি করো না বাবা। কার্তিক মাসের ২০শে তো আমি টাকা নিয়ে গেছি। কাতিক ছেড়ে দিলে, তা হলে ছ-মাস হয়। একশ টাকা আসল আর ছ-মাসে ছ-টাকা সুদ—'

'তা কি হয়? কার্তিকের ২০শে হলে কি আর কাতিক বাদ দিতে পারি?'

'তা, যেমনেই ধরো বাবা, একমাস তো বাদ যাবে। কার্তিক ধরে নাও তো বোশেখের সুদ বাদ যাবে।'

'তা কি হয়, কালীর মা? বোশেখেরও তো অর্ধেক হয়ে গেল। ও সাত মাসের সাত টাকাই তোমায় দিতে হবে বাছা।'

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কালীর মা কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর কহিল,—'আচ্ছা বাবা যা নিলে ভালো হয়, তাই নাও। কত কষ্ট করে যে এই সুদের টাকা দেওয়া, তা ওপরের ঐ যিনি রাত-দিনের কত্তা, তিনিই জানেন। নেহাত দায়ে ঠেকে বউটার গা থেকে খুলে এনে তখন দিয়েছিলুম, তাই এই ছ-মাস না খেয়ে না দেয়ে, ঋণ শোধ করতে এসেছি।'—বলিয়া আঁচলের গেরো খুলিয়া দশখানি দশটাকার নোট ও ছয়টি টাকা দে-মহাশয়ের সম্মুখে তক্তপোশের উপর রাখিয়া কহিল,—'একটা টাকা কাল সকালে তা হলে দিয়ে যাব।'

নোট কয়খানি ও টাকা কয়টি গণিয়া লইয়া দে-মহাশয় বাক্সর মধ্যে রাখিয়া বন্ধ করিলেন এবং তৎপরে খাতা খুলিয়া কালীর মার হিসাবটা একবার দেখিয়া

লইয়া, অকিঞ্চনকে টাকাটা জমা করিয়া লইতে বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। খানিক পরেই কয়েকটি সোনার জিনিস আনিয়া দে-মহাশয় কালীর মা-র হাতে দিলেন। কালীর মা সেগুলি ভালো করিয়া দেখিয়া কহিল,—'হার ছড়াটা?' দে-মহাশয় কহিলেন,—'হার? 'হার-টার তো কিছু ছিল না বাপু। যেমন দিয়েছিলে, তেমনই—'

'সে কি বাবা! আমার নাতির গলার সরু বিছে-হার? আপনি ভালো করে দেখো গিয়ে। হার যে আমি এর সঙ্গে দিয়ে গেছি। দোহাই বাবা, ভালো করে খুঁজে—'

'কী মুশ্‌কিল! ভালো করে আর খুঁজবো কোথায়! দেখি হে খাতাখানা। এই দেখো—২০শে কার্তিক, মারফত কালীর মা, এক জোড়া সোনার বালা, দুটা আংটি, একখানা চিরুনি, একজোড়া মাকড়ি। লেখার কড়ি কি কখনও বাঘে খায়, বাছা। হার যদি দিয়ে যেতে তো এই খাতাতেই আমার থাকতো। তোমাদের মেয়েমানুষের এই সব হাঙ্গামে কাজে—সেবার হরিপদর পিসী এই রকম মিছে কি-রকম হৈ-চৈটা বাধালে, কিন্তু ভাগ্যে আমার খাতা ছিল, তাই তো রক্ষে পেয়ে গেলুম।'

কালীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—'বাবা ওপরে ভগবান্ আছেন, এখনও চন্দর-সূয্যি উঠছে, এর সঙ্গে আমার নাতির গলার বিছে-হার দিয়ে গেছি। এক ভরি দশ আনা দিয়ে আমার কালী যেদিন তৈরি করে আনলে তার দু-দিন পরেই দিয়ে গেছি বাবা। বাছা আমার আর গলায় দিতে পারেনি। খাতা তোমার ভালো করে দেখো, ঠিকই লেখা আছে। না থাকে, লিখতে ভুলে গেছ, নিশ্চয়ই ভুলে গেছ।'

'কিছু ভুল হয়নি, ভুল হয়নি, খাতায় যে লেখা নেই।' কালীর মা-র কাঁদাই শুধু সার হইল। অনেক তর্ক, অনেক কথা, অনেক চোখের জল ফেলার পর, চোখের জল মুছিতে মুছিতে কালীর মা চলিয়া গেল।

দে-মহাশয় বহুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেইখানে তাকিয়ায় মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিলেন—'ভালো হাঙ্গামা যা হোক, মাগী শাপ-মন্দ কতকগুলো দিয়ে গেল। আস্পর্ধা দেখো একবার, ছোটলোক কোথাকার!'

পরদিন প্রাতঃকালে দোতলার বারান্দায় রাঁধিতে রাঁধিতে উঁকি দিয়া অকিঞ্চন দেখিল, ছেলেদের গলার একগাছি নূতন বিছে-হার হাতে লইয়া দে-গৃহিণী

'খবর নেওয়াচ্ছি আমি। টাকা আর নোটের চাবুক তৈরি করে, তাই দিয়ে বামনার হাতে গুণে-গুণে মারবো।'—বলিয়া পেটকাপড় হইতে কি-একটা রুমালে বাঁধা জিনিস ক্ষান্তর কপাল লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল।

চমকিত হইয়া ক্ষান্ত তাহা তুলিয়া লইল এবং খুলিয়া দেখিতে দেখিতে কহিল, 'এ কি গো, এ যে নোটের তাড়া! কত টাকার নোট।'

'গুণে দেখ।'

তিনবার গণিয়া, হিসাব করিয়া ক্ষান্ত চোখ কপালে তুলিয়া কহিল,—'এই ক-দিনে তিন-শ টাকা এনেছ তুমি?'

ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়া টাকার শব্দ করিতে করিতে অকিঞ্চন কহিল,— 'তিন শ-র স্যাঙাৎ-ভাইরা আবার এখানে সব আছে।'

'ও কত?'

'তা প্রায় শ-খানেক।'

চমকের বেগ কতক কাটিয়া গেলে, ক্ষান্ত স্বামীর সহিত আরও দুই-চারিটি কথা কহিয়া, চা তৈয়ারী করিবার জন্য উঠিয়া গেল। পরদিন প্রাতে বাঁড়ুজ্যে মহাশয় আসিয়া উঠানে দাঁড়াতেই, অকিঞ্চন কহিল,—'টাকা আপনাকে সবই এখনই শোধ করে দিতে পারি, কিন্তু দেব না। কেননা, আপনিই বলেছেন যে, আষাঢ় মাসের ভেতর দিতে। তাই দেব আপনাকে। তবে, সুদ কিছু না হয় দিয়ে দেব এখন, ওবেলা একবার আসবেন। পরশু এদের সব নিয়ে আমায় আবার যেতে হবে। সেখানে বিস্তর কাজ ফেঁদে এসেছি, বেশি দিন তো আর এখানে পড়ে থাকতে পারব না।'

বৈকালের দিকে বাঁড়ুজ্যে মহাশয় আবার আসিলেন এবং অকিঞ্চন তাঁহাকে সুদের বাবদ পঞ্চাশ টাকা দিয়া কহিল, 'হয়তো আষাঢ় মাসও লাগবে না; ও-মাসেই আপনার বেবাক দিয়ে ফেলবো।'

পরদিন গোছগাছ করিতেই কাটিয়া গেল এবং তৎপরদিন ক্ষান্তকে লইয়া অকিঞ্চন কলিকাতা রওনা হইল।

কলিকাতায় সে কোনোও বাসার ঠিক না করিয়াই ক্ষান্তকে লইয়া গেল, সুতরাং হাওড়ায় নামিয়া সে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বরাবর কালিঘাটে মন্দিরের নিকটবর্তী এক যাত্রীনিবাসে গিয়া উঠিল। সেখানে দৈনিক আট আনা হারে সাত দিনের জন্য একখানি ঘর ভাড়া করিয়া থাকিবার পর অনেক অনুসন্ধান করিয়া চেতলার হাটের ঐ দিকে পনের টাকা ভাড়ায় একটি ছোট টিনের বাড়ি

ভাড়া করিল।

অতঃপর অকিঞ্চন সুবিধামতো একটি কাজের সন্ধানে প্রত্যহ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল এবং সকাল-সন্ধ্যায় পাঁচ জায়গায় যাতায়াত করিতে লাগিল।

## পাঁচ

আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপর 'দৈনিক জগৎ' সংবাদপত্রের সুবৃহৎ কার্যালয়। প্রকাণ্ড ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া যেখানে উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক দিনের কাগজ কাঠের বোর্ডে আঁটা হইয়া ঝুলিতে থাকে, সেখানে সদাসর্বদাই অসংখ্য পাঠকের সমাবেশে বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করা দুষ্কর হয়। কর্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠের জন্যই অধিকাংশ পাঠক ব্যস্ত। এইখান হইতেই বামপদে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অকিঞ্চন দুই দিন চলিতে পারে নাই।

দ্বিতলে সুবিস্তৃত হলে শ্রেণীবদ্ধভাবে অসংখ্য কর্মচারী নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত। তাহারই একদিকে সম্পাদকের গৃহ, বিজ্ঞাপন বিভাগ, সহকারী সম্পাদক, চিত্র-বিভাগ, ক্যাশ প্রভৃতি এবং অপর দিকে প্রকাণ্ড সুসজ্জিত ঘরে স্বত্বাধিকারী যতীশবাবুর খাস আপিস।

খস্‌খসের পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইতে একটি ভদ্রলোক এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—'কি খবর, হঠাৎ তলব কেন?'

যতীশবাবু কিসের একটা হিসাব দেখিতেছিলেন, তাহা বন্ধ করিয়া কহিলেন, 'বসুন, কয়েকটা নালিশ রুজু করে দিতে হবে।'

ভদ্রলোকটি যতীশবাবুরই উকিল এবং বন্ধু। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাড়ি-ভাড়ার নালিশ তো?'

'শুধু ভাড়া নয়। ভাড়া আছে, হ্যাণ্ড নোট আছে, মর্টগেজ আছে, চিটিং আছে—'

'ঠকে ঠকে এত সাবধান হয়েও আবার চিটিংএর কেস?'

'কি করি বলুন, মতিবাবু। সাবধান হয়েও পারিনি। মানুষ হয়ে মানুষকে কত অবিশ্বাস করি বলুন? খুব সাবধান হয়েই কাজ করি, তাই রক্ষে, নইলে আমাকেই এতদিনে কেউ না কেউ 'চিট' করে নিয়ে গিয়ে মানুষ বেচার দেশে হয়তো বিক্রি করে দিয়ে আসতো।'

একটু থামিয়া যতীশবাবু আবার কহিলেন,—'কিন্তু জুচ্চুরি, বাটপাড়ি, ঠকামি

করেও তো কেউ কিছু সুবিধে করতে পারে না, আগেও যেমন তাদের হাভাত, পরেও ঠিক তাই। তবু এরা সৎপথে চলে না কেন, তাই শুধু আমি ভাবি।'

'সৎপথে প্রথম দিকটায় চলতে বড্ড হোঁচট লাগে কিনা। যাক্, আপনার হরেকেষ্টর খবর কি ?'

'তার কথা আর বলবেন না। বাপের শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ সব মিছে কথা। ঐ বলে এক মাসের মাইনে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে একেবারেই সরে পড়েছে। খবর নিলুম, তার বাপই ছিল না।'

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মতিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাপই ছিল না কি রকম ?'

'বাস্তবিকই ওর বাপ ছিল না। ওর জন্মের ৩।৪ মাস আগেই নাকি ওর বাপ মারা যায়। কিন্তু হরেকেষ্টর জায়গায়, মতিবাবু, এতদিনে খুব ভালো একটি লোক পেয়েছি। সত্যই ভালো।'

'কিন্তু তার ঐ চেয়ারের গুণে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়, তা বোধ হয় বলা যায় না।'

'এর বিষয়ে খুব পারা যায়। এ লোকটির চেহারা, কথাবার্তা, হাব-ভাব, কাজ-কর্ম দেখলেই বলা যায় যে, এর দ্বারা কোনো অন্যায় কাজ হতে পারে না। সংসারের টান নেই। কারণ সংসারে এর কেউ নেই। সন্ন্যাসীর মতোই থাকে। তবে ভগবানের ওপর এর বড়ো অভিমান।'

'তার কারণ ?'

'তার কারণ, চিরকাল ভগবানকে ডেকেই এর দিন কেটেছে, অথচ বছর কতক হল, সাত দিনের মধ্যেই কলেরায় এর পরিবার, ছেলে-মেয়ে, এক বিধবা ভগিনী—গুষ্টিসুদ্ধ সব মারা যায়। তারপরে, পাড়া-প্রতিবাসীরা একজোট হয়ে এর দু-চার বিঘে জমি-জমা যা ছিল, তাও ফাঁকি দিয়ে নেয়। সেই ধিক্কারে লোকটি দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। তাই ভগবানের ওপর এর যত নালিশ আর অভিমান। অভিমান বটে, অথচ দিনের ভেতর পঞ্চাশবার তার নাম করতেও ছাড়বে না।'

এই সময়ে একটি লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীশবাবু তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'পাওয়া গেল ?'

গোটা-চারেক কলের মুখের 'স্টপ-কক' টেবিলের উপর রাখিয়া লোকটি কহিল,—'খুব ভালো মেকই এনেছি বটে, তবে ঘুরে ঘুরে আঠারো আনার কমে

কোথাও আর পেলুম না। চারটেতে সাড়ে চার টাকা নিয়েছে।'

চমকিত হইয়া যতীশবাবু কহিলেন,—'বলো কিহে? হরেকেষ্ট বরাবর দু-টাকা করে এনেছে। বোধ হয়, দু-একবার ন-সিকে করেও নিয়েছে। যাক। তাহলে দশ টাকায় সাড়ে পাঁচ টাকা ফিরেছে বলো?'

পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট ও সাড়ে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া যতীশবাবুর সম্মুখে রাখিয়া লোকটি কহিল,—'সাড়ে পনের টাকা ফিরেছে।'

বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে যতীশবাবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'দশ টাকা দিলুম, সাড়ে পনের টাকা ফিরল কি রকম?'

'দুখানা নোট দিয়েছিলেন, বাবু! বোধহয়, তাড়াতাড়িতে ভুল হয়েছিল। নতুন নোট, গায়ে গায়ে চেপে বসেছিল আর কি—' বলিয়া লোকটি ঘরের বাহির হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে কহিল,—'একটা পয়সা আমায় দিন, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক পয়সার বাতাসা এনে একটু জল খাই।'

যতীশবাবু টেবিলের উপর হইতে একটি আনি তুলিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন,—'তেষ্টা পেয়েছিল তো এই থেকে পয়সা নিয়ে সরবত খেয়ে এলে পারতে।'

'তা কি পারি বাবু! আপনার বিনা অনুমতিতে কি সেটা কখনও সম্ভব হয়?'

লোকটি চলিয়া গেলে মতিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এরই কথা আপনি বলছিলেন বোধ হয়?'

'হ্যাঁ।'

'এর বাড়ি কোথায়?'

'বীরভূম জেলা। এখানে শ্যামবাজারের ওদিকে টিনের একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে।'

'কি নাম?'

'ধর্মদাস মিত্তির।'

মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন যতীশবাবুর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া মতিবাবু ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কহিলেন,—'কি খবর যতীশবাবু?'

যতীশবাবু কহিলেন,—'আরে মশাই, বেটা একরাশ টাকা-কড়ি নিয়ে ভেগেছে।'

'কে ?'

'সেই ভণ্ড, বিটলে, বাটপাড, রাসকেল্—'

'আপনার সেই ধর্মদাস মিস্তির ?'

'আরে হ্যাঁ মশাই ! বেটা মহা জোচ্চোর, ধড়িবাজ ! ভণ্ডের শিরোমণি !'

'কি নিয়ে সরেছে ?'

'তা বেশ ভালো রকমই নিয়ে গেছে। খান সাত-আট বিল আদায় করে প্রায় শ-পাঁচেক টাকা নিয়েছে। দত্ত কোম্পানির দোকান থেকে বারো ভরির এক ছড়া সোনার হার তাকে দিয়েই কাল আনতে পাঠিয়েছিলুম, সেটা নিয়েছে। আমার সোনার ঘড়িটা এই ড্রয়ার থেকে নিয়েছে, জামা থেকে সোনার বোতাম সেটটা—'

'ভগবানের ওপর অভিমান করেই নিয়েছেন আর কি, নইলে ধর্মদাস কখনও এতটা অধর্ম করতে পারেন কি ?'

'আরে ও নামই বোধ হয় ওর নয়। তার একখানা গীতা তার ডেস্কের মধ্যে ছিল, সেখানা সে প্রায়ই পড়তো। গীতাখানা সে ফেলে গেছে। তাতে নাম লেখা অকিঞ্চন পাল।'

'শ্যামবাজারে তার বাসায় খোঁজ নিয়েছিলেন।'

'সে সবই মিথ্যে, মতিবাবু, সবই মিথ্যে। সেখানে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল, টিনের বাড়ি-টাড়ি নেই, রাজসাহীর কে একজন জমিদারের প্রকাণ্ড চারতলা এক বাড়ি।'

মতিবাবু যতীশবাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

## ছয়

সকাল সাতটা সাতাশ মিনিটের সময় 'আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্ট এক্সপ্রেস' হাওড়া হইতে ছাড়িয়া দিবার জন্য যখন তৃতীয় ঘণ্টা পড়িল, তখন এক হাতে ক্ষান্তর একখানা হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ছুটিতে ছুটিতে অকিঞ্চন তাড়াতাড়ি কাছের যে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা পাইল, তাহাতেই উঠিয়া পড়িল। সঙ্গের কুলি প্রকাণ্ড এক স্টীলের তোরঙ্গ ও বিছানার একটা মোট তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া পয়সা লইয়া গেলেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

সেখানি মেয়েদের গাড়ি। অকিঞ্চন দেখিল, সকল আরোহীই পশ্চিমা স্ত্রীলোক। কি-একটা কথা লইয়া সকলেই মহা কলরবের সৃষ্টি করিয়াছে। ও-দিককার খালি বেঞ্চে ক্ষান্তকে বসাইয়া দিয়া অকিঞ্চন তাহার মুখের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—'বাস্, কাজ ফতে, আমায় পায় কে ; এইবার হরদম ফূর্তি– ' বাকি কথা মুখের ভিতরই রাখিয়া, পকেট হইতে বিড়ি দেশলাই বাহির করিয়া অকিঞ্চন বিড়ি ধরাইল।

গাড়ি শ্রীরামপুর আসিলে, একজন চেকার আসিয়া কহিল,—'এটা মেয়েদের গাড়ি, আপনাকে অন্য গাড়িতে যেতে হবে।' অকিঞ্চন একটা যুক্তি দেখাইয়া কি বলিতে গেল, চেকার্ মাথা নাড়িয়া কহিল,—'না না, মেয়েদের গাড়িতে পুরুষ থাকবে কি রকম? নেমে যান, নেমে যান!' অগত্যা অকিঞ্চন অন্য গাড়িতে গিয়া উঠিল। সে কামরাটিতে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে তখন এক মহাতর্ক চলিতেছিল।

তর্ক পুরুষদের জুয়াচুরি ও মেয়েদের জুয়াচুরি সম্বন্ধে। অবশ্য এ দেশের নহে—বিলাতের। অকিঞ্চন মাঝখানে আসিয়া তর্ককে আরও প্রবল করিয়া তুলিল। কহিল, 'মশাই, ও জাত পুরুষের ঘাড়ে—বুঝতে পেরেছেন তো? তার সাক্ষী আরব্য উপন্যাস পড়েছেন তো? সুতরাং—'

তর্ক আলোচনা তুমুলভাবে চলিতে লাগিল। গাড়ি স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করিতে লাগিল।

শ্যাওড়াফুলি স্টেশনে একটি আধা-বয়সী-স্ত্রীলোক মেয়ে-কামরায় উঠিয়া ক্ষান্তর সম্মুখে আসিয়া বসিল।

স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা, দোহারা, মুখখানি ঢল-ঢল, চোখ দুটি আয়ত। দৃষ্টি উজ্জ্বল। তাহার পরনে শান্তিপুরী একখানি কার্নিসপাড় শাড়ি, নাকে ওপ্যালের নাক-ছাবি, কানে কানফুল, কপালে উল্কি, মুখে দোক্তা দেওয়া পান, এবং তাহারই রসে ঠোঁট দুটি টুক্‌টুকে।

স্ত্রীলোকটি বসিয়া ক্ষান্তকে জিজ্ঞাসা করিল,—'কোথা যাবে ভাই?'

ক্ষান্ত কহিল,—'বর্ধমান।'

'আমিও যাব। সেখানে আমার ভাই রেলেতেই কাজ করে। তোমাকে যেন কোথাও দেখেছি ভাই, কোন্ গাঁয়ে বাড়ি বলো তো?'

'বর্ধমান থেকে আড়াই কোশ তিন কোশ যেতে হয়,—তালচটী।'

'তালচটী? তলচটীতে যে আমি প্রায়ই যাই,—আমার মাসতুতো বোনের

শ্বশুরবাড়ি।'

'কাদের বাড়ি, দিদি ?'

'সরকারদের বাড়ি, জানো ?'

'সরকারদের ? না দিদি।'

'চিনবে কি করে বোন্, বৌ মানুষ তো ?' তখন উভয়ে অনেক কথা, অনেক গল্প হইল। ক্ষান্ত কহিল,—'হ্যাঁ দিদি, একলা এই রকম গাড়িতে তোমার ভয় করে না ?'

'ভয় কিসের ? আমরা তো ধরতে গেলে এক-রকম রেলেরই লোক। তবে, আজকাল ভাই মেয়ে-গাড়িতে বড্ড চুরি হতে আরম্ভ হয়েছে। প্রায় রোজই হচ্ছে। এই সে দিন, গাড়ি মগরা স্টেশনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দুজন লোক হঠাৎ ঢুকে, চক্ষের নিমেষে একজনদের তোরঙ্গ তুলে নিয়ে চলে গেল, কেউ ধরতেও পারলে না।'

'বলো কি দিদি ?'

'কালও ব্যাণ্ডেলে ঐ রকম ব্যাপার হয়ে গেছে। তোমার ও তোরঙ্গে খালি কাপড়-চোপড় আছে তো ? পয়সা-কড়ি কিছু থাকে তো বার করে নিয়ে পেট-কাপড়ে বেঁধে রাখো।'

'অ্যাঁ! টাকা-কড়ি ? হ্যাঁ—না—আমার ক্যাশ-বাক্স ওর মধ্যে আছে।'

'সেটা বোন্, বার করে কোলে করে ধরে নিয়ে বসো। কি জানি বিপদ হতে বেশিক্ষণ লাগে না।'

ক্ষান্ত তোরঙ্গ খুলিয়া, স্টীলের ছোট ক্যাশ বাক্সটি বাহির করিয়া কোলের উপর লইয়া বসিল।

দিদি কহিল,—'আমি থাকতে অবশ্যি কোনো ভয় নেই, কেননা, আমরা রেলেরই লোক, ভাই আমার রেলের সবচেয়ে বড়ো বাবু, এই যেখানকার যত মাস্টার, সক্কলের ওপরে ; তবুও ভাই, সাবধানের মার নেই'—বলিয়া দিদি প্রস্রাবের ঘরে যাইয়া ঢুকিল, ফিরিয়া বসিতেই ক্ষান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—'আমিও একবার—'

'যাবে ? যাও। এই ব্যাণ্ডেল এসে পড়ল। এখানে বড্ড ভিড় হবে ভাই, এই বেলা সেরে এসো।'

বাক্সটি দিদির হাতে দিয়া ক্ষান্ত প্রস্রাব করিবার ঘরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও মন্থর গতিতে আসিয়া স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্ল্যাটফর্মের কোলে

আসিয়া পড়িল।

ব্যাণ্ডেলে গাড়ি পাঁচ মিনিট থামিবে জানিয়া অকিঞ্চন স্ত্রীর খোঁজ লইবার জন্য মেয়ে-গাড়ির সামনে একবার আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ক্ষান্ত অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, জানালায় মুখ বাড়াইয়া চারিদিকে কি যেন খুঁজিয়া দেখিতেছে।

অকিঞ্চনকে সম্মুখে দেখিয়া কহিল,—'শিগ্‌গির এসো, সর্বনাশ হয়েছে!'

তখনি গাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া অকিঞ্চন কহিল,—'কি হয়েছে?'

অধীরভাবে হাউ-মাউ করিয়া ক্ষান্ত কহিল,—'ক্যাশ-বাক্স নিয়ে চলে গেছে। ওগো, কি হল গো! ওরে বাবা রে!'

দুই চোখ কপালে তুলিয়া অকিঞ্চন চিৎকার করিয়া কহিল,—'ক্যাশ-বাক্স? ক্যাশ-বাক্স নিয়ে চলে গেছে! কে—কে—কে নিয়ে গেল?'

'আমি কি চিনি ছাই! নাকে নাক-ছাবি, কপালে উল্কি, বাঁ হাতে নাম লেখা, পটল—হরিনাম সত্য। ওগো, বাক্স নিয়ে দিদি কোথায় গেল গো!'

'পটল? হরিনাম সত্য?' দুই হাতে মাথার দুই পাশ চাপিয়া ধরিয়া অকিঞ্চন সেইখানে নির্জীবের মতো বসিয়া পড়িয়া অনুচ্চ কণ্ঠে আপন মনে কহিল,—দিদি নয়, দিদি নয়, সে তোমার ভাসুর—ভাসুর। আমারই সে দাদা!

জগদীশ গুপ্ত ( ১৮৮৬—১৯৫৭ )

# লাঙ্গুলোপাখ্যান

—আসিতেছে ! আসিতেছে !!—

—আসিতেছে !!!—

এই খবরটার দিকে আমাদের নজর গেল। আমাদের জীবনের স্বাদের তেতো-মিষ্টির দৈনন্দিন তারতম্য খুব কম ; জীবনেব স্রোতে জোয়ার-ভাঁটার ওঠা-নামা আরো কম।…পাঁচডা থেকে পানের চালান এল তো পান পয়সায় পাঁচটা—না এল তো দুটো। আলু পটল ঝিঙ্গের দর ; শীত গরম বর্ষার কম বেশি, ছেলেটাব জ্বর, মেয়েটার সর্দি, চাকরটার বে-আক্কেল—এমনি সব খবরের আদান-প্রদান ঘুরতে থাকে , তার বিবাম নেই, বদল নেই, শেষ নেই—

খুব যার কাজেব নেশা সে আদার বাজারে ঘোরে—আর খুব যে-বার বিপড়তা সে-বার কলেরা ঢোকে।

হঠাৎ লোকে দেখলে দেয়ালে, গাছে গাছে, আলোর খুঁটিতে, দোকানের ঝাঁপে, ফেরিওয়ালার ঝাঁকায়—এক কথায় নিত্যানন্দের টাক ছাড়া সমস্ত প্রকাশ্য স্থানে।

ঐ আসবার খবরটি পেয়ে আমরা একটু নডে বস্‌লাম অর্থাৎ একটু বিস্ময় এল, আর ছোট মেয়েটির জ্বরের খবর শোন্‌বার পর শুধোলাম,—কে আস্‌ছে হে ?

কিন্তু কেউ তা জানে না। কে আস্‌ছে, কেন আস্‌ছে, তা এমন করে অনুমানই করা গেল, যা সকলেরই মন-সই। তবু মনটা খাড়া হয়েই রইল।

পরদিনই শোনা গেল, যে আস্‌ছে বলে রটেছে সে এসেছে , সে আর কিছুই নয়, সার্কাসের দল। মেয়ে-পুরুষ আর ছোট-বড়োয় এত লোক যে, তাদের আসার খবর পেতে-না-পেতে তারা চোখের উপর পরিস্ফুট হয়ে উঠল। কোন্ দেশী লোক তারা তা বোঝা গেল না, কেউ পেণ্টুলান পরা, কারো পরনে লুঙ্গি, কারো পায়জামা, কারো ধুতি—

হালদার বল্‌লে—মগ।

মোহন বল্‌লে,—ছাই জানো, বর্গী।

তৃতীয় ব্যক্তি সর্বেশ্বর কোনোটাই মঞ্জুর কর্‌লে না, বল্‌লে,—তেলেঙ্গী।

আমি বল্‌লাম - বাড়িতে পটলে, আলুতে, থোড়ে, ঝিঙ্গেয়, পোস্তয় চচ্চড়ি—সব দেশের লোক ওতে আছে।

ছেলের দল তামাশা দেখতে দুপুর রোদেই ছুট্‌ল—এসে খবর দিলে,—রাজার মাঠে সার্কাসের তাঁবু উই উঁচু মাস্তলের সঙ্গে ঝুলে আছে, আর মানুষের চচ্চড়ির সঙ্গে ইঁদুর থেকে সিংহ পর্যন্ত জানোয়ারের ফোড়ন আছে।

আমাদের এখানে গাড়ি বল্‌তেই রুটিওয়ালা রঞ্জনের গাড়ি···সেই গাড়িখানাকে তারা সাজিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করে গেল।

মাস্টার তুলসীর অপূর্ব ক্রীড়াচাতুর্য !
বীরকেশরী বিশ্বনাথের হিংস্র ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ !!
ছয় বৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশু
অজিতকুমারের সিংহের পিঞ্জরে একাকী প্রবেশ !!!

ইত্যাদি অদ্ভুত কীর্তির খবর সেই হ্যাণ্ডবিলে পেয়ে জায়গাটায় এমন রৈ-রৈ উঠল যে, সর্বেশ্বর আদার বাজারে গেল না; আর বওয়াটেরা তাস-পিটতেই ভুলে গেল।

রাত আটটায় খেলা আরম্ভ কিন্তু এমনি মানুষের ব্যগ্রতা যে, সাড়ে ছ-টা না বাজতে তাঁবুতে তিলধারণের স্থান রইল না; দুটি মাথার ভেতর দিয়ে ছুঁচ গলানো যায় না, মাথায় মাথায় এমনি ঠাসাঠাসি।

তিন রাত্তির খেলা দেখিয়ে সার্কাসের দল খাঁচা আর তাঁবু গো-যানে বোঝাই দিয়ে চলে গেল। মাস্টার তুলসী, বীরকেশরী বিশ্বনাথ, আর ছয় বৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশু অজিতকুমার তার সঙ্গে গেলেন, কিন্তু আমরা বয়স্কের দল, তামাশা দেখতেই লাগ্‌লাম।—

আড়াআড়ি করে বাঁশ বেঁধে তার ওপর দিয়ে হাঁট্‌তে গিয়ে আনন্দ চাকির ছেলেটা তার বাঁ-হাতের হাড় দু-টুক্‌রো করে ফেল্‌লে। শ্যামাদাসের নাতি ভূতো নিলে সিংহের পার্ট আর ন্যালা নিলে অজিতকুমারের পার্ট কিন্তু সিংহের চেয়ে মানুষ হিংস্র বেশি, তাই ন্যালা ভূতোর মুখের ভেতর মাথা দেবার উদ্দেশ্যে তার হাঁ-র ভেতর নাক দিতেই ভূতো তার নাক এমন কামড়ে দিলে যে, রক্ত ঝরে একাকার। রক্ত বন্ধ কর্‌তে ডাক্তার ডাক্‌তে হল। ইত্যাদি।

সার্কাসের দল রওনা হয়ে যাবার পরদিনই যে ভয়ংকর গুজবটায় দেশে হৃৎকম্প ছেয়ে এল তার চেয়ে ওলাউঠো ভালো—সার্কাসের বাঘটা না কি খাঁচার দরজা

খোলা পেয়ে পালিয়েছে—এই দু-এক ক্রোশের মধ্যেই।

সার্কাসের খাঁচার মধ্যে বীরকেশরীর সঙ্গে মল্লযুদ্ধের সময় মনে হয়েছিল, বাঘকে নেশা ধরানো হয়েছে···বীরকেশরীর হুংকারে আর চপেটাঘাতেও তার তখন হুঁশ হয়নি—

বড়ো নিরীহ বাঘ, রাগ নামমাত্র নাই, খাবার লোভও নাই, কোনো ক্ষমতাই তার নাই—অমন বাঘের সঙ্গে লড়ে আমরাও জনে জনে বীরকেশরী হতে পারি···তখন এই সব মনে হয়েছিল, আলোচনাও হয়েছিল—

কিন্তু, সেই বাঘই দু-এক ক্রোশের মধ্যেই খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে গেছে শুনে সে যে আফিংখোর তা চট করে ভুলে গেলাম আর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে নিরম্বু হয়ে উঠ্‌ল—

তার স্তিমিত চক্ষু আর স্তিমিত রইল না—

পিট্‌পিট করে না তাকিয়ে সে যেন অঙ্গদরায়বারের রাবণের মতো চারিদিক্‌ থেকে কটমটিয়ে তাকাতে লাগল।···আশু সিক্‌দার সার্কাস দেখে এসে বলেছিল, —আফিং খেয়ে ঝিমচ্ছে যে বাঘ, তার মুখের ভেতর হাত দেয়া তো তুচ্ছ কথা, তার মুখের ভেতর দিয়ে হেঁটে আমি তার পাক্‌যন্ত্রে যেতে পারি। সেই আশু সিক্‌দেরও খবরটা শুনে ধাঁ করে পেছনদিকে চেয়ে নিলে; কিন্তু তার পেছনে ছিল দেয়াল।···আশুর চাউনি দেখে মনে হল, সার্কাসেব দলে যখন ছিল তখন বাঘ আফিং খেত, দল ছেড়ে এসে এখন সে নিবামিষ ঘাস খায় না তা আশু জানে—

বিন্দু বোষ্টম বল্‌লে—ভালোই হয়েছে, বাঘটাকে একবাব দেখ্‌তে পেলে নেমন্তন্ন করে বোষ্টমীকে তার সাথে দিতাম।

শুনে আমবা হাস্‌তে গেলাম, কিন্তু হাসিটা দাঁতেব ওপারেই আট্‌কে রইল।

হরি ঘোষের চিরটা কাল মাতব্বরি ধরন—

সে বল্‌লে,—বাজে গুজব। বাঘ যদি ছুটেই থাকে—ছুটেছে বলেই যে এদিকে আস্‌বে তারই বা কি কথা?

কথাটা সঙ্গত—

মেনে নিতেও সুখ হল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল না-আসারও তো হেতু নেই।

লোকপরম্পরায় শোনা গেল, মাইল তিনেক দূরে বাঘটাকে দেখা গেছে···

যদিই বাঘ আসে তবে আত্ম ও আর্তরক্ষার পক্ষ কোন্‌ দিকে, সবাই মিলে সলা-

পরামর্শ করে তাই একটা নির্ণয় করতে বিধু হালদারের উঠোনে জমায়েত হলাম—কিন্তু কোনোরূপ ব্যবস্থা না হতেই অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়িয়ে গেল…

তালাই পেতে একে একে সব বসেছি—বিধু হালদার ছিলিমটা ধরিয়েছে—দু-হাত তা ফিরেওছে—

নিমাই টেনে মোহনের হাতে দিতে যাবে, এমন সময় নিমাইয়ের হাত মধ্যপথে থেমে গেল……

"খেয়ে ফেল্লে, খেয়ে ফেল্লে"—এমনি একটা চিৎকার শুনে চম্‌কে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলাম, একটা লোক আলুথালু হয়ে ছুটে আস্‌ছে—

মুহুর্মুহুঃ পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কি দেখছে—যত সে চেঁচাচ্ছে তত তার দৌড়ের বেগ বাড়ছে…দেখতে দেখতে সে এসে পড়ল—

আসার পথে হরি ঘোষকে কাত করে ফেলে দিয়ে জলের ঘটিটা লাথি মেরে ঝম্ করে ছুটিয়ে দিয়েছে·· এমন সময় কে যেন বলে উঠল, -বুঝি বাঘ !…শুনে চোখের নিমেষ না পড়তেই যেন ঝড় উঠল……

বিধু হালদার লোকটার হাত ধরে একটা ঝট্‌কা মেরে তাকে মাটির ওপর বসিয়ে দিলে…ভূশায়িত হরি ঘোষকে পা দিয়ে চট্‌কে বারান্দায় উঠে পড়লাম……

পরক্ষণেই লোকে ঘর ভরে গেল—হরি ঘোষ বিদ্যুদ্বেগে উঠেই ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিলে… ··

বাইরে রইল কেবল অজানা সেই লোকটা।

সে বন্ধ দরজার ওপর হাত চাপড়ে কাঁদতে লাগল,—ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় বাঘের মুখে দিও না……

কিন্তু আমাদের তা কানেও গেল না।

হরি ঘোষ গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বল্লে,—ওই বেটাই বাঘ ডেকে এনেছে…ওই বাঘের পেটে যাক্।

বিন্দু বোষ্টম বল্লে—এগিয়ে যাও বাবা, এগিয়ে যাও…সঙ্গে করে এনেছ যদি তবে সঙ্গে নিয়েই আর একটু এগিয়ে যাও ··আমরা বাঁচি।

লোকটা এগিয়ে গেল না, দরজা ধরে কাতরাতে লাগল। কিন্তু গোল বাধালে মোহন। সে বল্লে,—আমার বৌ-ছেলে একলা আছে…দরজা ছাড়ো, আমি যাব। বলে সে বিধু হালদারের চার হাত লম্বা বাঁশের লাঠিগাছটা হাতে করলে।

আমরা বললাম, বৌ-ছেলে আমাদেরও আছে। তবু দরজা আমরা খুলব না।··· অন্য রাস্তা পাও, যাও।

দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিধু হালদার নিজে। মোহনের উদ্যম দেখে সে খিল্‌টা চেপে ধরে আরো শক্ত হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মোহন ভীষণ ষণ্ডা —ষাঁড়ের শিং ওপড়ায়—

সে বিনাবাক্যে এগিয়ে এসে বিধু হালদারের ঘাড়টা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরলে —এবং আমরা হাঁ হাঁ করে উঠে কিছু করে ওঠবার আগেই তাকে উঁচু করে তুলে বরাবর দেয়াল পর্যন্ত ছুঁড়ে দিলে—

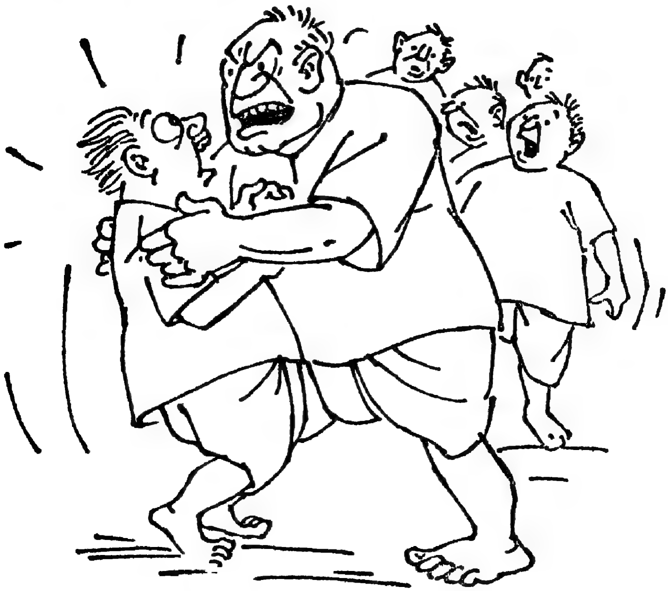

বিধু গিয়ে দেয়ালের ওপর পড়ল—

আর মোহন খিল খুলে ডাক ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে গেল ··সেই অবসরে সেই লোকটা আড় হয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ কর্‌তে কর্‌তে দড়াম্‌ করে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

অনর্থক আক্রান্ত হয়ে বিধু হতবুদ্ধির মতো দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে ছিল ·· সকলের আগে সে-ই ছুটে এসে অচৈতন্য লোকটাকে কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে হাওয়া কর্‌তে লাগল······

ঘরের এক কোণে ভাগ্যিস্‌ জলের কলসী ছিল ··আমি আঁজলা করে জল তুলে তুলে তার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম—

শুকনো কাঁচা মেঝে কাদা হয়ে চাষের উপযোগী হয়ে উঠল।

খানিক বাদেই লোকটা চোখ খুল্‌লে বটে কিন্তু দেখ্‌লাম, সে চোখে যেন কোনো ভাব নাই—মানে, চোখ চেয়েও কিছু যেন তার চোখে পড়ছে না··· তার শুক্‌নো ঠোঁট আর জলে-ভেজা চুলের দিকে চেয়ে আমার বড়ো মমতা হল—

যেন তার কেউ নেই, বেঘোরে মর্‌ছে।

যাই হোক্‌ হাওয়া কর্‌তে কর্‌তে তার আচ্ছন্ন ভাবটা কাট্‌ল···শুয়েই একটু হাঁ কর্‌লে -

শুধোলাম জল খাবে ?

উত্তরে হাঁ করেই রইল।

জল গড়িয়ে জলের ঘটিটা তার মুখের কাছে আন্‌তেই অবাক্‌ কাণ্ড ঘটে গেল—

ইচ্ছে ছিল, জল তার মুখে ঢেলে দেব—সে গিল্‌তে থাক্‌বে—

কিন্তু আচম্‌কা সে জলের ঘটিটা কেড়ে নিয়ে মাথাটি মাটি ছেড়ে একটু তুলে এক ঘটি জল এক চুমুকে খেয়ে ফেলেই কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে এমন একটা চিৎকার ছাড়লে যে পিলে চম্‌কে আমাদের মনে হল বাঘ বুঝি তার বুকের ওপর এসে বসেছে।

তার মুখের স্মুখ থেকে সরে এসে শুধোলাম, কথাটা কি হে ?

সে বল্‌লে—বাঘ !

–দেখেছ ?

—হুঁ· ····

—কোথায় ?

--মেটেপানি পুকুরে ··পুকুরে কাপড় কাচ্‌ছিলাম ··আমি ধোপা। ··একখানা কাপড জলে ডুবিয়ে নিয়ে পাটের ওপর ফেল্‌ব বলে যেমন হাত তুলেছি তেম্‌নি খস্‌খস্‌ একটা শব্দ কানে এল···চেয়ে দেখি, ওপারকার বনমল্লিকের ঝোপের ভেতর···বাবা রে !···বলেই লোকটা পুনরায় শিবনেত্র হয়ে গেল।

—কি দেখলে ?

—বাঘের দুটো চোখ, জল্‌ছে···হাতের কাপড় ফেলে দিয়ে দিলাম ছুট··· বাঘটাও এক লাফ মেরে আমার পিছু নিলে। ভাবলাম, এইবার গেছি। কিন্তু ভগবান বাঁচিয়েছেন···বাঘ পাটের ধারে এসেই কাপড়খানাকে ছিঁড়তে

লেগে গেল……

তাই রক্ষে নইলে এতক্ষণ ……

কি ঘট্‌ত তা সে বল্‌লে না—

কিন্তু বুঝ্‌তে কারো কষ্ট হল না।—

বাঘ-ভির্মির রুগী আপনি সুস্থ হয়ে উঠুক…কিন্তু আমাদের দুর্ভাবনার কথা হয়ে উঠল এইটে যে, বাঘ কাপড় ছেঁড়া তাড়াতাড়ি শেষ করে লোকটার পশ্চাদ্ধাবন করে এই ঘরের কাছাকাছি এসেছে কি না জান্‌তে হলে দরজা খুলে বেরিয়ে চারিদিকটা একবার দেখে আসা দরকার। বিশু সিকদার তাই দরজার খিল নিঃশব্দে খুলে কপাট একটুখানি ফাঁক করে বাইরের কতটা দেখ্‌লে তা সে-ই জানে—

তবে শশব্যস্তে খিল আরও শক্ত করে এঁটে দিয়ে বললে—কই, কোথায় বাঘ!·· কোথাও তো দেখ্‌তে পেলাম না।

বিন্দু বোষ্টম বল্‌লে- নাকের ডগার নজর দুনিয়ার এপার ছেড়ে কত দূরই বা যাবে! দুনিয়ার ওপারে যদি পথ থাকে, এ পারে তো নেই। কি বলো, বিশু?

শুনে আমবা কায়ক্লেশে একটু হাস্‌লাম।—

বিপদের ওপর বিপদ বাধালে হালদার—সে বড়ো তাগিদ দিতে লাগ্‌ল। এতগুলি লোক যদি তার বাড়িতেই রাত কাটাবার ইচ্ছে করে বসে তবেই একটা খরচার ধাক্কা—

চাল অভাবে চিঁড়ে-মুড়ির জলপান দিতেই হবে—অভুক্ত রাখাও অন্যায়—

কাজেই বিকাল পাঁচটায় সে সুদুর ভবিষ্যৎ ভেবেই ঠেল্‌তে লাগল, বল্‌লে—বাঘ যদি এ অবধি ধাওয়া করেই থাকে, তবে সে কি এতক্ষণ না খেয়ে আছে ভেবেছ? রাস্তায় লোকজন চলেছেই, তবু আর কাউকে সে না পাক, মোহন তো এক রকম যেন তাই ভেবেই বেরিয়ে গেল।…বাঘ দিনে একটার বেশি শিকার করে না।…বাড়ি যাও তোমরা, ছেলেপিলেরা সব অরক্ষিত অবস্থায় আছে।

ছেলেপিলেদের অরক্ষিত অবস্থাটা আমরাও জান্‌তাম, কিন্তু এও জান্‌তাম যে, ছেলেপিলেদের মায়েরা আছেন; আমাদের অভাবে তাঁরা অত্যন্ত অরক্ষিত হলেও দরজায় খিল লাগিয়ে দিতে পারেন।

এই কথা শুনে হালদার হাল ছেড়ে দিলে—

যা জানো তা-ই করো, আমি বস্‌লাম—বলে সে কাদার ওপরেই বসে পড়ল; বল্‌তে লাগল,—মোহনের দেহ কি একটুখানি!…একটা বাঘের তিন দিনের খোরাক—তা সে যত বড়ো বাঘই হোক না।…যতক্ষণে মোহনকে শেষ করে বাঘের আবার খিদে পাবে ততক্ষণেও কি তোম্‌রা বাড়ি পৌছতে পার্‌বে না?

শুনে তাকে যথেষ্ট কটূক্তি করা হল —

কিন্তু হালদারের হালছাড়া ভাবটা গেল না।

আসান দিলে মোহন—বাঘের পেটে গিয়ে নয়, ফিরে এসে।

বেরোও তোম্‌রা…বাঘ মারা পড়েছে—বলে সে হুংকার ছেড়ে লাঠি ঘোরাতে লাগ্‌ল—আমরা বাতাসের আওয়াজটা পেলাম—দরজা খুলেই বেরিয়ে এলাম, বেরিয়ে দেখি, তার সঙ্গে ঢের লোক—সবারই হাতে লাঠি।

তারা বল্‌লে—বাঘ এদিকে আসেনি। বলে তারা হাস্‌তে লাগল, যেন ঠাট্টা করে।

বাঘের ভয়ে ছেলেরা ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে—

আর, ক-জনে মতলব করে সদর দরজায় জাঁতি-কল পেতে রাখলে, এলেই বাঘ মারা পড়বে। মেয়েরা কালো হাঁড়ির তলায় চুন দিয়ে ভূতের ছবি এঁকে বাঁশের মাথায় রেখে দিলে—

সূর্য না ডুবতেই ঘরে ঘরে টিনের বাদ্য বাজতে লাগল…শুনে মনে হল, বাঘ যদি যম-কালা না হয় তবে এ শব্দের সীমানা ত্যাগ কর্‌তে সে বাধ্য।

পরদিন বাঘ সম্বন্ধে কোনো কথা শোনা গেল না—আমরা কিছু সাহস পেলাম …বাঘ তবে অন্যদিকে গেছে। গিরি গয়লা বাড়ি বাড়ি বেড়িয়ে একবার করে ময়লা দাঁত দেখিয়ে যেতে লাগল,—কি হে, কত বড়ো বাঘ? আছ তো?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, গিরিধরের হাসি বাসী হতেও গেল না —টাটকাই শুকিয়ে গেল।

কামিনীর মা বেচারী ছাগল পুষতো—

গিরি যেদিন হাসির টহল দিয়ে গেল সেই রাত্রের ভোরেই কামিনীর মা তার ছাগলের খোঁয়াড়ে ঢুকেই চেঁচিয়ে হাহাকার করে বেরিয়ে এল—

মাটিতে আছড়ে পড়ে লুটিয়ে লুটিয়ে মাথা কুট্‌তে লাগল, সে কী কান্না। একমাত্র ছেলে মরলেও মা অমন করে কাঁদে না।

কাকের মুখের খবর পেয়ে দেখতে দেখতে মানুষ জড়ো হল—

কামিনীর মা কাঁদ্‌তে লাগল—ধাড়ি বাচ্চায় নটি ছিল। ঐ টিম্‌টিমে দুটো আছে, আর-সব গেছে। ওরাও কি বাঁচবে? ওদের যে মা মরেছে!

কামিনীর মা মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল।

দেখলাম, খোঁয়াড়ের বেড়ার একটা দিক একেবারে ভাঙা; অগুন্‌তি ছোট ছোট ক্ষুরের দাগ আর হেঁচড়ে টেনে নেবার দাগ রয়েছে—ধুলোর ওপর··· ঐ টিম্‌টিমে দুটির চোখে এমন বিহ্বল ভাব যে, বাঘ ছাড়া অপর কিছু তার কারণ হতেই পারে না।—

কামিনীর মাকে বোঝাব কি! ভয়ে আমাদেরই বুদ্ধিশুদ্ধি তাল পাকিয়ে গেল। চেয়ে দেখি, হারু সরকার মাথা ঘুরে পড়ে বুঝি!

আমরা অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—

কামিনীর মা কাঁদ্‌তে লাগল—কী ঘুম তুই ঘুমিয়েছিলি হতভাগী···তোর যে সর্বনাশ হয়ে গেছে।···কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হঠাৎ সে পাগলের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—আমি থানায় চললাম···দেখি দারোগা কি বলে।

পরে শুনেছি দারোগা তাকে যা বলেছিল তা না শুন্‌লেই ভালো হত—

পরদিন গেল, রাধা গয়লার দুগ্ধবতী গাভীটি। তেমনি গোরু—দেশের সেরা গোরু; দু-বেলায় দশ সের ক্ষীরের মতো দুধ দিত!—

রাধা বল্‌লে,—ঝটাপটির শব্দে ঘুম ভেঙে বিছানায় শুয়ে সস্ত্রীক কাঁপতে লাগলাম ···ওদিকে গোরুর পরলোক যাত্রার শব্দ ক্রমশঃ দুরে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল···

আতঙ্ক ষোলো আনা পূর্ণ হল। দেশের লোক গিয়ে রাধা গয়লার গোয়ালের ভাঙা বেড়ার সাম্‌নে জম্‌ল—কেউ কেউ বাঘের পায়ের দাগ খুঁজতে লাগল, কিন্তু পেলে না।

অনুচিত পাকযন্ত্রে হজম হবার অপেক্ষায় খাসির দেহধারণ অনাবশ্যক—মনে মনে তর্কের পর এই সিদ্ধান্তে এসে দিনু মোড়ল তার খাসিটাকে মেরে ঘরে ঘরে তার মাংস বেঁটে দিলে।

····· চন্দ্র রায়ের ঘোড়াটা গেল—

আরো দুজনের গোরু গেল—

ডোমপাড়ার শুয়োর পর্যন্ত একাদিক্রমে বাঘের পেটে যেতে লাগল···

রোগের চিকিৎসা আছে—

মড়কে রক্ষা-কালী আছেন—

বাঘের জন্যে আফিং আছে, কিন্তু সে খাঁচায় ঢুকিয়ে···এখন উপায় কি? ভাবতে গিয়ে চোখে আঁধার দেখতে লাগ্‌লাম।

চন্দ্র রায় প্রস্তাব কর্‌লে,—ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, গোরু, পাঁঠা, খাসি, মেষ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা—যার যা আছে সব একত্র করে একটা ঘরে খিল এঁটে সারারাত যদি বসে থাকা যায়—

হারু বল্‌লে,—জানো না তাই ও কথা বল্‌ছ।···বাঘের আবার কী ভয়ংকর জোর···থাবার একটি ঘায়ে তোমার দরজা ভেঙে বাঘ যদি তোমায়—তোমায় বলেই বল্‌ছি—ঘরে ঢোকে, তবে সে কি আর মানুষ ফেলে পাঁঠা নিয়ে যাবে?

চন্দ্র রায় কেঁপে উঠল।

আশ্চর্য এই যে, সেই যে লোক্‌টা বাঘ দেখে হাঁপিয়ে এসে পড়েছিল, তারপর কেউ বাঘটিকে চাক্ষুষ করে নাই।

কে একজন অভয় দিল, রাত্তিরেই বাঘের ভয়, দিনে তারা ঘুমোয়।

শুনে ছেলেদের আবার ইস্কুলে পাঠাতে লাগলাম—কিন্তু সেই ইস্কুলের পথ থেকেই টেকো নিত্যানন্দের ছেলেটা ভয়ে সাদা হয়ে মুখে বা-আ-আ শব্দ কর্‌তে কর্‌তে ছুটে এসে একেবারে মরণাপন্ন হয়ে উঠ্‌ল।—

আমরা ভাবতে লাগ্‌লাম,—যখন গোরু বাছুর প্রভৃতি ইতরপ্রাণী সব শেষ হয়ে যাবে তখন কি হবে?

তারপর দেখলে টেকো নিত্যানন্দ নিজে—

সে যে কী অবস্থা তার!···তার টাক পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ কাঁটা দিয়ে উঠ্‌তে লাগল।···সাম্‌লে নিয়ে নিত্যানন্দ যা বল্‌লে তা এই—

চাদরখানা কাঁধে ফেলে সে বেয়াইবাড়ি যাবে বলে বেরিয়েছিল, না গেলেই নয়, তাই দিনে দিনে গিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসাই ছিল তার ইচ্ছে। রায়-বাবুদের আম-কাঁটালের বাগানের ভেতর দিয়ে যে পথটা সেইটে সোজা।··· চল্‌তে চল্‌তে বাগানের মাঝামাঝি সে এসেছে এমন সময় দেখে মস্ত একটা মোটা কাঁটালগাছের গুঁড়ি ঠেস্‌ দিয়ে বসে আছে বাঘ; হাঁড়ির মতো মাথাটা তার। দেখেই তার চোখের তারা কপালে আর নিজে সে "বাবা গো" বলে গাছে উঠে গেল।···বাঘ তারই দিকে চোখ রেখে ঠোঁট চাট্‌তে লাগল।·· সে একটা ডালে বসে আর-একটা ডাল দু-হাতে জড়িয়ে ধরেও পড়ে আর কি··· এমনি যখন অবস্থা, প্রাণ গেছে—আর নেই···তখন বাঘ ঠোঁট চাট্‌তে চাট্‌তে উঠে হেল্‌তে দুল্‌তে জঙ্গলে ঢুকে গেল; ডালে বসে সে কালীকে পাঁঠা আর

হরিঠাকুরকে "লুট" মানত করেছে।···বাঘ চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ সে গাছ থেকে নামে নাই, সম্প্রতি নেমে ছুট্‌তে ছুট্‌তে পালিয়ে এসেছে··· কাঁধের চাদর এখন কোথায় সে-জ্ঞান তার নেই।

তারপর বল্‌লে,—বাঘটা সাত হাত লম্বা খুব হবে।

বিবরণ শুনে কানা কেষ্ট বল্‌লে—বাঘ তোমার পেছু নিয়েছিল সেটা বললে না যে?

--কি রকম?

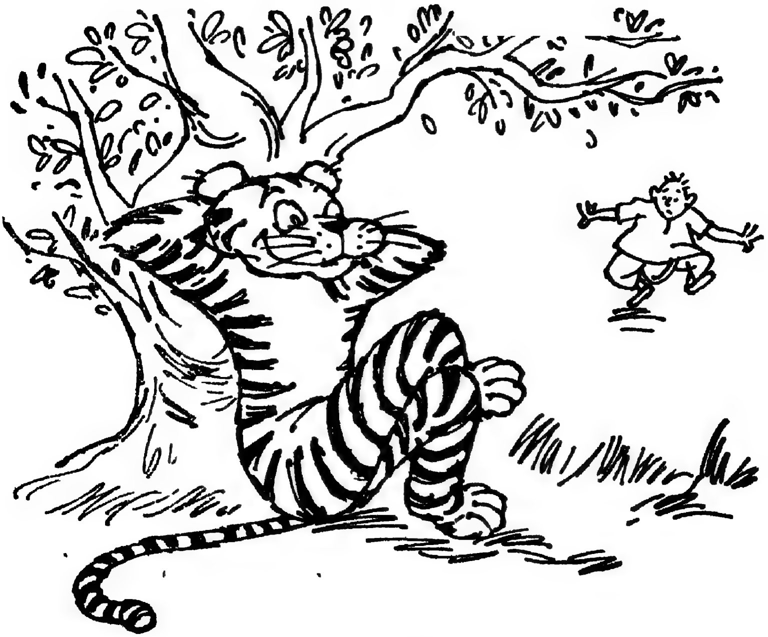

—আমি দেখেছি যে!·· তুমি তো গাছে উঠলে পরে, আগে তো এগুতে তুমি পেছুতে বাঘ···গাছ বেড়ে বেড়ে তুমিও যত ছোটো বাঘও তত ছোটে··· ঘণ্টাখানেক এমনি করে ছোটার পর দুত্তোর বলে তুমি গাছে উঠে গেলে।·· হাতে ছড়িটড়ি থাক্‌লে একহাত বোধ হয় লড়তেই, ভাব দেখে তাই মনে হল।

—তুমি তখন কোথায়?

—আর এক গাছের উপর। বলে কেষ্ট খল্‌খল্ করে হাসতে লাগ্‌ল।

নিত্যানন্দ চটে গেল, বল্‌লে,—আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি?

কেষ্ট বল্‌লে,—আমি কি বল্‌ছি যে তুমি—

কানাকে আমরা ধম্‌কে থামিয়ে দিলাম—

অসময়ে হাসি-তামাশা ভালো লাগে না।

মানুষ ছাড়া আর সব জন্তুই বাঘের পেটে যেতে লাগ্‌ল।

দারোগা কামিনীর মাকে হাঁকিয়ে দেবার সময় বলে দিয়েছিল,—খালি হাতে এলে কি আর বাঘের নামে নালিশ চলে রে? একটা খাসি আন্‌তিস তো দেখা যেতো।

বাঘ যাকে দয়া করে রেখে গেছে, নির্দয় হয়ে তাকেই দারোগার মুখে তুলে দিতে কামিনীর মা-র মন সরে নাই।

কামিনীর মা অবলা, শোকাতুরা—

তাকে দেখে দারোগা তার খাসি খেতে চেয়েছিল—

জোয়ান পুরুষ কাছে গেলে দারোগা যা চেয়ে বস্‌বে বলে অনুমান হল তা দামী জিনিস—

সে-বস্তু দারোগার পাতে দেবার সামর্থ্য আমাদের নাই। কাজেই থানার দিক থেকে সাহায্য পাবার আশা ত্যাগ করেই বসে ছিলাম—

একমাত্র ভরসা ( যদি দয়া করেন ) তিন কোশ দূরের বিজ্‌লিহাটি কুঠীর বাবুরা—ছোটবাবু মস্ত শিকারী, নাম শোনা ছিল।

দশ-বারোজন গিয়ে ছোটবাবুর পায়ের ওপর ঠাস্‌ হয়ে পড়লাম—বাবু রক্ষে করুন।

বাবু কেদারায় বসেছিলেন, হাঁটু কাঁপানো বন্ধ করে বল্‌লেন—কী হয়েছে তোমাদের?

—ভুবনডাঙা বাঘের পেটে গেল, বাবু। বলে হারু সরকার এগিয়ে যেতেই বাবু বল্‌লেন—তোমার নাম?

হারু বল্‌লে—হারাধন সরকার।

—বসো। বলে বাবু আমাদের বসিয়ে সব কথাগুলো মন দিয়ে শুন্‌লেন।

—ঘোড়া, বলদ, মোষ, গোরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, খাসি, পাঁঠা, এমন কি পাতিহাঁস পর্যন্ত, কত যে নষ্ট হয়েছে তা আর কি বল্‌ব, বাবু! আপনি শুনেছি ভারী শিকারী···আমাদের রক্ষে করুন। বলে হারু সরকার তাঁর পা ধর্‌তে গেলে বাবু পা টেনে নিয়ে রাজী হয়ে গেলেন—

বাবু বড়ো ভালোমানুষ।

তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে চলে এলাম—

আর সেই রাত্রে আমার বলদটি গেল।

পরদিন দুপুরে আহারাদি করে কুঁচকি পর্যন্ত বুট এঁটে ছোটবাবু শিকারে এলেন। তাঁর বন্দুক ধর্‌বার কায়দা দেখে ভাব্‌লাম, এ কাজ এঁরই বটে।

ছোটবাবু বিশ্রাম কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লেন,—একা এ বনে তো শিকার হয় না··· জঙ্গল ঘের্‌তে হবে; সঙ্গে লোক চাই।

শুনে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌তে লাগল—

দলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘে মানুষ নিয়ে গেছে এ গল্প শোনা আছে। কিন্তু বলদের শোকে আমার বুক জ্বল্‌ছিল; আমি লাফিয়ে উঠে বল্‌লাম—আমি আপনার সঙ্গে যাব।

ছোটবাবু হেসে বল্‌লেন,—দুজনেও হয় না।

আর একজন উঠ্‌ল···দেখাদেখি আর একজন···ক্রমে আমরা ত্রিশ-বত্রিশজন বাবুর সঙ্গে বাঘ মার্‌তে তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম। বাবু অনেক খোঁজ-পাত্তা নিলেন, ঠিক্ হল ঠিক বারোটার সময় রওনা হতে হবে।

বাবুর হাতে বন্দুক—

আমাদের হাতে কুড়োল থেকে কাটারি পর্যন্ত। ঐ জাতীয় অস্ত্র একটু ধারালো অবস্থায় যার বাড়িতে যটা ছিল সব এনে হাজির কর্‌লে···ছোটবাবু যার কাটারি অপছন্দ কর্‌লেন সে একটু ক্ষুণ্ণই হল। শিকার ব্যাপারে অস্ত্র-শস্ত্র হারাবার ভয় যথেষ্ট তা জেনেও লোকে না বল্‌তেই তা নিয়ে এল দেখে মনে হল, ভয়ে মানুষ দুর্বল হয় খুব। সে সব বাদে, প্রচুর টিন আনা হল—

মশালও নিলাম—

ছোটবাবু ইংরেজি কায়দায় আমাদের সাজিয়ে নিলেন·· এক সারে চারজন··· দু-সারের মাঝে দেড়হাত ফাঁক্···

সমান তালে পা ফেলে যখন রওনা হলাম তখন ভয়ের মধ্যেও আনন্দ হল।

যেখানে নিত্যানন্দ বাঘ দেখেছিল সেই রায়বাবুদের বাগানের পরই খানিকটা ফাঁকা জায়গা; তারপরই অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা জঙ্গল; সামনেই একটা ডোবা; ডোবার ভেতরকার জঙ্গল একেবারে নিরেট—জঙ্গলের মাথা মাটির ওপরেই দু-মানুষ সমান উঁচু, ডোবার পাশেও জঙ্গল—বেত আর বাঁশই বেশি। এইটেই আমাদের গন্তব্য।

রায়বাবুদের বাগানের মুখে আস্‌তেই সবারই পা যেন থেমে থেমে পড়্‌তে লাগ্‌ল—

সকলের আগে ছিলেন বন্দুক নিয়ে ছোটবাবু স্বয়ং ; বেশ আস্‌ছিলাম—ছোটবাবু নির্ভয়ে, আমরাও প্রায় তাই ; কিন্তু এই স্থানটিতে এসে ছোটবাবু পেছন ফিরে চেয়ে নিলেন—

তারপর মাথার ওপর বাঁ হাত ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন,—বলো ভাই বন্দে মাতরম্।

বল্‌লাম।

ছোটবাবু বল্‌লেন,—বাজাও টিন্।

সঙ্গে সঙ্গে এমন বাদ্য বেজে উঠল যে, ভয় হল, সার্কাসের বাঘ তার বীরকেশরী গুরুকে মনে পড়ে যদি এদিকেই আসে !

দুই সারের মধ্যে যে দেড় হাত ফাঁক ছিল, বাগান পার হবার সময় তা কম্‌তে কম্‌তে অগ্রগামীর পিঠের সঙ্গে পশ্চাদ্গামীর পিঠের প্রায় ঠেকাঠেকি হয়ে গেল।

খোসা ফকিরের পিঠের একটা স্থান নবাই কাহারের কাটারির খোঁচা লেগে ফুটো হয়ে গেল—

শিকারে নবাইয়ের এমনি আগ্রহ !

বাগানটা বেশ বড়োই ; পার হতে দেরি হল···আরো দেরি হল লোকগুলোর অনর্থক ভয়ের দরুন। যেতে যেতে একজন বলে ওঠে,—ও কি !···সঙ্গে সঙ্গে সবাই থেমে ভাবে, এইবার গেছি—

কিন্তু সেটা ভ্রমমাত্র।

এমনি করে নির্বিঘ্নে বাগান পার হয়ে ডোবার ধারে এসে ছোটবাবু বল্‌লেন,—এই জঙ্গল তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পেটো টিন্।

টিন্ বাজ্‌তে লাগল—

টিন বাজিয়ে জঙ্গল দু-বার প্রদক্ষিণ করা হল, কিন্তু বাঘ বেরুলো না।·· দু-একজন উঁচু গাছের আগড়ালে উঠে চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখে এল—

বাঘের নিশানা কোথাও নাই।······

কিন্তু দূরদৃষ্ট কাছেই ছিল, দেখা দিল। ··ছোটবাবুর কথায় আর তাঁর বন্দুকের দিকে চেয়ে সাহস পেয়ে লাঠি দিয়ে চোখ বুজে পিট্‌তে লাগলাম সেই মহাজঙ্গল···

পিট্‌তে পিট্‌তে—
যে জায়গায় নিত্যানন্দ পিট্‌ছিল সেই জায়গার জঙ্গল ফুঁড়ে-
কি বেরিয়ে এল তা দেখবার সময় কারো হল না—
মুহূর্ত মধ্যে শিকারবাহিনী নিজের পথ দেখ্‌লে...

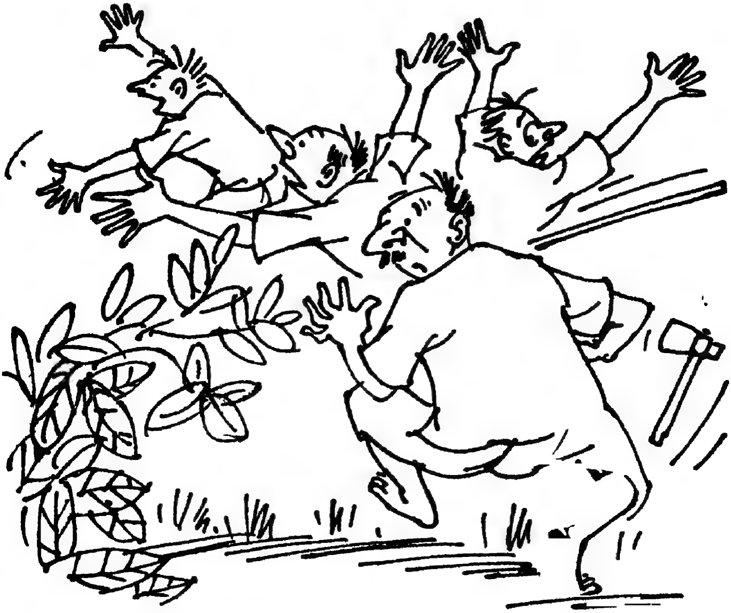

ছোটবাবু ডোবার দিকে লক্ষ্য রেখে আর কঞ্চি আশ্রয় করে বাঁশের ঝাড়ে বসেছিলেন, তিনি সেখান থেকে হেঁকে বল্‌লেন,—বাঘ নয়, বাঘ নয়।

যারা শুন্‌তে পেল তারা ফিরে এল।

—কি ওটা ?

—শেয়াল। বাঘ এখানে নেই। বলে ছোটবাবু নেমে এলেন।

চূড়ান্ত ক্লান্ত হয়ে যখন ফির্‌লাম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বাড়ি পৌঁছতে রাত হল।

আমারই ঘরে ছোটবাবুকে বসিয়ে তাঁকে সুস্থ কর্‌ছি···ডাবটার মুখ কেটে পাথরের বাটিতে জলটুকু ঢেলে তাঁর হাতে দিয়েছি···তিনিও জলটুকু খেয়ে আরামের একটা নিশ্বাস ফেলে সবল হয়ে উঠেছেন, এমন সময় নেপাল সাউ মরি বাঁচি করে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বল্‌লে—বাঘ!

কোথায় ?

—কানা কেষ্টর বাড়িতে ঢুকল। শিগ্‌গির এসো, এত বেলা বুঝি সাফ হয়ে গেল। বলে নেপাল ধুঁক্‌তে লাগ্‌ল।…

ছোটবাবু লাফিয়ে উঠে কাঁধের ওপর বন্দুক তুলে নিলেন, আমরাও কাটারি কুড়োল যা পেলাম তাই নিয়ে মশাল জ্বেলে ছুট্‌তে ছুট্‌তে কেষ্টর বাড়ি এসে দেখি বাড়ি অন্ধকার—কোনো জনমানব সেখানে নেই।……হাঁকতেই কেষ্ট বেরিয়ে এল—

ছোটবাবু বল্‌লেন—খবর পেলাম, তোমার বাড়িতে বাঘ ঢুকেছে।

কেষ্ট তার একটি চক্ষু বড়ো করে বল্‌লে—আমার বাড়িতে বাঘ? কই না।… ঢুকলে আমিই আগে খবর পেতাম।

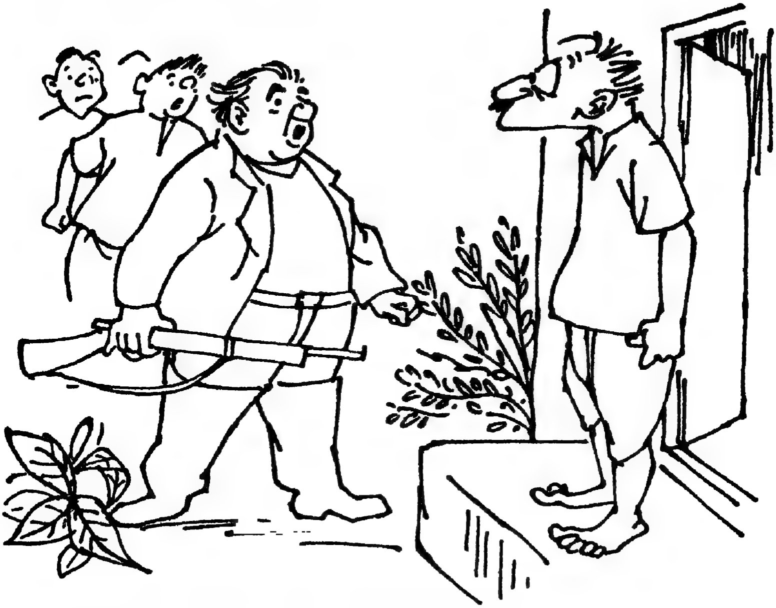

নেপাল এগিয়ে এল, বল্‌লে—হ্যাঁ ঢুকেছে, আমি দেখেছি।

কেষ্ট বল্‌লে,—রান্নাঘরে ঢুকেছিল, ফ্যান্ খেয়ে নর্দমা দে বেরিয়ে গেছে।

নেপাল নাছোড়বান্দা, বল্‌লে—আমি দেখলাম।

কেষ্ট রেগে উঠল—দেখেছ, বেশ করেছ, কাল এসো, রাজা করে দেব।

ছোটবাবু বল্‌লেন,—আহা, তুমি রাগ করছ কেন, কেষ্ট? না ঢোকাই তো মঙ্গলের কথা।

ছোটবাবুর কথায় কেষ্ট শান্ত হল—

হেসে বল্‌লে—আসুন বাবু, বস্‌বেন আসুন। গরীবের ঘর—মনে কিছু কর্‌বেন না। মহা সমাদরে বারান্দায় জল-চৌকি পেতে কেষ্ট বাবুকে বসালে।··· আমার হাতের লণ্ঠন নিয়ে কেষ্ট ঘরে ঢুকে তামাক্ সাজতে বস্‌ল।

ছোটবাবু বসে থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ বলে উঠলেন—কেষ্ট, ওটা কি হে ?

—কোন্‌টা, বাবু ?

—ঐ যে তোমার বিছানার নিচে থেকে ঝুল্‌ছে।

—ও, ঐটে ? ওটা একটা চামর।

—দেখি চামরটা।

কেষ্ট চুপ করে রইল।

ছোটবাবুর আর কোনো দোষ নাই, শিকারীও ভালো, তবে বড়ো একগুঁয়ে। বল্‌লেন—দাও না দেখি।

কেষ্ট নড়লও না, শব্দও কর্‌ল না।

ছোটবাবু তখন আমায় হুকুম কর্‌লেন—আনো তো ঐটে, আমি দেখব।

হুকুম পেয়ে এগিয়ে যেতেই কেষ্ট হাতের বল্‌কে মাটিতে রেখে চট্‌ করে দাঁড়িয়ে উঠে দরজা আগলে এক চক্ষু পাকিয়ে বল্‌লে—খবরদার, আমার ঘরে ঢুকো না বল্‌ছি।

আমি অবাক্ হয়ে পিছিয়ে এলাম—

কিন্তু ছোটবাবু অপমান বোধ করলেন—করবারই কথা। উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে রাগে আঙুল কাঁপিয়ে বল্‌লেন—নিয়ে এসো, আমি চাই ওটা।

ছোটবাবুকে যারা খুশি কর্‌তে চায় তারাই দলে পুরু, আর সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল যে চামর দেখাতে কেষ্টর এত আপত্তি আর অনিচ্ছা কেন!···কাজেই পাঁচ-সাতজন এসে কেষ্টর কিলবৃষ্টি গা-পেতে নিয়ে তাকে ধরে ফেললে—

আমি ঘরে ঢুকে বিছানা উল্‌টে দিলাম—দেখলাম, সাতফুট লম্বা একখানা বাঘছাল লম্বালম্বি পাতা।··

ঝুলছিল তারই লাঙ্গুল।

সুকুমার রায় ( ১৮৮৭-১৯২৩ )

# হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি

প্রফেসার হুঁশিয়ার আমাদের উপর ভারী রাগ করেছেন। আমরা ‘সন্দেশে’ সেকালের জীবজন্তু সম্বন্ধে নানা কথা ছাপিয়েছি। কিন্তু কোথাও তাঁর অদ্ভুত শিকার কাহিনীর কোনোও উল্লেখ করিনি। সত্যি এ আমাদের ভারী অন্যায়। আমরা সে সব কিছুই জানতাম না কিন্তু প্রফেসার হুঁশিয়ার তাঁর শিকারের ডায়েরি থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তারই কিছু কিছু ছাপিয়ে দিলাম। এ সব সত্যি কি মিথ্যা তা তোমরা বিচার করে নিও।

“২৬শে জুন ১৯২২—কারাকোরম, বন্দাকুশ পাহাড়ের দশ মাইল উত্তর। আমরা এখন সবসুদ্ধ দশজন, আমি, আমার ভাগ্নে চন্দ্রখাই, দুইজন শিকারী ( ছক্কড় সিং আর লক্কড় সিং ) আর ছয়জন কুলি। আমার কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

“নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র সব কুলিদের জিম্মায় দিয়ে আমি চন্দ্রখাই আর শিকারী দুজনকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে বন্দুক ম্যাপ আর একটা মস্ত বাক্স, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি আর খাবার জিনিস। দু-ঘণ্টা পথ চলে আমরা এক জায়গায় এলাম—সেখানকার সবই কেমন অদ্ভুত রকম। বড়ো বড়ো গাছ তার একটারও নাম আমরা জানি না। একটা গাছে প্রকাণ্ড বেলের মতো মস্ত মস্ত লাল রঙের ফল ঝুলছে, একটা ফুলের গাছ দেখলাম তাতে হলদে সাদা ফুল হয়েছে, এক একটা দেড় হাত লম্বা। আর একটা গাছে ঝিঙ্গের মতো কি সব ঝুলছে, পঁচিশ হাত দূর থেকে তার ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে এই সব দেখছি, এমন সময় হঠাৎ হুপ্ হাপ গুপ্ গাপ শব্দে পাহাড়ের উপর থেকে ভয়ানক একটা কোলাহল শোনা গেল।

“আমি আর শিকারী দুজন তৎক্ষণাৎ বন্দুক নিয়ে খাড়া; কিন্তু চন্দ্রখাই বাক্স থেকে দুই টিন জ্যাম বের করে নিশ্চিন্তে বসে খেতে লাগল। ওইটে তার একটা মস্ত দোষ, খাওয়া পেলে তার আর বিপদ আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না। এইভাবে, প্রায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকবার পর লক্কড় সিং হঠাৎ দেখতে পেল

হাতীর চাইতেও বড়ো কি একটা জন্তু গাছের উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। প্রথমে দেখে মনে হল একটা প্রকাণ্ড মানুষ। তারপর মনে হল মানুষ নয় বাঁদর, তারপর দেখি মানুষও নয় বাঁদরও নয় —একেবারে নতুন রকমের জন্তু। সে লাল লাল ফলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ঠিক মানুষের মতো করে হাসছে। দেখতে দেখতে পঁচিশ-ত্রিশটা ফল সে টপাটপ খেয়ে শেষ করলে। আমরা এই সুযোগে তার কয়েকখানা ছবি তুলে ফেললাম। তাবপর চন্দ্রখাই ভরসা করে এগিয়ে গিয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়ে আসল। জন্তুটা মহা খুশি হয়ে এক গ্রাসে আস্তো এক খানা পাঁউরুটি আর প্রায় আধ সের গুড় শেষ করে তারপর পাঁচ-সাতটা সিদ্ধ ডিম খোলাসুদ্ধ কড়মড়িয়ে খেলে ফেলল। একটা টিনে করে গুড় দেওয়া হয়েছিল সেই টিনটাও সে খাবার মতলব করেছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ চিবিয়ে হঠাৎ বিশ্রী করে সে কান্নার সুরে গাঁও গাঁও শব্দে বিকট চিৎকার করে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি জন্তুটার নাম দিয়েছি—হ্যাংলা থেরিয়াম।”

“২৪শে জুলাই ১৯২২—বন্দাকুশ পাহাড়ের একুশ মাইল উত্তর। এখানে এত দেখবার জিনিস আছে, নতুন নতুন এত সব গাছপালা জীবজন্তু, যে তারই সন্ধান করতে আর নমুনা সংগ্রহ করতে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে। দু-শ রকম পোকা আর প্রজাপতি আর পাঁচ-শ রকম গাছপালা ফুল ফল সংগ্রহ করেছি আর ছবি যে কত তুলেছি তার সংখ্যাই হয় না। একটা কোনো জন্তু জানোয়ার ধরে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা আছে। দেখা যাক কতদূর কি হয়। সেবার যখন কটক টোডন আমায় তাড়া করেছিল তখন সে কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। এবার তাই জলজ্যান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে নিচ্ছি।

“আমরা যখন বন্দাকুশ পাহাড়ে উঠেছিলাম তখন পাহাড়টা কত উঁচু তা মাপা হয়নি। সেদিন জরিপের যন্ত্র দিয়ে আমি আর চন্দ্রখাই হিসাব করলাম—বেয়াল্লিশ হাজার। তাই আজ আবার সাবধানে দুজনে মিলে মেপে দেখলাম এবার হল মোটে দু-হাজার সাতাশ ফুট। বোধ হয় আমাদের যন্ত্রে কোনো দোষ হয়ে থাকবে। যা হোক এটা নিশ্চয় যে এ পর্যন্ত ঐ পাহাড়ের চূড়োয় আর কেউ ওঠেনি। এ এক সম্পূর্ণ অজানা দেশ। কোথাও জন-মানুষের চিহ্নমাত্র নেই, নিজেদের ম্যাপ নিজেরা তৈরি করে পথ চলতে হয়।

“আজ সকালে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। লকড় সিং একটা গাছে হলদে রঙের

ফল ফলেছে দেখে তার একটুখানি খেতে গিয়েছিল। এক কামড় খেতেই হঠাৎ হাত পা খিঁচিয়ে সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট করতে লাগল। তাই দেখে ছক্কড় সিং “ভাইয়া রে ভাইয়া” বলে কেঁদে অস্থির। যা হোক মিনিট দশেক ঐ রকম হাত পা ছুঁড়ে লক্কড় সিং একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসল। তখন আমাদের চোখে পড়ল যে একটা জন্তু কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে অত্যন্ত বিরক্ত মতন মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখলে মনে হয় যে সংসারে তার কোনো সুখ নেই, এসব গোলমাল কান্নাকাটি কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। আমি তার নাম দিয়েছি—গোমড়া থেরিয়াম। এমন খিটখিটে খুঁতখুঁতে গোমড়া মেজাজের জন্তু আমরা আর দ্বিতীয় দেখিনি। আমরা তাকে তোয়াজ টোয়াজ করে খাবার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলাম। সে অত্যন্ত বিশ্রী মতো মুখ করে ফোঁস ফোঁস ঘোঁত ঘোঁত করে অনেক আপত্তি জানিয়ে, আধখানা পাঁউরুটি আর দুটো কলা খেয়ে তারপর একটুখানি পেয়ারার ‘জেলি’ মুখে দিতেই এমন চটে গেল যে রেগে সারা গায়ে জেলি আর মাখন মাখিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।”

“১৪ই আগস্ট—বন্দাকুশ পাহাড়ের পঁচিশ মাইল উত্তর।—ট্যাপ ট্যাপ থ্যাপ থ্যাপ ঝুপ ঝাপ—সকাল বেলায় খেতে বসেছি, এমন সময় এই রকম একটা শব্দ শোনা গেল। একটুখানি উঁকি মেরে দেখি আমাদের তাঁবুর কাছে প্রায় উটপাখির মতন বড়ো একটা অদ্ভুত রকম পাখি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কোন্ দিকে চলবে তার কিছুই যেন ঠিক ঠিকানা নাই। ডান পা এদিকে যায় তো বাঁ পা ওদিকে। সামনে চলবে তো পিছন বাগে চায়, দশ পা না যেতেই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে। তার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল তাঁবুটা ভালো করে দেখে কিন্তু হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে সে এমন ভড়কে গেল যে তক্ষুনি হুম্‌ড়ি খেয়ে হুড় মুড় করে পড়ে গেল। তারপর এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে প্রায় হাত দশেক গিয়ে আবার হেলে দুলে ঘাঁড় বাঁকিয়ে আমাদের দেখতে লাগল। চন্দ্রখাই বলল, “ঠিক হয়েছে, এইটাকে ধরে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।” তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে। আমি ছক্কড় সিংকে বললাম, “তুমি বন্দুকের আওয়াজ করো, তা হলে পাখিটা নিশ্চয়ই চমকে পড়ে যাবে আর সেই সুযোগে আমরা চার-পাঁচজন তাকে চেপে ধরব।” ছক্কড় সিং বন্দুক নিয়ে আওয়াজ করতেই পাখিটা ঠ্যাঙ মুড়ে মাটির উপর বসে পড়ল, আর আমাদের দিকে

তাকিয়ে ক্যাট ক্যাট শব্দ করে ভয়ানক জোরে ডানা ঝাপটাতে লাগল। তাই দেখে আমাদের আর এগুতে সাহস হল না। কিন্তু লক্কড় সিং হাজার হোক তেজী লোক, সে দৌড়ে গিয়ে পাখিটার বুকে ধাঁই করে এক ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল। ছাতার বাড়ি খেয়ে পাখিটা তৎক্ষণাৎ দুই-পা ফাঁক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর লক্কড সিং-এর দাড়ি কামড়ে ধরে তার ঘাড়ের উপর দুই পা দিয়ে ঝুলে পড়ল। ভাইয়ের বিপদ দেখে ছক্কড় সিং বন্দুকের বাঁট দিয়ে পাখিটার মাথাটা থেঁতলে দেবার আয়োজন করেছিল। কিন্তু সে আঘাতটা পাখিটার মাথায় লাগল না, লাগল গিয়ে লক্কড় সিং-এর বুকে। তাতে পাখিটা ভয় পেয়ে লক্কড় সিংকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দুই ভায়ে এমন মারামারি বেধে উঠল যে আমরা ভাবলাম দুটোই এবার মরে বুঝি। দুজনের তেজ কী তখন! আমি আর দুইজন কুলি ছক্কড় সিং-এর জামা ধরে টেনে রাখছি, সে আমাদের সুদ্ধ হিঁচড়ে নিয়ে ভাইয়ের নাকে ঘুঁষি চালাচ্ছে। চন্দ্রখাই রীতিমতো ভারিক্কে মানুষ, সে ছক্কড সিং-এর কোমর ধরে লটকে আছে, ছক্কড় সিং তাই সুদ্ধ মাটির থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বন্ বন্ করে বন্দুক ঘোরাচ্ছে। হাজার হোক পাঞ্জাবের লোক কিনা। মারামারি থামাতে গিয়ে সেই ফাঁকে পাখিটা যে কখন পালাল তা আমরা টেরই পেলাম না। যা হোক এই ল্যাগব্যাগে পাখি বা ল্যাগব্যাগার্নিসের কতকগুলো পালক আর কয়েকটা ফটোগ্রাফ সংগ্রহ হয়েছিল। তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।”

“১লা সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে।—আমাদের সঙ্গের খাবার ইত্যাদি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। তরিতরকারি যা ছিল, তা তো আগেই ফুরিয়েছে। জিনিসের মধ্যে সঙ্গে কতগুলো হাঁস আর মুরগী আছে, তারা রোজ কয়েকটা করে ডিম দেয়, তাছাড়া খালি বিস্কুট, জ্যাম, টিনের দুধ আর ফল, টিনের মাছ আর মাংস এই সব কয়েক সপ্তাহের মতো আছে। সুতরাং এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ফিরতে হবে। আমরা এই সব জিনিস গুণছি আর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় ছক্কড় সিং বলল যে লক্কড় সিং ভোর বেলা বেরিয়েছে, এখন পর্যন্ত ফেরেনি। আমরা বললাম “ব্যস্ত কেন, সে আসবে এখন। যাবে আবার কোথায় ?” কিন্তু তার পরেও দু-তিন ঘণ্টা গেল অথচ লক্কড় সিং-এর দেখা পাওয়া গেল না। আমরা তাকে খুঁজতে বেরুবার পরামর্শ করছি এমন সময়, হঠাৎ একটা ঝোপের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মাথা দেখা গেল। মাথাটা উঠছে নামছে আর মাতালের মতো টলছে।

দেখেই আমরা সুড়সুড় করে তাঁবুর আড়ালে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম লক্কড় সিং চেঁচিয়ে বলছে “পালিও না, পালিও না ও কিছু বলবে না।” তার পরের মুহূর্তেই দেখি লক্কড় সিং বুক ফুলিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার পাগড়ির কাপড় দিয়ে সে ঐ অতবড়ো জানোয়ারটাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লক্কড় সিং বলল যে সে সকাল বেলা কুঁজো নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ফিরবার সময় এই জন্তুটার সঙ্গে তার দেখা। তাকে দেখেই জন্তুটা মাটিতে শুয়ে কোঁ-কোঁ শব্দ করতে লাগল। সে দেখল জন্তুটার পায়ে কাঁটা ফুটেছে আর তাই দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে। লক্কড় সিং খুব সাহস করে তার পায়ের কাঁটাটি তুলে, বেশ করে ধুয়ে, নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর জানোয়ারটা তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে দেখে সে তাকে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই বললাম, “তাহলে ওটা ওই রকম বাঁধাই থাক, দেখি ওটাকে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাওয়া যায় কি না।” জন্তুটার নাম রাখা গেল—ল্যাংড়া থেরিয়াম।

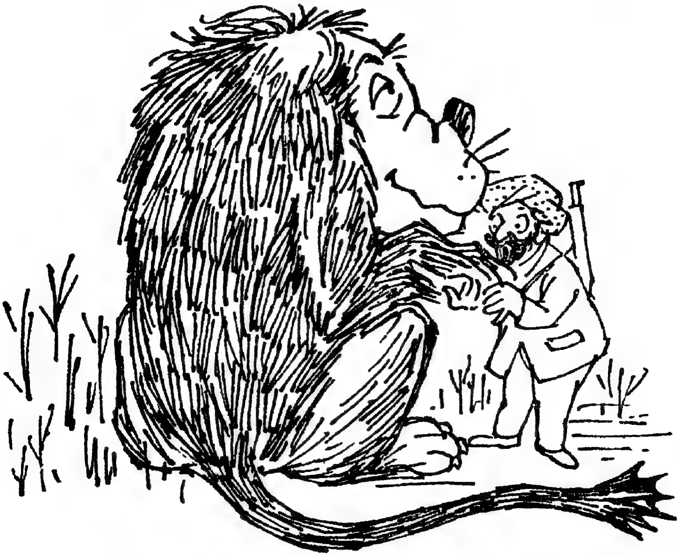

“সকালে তো এই কাণ্ড হল; বিকাল বেলা আর এক ফ্যাসাদ উপস্থিত, তখন আমরা সবে মাত্র তাঁবুতে ফিরেছি। হঠাৎ আমাদের তাঁবুর বেশ কাছেই একটা বিকট চিৎকার শোনা গেল। অনেকগুলো চিল আর প্যাঁচা একসঙ্গে

চেঁচালে যেরকম আওয়াজ হয়, কতকটা সেইরকম। ল্যাংড়া থেরিয়ামটা ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে একটা গাছের লম্বা লম্বা পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল। চিৎকার শুনবামাত্র সে ঠিক শেয়াল যেমন করে ফেউ ডাকে সেই রকম ধরনের বিকট শব্দ করে, বাঁধন টাধন ছিঁড়ে, কতক লাফিয়ে কতক দৌড়িয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে গভীর জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। আমরা ব্যাপার কিছু না বুঝতে পেরে, ভয়ে ভয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা প্রকাণ্ড জন্তু, সেটা কুমিরও নয়, সাপও নয়, মাছও নয়, অথচ তিনটারই কিছু কিছু আদল আছে, সে এক হাত মস্ত হাঁ করে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে আর একটা ছোট নিরীহ গোছের কি যেন জানোয়ার হাত-পা এলিয়ে ঠিক তার মুখের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমরা মনে করলাম যে এইবার বেচারাকে খাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, কেবল চিৎকার চলতে লাগল ; যাবার কোনো চেষ্টাই দেখা গেল না। লক্কড় সিং বলল, "আমি ওটাকে গুলি করি।" আমি বললাম "কাজ নেই, গুলি যদি ঠিকমতো না লাগে তাহলে জন্তুটা ক্ষেপে গিয়ে কি জানি করে বসবে, তা কে জানে?" এই বলতেই ধেড়ে জন্তুটা চিৎকার থামিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে নদীর দিকে চলে গেল। চন্দ্রখাই বলল, "এ জন্তুটার নাম দেওয়া যাক—চিল্লানোসরাস্।" ছক্কড় সিং বলল "উ বাছাকো নাম দিও—বেচারা থেরিয়াম।"

"৭ই সেপ্টেম্বর, কাঁকডামতী নদীর ধারে।—নদীর বাঁক ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের এক্কেবারে শেষ কিনারায় এসে পড়েছি। আর কোনো দিকে এগোবার জো নেই। দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড ; সোজা দু-শ তিন-শ হাত নিচে সমতল জমি সে একেবারে মরুভূমির মতো ; কোথাও গাছপালা জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। আমরা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ঝুঁকে এই সব দেখছি, এমন সময় আমাদের ঠিক হাত পঞ্চাশেক নিচেই কি যেন একটা ধড়ফড় করে উঠল। দেখলাম বেশ একটা মাঝারি গোছের তিমি মাছের মতো মস্ত কি যেন একটা জন্তু পাহাড়ের গা আঁকড়ে ধরে বাদুড়ের মতো মাথা নিচু করে ঘুমোচ্ছে। তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে এইরকম আরো পাঁচ সাতটা জন্তু দেখতে পেলাম। কোনোটা ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে, কোনোটা লম্বা গলা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে, আর অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে কি যেন খুঁটে খুঁটে বের করে খাচ্ছে। এই রকম দেখছি এমন সময়ে হঠাৎ কটকটাং কট শব্দ করে সেই প্রথম জন্তুটা হুড়ুৎ করে ডানা মেলে একেবারে

সোজা আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে আসতে লাগল, এমন বিপদের সময় যে পালানো দরকার তা পর্যন্ত আমরা ভুলে গেলাম। জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে আমাদের মাথার উপর এসে পড়ল। তারপর যে কি হল, তা আমার একেবারে মনে নেই—খালি একটু একটু মনে পড়ে একটা অসম্ভব বিট্‌কেল গন্ধের সঙ্গে ঝড়ের মতো ডানার ঝাপটা আমার গায়ে লেগেছিল তাতেই আমার দম বেরিয়ে প্রাণ বের হবার যোগাড়

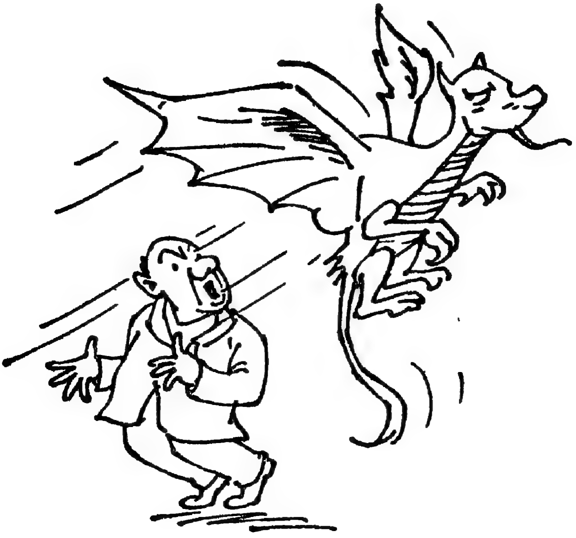

করেছিল। অন্য সকলের অবস্থাও সেই রকম অথবা তার চাইতেও খারাপ। যখন আমার হুঁশ হল তখন দেখি সকলেরই গা-বেয়ে রক্ত পড়ছে। ছক্কড় সিং-এর একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে; লক্কড় সিং-এর বাঁ হাতটা এমন মচকে গিয়েছে যে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে; আমারও সমস্ত বুকে পিঠে বেদনা ধরে গিয়েছে; কেবল চন্দ্রখাই এক হাতে রুমাল দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মুছছে, আর এক হাতে এক মুঠো বিস্কুট নিয়ে খুব মন দিয়ে খাচ্ছে। আমরা তখনি আর বেশি আলোচনা না করে জিনিসপত্র গুটিয়ে বন্দাকুশ পাহাড়ের দিকে ফিরে চললাম।"

প্রফেসার হুঁশিয়ারের ডায়েরি এখানেই শেষ। কিন্তু আমরা আরও খবর জানবার জন্য তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, "এর কাছেই সব খবর পাবে।" চন্দ্রখাইয়ের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয় খুব সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই:—

**আমরা ॥** আপনারা যে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সে-সব কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে ?

**চন্দ্র ॥** সে সব হারিয়ে গেছে ।

**আমরা ॥** বলেন কি ! হারিয়ে গেল ? এমনএমন জিনিস সব হারিয়ে ফেললেন ?

**চন্দ্র ॥** হ্যাঁ, প্রাণটুকু যে হারায়নি তাই যথেষ্ট। সে দেশের বাজ তো আপনারা দেখেননি। তার এক এক ঝাপটায় আমাদের যন্ত্রপাতি, বড়ো বড়ো তাঁবু আর নমুনার বাক্স, সব কাগজের মতো হুস্ করে উড়িয়ে নেয়। আমাকেই তো পাঁচ-সাতবার উড়িয়ে নিয়েছিল। একবার তো ভাবলাম মরেই গেছি। কুকুরটাকে যে কোথায় উড়িয়ে নিল, তা তো আর খুঁজেই পেলাম না। সে যা বিপদ। কাঁটা, কম্পাস, প্ল্যান, ম্যাপ, খাতাপত্র কিছুই আর বাকি রাখেনি। কি করে যে ফিরলাম, তা শুনলে আপনার চুল দাড়ি সব সজারুর মতো খাড়া হয়ে উঠবে। আধ পেটা খেয়ে, কোনো দিন বা না খেয়ে, আন্দাজে পথ চলে, দুই সপ্তাহের রাস্তা পার হতে আমাদের পুরো তিন মাস লেগেছিল।

**আমরা ॥** তাহলে আপনাদের প্রমাণ টমান যা কিছু ছিল সব নষ্ট হয়েছে ?

**চন্দ্র ॥** এই তো আমি রয়েছি, মামা রয়েছেন, আবার কি প্রমাণ চাই ? আর, এই আপনাদের সন্দেশের জন্য কতকগুলো ছবি এঁকে এনেছি ; এতেও অনেকটা প্রমাণ হবে।

আমাদের ছাপাখানার একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলল "আপনি কোন্ থেরিয়াম ?" আর একজন বলল "উনি হচ্ছেন 'গল্প থেরিয়াম', বসে বসে গল্প মারছেন।" শুনে চন্দ্রখাই ভীষণ রেগে আমাদের টেবিল থেকে এক মুঠো চীনে বাদাম আর গোটা আষ্টেক পান উঠিয়ে নিয়ে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ব্যাপার তো এই। এখন তোমরা কেউ যদি আরও জানতে চাও, তা হলে আমাদের ঠিকানার প্রফেসার হুঁশিয়ারকে চিঠি লিখলে আমরা তার জবাব আনিয়ে দিতে পারি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৯৪—১৯৫৪ )

# আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা

---

আইনস্টাইন কেন যে দার্জিলিং যাইতে যাইতে রানাঘাটে নামিয়াছিলেন বা সেখানে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে "On ইত্যাদি ইত্যাদি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন – এ কথা বলিতে পারিব না। আমি ঠিক সেই সময় উপস্থিত ছিলাম না। কাজেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আমি আপনাদের নিকট সরবরাহ করিতে অপারগ, তবে আমি যেরূপ অপরের নিকট হইতে শুনিয়াছি সেরূপ বলিতে পারি।

আসল কথা, নাৎসী জার্মানি হইতে নির্বাসিত হওয়ার পর হইতে বোধহয় আইনস্টাইনের কিছু অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, বক্তৃতা দিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্যেই তাঁর ভারতবর্ষে আগমন। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেনও একথা সকলে জানেন, আমি নূতন করিয়া তাহা বলিব না।

কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীন্তন গণিতের অধ্যাপক রায় বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। সেনেট হলে আইনস্টাইনের অদ্ভুত বক্তৃতা "On the Unity & Universality of Forces" শুনিয়া অন্য পাঁচজন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মতো তিনিও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কলেজে আইনস্টাইনকে আনাইয়া একদিন বক্তৃতা দেওয়াইবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রিন্সিপাল আপত্তি উত্থাপন করিলেন।

তিনি বলিলেন—"না রায় বাহাদুর, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এমন দিনে একজন জার্মান—"

রায় বাহাদুর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন ( যেমন ধরনের উত্তেজিত হইয়া তিনি উঠিতেন সন্ধ্যায় রাসমোহন উকিলের বৈঠকখানায় ভাগবত পাঠের সময়, অন্য কেহ যদি কোনো বিরুদ্ধ তর্ক উত্থাপন করিত ) "সে কি মশাই! জার্মান কি? জার্মান? আইনস্টাইন জার্মান? ওদের মতো মহামানবের, ওদের মতো ঋষি বৈজ্ঞানিকের দেশ আছে? জাতের গণ্ডি আছে? আমি বলি—"

প্রিন্সিপাল বলিলেন—"আমিও বলছি নে যে তা আছে। কিন্তু বর্তমানে যেমন

অবস্থা—” দুই প্রবীণ অধ্যাপকে ঘোর তর্ক লাগিয়া গেল।

প্রিন্সিপাল দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত, তিনি মধ্যযুগের স্কলাস্টিক দর্শনের প্রধান আচার্য জন স্কোটাসের উদাহরণ দেখাইলেন। আয়র্লণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াও নবম শতাব্দীর গোঁড়াদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ফ্রান্সে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। আয়র্লণ্ডে আর ফিরিতে পারিয়াছিলেন কি? আসল মানুষটাকে কে দেখে, তার মতামতেবই মূল্য দেয় লোকে।

যাহা হউক শেষ পর্যন্ত যখন প্রিন্সিপাল রাজী হইলেন না তখন রায় বাহাদুরকে বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইতে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার কানে গেল আইনস্টাইন শীঘ্রই দার্জিলিং যাইবেন। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি নানা স্থানে বক্তৃতা দিতে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি হিমালয় দেখিতে পারেন নাই, এইবার এত কাছে আসিয়া আর দার্জিলিং না দেখিয়া ছাড়িতেছেন না।

রায় বাহাদুর ভাবিলেন দার্জিলিঙের পথে রানাঘাটে নামাইয়া লইয়া সেখানে এক সভায় আইনস্টাইনকে দিয়া বক্তৃতা দেওয়াইলে কেমন হয়?

রায় বাহাদুর গ্র্যাণ্ড হোটেলে আইনস্টাইনেব সঙ্গে দেখা করিলেন।

আইনস্টাইন বলিলেন “ভারতবর্ষের দর্শনের কথা আমায় কিছু বলুন।”

রায় বাহাদুর প্রমাদ গণিলেন। তিনি গণিতের অধ্যাপক; দর্শন, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শনের কোনো খবর রাখেন না, তবুও ভাগ্যে গীতা মাঝে মাঝে পড়া অভ্যাস ছিল; সুতরাং অকূল সমুদ্রে গীতারূপ ভেলা (কোনো আধ্যাত্মিক অর্থে নয়) অবলম্বন করিয়া দু-এক কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। ‘বাসাংসি জীর্ণানি’ ইত্যাদি।

আইনস্টাইন বলিলেন, “ম্যাক্সমূলারের বেদান্তদর্শনের উপর প্রবন্ধ পড়ে এক সময় সংস্কৃত শেখবার বড়ো ইচ্ছে হয়। দর্শনে আমি স্পিনোজার মানস শিষ্য। স্পিনোজার দর্শন গণিতের ফর্মে ক্রমানুসারে সাজানো। স্পিনোজার মন গণিতজ্ঞ স্রষ্টার মন, সেজন্যে আমিও ওঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু বেদান্ত সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধ পড়ে আমি নতুন এক রাজ্যের সন্ধান পেলাম। ইউক্লিডের মতো খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক মন স্পিনোজার, সেখানে কূটতর্কও বাঁধা পথে চলে। আমি কিন্তু ভেতরে ভেতরে কল্পনাবিলাসী—।”

রায় বাহাদুর অবাক হইয়া আইনস্টাইনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনি!”

আইনস্টাইন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “কেন আমার কালের সঙ্গে ক্ষেত্রের

একত্র মিলনকে আপনি কল্পনার ছাঁচে ঢালাই করা বিবেচনা করেন না কি ?”

রায় বাহাদুর আরও অবাক। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, “নতুন ডাইমেনশনের সন্ধানদাতা আপনি, নিউটনের পর নববিশ্বের আবিষ্কারক আপনি—আপনাকে কল্পনাবিলাসী বলতে—”

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান যুগের এই শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীর কবিসুলভ দীর্ঘ কেশ ও স্বপ্নভরা অপূর্ব চোখের দিকে চাহিয়া রায় বাহাদুরের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। কল্পনা প্রখর না হইলে হয়তো বড়ো বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না, রায় বাহাদুর ভাবিলেন। কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, আইনস্টাইন পাশের ছোট টেবিল হইতে চুরুটের বাক্স আনিয়া রায় বাহাদুরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। নিজের হাতে একটি মোটা চুরুট বাহির করিয়া ছুরি দিয়া ডগা কাটিয়া রায় বাহাদুরের হাতে দিলেন। রায় বাহাদুরের বাঙালী মন সংকুচিত হইয়া উঠিল। অত বড়ো বৈজ্ঞানিকের সামনে সিগার ধরাইবেন তিনি, জনৈক হেঁজিপেঁজি অঙ্কের মাস্টার? তাছাড়া সাহেবও তো বটে, সেটাও দেখিতে হইবে তো। সাহেব জাত কাঁচাখেগো দেবতার জাত। রায় বাহাদুর একটা সিগার তুলিয়া বলিলেন—“আপনি ?”

“ধন্যবাদ। আমি ধুমপান করি নে।”

“ও।”

“আমি একটা কথা ভাবছি।”

“কি বলুন।”

“রানাঘাটে সভা করলে কেমন লোক হবে আপনার মনে হয় ? কেমন জায়গা রানাঘাট ?”

“জায়গা ভালোই। লোকও হবে।”

“কিছু টাকা এখন দরকার। যা ছিল জার্মানিতে রেখে এসেছি। ব্যাঙ্কের টাকা এক মার্কও তুলতে দিলে না, একরকম সর্বস্বান্ত।”

“আমি রানাঘাটে বিশেষ চেষ্টা করছি সার।”

“ওখানে বড়ো হল পাওয়া যাবে কি ?”

“তেমন নেই। তবে মিউনিসিপ্যাল হল আছে, মন্দ নয়, কাজ চলে যাবে।”

রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইতে চাহিলেন, ভাবিলেন এত বড়ো লোকের সময়ের ওপর অত্যাচার করিবার দরকার নাই।

আইনস্টাইন বলিলেন—“আমার কিছু ছাপা কাগজ ও বিজ্ঞাপন নিয়ে যান

যে বিষয়ে বক্তৃতা হবে, সে আপনাকে পরে জানাবো। টিকিটের দাম কত করবো?"

"খুব বেশি নয়—এই ধরুন—"

"তিন মার্ক—দশ শিলিং?"

"আজ্ঞে না সার। সর্বনাশ! এ সব গরিব দেশ। দশ শিলিং আজকাল দশ টাকার কাছাকাছি পড়বে। ও-দামে টিকিট কেনবার লোক নেই এ দেশে, সার।"

"পাঁচ শিলিং?"

"আচ্ছা তাই করুন। ছাত্রদের জন্যে এক শিলিং।"

আইনস্টাইন হাসিয়া বলিলেন, "ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের টিকিট কিনতে হবে না। আমি নিজেও স্কুল মাস্টার। আমার ওপর তাদের দাবি আছে। বম্বে ও বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতেও তাই হয়েছিল। ছাত্রদের টিকিট কিনতে হবে না। এই নিয়ে যান ছাপা হ্যাণ্ডবিল ও কাগজপত্র—"

রায় বাহাদুর বিল হাতে পাইয়া পড়িয়া দেখিতে গিয়া বিষণ্ণমুখে বলিলেন—"এ কি সার এ যে ফরাসী ভাষায় লেখা!"

"ফরাসী ভাষায় তো বটেই। প্যারিসে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ছাপিয়েছিলাম। কেন, ফরাসী ভাষা বুঝবে না কেউ? আমি তো সেদিন শুনলাম এখানে ইউনিভার্সিটিতে ফরাসী ভাষা পড়ানো হয়?"

"আজ্ঞে না। সে হয়তো এক আধজন বুঝতে পারে। সে ভাবে ফরাসী ভাষা পড়ানো হয় না। এখানে ইংরেজিটাই চলে। কেউ বুঝবে না, সার।"

"তাই তো! আপনি ইংরিজিতে অনুবাদ করে নিয়ে ওখানে কোনো প্রেসে ছাপিয়ে নেবেন দয়া করে?"

"তা—ইয়ে—আচ্ছা সার।"

রায় বাহাদুর মনে মনে ভাবিলেন—এখান থেকে বালিগঞ্জে গিয়ে বিনোদের শরণাপন্ন হইগে। ছোকরা ভালো ফ্রেঞ্চ জানে। কাঁহাতক আর একজন এত বড়ো লোকের সামনে 'জানি নে মশাই' বলা যায়!

বিনোদ চৌধুরী তাঁর বড়ো শালা। পণ্ডিত লোক। অনেক রকম ভাষা তার জানা আছে। সে উৎসাহের সঙ্গে বিলগুলির বাংলা ও ইংরিজি অনুবাদ করিয়া দিয়া বলিল, "আমি চাটুজ্যে মশাই, রানাঘাট যাব সে দিন। আমার থিয়োরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে পরিচয় অবিশ্যি লিণ্ডেন বুলটনের পপুলার বই

থেকে। তবুও আইনস্টাইনকে আমি এ যুগের ঋষি বলে মানি। সত্যকার দ্রষ্টা ঋষি। সত্যকে যাঁরা আবিষ্কার করেন তারাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। লম্বা লম্বা লাঙল মার্কা ইকোয়েশন বুঝতে না পারি, করতে না পারি, কিন্তু কে কি দরের সেটুকু—"

রায় বাহাদুর দেখিলেন চতুর শ্যালকটি তাঁহাকে ঠেস দিয়া কথা বলিতেছে। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অর্থাৎ সেই সঙ্গে আমার দরটাও বুঝি ঠিক করে ফেললে বিনোদবাবু? বেশ, বেশ।"

"রামোঃ! চাটুজ্যে মশাই, ছি ছি, তেমন কথা কি আমি বলি?"

"বলো না?"

"স্পেস—টাইম—কন্‌টিনিউয়ামের মোহজালে পড়ে কোন্‌টা কখন কি অবস্থায় বলেছি, তা কি সব সময় হলফ নিয়ে বলা যায় চাটুজ্যে মশাই? এবেলা এখানে থেকে যাবেন না?"

"না না, আমার থাকবার জো নেই। অনেক কাজ বাকি। যাতে দু-পয়সা হয় ভদ্রলোকের, সে ভার আমার ওপর। দেখি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানদের একটু ধরাধরি করি গে। ঘুঘু সব। হলটা যদি পাওয়া যায়—"

"কি বলেন আপনি চাটুজ্যে মশাই! আইনস্টাইনের নাম শুনলে হল না দিয়ে কেউ পারবে? আহা, শুনলেও কষ্ট হয়, অত বড়ো বৈজ্ঞানিককে আজ এ বৃদ্ধ বয়সে পয়সার জন্যে বক্তৃতা করে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে—দি ওয়ার্ল্ড ডাজ নট নো ইট্‌স গ্রেটেস্ট—"

"তুমি এখনও ছেলেমানুষ বিনোদ। ঐ যা শেষকালে বললে ঐ কথাটাই ঠিক। অনেক ধরাধরি করতে হবে। পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনেই যাই।"

ইহার পরের কয়েকদিন রায় বাহাদুর অত্যন্ত ব্যস্ত রহিলেন। রানাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান, স্কুলের হেডমাস্টার, উকিল, মোক্তার, সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসাদারগণের সঙ্গে দেখা করিয়া সব বলিলেন। আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য রাখিলেন, সকলেরই যথেষ্ট উৎসাহ, সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ। যেন সবাই আকাশের চাঁদ হাতে পাইতে চলিয়াছে।

বৃদ্ধ মোক্তার অভয়বাবু বলিলেন, "কি নামটি বলিলেন মশাই সাহেবের? আ—কি? আ-ইন্‌-স্টাইন? বেশ বেশ। হাঁ, বিখ্যাত নাম। সবাই জানে,

সবাই চেনে। ওঁরা হলেন গিয়ে স্বনামধন্য পুরুষ—নাম শোনা আছে বইকি।"

রায় বাহাদুর রাগে ফুলিয়া মনে মনে বলিলেন—তোমার মুণ্ডু শোনা আছে, ড্যাম ওল্ড ইডিয়ট! এ তুমি কাপুড়ে মহাজন শ্যামচাঁদ পালকে পেয়েছ? স্বনামধন্য পুরুষ—তিন জন্ম কেটে গেলে যদি এ নাম তোর কানে পৌঁছয়। মিথ্যে সাক্ষী শিখিয়ে তো জন্ম খতম করলি, এখন আইনস্টাইনকে বলতে এসেছ স্বনামধন্য পুরুষ! ইডিয়সির একটা সীমা থাকা চাই।

নির্দিষ্ট দিনে রায় বাহাদুর কৃষ্ণনগর কলেজের কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে লইয়া সকালের ট্রেনে রানাঘাটে নামিলেন। তাঁর শালা বিনোদ চৌধুরী দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিয়াছে, বিশেষ কার্যবশতঃ তাহার আসা সম্ভব হইল না, আইনস্টাইনের বক্তৃতা শোনা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে, ইত্যাদি। সেজন্যে রায় বাহাদুরের মনে দুঃখ ছিল, ছোকরা সত্যিকাব পণ্ডিত লোক, আজকার এমন সভায় বেচারীর আসিবার সুযোগ মিলিল না। ভাগ্যই বটে।

রানাঘাট স্টেশনের বাহিরে আসিয়া সম্মুখের প্রাচীরে নজর পড়িতে রায় বাহাদুর থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। একি ব্যাপার! প্রাচীরের গায়ে লটকানো ঢাউস এক দু-তিন-রঙা বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা আছে—

বাণী সিনেমা গৃহে ( নীল )
আসিতেছেন! আসিতেছেন!! ( কালো )
আসিতেছেন!!! ( কালো )
কে?? ( কালো )
কবে?? ( কালো )
সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী ( লাল )
অদ্য রবিবার ২৭শে কার্তিক সন্ধ্যা ৫॥০ টায় ( নীল )
জনসাধারণকে অভিবাদন করিবেন!! ( কালো )
প্রবেশ মুল্য—৫৲, ৩৲, ২৲ ও ১৲ টাকা ( কালো )
মহিলাদের—৫৲ ও ২৲ টাকা ( কালো )
এমন সুযোগ কেহ হেলায় হারাইবেন না। ( লাল )

কী সর্বনাশ!

রায় বাহাদুর রুমাল বাহির করিয়া কাতিক মাসের শেষের দিকের সকালেও কপালের ঘাম মুছিলেন। তাহার পর একবার ভালো করিয়া পড়িলেন তারিখটা। না, আজই। আজ রবিবার ২৭শে কার্তিক।

অন্যমনস্কভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন আর একখানা সেই বিজ্ঞাপন। ক্রমে যতই যান, সর্বত্রই সেই তিনরঙা বিজ্ঞাপন। ' মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান মহাশয়ের বাড়ি পর্যন্ত যাইতে অন্ততঃ ছত্রিশখানা সেই বিজ্ঞাপন আঁটা দেখিলেন বিভিন্ন স্থানে।

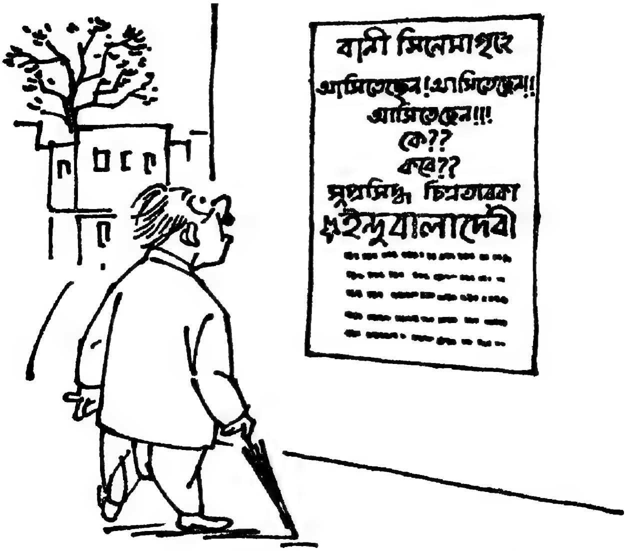

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীগোপালবাবু ফুলবাগানের সামনে ছোট বারান্দায় বসিয়া তেল-ধুতি পরনে তেল মাখিতেছিলেন। রায় বাহাদুরকে দেখিয়া ভালো হইয়া বসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"খুব সৌভাগ্য দেখছি। এত সকালে যে? —নমস্কার!"

"নমস্কার, নমস্কার! চানের জন্যে তৈরি হচ্ছেন? ছুটির দিনে এত সকালে যে?"

"আজ্ঞে হাঁ, চানটা সকালেই করি।"

"বাড়িতে?"

"আজ্ঞে না, চুর্ণীতে যাই। ডুব দিয়ে চান না করলে—অভ্যেস সেই ছেলেবেলা থেকেই। বসুন, বসুন। আজ যখন এসেছেন তখন দুপুরে গরিবের বাড়িতে দুটো ডাল-ভাত—"

"সেজন্যে কিছু না। নো ফরম্যালিটি। আমার মাসতুতো ভাই নীরেনের ওখানে না গেলে রাগ করবে। সেবার তো যাওয়াই হল না।"

"তাহলে চা চলবে তো?"

"তাতে আপত্তি নেই। সে হবে এখন। আসল যে জন্যে আসা—তা এ এক কী হাঙ্গামা দেখছি ? কে ইন্দুবালা দেবী আসছে বাণী সিনেমাতে আজই—"

"হ্যাঁ তাই তো, দেখছিলাম বটে।"

"দিন বুঝে আজই ?"

"তাই তো—আমিও তাই ভাবছিলাম। ক্ল্যাশ করবে কি না ?"

"এখন তো আমরা দিন বদলাতে পারি না। সব ঠিকঠাক। আমাদেরও হ্যাণ্ডবিল বিলি, বিজ্ঞাপন বিলি, সব হয়ে গিয়েছে। আইনস্টাইন আসবেন এই দার্জিলিং মেলে।"

"আমিও তা ভেবেছি। তাই তো—"

"তবে আমার কি মনে হয় জানেন ? যারা সিনেমাতে ইন্দুবালাকে দেখতে যাবে, তারা সাহেবদের লেকচার শুনতে আসবে না। সাহেবদের সভায় যারা আসবে, তারা ঠিকই আসবে।"

আইনস্টাইনকে 'সাহেব' বলিয়া উল্লেখ করাতে রায় বাহাদুর মনে মনে চটিয়া গেলেন। এমন জায়গাতেও তিনি আনিতে চলিয়াছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে ! একি পাটকলের ম্যানেজার, না রেলের টি-আই, যে 'সাহেব' 'সাহেব' করবি ? বুঝে-সুঝে কথা বলতে হয় তো।

মুখে বলিলেন, "হাঁ, তা বটে।"

ভাইস-চেয়ারমান শ্রীগোপালবাবু তাঁর অমায়িক আতিথেয়তার জন্য রানাঘাটে প্রসিদ্ধ। চা আসিল, সঙ্গে এক রেকাবি খাবার আসিল। রায় বাহাদুর চা-পানান্তে আরও নানাস্থানে ঘুরিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। অনেকের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। অনেক কিছু ঠিক করিতে হইবে।

যাইবার সময় বলিলেন—"মিউনিসিপ্যাল হলের চাবিটা—"

শ্রীগোপালবাবু বলিলেন—"আমাদের হলের চাকর রাজনিধিকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার বাসার চাকরও যাবে। ওরা হল খুলে সব ঠিক করবে। সেখানে ফ্রী রীডিং রুম আছে, সকালে আজ ছুটির দিন খবরের কাগজ পড়তে লোকজন আসবে। তাদের মধ্যে যারা ছেলে-ছোকরা তাদের ধরে চেয়ার বেঞ্চি সাজিয়ে নিচ্ছি। কিছু ভাববেন না।"

শ্রীগোপালবাবু স্নান করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিতেই তাহার বড়ো মেয়ে ( শ্রীগোপালবাবু আজ তিন বৎসর বিপত্নীক, বড়ো মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়াছে, সে-ই সংসার দেখাশুনা করে ) বলিল, "বাবা, আমাদের পাঁচখানা

টিকিট করে এনে দাও।"

"কিসের টিকিট ?"

"বা রে, বাণী সিনেমায় ওবেলা ইন্দুবালা আসছে—নাচগান হবে। সবাই যাচ্ছে আমাদের পাড়ার।"

"কে যাচ্ছে ?"

"সবাই। এই মাত্তর রাণু, অলকা, টেঁপি, যতীনকাকার মেয়ে টেঁড়স এরা এসেছিল। ওরা সব বক্স নিচ্ছে একসঙ্গে—বক্স নিলে মেয়েদের আড়াই টাকা করে রিজার্ভ টিকিট দিচ্ছে। আমাদের জন্যে একটা বক্স নাও।"

শ্রীগোপালবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন, "হ্যাঁ ভারী—আবার একটা বক্স। বড্ড টাকা দেখেছিস আমার। সেই ১৯০৩ সাল থেকে জোয়াল কাঁধে নিয়েছি, সে জোয়াল আর নামলো না। কেবল টাকা দাও আর টাকা দাও—"

অপ্রসন্ন মুখে দেরাজ খুলিয়া মেয়ের হাতে একখানা দশ টাকার নোট ও কয়েকটি খুচরা টাকা ফেলিয়া দিলেন।

একটু পরে প্রতিবেশী রাধাচরণ নাগ আসিয়া বৈঠকখানায় উঁকি মারিয়া বলিলেন, "কি হচ্ছে শ্রীগোপালবাবু ?"

"আসুন ডাক্তারবাবু, খবর কি ? যাচ্ছেন তো ওবেলা ?"

"হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনারা যাচ্ছেন তো ?"

"যাব বই কি। রানাঘাটের ভাগ্যে অমন কখনও হয়নি। যাওয়া উচিত নিশ্চয়।"

"আমিও তাই বলছিলাম বাড়িতে। টাকা-খরচ—ও তো আছেই। কিন্তু এমন সুযোগ—বাড়ির সবাই ধরেছে, দিলাম দশটা টাকা বার করে। বলি বয়স তো হল ছাপ্পান্নর কাছাকাছি, কোন্‌দিন চোখ বুজবো, তার আগে—"

"নিশ্চয়। জীবনে ওসব শোনবার সৌভাগ্য ক-বার ঘটে ? আমাদের রানাঘাটবাসীর বড়ো সৌভাগ্য যে উনি আজ এখানে আসবেন।"

"আমিও তাই বলছিলাম বাড়িতে। বয়স হয়ে এল, দেখে নিই শুনে নিই—গেলই না হয় গোটাকতক টাকা।"

"তাছাড়া অত বড়ো বিখ্যাত একজন—"

"সে আর বলতে। আজকাল সব জায়গায় দেখুন ইন্দুবালা দেবী, সাবানের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা, গন্ধতেলের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা, শাড়ির বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালার ছবি! তাকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য—বিশেষ করে রানাঘাটের

মতো এঁদোপড়া জায়গায়—সৌভাগ্য নয় ? নিশ্চয়ই সৌভাগ্য !”

শ্রীগোপালবাবু হাঁ করিয়া নাগ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, প্রথমটা তাঁর মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। ঝাড়া মিনিট-দুই পরে আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, “আমি কিন্তু সে কথা বলছিনে। আমি বলছি সাহেবের লেকচারের কথা, মিউনিসিপ্যাল হলে।”

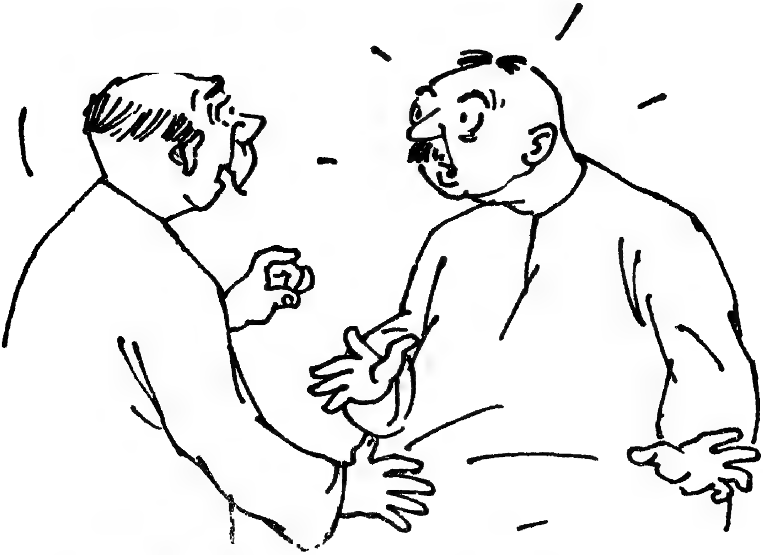

রাধাচরণবাবু ভুরু কুঁচকাইয়া বলিলেন, “কোন্ সাহেব ?”

“কেন আপনি জানেন না ? আইনস্টাইন—মিঃ আইনস্টাইন !”

রাধাচরণবাবু উদাসীন স্বরে হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ার ভঙ্গিতে বলিলেন, “ও সেই জার্মান না ইটালিয়ান সাহেব ? হ্যাঁ—শুনেছি, আমার জামাই বলছিল। কি বিষয় যেন লেকচার দেবে ? তা ওসব আর আমাদের এ বয়সে—লেখাপড়ার বালাই অনেকদিন ঘুচিয়ে দিয়েছি। ওসব করুক গে কলেজের ইস্কুলের ছেলে-ছোকরারা—হ্যাঃ !”

শ্রীগোপালবাবু ক্ষীণ প্রতিবাদের স্বরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, রাধাচরণবাবু পুনরায় বলিলেন, “তা, আপনি কি করবেন শুনি ?”

“আমার বাড়ির মেয়েরা তো যাচ্ছে সিনেমায়। তবে আমাকে যেতেই হবে সাহেবের বক্তৃতায়। রায় বাহাদুর নীলাম্বরবাবু এসে খুব ধরাধরি করেছেন—”

“কে রায় বাহাদুর ? নীলাম্বরবাবুটি কে ?”

“কৃষ্ণনগর কলেজের প্রফেসার। তাঁরই উদ্যোগে এ সব হচ্ছে। তিনি এসে

বিশেষ—”

রাধাচরণবাবু চোখ মিটকি মারিয়া বলিলেন, “আরে ভায়া, একটা কথা বলি শোনো। একটা দিন চলো দেখে আসা যাক। ছবির ইন্দুবালা আর জ্যান্ত ইন্দুবালাতে অনেক ফারাক। ইহজীবনের একটা কাজ হয়ে যাবে। ওসব সাহেব-টাহেব ঢের দেখা হয়েছে। দু-বেলা রানাঘাট ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে থাকো দার্জিলিং মেল শিলং মেলের সময়ে দেখো না কত সাহেব দেখবে। কিন্তু ভায়া, এ সুযোগ—বুঝলে না?”

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, “তা—তা—কিন্তু, তবে রায় বাহাদুরকে কথা দেওয়া আছে কিনা, তিনি কি মনে করবেন—”

রাধাচরণবাবু মুখ বিকৃত করিয়া খিঁচাইবার ভঙ্গিতে বলিলেন, “হ্যাঃ! কথা দেওয়া হয়েছে রায় বাহাদুরকে! ভারী রায় বাহাদুর! এত কি ওব্লিগেশন আছে রে বাবা। বোলো এখন, বাড়ির মেয়েরা সব গেল তাই আমায় যেতে হল। তারা ধরে বসলো তা এখন কি করা। বলি, কথাটা তো নিতান্ত মিথ্যে কথাও নয়।”

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, “তা—তা—তা তো বটেই। সে কথা তো—”

রাধাচরণবাবু বলিলেন, “রায় বাহাদুর এলে বোলো এখন তাই। তাঁকেও অনুরোধ করো না বাণী সিনেমায় যেতে।”

“চললেন?”

“চলি। ও বেলা আসব ঠিক সময়ে।”

রায় বাহাদুর স্থানীয় জমিদার নীরেন চাটুজ্যের বাড়িতে বসিয়া সভা সম্বন্ধে পরামর্শ ও আয়োজন করিতেছিলেন।

নীরেনবাবু রায় বাহাদুরের মাসতুতো ভাই, স্থানীয় জমিদার ও উকিল। উকিল হিসাবে হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু জমিদারির আয় ও পূর্বপুরুষ-সঞ্চিত অর্থে রানাঘাটের অনেকেই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। শিক্ষিত লোকও বটে।

রায় বাহাদুর গুরুভোজন করিয়া উঠিয়াছেন মধ্যাহ্নে। ধনী মাসতুতো ভাই-এর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন রীতিমতো গুরুতর। দু-একবার নিদ্রাকর্ষণ হইতেও ছিল, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে শুইতে পারেন নাই।

নীরেনবাবু বলিলেন, “আচ্ছা দাদা, বক্তৃতার মোট কথাটা কি হবে আজকের ?”

“তা ঠিক জানিনে। On the unity of forces—এই বিষয়বস্তু। এ থেকে ধরে নাও।”

“উনি space-এর অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছেন, কি বলো ?”

“অর্থাৎ ?”

“Space বলেছেন সীমাবদ্ধ। আগেকার মতো অসীম, অনন্ত space আর নেই।”

“তোমার ম্যাথেমেটিক্‌স ছিল এম এস-সি-তে ? Geometry of Hyperspaces পড়েছো ?”

“মিক্সড ম্যাথেমিটিক্স ছিল। আপনি যা বলছেন, তা আমি জানি।”

“খুব খুশি হলুম দেখে নীরেন যে শুধু জমিদারি করো না, জগতের বড়ো বড়ো বিষয় একটু-আধটু সন্ধান রাখো। খুব বেশি সন্ধান হয়তো নয়, তবুও the very little that you know is unknown to many.”

“আচ্ছা দাদা উনি কি আজই চলে যাবেন ?”

“সম্ভব। দার্জিলিং যাবেন বলছিলেন। দার্জিলিঙের পথে এখানে নামবেন। যাতে ওঁর দু-পয়সা আজ হয়, সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।”

“আজ সভার পরে আমার বাড়িতে আনুন না একবার দাদা ? এখানে রাতের জন্যে রাখতেও পারি। আজ দার্জিলিঙের গাড়ি নেই। রাত্রে এখানে থাকুন। কোনো অসুবিধা হবে না।”

“বেশ তাই বলব এখন।”

“যাতে থাকেন তাই করুন। কালই খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট করিয়ে দেব এখন। ফ্রী প্রেসের আর আনন্দবাজারের রিপোর্টার এখানে আছে।”

রায় বাহাদুর বুঝিলেন তাঁর মাসতুতো ভাইটির দরদ কোথায়। সে সব কথা তুলিয়া কোনো লাভ নাই, এখন কোনো রকমে কার্যসিদ্ধি হইলেই হয়। কোনো রকমে আজ মিটিং চুকিলে বাঁচেন।

বাড়ির ভিতর হইতে নীরেনবাবুর মেয়ে মীনা আসিয়া বলিল, “ও জ্যাঠামশাই, বাবাকে বলে আমাদের টিকিটের টাকা দিন।”

নীরেনবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, “যা যা বাড়ির মধ্যে যা, এখন বিরক্ত করিস নি। ব্যস্ত আছি।”

মীনা আবদারের সুরে বলিল, "তোমাকে তো বলিনি বাবা, জ্যাঠামশাইকে বলছি।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের টিকিট রে মীনু?"

মীনা বলিল, "আপনি কোথায় থাকেন যে সর্বদা! আমাদের পাশের বাড়ির সবিতা আপনাদের কলেজে পড়ে, সে বললে আপনি নাকি পথ চলতে চলতে অঙ্ক কষেন। সত্যি, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই?"

নীরেনবাবু পুনরায় ধমকের সুরে বলিলেন, "আঃ, জ্যাঠা মেয়ে! যা এখান থেকে। জ্বালালে দেখছি। কিসের টিকিট জানেন দাদা, ঐ যে ইন্দুবালা নাকি আজ আসছে আমাদের এখানকার বাণী সিনেমাতে, নাচগান হবে, কি নাকি বক্তৃতাও দেবে, তাই পাড়াসুদ্দু ভেঙেছে দেখবার জন্যে। মেয়েরা তো সকাল থেকে জ্বালালে।"

"তা দাও না ওদের যেতে। আইনস্টাইনের লেকচারে আর ওরা কি যাবে। তবে দেখে রাখলে একটা বলতে পারতো সারাজীবন। কি রে মীনু কোথায় যাবি?"

"আমরা জ্যাঠামশাই সিনেমাতেই যাই। 'মিলন' ফিল্‌মে ইন্দুবালাকে দেখে পর্যন্ত বড্ড একটা ইচ্ছে আছে ওকে দেখবো। রানাঘাটে অমন লোক আসবে—"

রায় বাহাদুর বাকিটুকু জোগাইয়া বলিলেন, "—স্বপ্নের অগোচর! তাই না মীনু? টিকিটের দাম দিয়ে দাও মেয়েকে ওহে নীরেন।"

মীনা এবার সাহস পাইয়া বলিল, "আপনাকে আর বাবাকে যেতে হবে আমাদের নিয়ে। সে শুনছিনে। বাবার মনে মনে ইচ্ছে আছে জ্যাঠামশাই। শুধু আপনার ভয়ে—"

নীরেনবাবু তাড়া দিয়া বলিলেন, "তবে রে দুষ্টু মেয়ে—"

মীনা হাসিতে হাসিতে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

যাইবার সময় বলিয়া গেল, "বাবা তোমাকে যেতেই হবে আমাদের নিয়ে। ছাড়বো না বলে দিচ্ছি।"

দার্জিলিং মেলের সময় হইয়াছে। বেলা সাড়ে পাঁচটা।

রায় বাহাদুর ও কয়েকজন ছাত্র, নীরেনবাবু ও শ্রীগোপালবাবু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু—একি?

এত ভিড় কিসের ? প্ল্যাটফর্মের চারিদিকে এত ছোকরা ছাত্র, লোকজনের ভিড় ! সত্যই কি আজ আইনস্টাইনের উপস্থিতিতে এখানকার সকলের টনক নড়িয়াছে ? ইহারা সকলেই দার্জিলিং মেলের সময় আসিয়াছে তাঁহাকে নামাইয়া লইতে ? অত বড়ো বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা বটে ! লোকে লোকারণ্য প্ল্যাটফর্মে। হৈ হৈ কাণ্ড। রায় বাহাদুর পুলকিত হইলেন। সশব্দে মেলট্রেন আসিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল।

একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা হইতে ছোট একটি ব্যাগ হাতে দীর্ঘকেশ আয়তচক্ষু আইনস্টাইন অবতরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি ফার্স্ট ক্লাস হইতে জনৈকা সুন্দরী তরুণী, পরনে দামী ভয়েল শাড়ি, পায়ে জরিদার কাশ্মীরী স্যাণ্ডেল—হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলাইয়া নামিয়া পড়িলেন। তরুণীর সঙ্গে আরও দুটি তরুণী, দুটিই শ্যামাঙ্গী—দুজন চাকর, তারা লাগেজ নামাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

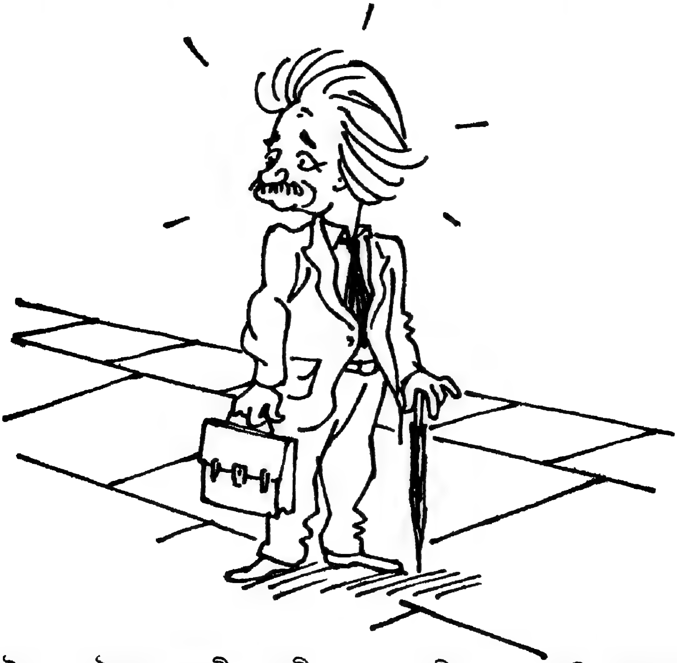

কে একজন বলিল, “ঐ যে নেমেছেন ! ঐ তো ইন্দুবালা দেবী—”

মুহূর্তমধ্যে প্ল্যাটফর্মসুদ্ধ লোক সেদিকে ভাঙিয়া পড়িল। সেই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে রায় বাহাদুর অতিকষ্টে আইনস্টাইনকে লইয়া গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আইনস্টাইন অত বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ভাবিলেন তাঁহাকেই দেখিবার জন্য এত লোকের ভিড়। রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা সবই কি স্থানীয় ইউনিভার্সিটির ছাত্র? এদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন না মিঃ চ্যাটার্জি?"

রায় বাহাদুর এই উদার সরলপ্রাণ বিজ্ঞান-তপস্বীর ভ্রম ভাঙাইবার চেষ্টা করিলেন না।

রানাঘাটে আবার ইউনিভার্সিটি! হায় রে, এ দেশ কোন্ দেশ তা ইনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। সবই ইওরোপ নয়।

নীরেনবাবু চাহিয়া চিন্তিয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনী গোপাল পালেদের পুরানো ১৯১৭ সনের মডেলের গাড়িখানি জোগাড় করিয়াছিলেন। তাহাতেই সকলে মিলিয়া চড়িয়া মিউনিসিপ্যাল হলের দিকে অগ্রসর হইলেন। গাড়িতে উঠিবার সময় দেখা গেল তখনও বহুলোক স্টেশনের গেটের দিকে ছুটিতেছে। একজন কে বলিতেছিল, "গাড়ি অনেকক্ষণ এসেছে, ঐ দেখ্ লেগে আছে প্ল্যাটফর্মে। শিগগির ছোট।" ভিড়ের মধ্যে কে উত্তর দিলে, "এখান দিয়েই তো বেরুবেন, আর ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দরকার নেই। বড্ড ভিড়। ও তো চেনামুখ। দেখলেই চেনা যাবে! কত ছবিতে দেখা আছে! সে দিনও 'মিলন' ফিল্‌মে—"

আইনস্টাইন কৌতুকের সঙ্গে বলিলেন, "এরাও ছুটছে স্টেশনে বুঝি? ওরা জানে না যাকে দেখতে চলেছে সে তাদের সামনেই গাড়িতে উঠেছে। বেশ মজা, না? মিঃ চ্যাটার্জি এখানে ইউনিভার্সিটি কোন্ দিকে?"

সৌভাগ্যক্রমে ভিড়ের মধ্যের একটা লোক আইনস্টাইনের গাড়ির সামনে আসিয়া চাপা পড়োপড়ো হওয়াতে হঠাৎ ফুটব্রেক কষার কর্কশ শব্দের ও 'এই এই' 'গেল গেল' রবের মধ্যে তাঁহার প্রশ্নটা চাপা পড়িয়া গেল। স্টেশন ও ভিড় ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই মোড়ের মাথায় শ্রীগোপালবাবু ও নীরেনবাবু নামিয়া গেলেন। রায় বাহাদুর বলিলেন, "এখুনি আসবেন তো?"

শ্রীগোপালবাবু কি বলিলেন ভালো বোঝা গেল না। নীরেনবাবু বলিলেন, "ওখানে ওদের পৌঁছে দিয়েই আসছি। আর কেউ বাড়িতে লোক নেই মেয়েদের নিয়ে যেতে। টিকিটে এতগুলো টাকা যখন গিয়েছে—"

ঐ সামনেই মিউনিসিপ্যাল হল। স্টেশনের কাছেই। কিন্তু এ কি? সাড়ে

পাঁচটা সময় দেওয়া ছিল। পৌনে ছটা হইয়াছে, কেউ তো আসে নাই। জনপ্রাণী নয়। কেবল মিউনিসিপ্যাল আপিসের কেরানী জীবন ভাদুড়ী একটা ছোট টেবিলে অনেকগুলি টিকিট সাজাইয়া শ্রোতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মোটর হলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেই আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া নামাইলেন রায় বাহাদুর। মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "হে বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ, সুস্বাগত! আমাদের রানাঘাটের মাটিতে আপনার পদার্পণের ইতিহাস সুবর্ণ অক্ষরে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করুক —আমরা রানাঘাটবাসীরা আজ ধন্য!"

চকিত ও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে শূন্যগর্ভ হলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সঙ্গে সঙ্গে। লোক কই? রানাঘাটবাসীদের অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ কোথায়?

আইনস্টাইন বিস্মিত দৃষ্টিতে জনশূন্য হলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখনও আসেনি কেউ? সব স্টেশনে ভিড় করেছে। মিঃ চ্যাটার্জি, একটা ব্ল্যাক-বোর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে যে। বক্তৃতার সময় ব্ল্যাক-বোর্ডে আঁকবার দরকার হবে।"

আর ব্ল্যাক-বোর্ড। রায় বাহাদুর স্থানীয় ব্যক্তি। নাড়িজ্ঞান আছে এ জায়গার। তিনি শূন্য ও হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

জীবন ভাদুড়ী কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "মোটে তিন টাকার বিক্রি হয়েছে। তাও টাকা দেয়নি এখন। কি করবো বলুন সার? আমাকে কতক্ষণ থাকতে হবে বলুন। আমার আবার বাসার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাণী সিনেমাতে যেতে হবে। কলকাতা থেকে ইন্দুবালা এসেছেন—বাড়িতে বড্ড ধরেছে সব। পঁয়ত্রিশ টাকা মোটে মাইনে—তা বলি যাক গে, কষ্ট তো আছেই। ওঁদের মতো লোকে তো রোজ কলকাতা থেকে আসবেন না। যাক্, পাঁচ টাকা খরচ হলে আর কি করছি বলুন। আমায় একটু ছুটি দিতে হবে সার। এ সাহেব কে? এ সাহেবের লেকচারে আজ লোক হবে না - কে আজ এখানে আসবে সার!"

জীবন ভাদুড়ী ক্যাশ বুঝাইয়া দিয়া খসিয়া পড়িল। হলের মধ্যে দেখা গেল চেয়ার বেঞ্চির জনহীন অরণ্যে মাত্র দুটি প্রাণী -- আইনস্টাইন ও রায় বাহাদুর।

আইনস্টাইন ব্যাগ খুলিয়া কি জিনিসপত্র টেবিলের উপর সাজাইতে ব্যস্ত ছিলেন, সেগুলি তাঁহার বক্তৃতার সময় প্রয়োজন হইবে—সেই সুযোগে রায়

বাহাদুর একবার বাহিরে গিয়া রাস্তার এদিক ওদিক উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিতে লাগিলেন।

লোকজন যাইতেছে, ঘোড়ার গাড়িতে মেয়েরা সাজগোজ করিয়া চলিয়াছে, দ্রুতপদে পথিকদল ছুটিয়াছে—সব বাণী সিনেমা লক্ষ্য করিয়া।

রায় বাহাদুরের একজন পরিচিত উকিলবাবু ছড়িহাতে দ্রুতপদে জনসাধারণের অনুসরণ করিতেছিলেন, রায় বাহাদুরকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন —"এই যে! সাহেব এসেছেন? লোকজন কেমন হয়েছে ভেতরে? আজ আবার আনফরচুনেটলি ওটার সঙ্গে ক্ল্যাশ করল কি না? অন্যদিন হলে—না, আমার জো নেই—বাড়ির মেয়েরা সব গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কেউ নেই। বাধ্য হয়ে আমাকে—কাজেই—"

রায় বাহাদুর মনে মনে বলিলেন—হ্যাঁ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সাড়ে ছটা। পৌনে সাতটা। সাতটা। জনপ্রাণী নাই।

বাণী সিনেমা গৃহ লোকে লোকারণ্য। টিকিট কিনিতে না পাইয়া বহুলোক বাহিরে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে। একদল জোর-জবরদস্তি করিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে। মেয়েদের বসিবার দুই দিকের ব্যালকনির

অবস্থা এরূপ যে আশঙ্কা হইতেছে ভাঙিয়া না পড়ে। স্টেজে যবনিকা উঠিয়াছে। চিত্রতারকা ইন্দুবালা সম্মুখে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন—তাঁরই গাওয়া 'মিলন' ছবির কয়েকখানি দেশবিখ্যাত, বালক বৃদ্ধ, যুবার মুখে মুখে গীত গান—'জংলা হাওয়ায় চমক লাগায়,' 'ওরে অচিন দেশের পোষা পাখি,' 'রাজার কুমার পক্ষীরাজ' ইত্যাদি।

এমন সময় রায় বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে টকি হলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে শ্রীগোপালবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পাশেই অদূরে নীরেনবাবু বসিয়া। বলিলেন—"বা রে, আপনিও এখানে!"

হঠাৎ ধরাপড়া চোরের মতো থতোমতো খাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে শ্রীগোপালবাবু বলিলেন—"আসার ইচ্ছে ছিল না, কি করি, কি করি—মেয়েরা—ওদের আনা—ইয়ে—সাহেবের লেকচার কেমন হল? লোকজন হয়নি?"

"কি করে হবে? আপরারা সবাই এখানে। লোক কে যাবে?"

"সাহেব কোথায়? চলে গেলেন?"

"এই যে—"

রায় বাহাদুরের পিছনেই দাঁড়াইয়া স্বয়ং আইনস্টাইন।

শ্রীগোপালবাবু শশব্যস্তে উঠিয়া আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া খাতির করিয়া নিজের চেয়ারে বসাইলেন।

একটি খবরের কাগজের কাটিং রাখিয়াছিলাম। সেটি এখানে জানাইয়া দেওয়া গেল—

এখানে আলুর দর ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ধানের দর কিছু কমের দিকে। ম্যালেরিয়া কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। স্থানীয় সুযোগ্য সাবডিভিশনাল অফিসার মহোদয়ের চেষ্টায় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

গত সপ্তাহে স্থানীয় বাণী সিনেমা গৃহে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী শুভাগমন করেন। নৃত্যকলা-নৈপুণ্যে ও কিন্নরকণ্ঠের সংগীতে তিনি সকলের মনোহরণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ 'কালো বাদুড় নৃত্যে' তিনি যে উচ্চাঙ্গের শিল্প-সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন, রানাঘাটবাসীগণ তাহা কোনো দিন ভুলিবে না। এই উপলক্ষে উক্ত সিনেমা গৃহে অভূতপুর্ব জন-সমাগম হইয়াছিল—সেও একটি দেখিবার মতো জিনিস হইয়াছিল বটে। লোকজনের ভিড়ে মেয়েদের

ব্যালকনির নিচের বরগা দুমড়াইয়া গিয়াছিল। ঠিক সময়ে ধরা পড়াতে একটি দুর্ঘটনার হাত হইতে সকলে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন, গতকল্য দার্জিলিং যাইবার পথে এখানে মিউনিসিপ্যাল হলে একটি বক্তৃতা দিতে নামিয়াছিলেন। তাঁহাকেও সেদিন বাণী সিনেমা গৃহে ইন্দুবালার নৃত্যের সময় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

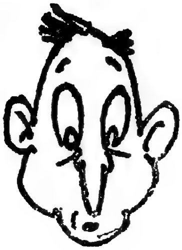

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ( ১৮৯৪—)

# ডম্ফার ভয়ে

## এক

ডম্ফা একরকম বাদ্য। ধ্বনিগৌরবে জয়ঢাকের সমগোত্র, যদিও গতর ঢের কম। একটা ইঞ্চি তিনেক চওড়া কাঠের চাকায় চামড়াটা আটকানো থাকে ; যখন চাঁটি পড়ে, পাঁচ-শ গজ দূরেও টেঁকা দায় হইয়া ওঠে। পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা হোলির সময় এটাকে একেবারে নিজের কানের কাছে তুলিয়া গানের সঙ্গে বাজায়, আওয়াজটাকে আরও খোলতাই করিবার জন্য কোনো কোনো ডম্ফায় খত্তাল বা ঝাঁঝর বসাইয়াও লয়।……অল্পে সুখং নাস্তি।

হোলির দিন, কোনো কোনো গাড়িতে সঙ্গীত চলিতেছে, তবে আমাদের ইণ্টার ক্লাসের কক্ষটায় কোনো উপদ্রব নাই। হোলির জন্যই ভিড়টাও কম, শিমুলতলা স্টেশনে একটি ছোটখাটো দল উঠিল বটে, মুখে-হাতে জামা-কাপড়ে এমন কি কমবেশ করিয়া চোখেও সবার রঙের ছোপ, কিন্তু ভদ্র শ্রেণীর যাত্রী, নির্ঝঞ্ঝাটেই এক একটা জায়গা দখল করিয়া কিউল পর্যন্ত আসিল, তাহার পর সাবধানে পা ফেলিয়া নামিয়া গেল।

এদিকে দুটি বেঞ্চে আমরা পাঁচ-ছয়জন শুধু বাঙালী ছিলাম, সামনের বেঞ্চটিতে আছেন তিনজন, তাঁহাদের মধ্যে মাঝের ভদ্রলোকটির মাথায় একটু ছিট আছে বলিয়া মনে হইল। আসানসোলে উঠিয়াই আগে আমাদের চারজনের নাম-ধাম গন্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজেরও নাম বলিলেন রাজীবলোচন মল্লিক, তাহার পর সেই যে বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন, না নিজের বিরাম আছে, না শ্রোতাদের, বিষয়বস্তু লইয়া কোনো তারতম্য নাই, যাহাই চোখের সামনে দেখেন বা যে কোনো প্রসঙ্গই ওঠে প্রত্যেকটির বিষয়ে তাঁহার পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব একটি অভিমত আছে, এক একটা বিষয়ে সত্যই কিছু কিছু জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এক একটাতে খানিকটা গভীরতা পর্যন্ত, তাই মনে হয় ডাহা পাগল নয়, তবে নিজে না হইলেও আর সবাইকে করিয়া তুলিবার ক্ষমতা রাখেন।

আমার বেঞ্চটিতে আমরা দুজন আছি। একজন কোণটি আশ্রয় করিয়া গল্প হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য একখানি দৈনিক কাগজের পিছনে আত্মগোপন করিয়াছেন, যখন নিতান্তই অসহ্য হইতেছে, মুখটা তুলিয়া ঠোঁট দুইটা নাকের নিচে চাপিয়া ধরিতেছেন। আমি বহু অভিজ্ঞতার ফলে এ রকম অবস্থায় নীরবে শুনিয়া যাইবার একটি বিশেষ ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছি, তবে পাশের দুই জন যাত্রীর সঙ্গে ভদ্রলোকের মাঝে মাঝে খিটিমিটি হইয়া যাইতেছে। ওঁর ডানদিকের লোকটিরও একটু গল্প করিবার বাতিক আছে, কিন্তু আসর খালি না পাওয়ায় অপ্রসন্নভাবে বসিয়া আছেন, যখন বোধ হয় নিতান্তই পেট ফুলিয়া উঠিতেছে, চেষ্টা করিতেছেন, ফলে কথা কাটাকাটি হইতেছে। ওঁর অপর পাশের ভদ্রলোকটি ক্ষীণজীবী গোছের, তাহার উপর দাঁতে ব্যথা উঠিয়া এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে নামটাও ভালো করিয়া বলিলেন না। 'নাম হচ্ছে বটেশ্বর'—বলিয়া ক্লান্ত ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইলেন। বাঁ হাতের বাঁদিকের চোয়াল আর কানের খানিকটা চাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিলে নিজের মনে কাতরাইতেছেন, দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছেন। এক একবার কিন্তু গল্পের জন্য ধৈর্যও হারাইয়া ফেলিতেছেন, খানিকটা করিয়া বচসা হইয়া যাইতেছে।—

'থামুনই না দয়া করে; যেন কাকে বলছি! বকর—বকর—বকর…দেখছেন একটা মানুষ দাঁতের যন্ত্রণায়…উঃ, ইস—স্—স্!'

'আপনাকে বললাম বাবলার ছাল সেদ্ধ করে কুলকুচু করতে…'

'বাড়ি গিয়ে তবে তো মশাই? বাবলার তলায় তো বসে নেই—ইস্—স—স্, ই—হি—হি—হি…'

'চটেই রয়েছেন! ভালোর দুনিয়া নয় তো; বললাম একটা টোটকার কথা—নিজের পরীক্ষিত…'

'আগে আমায় পরীক্ষা করতে দিন—বাড়ি গিয়ে…'

'তা না হলে বিশ্বাস হবে না?'

'দেখো জ্বালা! আরে মশাই, কথা শুনেই ব্যথা মরে যাবে?…উহু—হু—মাগো!'

'বেশ, কথা শুনেই ব্যথা না কমে তো, কথা শুনে বাড়বেই বা কেন, মশাই?—সেটা বলুন।'

'বকুন, যত পারেন। ভগবান এক একজনকে আকালকেঁড়ে দমও দেন তো!'

ভদ্রলোক সাময়িক ভাবে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, আমায় সাক্ষী মানিয়া বলিলেন, 'দেখলেন তো ? কারুর ভালো করতে ইচ্ছা করে এতে ?'

বলিলাম, 'একটু না হয় চুপই করি আমরা, বেদনাটা বোধ হয় চাগিয়েছে ; একে গাড়ির আওয়াজটা লেগেই আছে—'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, যেন গল্পের জন্য যে দমটুকু আহরণ করিয়াছিলেন অপ্রয়োজন বোধে সেটাকে খালাস করিয়া দিলেন ; তাহার পর চুপ করিয়াই রহিলেন।

মিনিটখানেকও গেল না, ডানদিকের ভদ্রলোকটি বার দুয়েক অল্প অল্প গলা-খাঁকারি দিয়া আরম্ভ করিলেন, 'তখন সেই যে বলছিলাম, খুব একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল গ্রামের মধ্যে—খোঁজ, খোঁজ, বের কর্ কোথায় গেল বেটা সন্ন্যাসী —দেখা গেল গ্রামের বাইরে সদর রাস্তার ধারেই একটা বেলগাছের তলায় চিমটেটি পুঁতে বসে আছেন—সবার একটু ধাঁধা লেগে গেল—এই গ্রামের ভেতরেই অমন একটা কাণ্ড করেছে, কোথায় গা ঢাকা দিয়ে বেড়াবে, না একেবারে সদর রাস্তা আগলে গ্যাঁট হয়ে ধুনি জেলে বসেছে। শেষে দুটো চ্যাংড়া ছোঁড়া এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'সে-সোনার তালটা কোথায় ?—পেতল-কাঁসা সোনা করে দেবে বলে যেটা যজ্ঞি করে শোধন করবার জন্যে নিয়েছিলে'·· সাধুবাবা মুখে কিছু না বলে ধুনি থেকে তিনটি আঙুলে করে···'

'কি মশাই, আর এটা বুঝি দাঁত কনকনানির ওষুধ ?'

বাধা দিলেন রাজীবলোচনই, বক্তার দিকে চাহিয়া নয়, দন্তশূলগ্রস্ত বটেশ্বরবাবুর দিকেও নয়, আমার পানে ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া। আমরা আপত্তি করি কিনা এতক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিলেন, সমস্ত গল্পটাই নির্বিবাদে শেষ হয় দেখিয়া আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না।

বলিলাম, 'কি করে বলুন লোকে ? অনুরোধ করা সত্ত্বেও উনি যখন থামবেন না···'

গাড়ি ছাড়িয়া কিউলের পুলের ওপর আসিয়াছে, শব্দ হইতেছে, সেইটে ধরিয়া বলিলাম—'অবশ্য এটুকুতে ক্ষতি হয়নি, কেননা পুলের আওয়াজই সব চাপা দিয়ে দিয়েছে।'

বটেশ্বরও ক্ষীণকণ্ঠে কতকটা আক্রোশের সঙ্গে বলিলেন, 'আর পুলের আওয়াজটা হল দৈব, উপায় নেই ; মানুষ জেনে শুনে শত্রুতা—উ-হু-হু, মলুম !'

লক্ষ্মীসরাইয়ে থামিবে গাড়িটা, পুল পার হইয়া গতিবেগ কমিয়া আসিয়াছে,

রাজীবলোচন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রশ্ন করিলাম, 'উঠলেন যে?'

আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। গাড়িটা থামিতে সতরঞ্চি-জড়ানো ছোট্ট বিছানাটা তুলিয়া লইলেন, নিজের মনেই বকিতে বকিতে দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন, 'তুই বেটা কথা কইলেই সেটা হল বকর-বকর, দম বন্ধ করে বসে থাকো, আর সবাই গ্যাঙাক, না হয় ঢাক পিটুক—বসে বসে শোনো…উঠলেন যে! না কাজ কি উঠে?'

একটা কড়া হেঁচকায় দরজাটা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গাড়ি ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোকটি আবার আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, 'আমি সেই যে সাধুবাবার কথা বলছিলাম…'

কোণের ভদ্রলোক খবরের কাগজের ওপর মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আর আপনি নামবেন কোথায়?'

একটা কি হইল, এর পর লোকটি আর মুখ খুলিলেন না, কোথায় নামিবেন সেটুকুও বলিবার জন্য নয়, ওঁর দিকে একটু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বেশ বোঝা গেল এবার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ভাবা গেল বিপদটা তবে বুঝি কাটিল শেষ পর্যন্ত, এমন সময় ডম্ফা আসিয়া উপস্থিত হইল—সপরিবারে এবং সবান্ধবে—দুইটি ডম্ফা, দুই জোড়া ডবল সাইজের খঞ্জনি, এক জোড়া কাঠের করতাল।

## দুই

লক্ষীসরাই হইতে কয়েক গজ গিয়া গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষিয়া থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা কোলাহল: 'আগ লাগা হ্যায়!'

গলা বাড়াইয়া দেখি সামনের দিকে, দুখানা গাড়ি পরেই কে যেন চেন টানিয়া দিয়াছে, পাখাটা বাহির হইয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই হট্ অ্যাকসেলের ব্যাপার। লোকগুলো তাড়াতাড়ি পোঁটলা পুঁটলি লইয়া নামিয়া পড়িল। গার্ড আসিল, ইঞ্জিনের লোকেরা আসিল, একটু পরে আবার গাড়িটাকে আস্তে আস্তে পিছু হটাইয়া প্ল্যাটফর্মে হাজির করা হইল। দুষ্ট গাড়িটা যতক্ষণে কাটিয়া বাদ দেওয়া হইতেছে, ততক্ষণে আশ্রয়ভ্রষ্ট লোকগুলিও আসিয়া পড়িল প্ল্যাটফর্মে। সবাই ছোটাছুটি হাঁকাহাঁকি করিয়া এ গাড়ি সে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল, শুধু

একটা হোলির দল সুবিধা করিতে পারিতেছে না। এক সঙ্গে প্রায় জন কুড়ি, রঙে-আবিরে লাল, আর নেশায় চুর প্রায় সকলেই। সকলেই এক গাড়িতে উঠিবে।

আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া টলিতে টলিতে পিছন দিকে বেশ খানিকটা গেছে, এমন সময় রাজীবলোচন হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া দরজার সামনে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া হাঁকিলেন, 'আপলোক ইস গাড়িমে আইয়ে না, তোকলিফ কাহে করতা, গাড়ি খুল জায়গা।'

আক্রোশ মিটাইবার ফিকির দেখিয়া রাগে বিস্ময়ে মুখ দিয়া কিছুক্ষণ কথা বাহির হইল না, তাহার পর বলিলাম, 'আপনার এত মাথা-ব্যথা কিসের, মশাই ? যান না যে-গাড়িতে রয়েছেন।'

'একদম খালি হ্যায় গাড়ি, আইয়ে না ! ইধার, এই গাড়িমে।'

কোণের ভদ্রলোকটিও আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, 'ইণ্টার ক্লাস সেটা হুঁশ আছে ? লেলিয়ে দিচ্ছেন ? চেকার ওদের ধরলে ম্যাও সামলাতে পারবেন ?'

'এই যে এই গাড়ি, আইয়ে ; হাত পা খেলায়কে হোলি গানেকা আর এয়সা গাড়ি নেহি মিলেগা ; বহুৎ জায়গা।'

বটেশ্বরবাবু আতঙ্কে একেবারে সিঁটকাইয়া গেছেন, ত্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আসছে নাকি ?'

'হ্যাঁ, আসছে, এসে পড়ল বলে, অত উতলা হচ্ছেন কেন ? এসেই গান ধরবে-খন।'

'মশাই, আপনিই না-হয় দয়া করে আসুন, বেশ গল্প করছিলেন অন্যমনস্ক ছিলাম···'

'আইয়ে--আইয়ে—এই গাড়ি--'

খাতির করিয়া একজন ডাকিতেছে দেখিয়া দলটা উৎসাহের সঙ্গে আগাইয়া আসিতেছে, ডম্ফার খত্তালের আওয়াজও আরম্ভ হইয়া গেছে, অবশ্য অসংলগ্নভাবে।

বটেশ্বরবাবু আগুন হইয়া উঠিয়াছেন—'কি করি ? হ্যাঁ মশাই।···উহু-হু-হু-উস। চাগালো আবার, হ্যাঁ মশাই ?—এসে গেল যে, এ-যে প্রাণে মারবার ব্যবস্থা।'

কোণের লোকটিও বেশ সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন, বলিলেন, 'র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে

ফ্ল্যাট হয়ে যান, ওই ওঁর উরুতে মাথা দিয়ে···ওঁর—ওঁর—এই জামাই—অসুখে পড়ে গেছেন···নিন, আর দেরি নয়—এসে পড়ল বলে !’

ভদ্রলোক উরু লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল, বলিলেন, ‘সে কি মশাই ! বাঃ আমার জামাই ।—বা রে তামাশা ! আবদার মন্দ নয় তো !’

‘মলে মেয়ে বিধবা হয়ে যাবে—এমনি ও ব্যাটারা থামবে না, জামাই না বলে উপায় নেই, একটা লোকের প্রাণ···নিন আপনি শুয়ে পড়ুন—না হয় তথতার ওপরই···’

বটেশ্বরবাবু র‍্যাপারটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া শুইয়া পড়িলেন, ঢাকার মধ্যে থেকেই চিঁ চিঁ করিয়া বলিলেন, ‘না হয় শ্বশুরই বলবেন, মশাই, আগে বাঁচান সবাই মিলে, এর ওপর ডম্ফা বাজালে আর···’

দলটা আসিয়া পড়িল। রাজীবলোচন দোরটা ঠেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, ‘আইয়ে, বহুৎ জায়গা, সব চেয়ে এই গাড়ি খালি হ্যায়, কেত্তা দূর তক যাইয়েগা ?’

ইঞ্জিন আসিয়া জুড়িয়াছে, কয়েকজনকে উঠিতে একটু সাহায্য করিয়া নিজের গাড়িতে চলিয়া গেলেন।

## তিন

খানিকটা হট্টগোল হইলই, হোলির মাতালদেব কাণ্ড তো, তাহার পর ওরই মধ্যে গোছগাছ করিয়া লইয়া গান শুরু করিবার জন্য ডম্ফায় ঘা দিয়াছে, আমি উঠিয়া হিন্দীতে বলিলাম, ‘এক মিন্‌তি হ্যায় আপ লোগোঁসে—’

দলটি নিস্তব্ধ হইয়া গেল একটু, বুঝিতে কিছু সময় গেল, তাহার পর জড়িত কণ্ঠে নানা মুখে প্রশ্ন, মন্তব্য : ‘কেয়া হ্যায়, বাঙ্গালীবাবু ?—বাত কেয়া হ্যায় ?··· মিন্‌তি কেঁও ?···আপনার গোলাম হাজির, কি করতে হোবে হুকুম করুন, আভি তামিল হয়ে যাবে···’

কোণের ভদ্রলোকটিও নিশ্চয় মাথা ঘামাইতেছিলেন, আমি কিছু বলিবার আগেই—কাগজের উপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, ‘ও বাবুঠো মর গিয়া হ্যায়, বাত বোলতা থা, হঠাৎ বেঞ্চপর লুটায়ে পড়া। এই বাস্তে মেহেরবানি করকে গানঠো নেই কিজিয়ে।’

আমরা দুইজনেই বিস্মিতভাবে চাহিতে বাংলায় বলিলেন, ‘ও শ্বশুর জামাইয়ের সম্বন্ধের হ্যাঙ্গামই চুকিয়ে দিলাম, মশাই।’ সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা আবার আড়াল

করিয়া বটেশ্বরবাবুর উদ্দেশে একটু চাপা গলায় বলিলেন, 'আপনিও কাঠ হয়ে পড়ে থাকুন, বাঁচতে চান তো—'

দলটা একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেল। সবাই বসিয়া বসিয়া টলিতেছে, কথাটা বুঝিতে একটু সময় লাগিল, তাহার পর আবার প্রশ্ন হইল—

'মরে গেছেন? ওহো-হো! বেঁচে থাকলেন না কেন? এমোন হোলিকা দিন।'

'মরে গেছেন বলেই বেঁচে থাকতে পারলেন না, আপনারা দয়া করে গানটা একটু বন্ধ রাখবেন এই মোকামাঘাট পর্যন্ত।'

'মোকামাঘাট কেনো, বাবুজী?'

ভদ্রলোকের মুখে কথাটা বোধ হয় একটু আটকাইল, অল্প চুপ থাকিয়া বলিলেন, 'সেখানে নেমে ওঁর সৎকারটা করতে হবে। আমরা নেমে গেলে আপনারা আবার আরম্ভ করবেন, এইটুকু তো, এর পরেই মোকামাঘাটে আসবে গাড়ি।'

আবার একটু চুপচাপ, প্রায় সবার মাথাই একটু একটু ঢুলিতেছে, বিপুল সমস্যার সামনে পড়িয়া মুখে কথা যোগাইতেছে না। তাহার পর উহারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটু ধাতস্থ গোছের একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'বাবুজী, গোস্তাকি মাফ কিজিয়ে গা। লেকিন বাবু তো শুনেগা নেহি, মুর্দা হো গিয়া।'

ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, 'তা উনি পাচ্ছেন না শুনতে…লেকিন—লেকিন—আর সবকো তোকলিফ হোগা তো?'

'কিসকো বাবুজী?'

ভদ্রলোক বটেশ্বরবাবুর পাশের লোকটির পানে একটু আড়ে চাহিতে তিনি সরিয়া বসিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে না, আবদার থাক, আমার কেউ নয়, আগেই বলে দিয়েছি, মনে থাকে যেন,—একটা মানুষকে এক কথায় শেষ করে দিয়ে এখন আপলোক গাইয়ে যেত্তা খুশি। ও মুর্দাকা কেয়া বয়ে গিয়া হ্যায়?—গান হোনেসে ভি য্যায়সা, হোরিবোল হোনেসে ভি ত্যায়সা, ও তো পগার পার হো গিয়া।'

ডম্ফার ভয় আমারও ছিল, আশা করিয়াছিলাম সামলাইয়া যাইবে, মাতালদের মন যেদিকে চালানো যায় সেইদিকেই চলে, ভদ্রলোকও নিশ্চয় সেই ভরসাতেই ব্যবস্থাটা করিয়া ছিলেন, কিন্তু অন্য রাস্তা নেওয়ায় একটু যেন থমকাইয়া গিয়াছেন, ব্যাপারটা কাঁচিয়া যায় দেখিয়া আমি বললাম, 'আতে আতে বেচারি

মর গঁয়ে, আপ সবকা ভি তো তকলিফ হোনা চাহিয়ে। আব স্বরাজ হো গয়া, বাঙ্গালী মরনেসে বিহারীকা দুখ্, বিহারী মরনেসে বাঙ্গালীকা দুখ।'

কাজ হইল—'ঠিক বাবুজী, ঠিক, ঠিক,·· ···নেহি গায়গা, বাবুজী···অ-হা-হা, বাঙ্গালী বাবু মর গিয়া।···আমি বাংলা-মুলুকে থাকছিল, বড়া আচ্ছা বাঙ্গালী বাবু সব···'

এই হাওয়াই বহিল কিছুক্ষণ, তাহার যা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাও বাদ গেল না, শেষের দিকে একজন হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢাকিয়া 'বাঙ্গালী বাবু হো!' বলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পাশের লোকটি বলিলেন, 'নিন, গান ছেড়ে মরা কান্নার ধাক্কা সামলান এখন—ঐ গোটা দলটির।'

ভাবনার কথা নিশ্চয়, তবে হাওয়াটা আবার মোড় ফিরিল হঠাৎ, একটি অধিকতর বয়সের বেশ মোটাসোটা লোক সবার মধ্যে আগাইয়া আসিল, মড়ার দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, 'অ—হা হা! হায় রে বাঙ্গালীবাবু, বড়ো ভালা আদমি আছে।···বাবুজী, এক আর্জি আছে আমাদের।'

এই লোকটাই পিছন থেকে ভাঙা-ভাঙা কথা বলিতেছিল, বলিলাম, 'কেয়া? কহিয়ে, কহিয়ে।'

সফলতায় বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছি।

'হামলোক ভি সোৎকার করতে লিয়ে যাব বাঙ্গালীবাবুকে; আমি বাংলা মুলুকে থাকছিল, অনেক লাস অস্‌মশানে লিয়ে গেছি।'

এতটা ভাবিয়া বাঙালী-বিহারী এক করিতে যাই নাই স্বরাজের যশ গাহিয়া। মুখটা শুকাইয়া গেল। পাশের লোকটি বিড়বিড় করিয়া বলিলেন, 'নিন এবার ঠিক হয়েছে। টেনে-হিঁচড়ে ঐ কুড়ি-বাইশ জনে মিলে না চিতেয় তোলে জ্যান্ত মানুষটাকে তো কি বলেছি; ওর আবার দোরোস্ত হাত।'

হঠাৎ 'মড়া'র পায়ের পাতা একটি নড়িয়া উঠিল। অবশ্য লোকটি উত্তরের আশায় আমার পানে চাহিয়াছিল, দেখিতে পাইল না। কোণের ভদ্রলোকটির নজরে পড়িয়াছে, আবার কাগজের আড়াল থেকে চাপা কণ্ঠে ভরসা দিলেন, 'ভয় নেই, আমরা আছি, পড়ে থাকুন।'

আমিও একটু সামলাইয়া লইলাম, ভাবিবার সময় লইবার জন্য লোকটিকে বলিলাম, 'সে তো আপনাদের দয়া, পথে-ঘাটে এরকম বিপদে সাহায্য না

করলে করবে কে বলুন? তাহলে আপনারা গুছিয়ে-সুছিয়ে বসুন নিশ্চিন্দি হয়ে, মোকামাঘাটটা আসুক। যাবেন কোথায় সব?'

'আমরা মোকামা জংশন কো যাব। বাবু, আগে এক ইস্টিশন। লেকিন পহিলে বাবুর লাস জ্বালায়কে তো পরে যাব। আপনি কুচ্ছু ভাববেন না, আমরাই লিয়ে যাব। অহা হা! বাবু মোরে গিলেন, বড়া ভালো ছিলেন বাঙ্গালীবাবু।'

ওব কথার মধ্যে কোণের ভদ্রলোক আবার সেইভাবে কাগজের আড়াল থেকে বলিলেন, 'আবাব যেন ভয়ে পা নড়িয়ে বসবেন না, মশাই!'

'আচ্ছা বাবুজা, হমলোক ভজন গাই না? ভজন তো চলতে পারে মুর্দার সঙ্গে—'

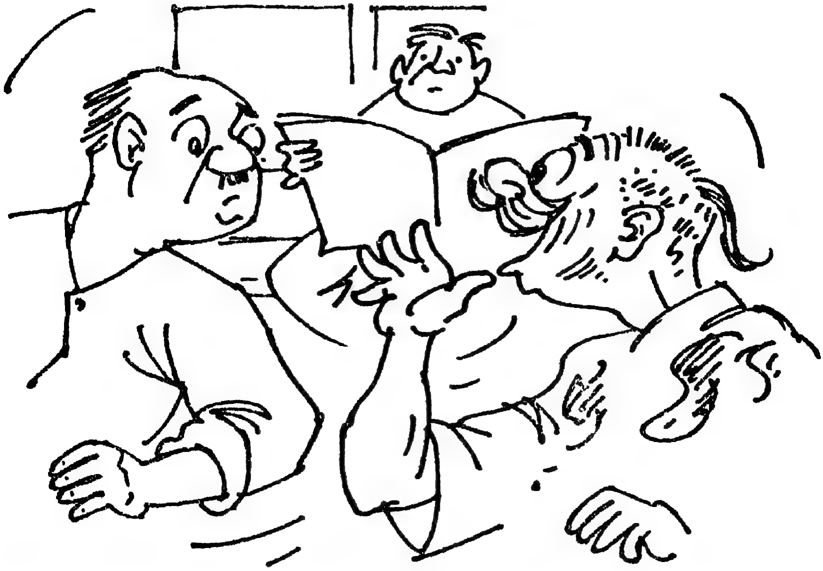

বিপদ কাটিয়াও কাটে না, গলা খুশখুশ করিতেছে, বাগ মানিবে কেন? বলিলাম, 'আপনি বাংলা দেশের রেওয়াজ জেনেশুনেও ওকথা বলছেন? ভজন-কীর্তন হয় বুড়ো-বুড়ি কেউ মলে, আর এ চল্লিশও পেরোয়নি ভদ্রলোকের, তার ওপর এই বিঘোরে মরা, সুখের নয় তো। আপনি বিজ্ঞ লোক, ভেবে দেখুন না।'

'অহ-হ! চালিশও হোয়নি। শুনিয়ে ভাইসব, চালিশ ভি ন পুরা থা বাঙ্গালী বাবুকা, আপসোস!...তাহলে ভজনভি থাক, বাবুজী। আপনি রক্তিভরভি

ফিকির কোরবেন না, গাড়ি থামলেই হয়লোক নামিয়ে নিব—আমি অকেলাই নামিয়ে নোব কব্জা কোরে।'

কোণের লোকটি আবার কাগজের আড়াল হইলেন, বলিলেন, 'পা সামলে, কিছু ভয় নেই, না হয় পুলিস ডাকা যাবে তখন।'

## চার

ডম্ফার দুশ্চিন্তা কাটিল, এইবার মোকামাঘাটে কি করিয়া সামলানো যাইবে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সমস্যাটা একেবারে গুরুতর আকার ধারণ করিল।

আমারই চোখে পড়িল এটা। কোণের ভদ্রলোক কাগজ আড়াল করিয়া বসিয়া আছেন, বোধহয় চারিদিকে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িতেছেনই, পাশের লোকটি নির্বিকারভাবে সামনে চাহিয়া বসিয়া আছেন, আমার হঠাৎ মনে হইল বটেশ্বরবাবু যেন নিঃসাড় হইয়া গেছেন! ভীত হইয়া পড়িলাম; মড়ার অভিনয় করিবার জন্য যন্ত্রণাটা চাপিতে চাপিতে হার্টফেল হইয়া যায় নাই তো? গাড়ি লেট হইয়া পড়ায় ড্রাইভার গতিবেগ খুব দ্রুত করিয়া দিয়াছে, প্রবল ঝাঁকানিতে ভদ্রলোকের শরীরটা দুলিতেছে বলিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াটা হইতেছে কিনা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।…এ আবার কিসে কী হইয়া গেল!

মনটা যথাসাধ্য সংযত করিয়া লইয়া ভাবিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছু মাথায় আসিতেছে না। কতকটা দোমনা হইয়াও রহিয়াছি; না হয় নাড়ি টিপিয়া দেখিব? কিন্তু তাহা হইলে হোলির দল সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিবে, ডম্ফা আরম্ভ হইয়া যাইবে দ্বিগুণ আবেগেই, কিছু যদি ধুকধুকুনি থাকেও বুকের মধ্যে তো সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া যাইবে। কী করা যায়? কিছু একটা হইয়াছেই, হয় শেষ, না হয় খুব কাছাকাছি; একটা মানুষ ওভাবে কানে হাত চাপিয়া কাতরাইতেছিল, আর একেবারে ঠাণ্ডা!—তাহাও গাড়ির এই প্রবল দোলানির মধ্যে!

কোণের ভদ্রলোকটির দিকে সরিয়া গেলাম, গলা নামাইয়া বলিলাম, 'মশাই, শুনছেন?'

কাগজের উপর মুখ তুলিলেন।

'নড়ে-চড়ে না কেন? দেখছেন?—এ তো জ্যান্ত মানুষের দোলা নয়, একটা যেন কাঠের গুঁড়ি নড়ছে।'

ভদ্রলোক একটু স্থিরভাবে চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন, 'বোধহয় গানের ভয়, আবার তার ওপর দাহ করতে নিয়ে যাবে কিনা, রুখতে পারবেন কি না-পারবেন—সিঁটকে-মিটকে পড়ে আছেন।'

'ভগবান করুন যেন তাই হয়; কিন্তু ধরুন যদি না হয় তাই! একটা মানুষ কাটা-ছাগলের মতন অমন করে ছটফট করছিল, আর একেবারে…'

'তাই তো! ও মশাই পা-টা না হয় নাড়ুন না—একটু—খুব সাবধানে…'

নড়ার আশায় দুজনে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।…কোথায়? গোটা শরীরটা শুধু গাড়ির আক্ষেপে টলমল করিতেছে।

ভদ্রলোক বিহ্বলভাবে চাহিয়া বলিলেন, 'তাহলে?'

'তাই তো ভাবছি! নাড়ি দেখতে যাওয়া ঠিক হবে না। দাঁড়ান, ও ভদ্রলোককে ডাকি।…মশাই, একটু এদিকে ঘেঁষে বসুন তো, একটা কথা আছে। একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে।'

'এতক্ষণে মোটে একটা চোখে পড়ল আপনার? আমি তো কূল কিনারা পাচ্ছি না।' বলিয়া বিরক্তভাবে সরিয়া আসিলেন। বলিলাম, 'লক্ষ্য করেছেন? লোকটা সত্যিই টেঁসে গেল নাকি? যা ক্ষীণজীবী, আর যা যন্ত্রণাটা পাচ্ছিল! একবার না হয় ওদের আড়াল করে একটু নাকের কাছে হাতটা নিয়ে গিয়ে দেখবেন?'

ভীত এবং বিরক্তভাবে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া লইয়া আরও একটু এদিক পানেই সরিয়া আসিলেন, বলিলেন, 'হ্যাঃ, আমি এখন মড়া ঘাঁটতে গেলাম, এই সন্ধ্যের বেলা! টেঁসে গিয়ে থাকে ভালোই তো হল; ঐ কুড়ি-বাইশটা যমদূতে জ্যান্ত মানুষ নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করত তো! যা ব্যবস্থাটা করেছেন, ওরা ছাড়ত ভেবেছেন নাকি?—টেঁসে গিয়ে থাকে সে তো বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।'

গাড়ি উন্মত্তবেগে ছুটিয়াছে, ড্রাইভারটারও হোলির ছোঁয়া লাগিল নাকি? একটা কাণ্ড না করিয়া বসে! স্টেশনের পর স্টেশন সট্ সট্ করিয়া পিছাইয়া যাইতেছে, মোকামাঘাট আসিয়া পড়িল বলিয়া।

ওদিকে দলের বেশির ভাগ লোকই নেশার ঝোঁকে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে, তবে কয়েকজন দাহ করিবার লোভে যেন চেষ্টা করিয়া চোখে চাড়া দিয়া সজাগ আছে, বিশেষ করিয়া সেই লোকটি, যে প্রস্তাবটা করে।

এই সময় গাড়ি মেন লাইন ছাড়িয়া ঘাটের লাইনে প্রবেশ করায় আচমকা

একটা আরও বড়ো রকম ঝাঁকানি লাগিল। 'বাবুজী, মুর্দা বিরিঞ্চি থেকে গিরে যাবে।'—বলিয়া লোকটি নিজেই উঠিয়া আসিতেছিল, আমার মাথায় একটু বুদ্ধি খেলিয়া গেল—পরীক্ষার এই একটা সুযোগ। বলিলাম, 'থাক, আপনি কষ্ট করবেন না, আমিই ঠিক করে দিচ্ছি।'

উঠিলাম, গাড়ির বেগ কমিয়া আসিয়াছে, গোছগাছ করিয়া দিবার অছিলায় র‍্যাপারের মধ্যে হাতটা চালাইয়া একবার নাড়িটা টিপিলাম। বুঝিতে পারিতেছি না—গাড়ির দোলানি আছে একটু, সেই সঙ্গে নিজের মানসিক উদ্বেগ; নাকের নিচে হাত দিলাম, আরও বোঝা যায় না; শেষে বুকের ওপর চারিটা আঙুল চাপিয়া ধরিয়াছি, এমন সময় ব্রেকটা চাপিয়া বেশ একটু গতির মুখেই গাড়িটা আর একটা বড়ো নাড়া দিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

বটেশ্বর একেবারে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া সামনেই আমাদের তিনজনকে দেখিয়া বলিলেন—'আ-হ্! ব্যথাটা গেছে মশাই, একেবারে টানা একটি ঘুম—কিচ্ছু বুঝতে পারিনি। মোকামাঘাট এসে গেল নাকি?'

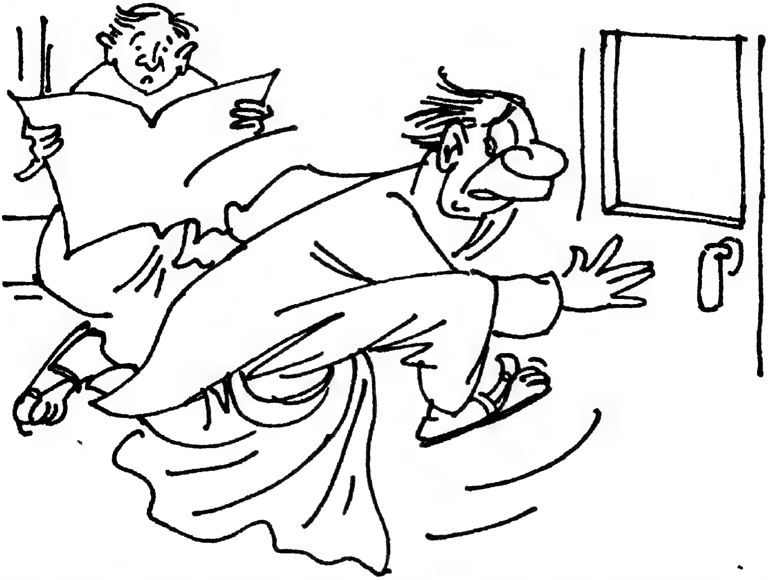

তারপর পিছন দিকে নজর পড়িয়া যাইতেই সব মনে পড়িয়া গেল; তীব্র আতঙ্কে কয়েক সেকেণ্ড দলটার পানে চাহিয়া থাকিয়া নিজের পুঁটুলিটি পর্যন্ত না লইয়া তিন লাফে দরজার কাছে গিয়া পড়িলেন এবং কোনো রকমে হ্যাণ্ডেলটা ঘুরাইয়া দরজা গলিয়া প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া

গেলেন।

লোকটি সবাইকে 'লাস জ্বালাইতে' যাইবার জন্য চাঙ্গা করিয়া তুলিতে যাইতেছিল, এরকম বিপরীত কাণ্ড দেখিয়া কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গিয়া বলিল, 'বাবুজী—মুর্দা তো ··!'

'তাই তো দেখছি'—বলিয়া আমি গলা বাড়াইয়া হাঁক দিলাম, 'কুলি! এই কুলি, ইধার আও, জলদি --'

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ( ১৮৯৬—১৯৩৫ )

# ত্রিলোচন কবিরাজ

আর কোনোও শব্দ কানে আসিতেছিল না, শুধু পায়ের খড়ম জোড়ার সঙ্গে ফুটপাথ ঘর্ষণের ফলে অবিশ্রাম নানা ছন্দে খটাস্ খটাস্ ধ্বনি উঠিতেছিল, তাহাই শুনিতে শুনিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চলিতেছিলাম। সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ মনে হইতেছিল। সকালে 'জেণ্টস রেস্তোরাঁ ডি ল্যুক্স'-এ এক পয়সার এক কাপ চায়ের সঙ্গে তিন দিনকার বাসী রুটির একখানা পোড়া টোস্ট খাইয়াছিলাম। ক্রমাগত তাহারই ঢেঁকুর উঠিতেছিল। সমস্ত দিন বাড়ি ফিরিব না সংকল্প লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু কোথায় দিন কাটাইব স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। পরিচিত দুই একটি বন্ধুর বাড়ি কাছেই ছিল, যাইতে পারিতাম, কিন্তু মনে মনে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের উপরই কেমন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কাহারও কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। দুই একটি ঝি বাজার লইয়া পাশ দিয়া চলিয়া গেল, ফিরিয়াও চাহিলাম না। প্রতি মুহূর্তেই মন উত্তরোত্তর সংসারে বীতরাগ হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত জগৎটাই যদি কেওড়াতলা অথবা কাশীমিত্রের ঘাট হইয়া যাইত তাহাতেও কোনো আপত্তি ছিল না।

সহসা পথের ধারের একটি ঘরের মধ্যে পুরুষের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। জানালা দিয়া দেখি অনেকগুলি লোক। কেহ সরবে কাঁদিতেছে, কেহ রুমালে চোখ মুছিতেছে। কেহ মরিয়াছে মনে হইল, কিন্তু বাড়ির সম্মুখে খাটিয়া দেখিলাম না ; উপরে চাহিলাম—দেখিলাম বাড়িখানার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা সাইনবোর্ড—তাহাতে সোনালী অক্ষরে লেখা 'প্রেমার্তিহরণ ঔষধালয়', তাহার নিচে লেখা—শ্রীত্রিলোচন কবিরাজ। ঔষধালয় ও কবিরাজ উভয়কেই নূতন মনে হইল, কাজেই কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু অচিরাৎ বুঝিলাম ভুল করিয়াছি, কবিরাজ এবং ঔষধালয় কোনোটিই নূতন নহে, যেহেতু সাইনবোর্ডের সোনালী অক্ষরে কালো দাগ পড়িয়াছে এবং সদরের যে ঘরে রুদ্যমান জনগণকে দেখিলাম তাহারই পাশে একটা বড়ো হল ঘর, তাহার আসবাব পত্রও অতি পুরাতন এবং ফরাসের একশ

একটি স্থানে কালি এবং তেলের দাগ ; ক্যাশবাক্সের সম্মুখে যে লোকটি বসিয়া ছিলেন তিনিও অতি প্রাচীন। বুঝিলাম এইটি কবিরাজ মহাশয়ের ডিস্‌পেনসারী। ক্যাশবাক্স-রক্ষক ভদ্রলোকটি আমাকে আগ্রহের সঙ্গে দেখিতেছিলেন, সহসা ডাকিলেন, "আসুন ভিতরে আসুন !"

ভিতরে ঢুকিয়া ফরাসে বসিলাম। দেয়ালে একখানি প্রকাণ্ড আকারের মদনভস্মের অয়েল পেন্টিং ছিল, সেইখানি দেখিতেছি এমন সময় ভদ্রলোকটি কহিলেন, "জানেন তো বাড়িতে ব্যবস্থা নিলে দর্শনী আট টাকা ?"

কহিলাম "কিসের দর্শনী ?"

"কবরেজ মশায়ের। ব্যাধি অবশ্য আপনার তিনদিনেই নির্মূল হবে। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী।"

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "এই কথা বলবার জন্যে ডেকেছেন বুঝি ? ব্যাধি আমার নেই।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "অবশ্য আছে। এই ব্যাধি নেই এমন পুরুষ এবং নারী জগতে নেই মশাই, রাজা রাজড়া থেকে—"

কথা সমাপ্ত হইতে দিলাম না। বিদ্রূপ করিয়া কহিলাম, "আপনি অন্তর্যামী দেখছি।"

বৃদ্ধ নির্বিকার ভাবে কহিলেন, "প্রায়, এই তেষট্টি বছর বয়স হল মশাই, আঠারো বছর থেকে কবরেজ মশায়ের কম্পাউণ্ডারী করছি। প্রত্যহ গড়পড়তায় তিন-শ রোগীকে ওষুধ দেই। বর্ষা আর বসন্তে এই রোগী হয় দুনো। ত্রিশটি ছেলে মোড়ক বেঁধে অবকাশ পায় না, নিজে দেখছি তো কবরেজ মশায়ের ওষুধ নইলে কারো চলে না। আর আপনি কিনা—"

একটু সম্ভ্রম হইল, কহিলাম, "কি ব্যাধির কথা বল্‌ছেন জানলে—"

বৃদ্ধ কহিলেন, "সাইনবোর্ড দেখেননি ? যাবতীয় প্রণয়ঘটিত ব্যাধির চিকিৎসা এখানে ওষুধ এবং মুষ্টিযোগ সহযোগে করা হয়। দর্শনী আট টাকা ওষুধ বিনামূল্যে। এর চেয়ে সুবিধে পাবেন কোথাও ?"

শিরোঘূর্ণন, হৃৎকম্প প্রভৃতি প্রণয়ঘটিত অনেক প্রকার ব্যাধির নাম ও তাহার বহুবিধ পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন বড়ো বড়ো মাসিক ও সংবাদপত্রে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছি, এ পর্যন্ত তাহার প্রয়োজন হয় নাই। আর আজ বৃদ্ধ কহিলেন, "ভাবছেন ? ভাবছেন বুঝি কোনোও ব্যাধি নেই আপনার ? কবরেজ মশায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই বুঝতে পারবেন ব্যাধি আছে কিনা।

আপনার আর বয়স কি মশাই, আমি শ্রীবলরাম রসনিধি, পাঁচ পাঁচটি স্ত্রীকে নিমতলার ঘাটে পার করেছি, এই তেষট্টি বছর বয়স, এখনও আমাকে মাঝে মাঝে কবরেজ মশায়ের কাছে ব্যবস্থা নিতে হয়।" প্রতিবাদ করিলাম না, কিন্তু মনে হইল হয়তো ব্যাধি আমারও কোথাও আছে। গৃহিণীর সহিত ঝগড়া করিয়া আসা অবধি মাথাটা টন্ টন্ করিতেছিল, ভাবিলাম হয়তো এটাও প্রণয়ঘটিত কোনো ব্যাধি হইবে, কিছু জিজ্ঞাসা করিব এমন সময় রসনিধি মহাশয় সসম্ভ্রমে কহিলেন, "ওই কবিরাজ মহাশয় আসছেন!" পরক্ষণেই হুঁকা হাতে ত্রিলোচন কবিরাজ মহাশয় মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বয়স সত্তর পার হইয়া গিয়াছে। মাথার সম্মুখের দিকে চুলের উৎপাত নাই, পিছনে কয়েক গুচ্ছ শুভ্র কেশ, তাহাতে একটি ধুতুরা ফুল। কবিরাজ মশায়ের ললাটে একটি যাত্রার দলের মহাদেবের ধরনে ললাটনেত্র আঁকা, তাহার মধ্যে একটি রক্ত-চন্দনের অক্ষিতারকা। ফরাসে

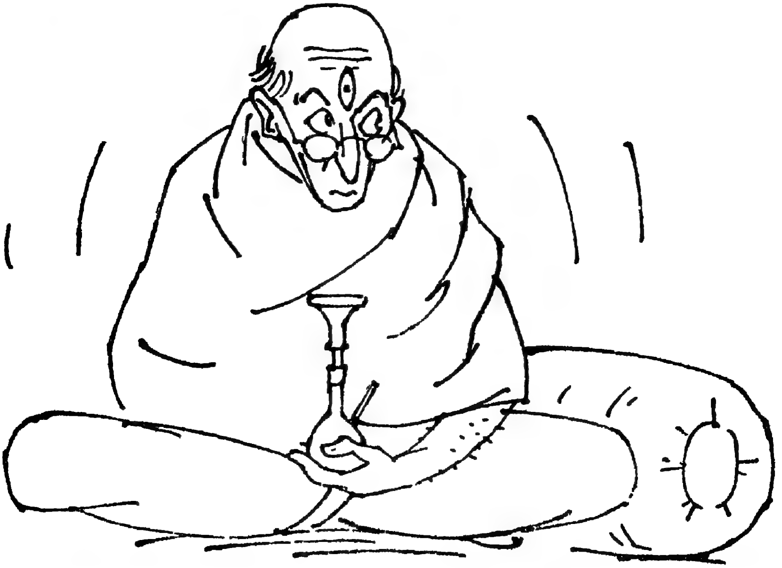

বসিয়াই কবিরাজ মহাশয় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কেন জানি না, আমি চোখ বুজিলাম, কবিবাজ মহাশয় কহিলেন, "ভয় নাই, আরোগ্য হবে।" পরে হুঁকায় টান দিয়া কহিলেন, "রোগীগণকে উপস্থিত করো মাধাই!" কবিরাজ মহাশয়ের আহ্বান শুনিয়া গুটিকয়েক অল্প বয়সের শিক্ষার্থী ডিস্‌পেন্‌সারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কবিরাজ মহাশয়কে

প্রণাম করিয়া রোগীদের বসিবার ঘরে চলিয়া গেল। আমি ফরাস ছাড়িয়া একটি টুলের উপর গিয়া বসিয়া সতৃষ্ণনেত্রে রোগীদের ঘরের দরজার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

রোগীদের ঘর হইতে নানারূপ গুঞ্জন দীর্ঘশ্বাস অস্ফুট স্ফুট রোদন শুনিতে পাইলাম। তাহার পরই কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্রদের কাঁধে ভর দিয়া রোগীরা আসিতে শুরু করিল। একি! প্রায় যে সকলেই আমার পরিচিত। রসনিধি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দেখিতেছি মিথ্যা নহে। রাজনৈতিক নেতা হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিকপত্র-সম্পাদক পর্যন্ত সর্ববিধ ব্যক্তিই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। একটা বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে সকলেই কাঁদিতেছেন, কিন্তু কেহ কাহারও দিকে চাহিতেছেন না। অতি বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরের বালক পর্যন্ত রোগ দেখাইতে আসিয়াছে। একটা প্রশ্ন মনে জাগিল, উঠিয়া রসনিধি মহাশয়ের কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কহিলেন, "হাঁ মেয়েরাও আছেন, তবে তাঁরা দোতলায়। এঁদের ব্যবস্থার পর তাঁদের ব্যবস্থা হবে।"

কবিরাজ মহাশয় হাঁকিলেন, "অগ্রে অল্পবয়স্কগণকে উপস্থিত করো।" এক সঙ্গে পাঁচ-সাতটি স্কুলের ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া ফরাসে বসিল। কবিরাজ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "পরীক্ষায় ফেল করিয়াছ?"

সকলেই সমস্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তব দিল, "হুঁ।"

কবিরাজ মহাশয় আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। রসনিধির দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "প্রাতে মোহমুদ্গার গুড়িকা একমাত্রা, পথ্য উপবাস।" ব্যবস্থাপত্র লইয়া ছেলে কয়টি দর্শনী দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এইবার বয়স্ক রোগী আসিতে শুরু করিলেন। প্রথমে যিনি আসিলেন তাঁহাকে চিনিতাম না। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কবিরাজ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেশা কি?"

ভদ্রলোক কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিলেন, "পত্রিকা সম্পাদক।"

"হুঁ! কবিতা ছাপা হয়?"

"আজ্ঞে তাতেই তো—"

"হুঁ! লেখিকার কাছে পত্রলিখন কার্য করা হইয়াছে?"

"আজ্ঞে। তাঁর জবাব পেয়েই তো—" বলিয়াই ভদ্রলোক আবার কাঁদিয়া

উঠিলেন। আমি কবিরাজ মহাশয়ের অভ্রান্ত নির্দেশ দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। কবিরাজ মহাশয় হাত বাড়াইয়া রোগীর নাড়ি দেখিলেন। তাহার পর কহিলেন, "ব্যবস্থা—প্রাতে ও সন্ধ্যায় অশ্রুভৈরব বটি, মধ্যাহ্নে স্বল্প প্রণয়ান্তক।" তাহার পর রোগীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "পত্রিকা সম্পাদনা ত্যাগ করো।"

এই সময় ক্ষীণ একটি আর্তনাদ শুনিলাম. পরক্ষণেই মাধাই আসিয়া জানাইল যে, দ্বিতলে একটি রোগিণীর মূর্ছা হইতেছে। ত্রিলোচন কবিরাজ উঠিলেন এবং একটিপ নস্য নাসারন্ধ্রে টিপিতে টিপিতে দ্বিতলে চলিয়া গেলেন, এই অবসরে আমি রসনিধি মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিয়া কহিলাম, "যদি কিছু মনে না করেন—"

রসনিধি কহিলেন, "আদৌ মনে করব না, প্রশ্ন করুন।"

ত্রিলোচন কবিরাজের জীবন কাহিনী শুনিবার জন্য দুর্নিবার আগ্রহ হইতেছিল। কহিলাম, "কবিরাজ মহাশয়কে অনেক দিন থেকেই জানেন আপনি। তাঁর সম্বন্ধে—"

রসনিধি কহিলেন, "ত্রিলোচন কবরেজের কথা জানেন না আপনি? আচ্ছা, সংক্ষেপে শুনুন তবে। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, কবরেজ মশাই পড়তেন সিদ্ধান্ত কৌমুদি, আমরা পড়তাম মুগ্ধবোধ। অকস্মাৎ একদিন গ্রামের রজক-নন্দিনী ধৈর্যময়ী ত্রিলোচন কবরেজের নামে অভিযোগ করল যে, তিনি তার অঙ্গ স্পর্শ করেছেন। অধ্যাপক মশাই চতুষ্পাঠী থেকে তাঁকে বিদায় দিলেন। ত্রিলোচন কবরেজ সেই থেকে সংসার ত্যাগ করেন। তারপর এ দেশ সে দেশ ঘুরে দেখলেন যে, জগতে প্রেম ব্যাধিই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তখন জীবহিতের জন্য এই ব্যাধির ওষুধ খুঁজতে তিনি গেলেন হিমালয়। সেখানে সিদ্ধবাবা মদনমথনজীর নিকট দীক্ষা নেন, তিনিই তাঁর প্রেম ব্যাধি আরাম করেন। তারপর গুরুর আদেশে তিনি লোকহিত সাধনের জন্য গুরুদত্ত ওষুধ পত্তর নিয়ে সংসারে আসেন এবং এই ডিস্‌পেন্‌সারী খোলেন। তাঁর ছাত্রেরা কেউ বিবাহ করতে পারে না; তবে আমার পৈতৃক বৃত্তি বলে আমার সম্বন্ধে তাঁর অন্য ব্যবস্থা ছিল। তা তাঁর কৃপাতে হোক আর ভাগ্য বলেই হোক পাঁচ পাঁচটার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি। গুরু হে তুমিই সত্য।" বলিয়া রসনিধি হাত জোড করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। এই সময় কবিরাজ মহাশয় আবার আসিয়া ফরাসে বসিলেন। এইবার আমিও ভক্তিভরে কবিরাজ মহাশয়ের পদধূলি লইলাম। কবিরাজ মহাশয় মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

রোগীরা তখনও কাঁদিতেছিল। ত্রিলোচন কবিরাজ হাঁকিলেন, "চুপ!" ক্রন্দনধ্বনি থামিয়া গেল, শুধু ফোঁস ফোঁসানি শোনা যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় রোগী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স বছর পঁচিশ, গায়ে একটা রঙিন পাঞ্জাবী, চোখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ। ফরাসে বসিয়াই ভদ্রলোক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজের খোলা নস্যদানি হইতে খানিকটা নস্য ফরাসে উড়িয়া পড়িল, কবিরাজ মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর রোগীর নাড়ি দেখিয়া কহিলেন, "রোগের বিবরণ বর্ণনা করো।"

কেমন করিয়া পাশের বাড়ির ছাতে শাড়ি শুকাইতে দেখিয়া তাঁহার রোগের প্রথম সূত্রপাত হয় এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনিদ্রা অরুচি দীর্ঘনিশ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, ভদ্রলোক তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শেষে গত সন্ধ্যায় শাড়ির অধিকারিণী তাহার মাথায় 'ছাত' হইতে একঝুড়ি তরকারির খোসা ফেলিয়া দেওয়াতে অনেকগুলি নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। কবিতা রচনা করিবার প্রবৃত্তি তাহার অন্যতম। এই পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া পকেট হইতে একটি কলার খোসা কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রোগী পুনরায় কহিলেন, "তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রেখেছি আমি—খোসা নয়, এ ফুল।" কবিরাজ মহাশয় তাহাব হাত হইতে খোসা লইয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহাব পব সেটা ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হুঁ, জঞ্জাল প্রক্ষেপ কারিণীর বয়স কত?" রোগী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ষোলো, ষোলো! Sweet—"

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিয়া কহিলেন, "চুপ! ব্যবস্থা—কিশোরী কালানল প্রাতে, সন্ধ্যায় দীর্ঘশ্বাসারি ঘৃত, বুকে মালিশ। যাও দক্ষিণের বাতায়নে একটি স্থূল যবনিকা প্রলম্বিত করো গে।"

ইহার পর ক্রমাগত রোগীরা আসিতে লাগিলেন; একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম যে, সকলেই অসংকোচে সকলের সম্মুখে রোগের গূঢ় নিদান উদ্ঘাটন করিতেছে। লজ্জার লেশমাত্র কাহারও নাই। বৃদ্ধ অনুকূল চক্রবর্তীকে চিনিতাম। চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর সহিত বনিবনা না হওয়াতে তিনি সম্প্রতি বিশ্বম্ভর পাকড়াশীর প্রৌঢ়া পত্নীকে দেখিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছেন এবং এদিকে পাকড়াশী মহাশয় অনুকূলবাবুর চতুর্থ পক্ষের সহধর্মিণীকে কাশীবাস করাইবার সংকল্প করিয়াছেন—সংকল্পের ফলে তাঁহার অরুচি ও শিরঃশূল ইত্যাদি উপসর্গ দেখা

দিয়াছে। উভয়ের রোগের এই পারিবারিক গোপন নিদানের কথা উভয়ে পরস্পরের সম্মুখেই বর্ণনা করিয়া গেলেন, বলিতে বাধিল না। দেখিয়া ত্রিলোচন করিরাজের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি আমার ভক্তি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল।

রোগী ক্রমাগত আসিতেছে, ব্যবস্থা লইতেছে, বিরাম নাই। এদিকে বেলা বাড়িয়া উঠিল দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ঝড়ের মতো একজন ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। 'বাস্তবিকা'র অন্যতম সদস্য রাতুল রাহা! সহসা রাতুল রাহা হরিকুমারের স্বপ্নরাজ্য হইতে বাস্তব শহরে আসিলেন কি করিয়া! ঘরসুদ্ধ সমস্ত লোক নিস্তব্ধ। যে সকল রোগীরা ক্ষণকাল পুর্বেও ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন তাঁহারাও নবাগত রোগীর অবস্থা দেখিয়া কৌতূহলে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন; ত্রিলোচন কবিরাজ রাতুল রাহার দিকে একবার চাহিলেন তাহার পর উঠিয়া আলমারি হইতে বেল কাঠের

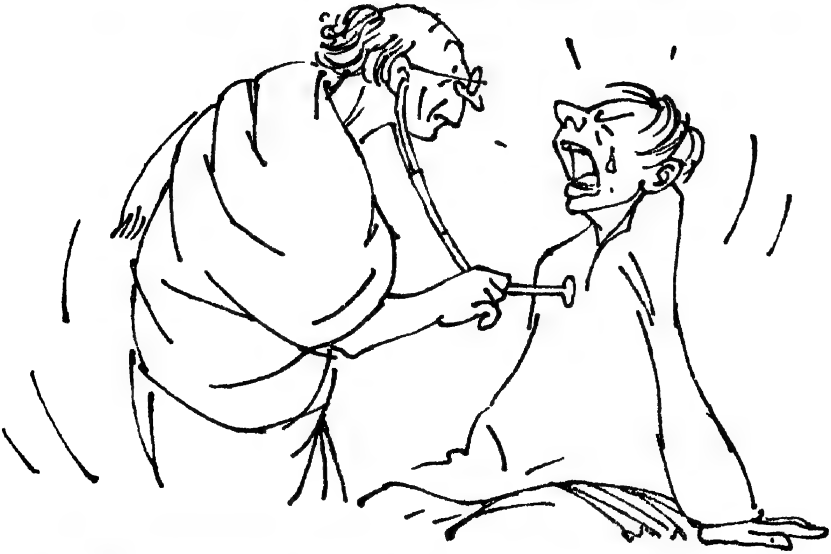

স্টেথস্কোপটি বাহির করিয়া রাতুল রাহার বুকে লাগাইলেন। রোগী চিৎকার করিয়া উঠিলেন "ব্যথা! ব্যথা! বুক আর নেই—ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কবরেজ মশাই।"

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিলেন, রোগী চুপ করিলেন। নাড়ি পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "হুঁ! রোগ জটিল।"

রাতুল রাহা হতাশ হইয়া কহিলেন, "সারবে কি ! না ফাঁদে বদ্ধ হয়ে—"

ত্রিলোচন কবিরাজ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় নাই। অবস্থা বলো।" রোগী কহিলেন, "অবস্থা নেই আর। হৃদয়ের নাভিশ্বাস উঠেছে।" ত্রিলোচন কবিরাজ চক্ষু মুদিয়া কহিলেন, "হুঁ। বলো।"

রাতুল রাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "প্রেম আমার বুকে নীড় বেঁধেছিল সেই ছোট বেলা থেকে। সেই নীড়ে হাজারো প্রেমপাখি ডিম ফুটে বেরিয়েছে। তারা জগৎ ঘুরে সবাই এখন হৃদয় খাঁচায় আসতে চায়। কিন্তু ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই!" বলিয়া রাতুল রাহা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ত্রিলোচন কবিরাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "স্পষ্ট করে বলো।" রাতুল রাহা যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই যে, একাদিক্রমে উনিশটি কুমারীকে তিনি প্রেমনিবেদন করিয়াছেন। পরে নিবাদিতাগণের অভিভাবক এবং অভিভাবিকারা সন্ধান পাইয়া রাহা মহাশয়কে 'বাস্তবিকা' হইতে কুমারীগণের প্রেমার্ঘ্য গ্রহণ করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছেন, ফলে তাঁহার ইহলৌকিক জনক-জননী শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘটক বলিতেছেন যে, রাহা মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এক বৎসরে একান্নটি বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং যথোপযুক্ত মর্যাদা পাইয়াছিলেন। শুনিয়া পুরোহিত ঠাকুরেরা অত্যন্ত খুশি হইয়াছেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া একটা আসন্ন সুতহিবুক যোগের সন্ধান করিতেছেন।

ত্রিলোচন কবিরাজ খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "রোগ জটিল। রীতিমতো চিকিৎসা আবশ্যক।" তাহার পর চক্ষু মুদিত করিয়া ব্যবস্থা বলিতে লাগিলেন, "প্রাতে বৃহৎ প্রেমাঙ্কুশ-লৌহ পূর্ণমাত্রা ও পুরোহিত-নিসূদন রস অর্ধবটি; মধ্যাহ্নে বিবাহ-বিদ্রাবণ রস ও সন্ধ্যায় ঘটকাশনি ও খট্টাঙ্গাবলেহ। পথ্য প্রথম তিন দিবস লঙ্ঘন পরে অবস্থা মতো।" ব্যবস্থামতো ঔষধ লইয়া যখন রাহা মহাশয় বাহির হইয়া যাইতেছিলেন তখন হরিকুমারের বর্তমান সংবাদ শুনিবার অভিপ্রায়ে আমিও উঠিলাম। ত্রিলোচন কবিরাজ পিছন হইতে ডাকিলেন, "অপেক্ষা করো।" ফিরিলাম, কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "তোমাকে আমার একটু প্রয়োজন আছে।" বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত রোগী বিদায় হইয়া গেল। তখন ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, "তোমাকে এই প্রথম দেখিলাম কিন্তু তোমার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ মমতার সঞ্চার হইয়াছে, যেহেতু দেখিতেছি এই ব্যাধি তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। কিন্তু দেখিলে তো বিদ্বান, বুদ্ধিমান, খ্যাতিমান, ধনী, দরিদ্র কেহই এই নিদারুণ

প্রেমব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পান নাই। আমি যদি তোমাদের শহরে চিকিৎসালয় না খুলিয়া বসিতাম তাহা হইলে কি হইত তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। প্রথম যৌবনে এই ব্যাধি আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, গুরুদীক্ষা লইয়া উদ্ধার পাইয়াছি কিন্তু এখনও আমার মাঝে মাঝে তোমাদের নূতন নূতন উপন্যাস ও কবিতার বই পড়িয়া আবার দুই একটি উপসর্গ দেখা দিতেছে। কাজেই গ্রন্থপাঠ একরকম বর্জন করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এই দারুণ সংক্রামক ব্যাধি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তোমরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িতেছ বলিয়াই বোধ হয় এত শীঘ্র রোগগ্রস্ত হও। পুর্বে যেখানে কণ্ঠাশ্লেষ ব্যতীত রোগোৎপত্তি হইত না সেখানে এখন একটি কটাক্ষই দেখিতেছি যথেষ্ট—আবার স্কুল কলেজ এবং তোমাদের মধ্যে শাড়ির আঁচল ও চাবির গুচ্ছ পর্যন্ত রোগবীজাণু ছড়াইতেছে। ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ পদশব্দ শুনিয়াই তোমরা মূর্ছা যাইবে।”

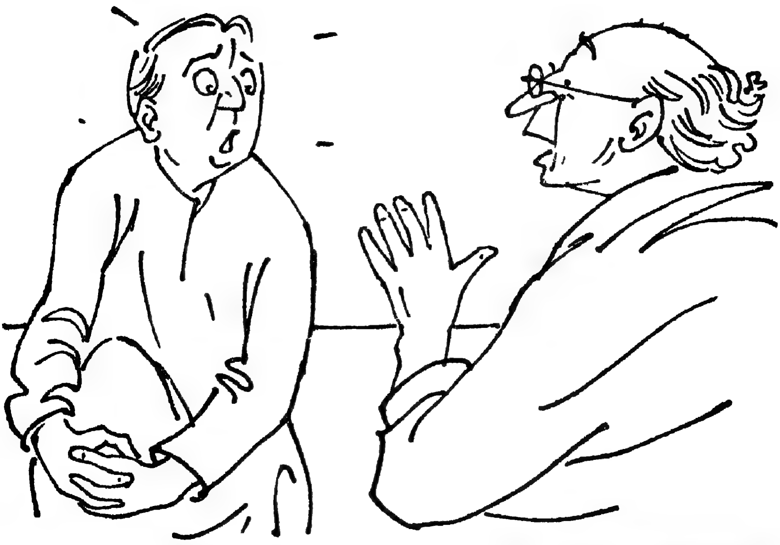

লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলাম, পকেটে পয়সা না থাকিলে এখনও গৃহিণী আসিবার শব্দ শুনিলে মূর্ছার উপক্রম হয়, তাহা আর বলিতে পারিলাম না। ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, “তুমি অদ্য যাও। তুমি রোগগ্রস্ত হও নাই সুখের কথা, কিন্তু এ ব্যাধিসঙ্কুল নগরে যেখানে মেয়েস্কুলের গাড়ি হইতে বায়োস্কোপের ছবি পর্যন্ত এই দারুণ রোগের জীবাণু বহন করিতেছে, সেখানে রোগগ্রস্ত হইতে বেশি সময় লাগে না। সাবধানের বিনাশ নাই, কাজেই প্রতিষেধক মদনমর্দন

বটি ও কটাক্ষারি অঞ্জন লইয়া যাও। সপ্তাহে একটি করিয়া বড়ি শীতল জলসহ সেবন করিবে ও প্রত্যহ চোখে কটাক্ষারি অঞ্জন একবার করিয়া লাগাইবে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, রোগিণীরা অপেক্ষা করিতেছেন।”

আমি প্রণাম করিলাম। কবিরাজ মহাশয় পুনরায় মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে করিতে দোতলায় চলিয়া গেলেন।

বাহির হইয়া প্রথমে দ্রুতপদে কাশীমিত্রের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজল অনুপানে ত্রিলোচন কবিরাজের একটি বটি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নারীজন সংক্রান্ত সর্বপ্রকার চিন্তা তিরোহিত হইল, গৃহিণীর কথাও ভুলিয়া গেলাম, মনে হইতে লাগিল জগতে আমি একাকী—আমার কেহ নাই, কেহ নাই, কেহ নাই। সম্মুখে দুর্গতিনাশিনী গঙ্গা খল্ খল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতে লাগিলেন।*

---

*এই রচনা প্রেসে দিবার পবই আমরা বিপন্ন হইয়া পডিলাম। আমাদের বুডা কম্পোজিটর হইতে আরম্ভ করিয়া দপ্তরীর নয় বৎসরের ছেলেটি পর্যন্ত ত্রিলোচন কবিরাজের ঠিকানা জানিবার জন্য বার বার বিরক্ত করিতে লাগিল। এমন কি প্রসিদ্ধ মুষ্টিবীর অবলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ও সংবাদপত্র-তাত্ত্বিক বৈকুণ্ঠ চাটুজ্যে, সেলটিক সভ্যতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক বারিদবরণ চৌধুরী, সংবাদপত্র-সেবক ঔপন্যাসিক উৎফুল্ল দত্ত, প্রসিদ্ধ পাঁচালী গায়ক সুবর্ণবণিক কুলতিলক ভবভূতি লাহা পর্যন্ত পত্র লিখিলেন। রচনায় ঠিকানা না থাকাতে অবস্থা বুঝিয়া আমরা শ্রীযুক্ত দিবাকর শর্মাব নিকট পত্র লিখি। তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন—

“গৃহিণী কর্তৃক তাডিত হইয়া সমস্ত জগতের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি হইতে বাহির হই। শেষে ক্লান্ত হইয়া গয়লামাসীর খোলার ঘরের বারান্দায় চাদর বিছাইয়া শুইয়া পড়ি, নিদ্রিত অবস্থায় ত্রিলোচন কবিরাজকে স্বপ্নে দেখি এবং বাডিতে ফিরিয়াই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলি। রচনাটি তাহাই, তবে ভরসা আছে স্বপ্ন ফলিবে— যেহেতু ত্রয়োদশীর দিন স্বপ্ন দেখিয়াছি। এই কথা বলিয়া আপনার বন্ধুগণকে ভরসা দিবেন, ইতিমধ্যে পারিবারিক তাডনার ফলে যদি পুনরায় স্বপ্ন দেখি তবে ত্রিলোচন কবিরাজকে তাঁহার পার্থিব ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা করিব। ইতি— শ্রীদিবাকর শর্মা

সম্পাদক, শঃ, চিঃ

পরিমল গোস্বামী ( ১৮৯৭— )

# অভিনন্দন

সভায় লোক গমগম করছে। সে অবশ্য সভার ঘরটা খুব বড়ো নয় বলেই। মাঝারি হলঘর এক জমিদার বাড়ির। জমিদার স্বয়ং সভার একজন উদ্যোক্তা।

কবি হলধর হালদারের আজ ত্রিংশত্তম জন্মদিন। এই জন্মতিথি পালন করা হচ্ছে আজ বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ঘটনা অভিনব। কারণ এ দেশে সাহিত্যের যদিবা কিছু মর্যাদা হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যিকের মর্যাদা, বিশেষ করে এত অল্প বয়সে কেউ পায়নি। রবীন্দ্রনাথও এত কম বয়সে দেশবাসীর তরফ থেকে প্রকাশ্য সভায় কোনো অভিনন্দন পাননি।

কিন্তু বাংলাদেশ ইতিমধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে, দেশ উন্নতির পথে চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। এমন অবস্থায় হলধর হালদারের মতো কবিকে জাতির অভিনন্দন লাভের জন্যে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে দেওয়া জাতীয় কলঙ্ক। দেশের মন জেগেছে, স্বাধীনতা এসে গেছে, এই তো বীরপূজার সময়। রাজনীতির দিকে এই বীরপূজা শুরু হয়েছে অতি ব্যাপকভাবে। ইংরাজ তাড়ানোর অভিপ্রায়ে যারা একদিনের জন্যেও গোপনে গুলি ছোঁড়া অভ্যাস করেছে তারা সবাই পূজনীয়। তাদের পূজা আগে। কিন্তু এই পূজা এমন আড়ম্বরের সঙ্গে শুরু হয়েছে যে এর মধ্যে সাহিত্যিকদের কথা কেউ ভাবছেই না। স্বাধীনতা লাভের আগের দিন কিন্তু সাহিত্যিকরা ভেবেছে তারাই দেশের সংস্কৃতির পরিচালক, স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়েছে তারাই। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর থেকে তারা চাপা পড়ে গেছে। কলমকে লোকে ভুলে গেছে। চারিদিকে বোমা পিস্তলের জয়ধ্বনি, আর কিছু না। লোকে বলছে, মশাই আত্মত্যাগ চাই। ক-টা সাহিত্যিক মরেছে এই স্বাধীনতার কাজে? এমন কি এত বড়ো দাঙ্গা হয়ে গেল এর মধ্যেও কোনো সাহিত্যিক মরেছে? ১৯৪৬ সালের প্রথম দাঙ্গায় দুজন সাহিত্যিক নিখোঁজ হয়েছিলেন মাত্র কিন্তু তাও বেশিদিনের জন্যে নয়।

তাছাড়া দেশকে বাঁচানোর জন্যে শুধু আত্মত্যাগের কোনো দাম নেই। সে রকম আত্মত্যাগ তো মশাই, যারা নিজেরা না খেয়ে দেশকে খাইয়েছে সেই কোটি কোটি চাষাও করেছে! তাদের ভাগ্যে ক-টা অভিনন্দন জোটে? জোটে না, তার কারণ সে আত্মত্যাগে নাটকীয় গুণ থাকে না, সভা সমিতিতে তার উপর কোনো বক্তৃতা দেওয়া যায় না। নাটকীয় গুণবিশিষ্ট আত্মত্যাগই আসল আত্মত্যাগ, ওকেই বলে দেশপ্রেম। বেছে বেছে এই দেশপ্রেমকে পুজো না করলে গণতান্ত্রিকতার সম্মান থাকে কোথায়?

সুতরাং সাহিত্যিকরা আর অপেক্ষা করতে পারে না। হলধর হালদারের মতো সাহিত্যিক তো নয়ই। আপাতদৃষ্টিতে হঠাৎ এ ঘটনাকে বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনাটি তলিয়ে দেখুন। কবি ও কথাশিল্পীরাও দেশপ্রেমিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের ছবি টাঙিয়ে একটা প্রদর্শনীও হয় না। তারা ইতিপূর্বে যেটুকু সম্মান পেয়েছে তার জন্যে দেশের লোক হয়তো অনুতাপ করবে। এই সম্মান তারা এখন নিজেরা চেষ্টা করে যদি না উদ্ধার করতে পারে তাহলে দেশের পরিণাম অতি ভয়াবহ। হয়তো হঠাৎ একদিন প্রবন্ধ লেখকরা দেশপ্রেমিক হিসেবে পুজো পেয়ে বসবে, কারণ সাহিত্যক্ষেত্রে তারাও এখন একটা মর্যাদা পাচ্ছে। সুতরাং সব দিক ভেবে চিন্তেই স্বাধীন বাংলার কবি হলধর হালদারকে দিয়ে প্রথম সাহিত্যিক পুজা শুরু হল। এতে অতঃপর পালাক্রমে সবাই পর পর অভিনন্দন পেতে পারবে তাদের জীবিতকালেই। বাংলাদেশের পরমায়ুর গড় তেইশ বছর। কে কবে মরে যায় ঠিক নেই। সে হিসেবে ত্রিশ বছরের হলধর হালদারের তো জীবনের মেয়াদ পার হয়ে গেছে। তা ছাড়া রচনা সংখ্যার দিক দিয়ে তাকে প্রবীণ বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। সে কবিতা লেখা শুরু করেছে আঠারো বছর বয়স থেকে, তার বারো বছরের কাব্যজীবনে কবিতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার। এত অল্প দিনে এত কবিতা—দেশপ্রেমের চূড়ান্ত প্রমাণ।

সভা জমে উঠেছে। হলধর হালদারকে উপযুক্ত সম্মানই দেওয়া হচ্ছে সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ জাতির পক্ষ থেকে। হলধর রচিত গান দিয়েই সভার উদ্বোধন হল। তারপর বক্তারা উঠতে লাগলেন একে একে। প্রথম বক্তা বললেন, 'হলধর হালদার বাংলার গৌরব। তিনি দেশের দুঃখ-দুর্দশার গান গেয়ে চলেছেন হৃদয়ের সকল আবেগ দিয়ে। যখন তিনি প্রথম কবিতা লেখা শুরু করেন—সে আজ বারো বছর আগের কথা—সে সময় তিনি

বাংলার পাখি, বাংলার আকাশ এবং বাংলার বাতাসকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন। তারপর তাঁর কাব্যজীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু। এই পর্বে আকাশ থেকে তাঁর দৃষ্টি যে ক্রমশঃ মাটির দিকে ফিরছে তার প্রথম আভাস পাওয়া যায়

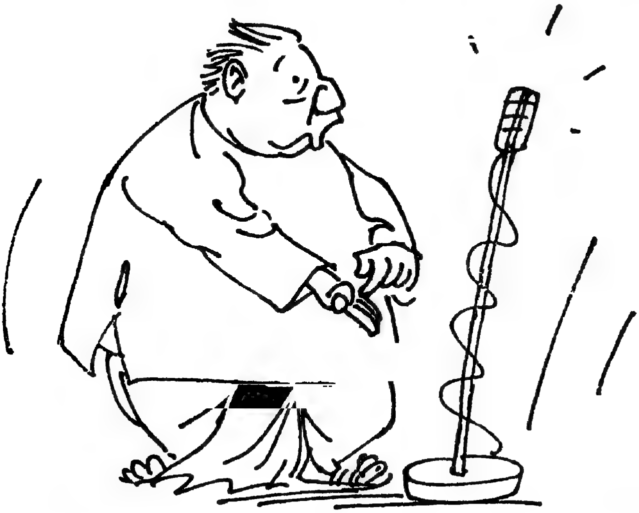

তাঁর কেঞ্চু নামক গদ্য কবিতায়। এই কবিতাটি আমি পড়ে শোনাচ্ছি।—কেঞ্চু হচ্ছে আমাদের সুপরিচিত কেঁচো।'

বক্তা পাঁচ মিনিট ধরে পড়লেন কবিতাটি।

তারপর বলতে লাগলেন, “এ এক আশ্চর্য কাব্য। বাঙালীকে শেষ পর্যন্ত কল্পনার আকাশে উড়ে বেড়ানোর শখ ছেড়ে তার চিরদিনের বাসস্থান মাটিতেই পড়ে থাকতে হবে—সেই কথাটা একটা কঠোর ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন এতে। কিন্তু বলতে পারেন এই কেঞ্চু কে? এই কেঞ্চু হচ্ছি আমরা, কারণ আমাদের মেরুদণ্ড নেই, আমরা গর্তে বাস করি—বিস্তীর্ণ পৃথিবী আমাদের অপরিচিত। এই দিকেই কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটাই হল কবিধর্ম। কবির কাজই হল নবযুগের সূচনা করা। কবি হলেন সত্যদ্রষ্টা, হলধর হালদারও সত্যদ্রষ্টা। আর সত্যদ্রষ্টা যিনি তিনি হচ্ছেন ঋষি। হলধর হালদার ঋষি।”

করতালি ধ্বনিতে হলঘর মুখরিত হল।

দ্বিতীয় বক্তা বললেন—“আমি ওঁর হিমালয় ও বঙ্গোপসাগর নামক কবিতাটিকে একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে বিবেচনা করি। কারণ এ কবিতার মধ্যে তিনি

ভবিষ্যৎ বঙ্গ-বিচ্ছেদের সুরটি ফুটিয়েছেন। ১৯৪৫ ও ১৯৪৭-এর আভাস ধরা পড়েছে তাঁর কল্পনায়। হিমালয়ের প্রস্তরীভূত তরঙ্গের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরল তরঙ্গের তুলনা করে তিনি যে অসাধারণ কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার কথা আমি নতুন করে বলব না, আমি বলতে চাই তাঁর ঋষিসুলভ দৃষ্টির কথা। ১৯৪৫ সাল কবিতাটির রচনাকাল। কিন্তু তবু হিমালয় ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী দেশগুলোর কথা একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন। তার অর্থ, ১৯৪৭ সালের বাউণ্ডারি কমিশন উত্তরে হিমালয় সংলগ্ন দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর-সংলগ্ন চব্বিশ-পরগনা-মেদিনীপুর যে একই রাষ্ট্রে রাখবেন তার ইঙ্গিত আছে এতে। কবি মধ্যবর্তী জেলাগুলোর কোনো বৈশিষ্ট্যই এই কবিতায় স্থান দেননি। দিতে পারতেন। পাহাড় ও জলের ঢেউয়ের সঙ্গে ধানক্ষেতের ঢেউ উল্লেখ করতে পারতেন, কিন্তু কোন্ ধানক্ষেত কোন্ রাষ্ট্রে পড়বে তা নিয়ে পাছে গোলমাল হয়, সেজন্যে তাঁর ধ্যানচিত্রে ধানক্ষেত কোনো ছায়াপাত করেনি। অতএব হলধর হালদার যে ঋষি এই কথাটি আশা করি আমিও প্রমাণ করতে পেরেছি।"

সভাঘর আবার হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হল।

বক্তৃতা চলল পাঁচ ঘণ্টা ধরে। কেউ কবিতা পাঠ করলেন, কেউ গান গাইলেন, কেউ নাচলেন, এবং সব শেষ হলে সভাপতি বললেন—

"আমরা আজ হলধর হালদারকে যে অভিনন্দন জানাচ্ছি এ সম্পর্কে আমার পুর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, 'এ অভিনন্দন শুধু আমাদের এই কয়েকজন সাহিত্যিকের নয়, এ হচ্ছে সমস্ত বাংলাদেশের অভিনন্দন।' কিন্তু কথাটা আমি একটু অন্যভাবে বলতে চাই। আমি বলি এ অভিনন্দন বাংলাদেশকেই অভিনন্দন। কারণ হলধর হালদারের কাব্যে দেশের মর্মকথা ব্যক্ত হয়েছে। —অতএব হলধর হালদারই বাংলাদেশ।"

সভাপতি বলতে লাগলেন "আমি হলধর হালদারের কাব্যে একটি অতি গভীর ও মুল্যবান ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। তিনি গত এক বছরের মধ্যে ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগের উপর এক হাজার, দাঙ্গার উপর সাত-শ, বোমার যুগের উপর পাঁচ-শ, ১৫ই আগস্টের উপর সাড়ে চার-শ এবং বাউণ্ডারি কমিশনের রায়ের উপর তিন-শ কবিতা লিখেছেন। কবির উদ্দেশ্য আপনারা কিছু বুঝতে পেরেছেন কি? মোটামুটি একরকম অবশ্যই বুঝেছেন, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য থেকে তার শাঁস গ্রহণ করতে হলে খোসা ছাড়িয়ে, খোল ভেঙে, ভিতরে প্রবেশ করতে হবে।

আমি তা করেছি। এবং করে যা পেয়েছি তা হচ্ছে এই যে স্বভাবতঃ উদ্যমহীন বাঙালীর সম্মুখে অবিলম্বে-কর্তব্য কোনো কাজের লোভনীয় পরিকল্পনা নেই, অথচ স্বাধীন বাংলায় বাঙালীকে একদিন না একদিন কাজের ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। তাই বাঙালী জীবনে তৎপরতা এবং কর্মচাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলার জন্য আপাতত হাতের কাছে যা আছে তারই দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। তার মনে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করা দরকার। আমরা কি ছিলাম তা বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। দাঙ্গায় মাঝে মাঝে উস্কানি দিয়ে হাত-পা চালনা শিক্ষা দেওয়া দরকার। তাই হলধর হালদার তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছেন বাঙালী উদ্বোধনের কাজে। বাঙালীত্ব

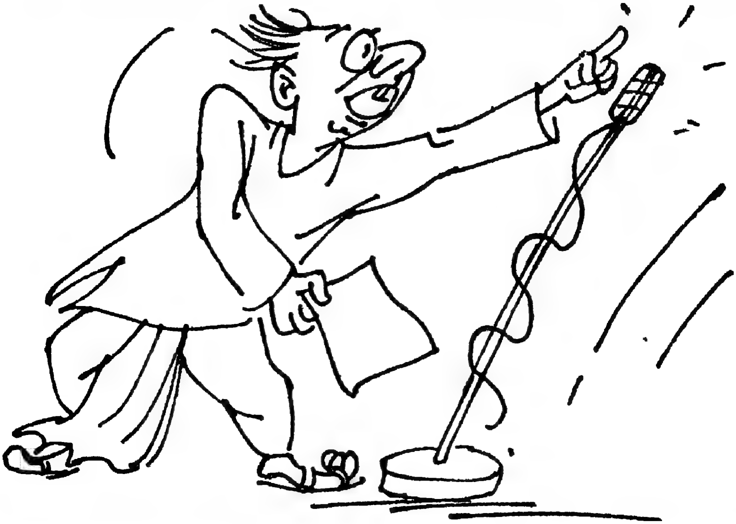

উদ্বোধনের কাজে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ গড়ে তোলার কাজে। তাই হলধর হালদার আমার মতে মহাবাঙালী এবং মহামানব।"

সুদীর্ঘ আধঘণ্টাব্যাপী হর্ষধ্বনি ও কোলাহলের মধ্যে সভা ভঙ্গ হল। হলঘর খালি হয়ে গেল ধীরে ধীরে। সভার উদ্যোক্তারা দশ বারোজন মিলে জমিদারের বৈঠকখানা ঘরে নিমন্ত্রিত হলেন চা খেয়ে যাওয়ার জন্যে। হলধর হালদারকে শোভাযাত্রা করে প্রকাশ্য পথে বের করে নিয়ে গেল ভক্তরা।

চায়ের আসরে প্রথম বক্তা বললেন, "কেঞ্চু কবিতাটি একটা ধাপ্পা। রূপক টুপক কিছু নেই ওতে।"

আর একজন বললেন, "হিমালয় ও বঙ্গোপসাগর-টাই বা কী হয়েছে ?"

আর একজন বললেন "গত এক বছরের সব কবিতাই দেখেছি—যে সব দাবি করা হল, যে-সব ইঙ্গিত আছে বলা হল, সে অনেকটা জোর করে নয় কি ?"

আর একজন বললেন, "সত্য কথা বলতে কি ওর কোনো কবিতাতেই মনে কোনো ছাপ আঁকে না।"

সভাপতি বললেন, "ও শালা আবার কবিতা লিখতে জানে নাকি !"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৯৮— )

# ট্রিটি

‘লাগ’ ও ‘ফাঁস’ শব্দ দুটি নাগ ও পাশের অপভ্রংশ রূপ নয়। দুটিই আভিধানিক শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং দুটি ব্যক্তির নাম। ‘লাগ’ অর্থে লাগাইয়া দেওয়া বা বাধাইয়া দেওয়া আর ফাঁস অর্থে ফাঁসাইয়া দেওয়া। আরও একটু খুলিয়া বলা দরকার, বিবাদই হউক আর বন্ধুত্বই হউক, একজন বাধাইয়া দেন অর্থাৎ লাগাইয়া দেন, অপরজন সে বিবাদ বা বন্ধুত্ব ফাঁসাইয়া দেন। বিবাদ ফাঁসাইয়া মিটমাট হয়, বন্ধুত্ব বাধে; বন্ধুত্ব ফাঁসাইয়া বিবাদ বাধে; মোট কথা, পৌনঃপুনিক নিয়ম অনুযায়ী ইহা চলিতেই থাকে। তাহার উপর দেশে ষষ্ঠীপুজার সমারোহ এখনও একবিন্দু কমে নাই, লোকসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে, সুতরাং উপলক্ষ বা পক্ষের অভাব হয় না। তবে কে যে ‘লাগ’, আর কে যে ‘ফাঁস’—এ নিরাকরণ এখনও হয় নাই, বোধহয় এ জীবনে হইবেও না; কারণ ইনি যেখানে বিবাদ লাগাইয়া দেন, উনি সেখানে ফাঁসাইয়া দেন; আবার উনি যেখানে লাগাইয়া দেন, ইনি সেখানে ফাঁস-মূর্তিতে আবির্ভূত হন।

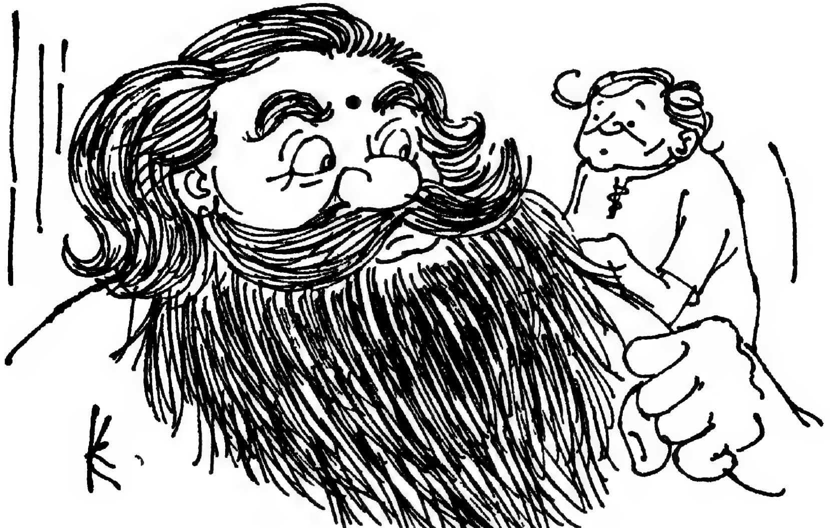

পরস্পরের বাড়ি আট মাইল দূরবর্তী দুখানি গ্রামে। একজন কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় শাক্ত বংশের সন্তান। কালীচরণের আবক্ষলম্বিত দাড়ি, বড়ো বড়ো গোঁফ, বড়ো বড়ো চুল; কপালে সে একটা পয়সার মতো আকারের সিন্দুরের ফোঁটা কাটে, গলায় ইয়া মোটা এক রুদ্রাক্ষের মালা পরে এবং মোটা গলায় মধ্যে মধ্যে ডাকে—কালী! কালী! সে ডাক শুনিলে মনে হয় কালী কালীচরণের বদ্ধ কালা ঝি। পৈতৃক ব্যবসায় গুরুগিরি, তাহার উপর ভাগ্যক্রমে জুটিয়াছে এই লাগ ফাঁসের ব্যবসায়।

অপরজন—রাধাচরণ, বৈষ্ণবধর্মী ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, উপাধি গঙ্গোপাধ্যায়। রাধাচরণ কিন্তু কেশ-ধর্মী নয়, মুখে তাহার দাড়ি গোঁফের চিহ্নমাত্র নাই। মাথার চুল সে খুব ছোট করিয়া ছাঁটে, কেবল মধ্য-মস্তকে পরিপুষ্ট লম্বা টিকি পাদপহীন দেশের এরণ্ডের মতো ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে থাকে। গলায় চার ফের মোটা তুলসীর মালা, কপালে নাকে তিলক মাটির ফোঁটা ও বুকে হাতে পদচিহ্নের ছাপে রাধাচরণ বিশোভিত। সেও মধ্যে মধ্যে ডাকে, রাধে! রাধে! মোলায়েম গলায় সুরের একটি রেশ ডাকের মধ্যে বেশ বুঝা যায়। সম্মুখের পথে সে সময় জলের কলসী লইয়া সিক্ত বস্ত্রে যে সব পল্লীকন্যা বা বধূরা যায় তাহারা আত্মগত ভাবেই বলে, মরণ! এত লোক মরে –। বাকিটা আর শোনা যায় না, মৃদু স্বর দূরত্ব হেতু আর ভাসিয়া আসে না। রাধাচরণেরও পৈতৃক ব্যবসায় গুরুগিরি, তাহার উপর এই লাগ ফাঁসের ব্যবসায়।

একজন সাবমেরিন, অন্যজন বোমাবর্ষী এরোপ্লেন। কালীচরণ কারণ সলিলে অহরহই নিমজ্জমান, রাধাচরণ বৈষ্ণব, গঞ্জিকা প্রসাদাৎ সে ব্যোমমার্গী। আবার উভয়েই উভয়ের পরমাত্মীয়, উভয়েই উভয়ের ভগ্নীপতি অর্থাৎ উভয়েই উভয়ের শ্যালক।

প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বে একটি কায়স্থ জমিদার বংশকে উপলক্ষ করিয়া এই 'লাগ'-'ফাঁস' লীলা আরম্ভ হইয়াছিল। একই বাড়ি ভাঙিয়া দুই বাড়ি, এক বাড়ির মালিকের ছিল নেড়ানেড়ির উপর প্রচণ্ড ক্রোধ, অপরজনের ছিল মাতালের উপর বিষম বীতরাগ। ফলে পারলৌকিক সদ্গতির জন্য প্রথম পক্ষ শরণ লইলেন কালীচরণের। কালীচরণ বলিল, মাভৈ!

অপর পক্ষ রাধাচরণের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পায়ের ধূলা স্তূপ করিয়া

মুখে এবং ভক্তিভরে মাথায় বুলাইয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, আমাকে পার করতেই হবে।

রাধাচরণ গদগদ হইয়া বলিল, রাধারানী ভরসা!

সদ্গতি ইহলোকেই আরম্ভ হইল। দুই পক্ষেরই দীক্ষা হইল একই দিনে একই স্থানে, পিতৃপুরুষের এজমালি ঠাকুর-বাড়িতে। ঠাকুর বাড়ির একদিকে কালীমন্দির, অপরদিকে গোবিন্দজীর আনন্দ নিকেতন; উভয় দেবতার মন্দিরের সম্মুখে এক প্রশস্ত নাটমন্দির। সন্ধ্যায় উভয় পক্ষেরই গুরু-শিষ্যে আপন আপন ইষ্টদেবতার মন্দির-দুয়ারে বসিয়া স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিবার কল্পনা করিতেছিল। রাধাচরণ ও কালীচরণ পরস্পরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, কারণ কেহ কাহারও মুখ দেখিত না।

সে কথা পরে বলিব। রাধাচরণ অকস্মাৎ নাক সিঁটকাইয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস টানিয়া বলিল, উঃ, এমন দুর্গন্ধ কিসের হে?

মাথা চুলকাইয়া শিষ্য বলিল, আজ্ঞে, ও বাড়ির ঠাকুরমশাই 'কারণ' করছেন।

বিষম ঘৃণায় ঠোঁট দুইটি বিকৃত করিয়া রাধাচরণ বলিল, রাধে, রাধে, ছি-ছি-ছি! প্রভু বিরাজমান থাকতে এই অনাচার এখানে! তারপর সন্ধ্যায় যেরকম ঢাকের শব্দ! কাল থেকে তুমি এখানে সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করো।

শিষ্য উৎসাহিত হইয়া বলিল, যে আজ্ঞে।

গাঁজার কল্কের গোড়ায় গোলাপজলে ভিজানো ন্যাকড়া জড়াইতে জড়াইতে রাধাচরণ বলিল, আর ওই ঘৃণিত দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটা বন্ধ করারও প্রয়োজন বাবা। রাধাগোবিন্দ ও গন্ধ সহ্য করতে পারেন না।—বলিয়া চোঁ করিয়া টান মারিয়া কুম্ভক করিয়া দম চাপিয়া বসিয়া রহিল। তারপর 'ফু' করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া কল্কেটি শিষ্যের হাতে দিল, বলিল, সেই জন্য প্রথম থেকে মনে হচ্ছিল, প্রভু আমার যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে আছেন। সন্ধ্যায় তুমি প্রভুর মন্দিরে ত্বরিতানন্দ ভোগের ব্যবস্থা করো; খুব সুগন্ধি ষোড়শাঙ্গী ধূপের ব্যবস্থা করো, যেন ওই পদার্থটার গন্ধ প্রভুর কানে আর না যায়, মানে নাকে।

শিষ্য আরও খানিকটা উৎসাহিত হইয়া বলিল, তাই করবো আমি।

গুরু এবার বলিলেন, কিন্তু কই, তুমি তো ত্বরিতানন্দের প্রসাদ নিচ্ছ না। না না না, ওতে তুমি লজ্জা কোরো না। দেবভোগ্য বস্তু, দেখবে জপ করতে কত একাগ্রতা আসে মনে।

শিষ্য সলজ্জভাবে মুখটি ঈষৎ ফিরাইয়া চোঁ করিয়া দম টানিয়া লইল। কিছুক্ষণ

পরই লালচে চোখ পিটপিট করিতে কবিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠিক বলেছেন আপনি, প্রভু আমার বিমর্ষ হয়েই আছেন।

পরদিন সন্ধ্যায় মহাসমারোহে সংকীর্তন আবম্ভ হইল। বারান্দায় গুরু-শিষ্যে ত্বরিতানন্দের ভোগ দিতেছিল। দশ বারোটি ধূপকাঠির মাথায় ধোঁয়া উঠিতেছে, সে বস্তুটার গন্ধ আজ সত্যই চাপা পড়িয়াছে।

ওদিকে কালীমন্দিরেব দুয়াবে 'কারণ' করিতে কবিতে কালীচবণ খোলের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া আরক্ত চোখে বলিল, এ কী অনাচার। খোলের শব্দে যোগমাযার যোগভঙ্গ হবে যে। বন্ধ করো।

শিষ্য বিব্রত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, ওবা বলছে, তা হলে এখানে ঢাক বন্ধ করতে হবে।

হুম। চোখ পাকাইয়া ঠোটেব উপর ঠোঁট চাপিয়া হুংকার দিবাব ভঙ্গিতে কালীচবণ বলিল, হুম্। সঙ্গে সঙ্গে একপাত্র কাবণ ঢালিয়া পান করিয়া শিষ্যের পাত্রও পরিপুর্ণ কবিয়া দিয়া বলিল, পান কবো।

আবাব অকস্মাৎ বলিল, হুম্। তাবপব বলিল, উত্তম, তুমি মা-কালীব দববাবে বলিব ব্যবস্থা কবো।—বলিয়াই অভ্যাসমতো হাঁক মারিয়া ডাকিয়া বলিয়া উঠিল, কালী—কালী।

শিষ্য একটু দ্বিধাভবে বলিল, আজ্ঞে, বলিব প্রথা তো প্রচলিত নেই, এজমালি নাটমন্দিব, ওবা যদি বাধা দেয়।

কালীচবণ হাঁক দিয়া উঠিল, মাভৈ!

পবদিন দ্বিপ্রহবে ঢাকে বলিদানেব বাজনা বাজিয়া উঠিল। রাধাচরণ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, বাবাজী, এ কী ব্যাপার? বাজনাটা যে কেমন কেমন মনে হচ্ছে।

শিষ্য কোনো উত্তব দেবার পুর্বেই একজন কর্মচারী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, আজ্ঞে বাবু সর্বনাশ হয়ে গেল। ও বাড়ির কত্তা কালীমন্দিরে বলি দিলেন আজ।

বলি? বলি কি?

আজ্ঞে, পাঁঠা।

হা গোবিন্দ।—বলিয়া রাধাচবণ সেইখানেই গড়াইয়া পড়িল। নাটমন্দিরে

তখন কালীচরণ পরমানন্দে সিংহনাদে গান ধরিয়াছে—

ওমা দিগম্বরী নাচ গো!

রাধাচরণ শিষ্যকে বলিল, বলি বন্ধ করিতে হইবে। মোকদ্দমা করো তুমি। যা কখনও নেই, তা হতে পারে না। আমি জানি, হাইকোর্টে মোকদ্দমা হয়েছে, তাতে শাক্তের দেবী মন্দিরে এক অংশীদার বৈষ্ণবমন্ত্র নেওয়ায় তার পালার সময় বলি বন্ধ হয়েছে। আর এ বলি যখন কখনও নেই তখন বলি হতেই পারে না।

শিষ্যও মাতিয়া উঠিয়াছিল, একে জমিদার, তায় জ্ঞাতি বিরোধের গন্ধ, সর্বোপরি কিছুক্ষণ পূর্বেই গুরুতর প্রসাদ পাইয়াছে। সে বলিল, আপনি আমার গুরু, আপনার কাছে শপথ করছি এ অনাচার আমি বন্ধ করবই। দেখুন, একটা ভালো দিন দেখুন--

বাধা দিয়া রাধাচরণ বলিল, গুরুর সঙ্গে মঘা ত্র্যহস্পর্শে যাত্রায় বাধে না। কালই চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাব। দিনও অবশ্য কাল খুব ভালোই—সর্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী।

শিষ্য কৃতার্থ হইয়া গেল। রাধাচরণ আবার গাঁজা লইয়া বসিল। ব্যোমমার্গী বোমাবর্ষী এরোপ্লেন উড়িল।

শিষ্যের নায়েব বলিল, মামলার চেয়ে আপনারা দুই গুরুদেবে মিলে একটা মীমাংসা করে দিন—

বাধা দিয়া প্রচণ্ড ঘৃণাভরে রাধাচরণ বলিল, ও পাপিষ্ঠের আমি মুখ দেখি না।

কালীচরণের শিষ্য একটু চিন্তিত হইয়াই সংবাদটা দিল। কালীচরণ হা-হা করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, এতেই তুই ভয় পেয়ে গেলি বেটা, মাভৈ রে বেটা, মাভৈ! চল্, দেখি, আমার সর্বনাশী ন্যাংটা বেটি কি বলে দেখি! নিয়ে আয় কারণ।

কারণ পান করিয়া শিষ্যকে প্রসাদ দান করিয়া বলিল, দেখ, মায়ের হাসিটা দেখ। বলিয়া নিজেই খল খল করিয়া হাসিয়া সারা হইল। শিষ্য মূর্তির দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যই মা হাসিতেছেন। সে গুরুর পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

কালীচরণ বলিল, লাগিয়েছে মোকদ্দমা লাগাতে দে, তিন তুড়িতে আমি

ফাঁসিয়ে দোব। হাইকোর্টের নজির আছে, শাক্তের বাড়িতে এক শরিক বৈষ্ণব হওয়ায় তার পালায় বলি বন্ধ হয়েছে। তখন শরিক শাক্ত হলে তার পালাতেই বা বলি প্রচলন হবে না কেন শুনি?

শিষ্য আর এক পাত্র কারণ পান করিয়া বলিল, ফিন কাল বলি দেঙ্গে জোড়া পাঁঠা।

কালীচরণ হাসিয়া বলিল, এক খোঁচাতে মামলার তলা ফাঁসিয়ে দোব, ভাবছিস কেন?—বলিয়া হাঁক মারিয়া উঠিল, কালী—কালী! আবার পাত্রে পাত্রে কারণ ভরিয়া উঠিল।

বাবা! শিষ্যের বৃদ্ধা মাতা আসিয়া বলিলেন, বাবা, এইসব মোকদ্দমা-ফৌজদারীর চেয়ে আপনারা দুই গুরুতে বিচার করে যদি মিটমাট করে দেন সে তো ভালো হয়। আপনারা দুজনে পরমাত্মীয়—

কালীচরণ বিপুল বিক্রমে হাঁক মারিয়া উঠিল, কালী—কালী! ওকথা বোলো না আমাকে—ওটা হল ভণ্ড, ওটা একটা পাঁঠা। মা কালীর দরবারে ওকে বলি দিলে তবে আমার রাগ যায়।

পরদিনই জোড়া পাঁঠা বলি দিয়া পুজান্তে কালীচরণ সশিষ্য সদরে রওনা হইল, মামলার জবাবের চেষ্টায়।

সারমেরিন ভর ভর করিয়া ডুবিল।

বাক্যালাপ তো নাই-ই, কেহ যে কাহারও মুখ পর্যন্ত দেখে না ইহার মধ্যে এতটুকু ছলনা নাই, কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ইহার কারণ স্মরণ করিয়া কালীচরণ দাঁত কড়মড় করিয়া উঠে বন্য বাঘের মতো; রাধাচরণ সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আক্রোশে মুখ চোখ তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিতে থাকে দংশনোদ্যত কেউটের মতো।

জীবনে প্রথম দেখা হইতেই ইহার সূত্রপাত। রত্নপুরের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত টোলে একই বৎসরে দুই রত্নের আগমন হইয়াছিল। রত্নপুর গ্রামখানি কালীচরণ ও রাধাচরণ উভয়ের গ্রামের প্রায় মাঝখানে পড়ে। গ্রাম্য পাঠশালায় উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করিয়া দুইজনেই আসিয়া টোলে ভর্তি হইল। মহাপুরুষদের চিন্তাধারা প্রায় এক রকম, এবং কর্মধারাও সেই সঙ্গে সঙ্গে এক রকমই হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। উভয়েই মনস্বী, উচ্চ-প্রাথমিক পাস করিতে করিতেই কালীচরণের দাড়ি বেশ ইঞ্চিখানেক লম্বা হইয়া গজাইয়া উঠিয়াছিল, এবং রাধাচরণের মুখমণ্ডলেও তখন সপ্তাহে দুইবার

ক্ষুর চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কামানো মুখে কালসিটের দাগের মতো আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কালীচরণ কয়দিন আগে আসিয়াছে। কিন্তু রাধাচরণ যখন আসিল, তখন সে উপস্থিত ছিল না, পূর্বদিন সন্ধ্যাতেই স্থানীয় এক শিষ্যের বাড়িতে কালীপুজা উপলক্ষে গিয়াছিল। বেলা প্রায় দু-প্রহরের সময় ঘর্মাক্ত দেহে পাঁঠার একটা ঠ্যাং হাতে করিয়া টোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠ্যাংটা ধপ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া রাধাচরণের পাশের বিছানাটাতেই বসিয়া পড়িল, রাধাচরণ সবে তখন স্নানান্তে তিলক কাটিয়া মায়ের দেওয়া মাল-পোর ভাঁড় হইতে খানদুয়েক মাল-পো লইয়া জলযোগের উদ্যোগ করিতেছে। সে ঘৃণায় শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, রাধে রাধে!

কালীচরণ খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল, এ বোরেগী কোত্থেকে এলো রে?

রাধাচরণ চোখ পাকাইয়া বলিল, খবরদার!

খবরদার! কালীচরণ দুই হাত মাটিতে পাড়িয়া চতুষ্পদের মতো ভঙ্গিতে রাধাচরণের মুখের কাছে আসিয়া প্রকাণ্ড এক হাঁ করিয়া বলিল, খেয়ে ফেলব তোকে।

রাধাচরণ অহিংস হইলেও ভয় পাইবার পাত্র নয়; সে চট করিয়া ওই পাঁঠার কাঁচা ঠ্যাংটা তুলিয়া লইয়া সজোরে কালীচরণের হাঁয়ের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, নে, খা।

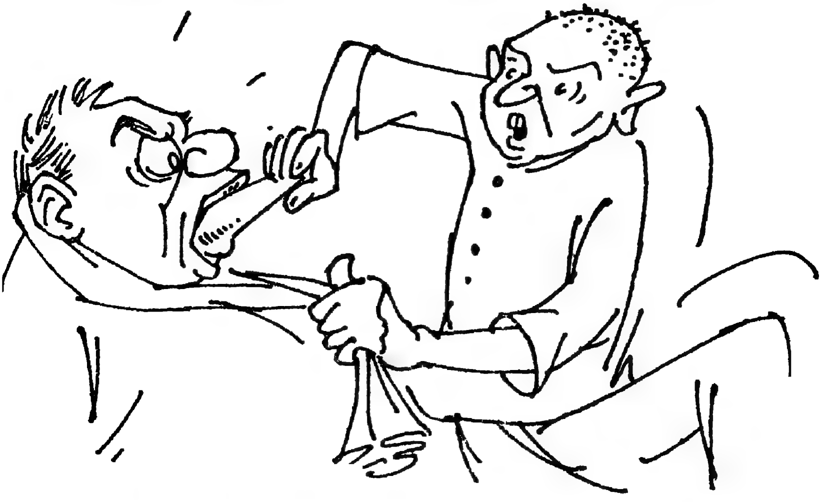

হাঁ কালীচরণের প্রকাণ্ড, কিন্তু পাঁঠার ঠ্যাংটার গোড়ার দিকটা তার চেয়ে প্রকাণ্ড ছিল, সজোরে তুলিয়া দিতেই কালীচরণ ঘায়েল হইয়া পড়িল। রুদ্ধমুখে দুর্দান্ত পশুর মতো আঁ আঁ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ব্যাপারটা আরও অনেক দূর অগ্রসর হইত, কিন্তু কালীচরণের নিকট আঁ-আঁ শব্দ শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয় আসিয়া পড়িলেন, কাজেই দুইজনেরই নিরস্ত না হইয়া উপায় রহিল না। সমস্ত শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয় দুইজনকে সরাইয়া দুই ঘরে পৃথক বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মজা এমনিই যে সঙ্গে সঙ্গেই দুই ঘরের কয়েকটি ছাত্র আপনা হইতেই ঘর বদল করিয়া ফেলিল। শাক্ত যাহারা ছিল তাহারা চলিয়া আসিল কালীচরণের ঘরে, বৈষ্ণবেরা আসিয়া রাধাচরণের ঘরে আখডা জমাইয়া তুলিল।

অপরাহ্নে এ ঘবে সমবেতভাবে মালপো ভক্ষণ চলিতে আরম্ভ করিল, ওঘরে কডমড শব্দে মাংসের হাড চূর্ণ হইতে লাগিল।

কিন্তু একদা দুইজনেব এই বিবাদ সাময়িকভাবে মিটিয়া গেল। সেদিন রত্নপুরের বাবুদের বাড়িতে বিপুল উৎসব। একসঙ্গে দুই গৃহদেবতাব পুজা—কার্তিকের শুক্লাষ্টমীতে একদিকে গোবিন্দজীর গোষ্ঠাষ্টমী, অন্যদিকে শুক্লানবমীতে জগদ্ধাত্রী পুজা। অষ্টমী এবং নবমীর পুজা সেবার একদিনেই পডিয়াছিল। সন্ধ্যায় কালীচরণ প্রায় একটি গামলা পরিপূর্ণ রান্না মাংস আনিয়া বন্ধুদের বলিল, কেইসা সাঁটিয়েছি দেখ, নে খা যে যত পারিস খা। দেখুক শালারা চেয়ে চেয়ে।—বলিয়া বৈষ্ণব প্রতিপক্ষীয়দের ঘরের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

ওঘরে খিল খিল করিয়া হাসির একটা বোল উঠিয়া গেল। শাক্ত ঘরেরই একটি ছেলে বলিল, ওরাও মালপো এনেছে, তাই হাসছে পণখানেক।

কালীচবণ খানিকটা গম্ভীব হইযা চুপ করিয়া রহিল।

ওঘরের কথাবার্তার সাডা না পাইয়া এদিকে রাধাচরণ একজনকে বলিল, চুপিচুপি দেখে আয় তো কি কবছে ওরা।

সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ওরা মদ আনবে, কালীচরণ আনতে গেল। খুব ফুর্তি করবে আজ।

ঘাড় নাডিতে নাডিতে রাধাচরণ বলিল, হুঁ। আচ্ছা আমরাও গাঁজা আনব। খাসনি এখন মাল-পো, গাঁজা খেয়ে তারপর। চললাম আমি।

একজন বলিল, এই রাত্রে তুমি গাঁজা পাবে কোথায় ?

তাহাকে ভ্যাঙাইয়া রাধাচরণ বলিল, রাজারা মানিক পায় কোথা ?—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

ওদিকে বাবুদের নাটমন্দিরে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, কন্‌সার্ট বাজিতে শুরু করিয়াছে। ছেলেরা চঞ্চল হইয়া উঠিল ; একজন বলিল, ঘরে বসে থেকে কি করব ? চল, রাধাচরণ আসতে আসতে যাত্রা শুনে আসি।

অমত কাহারো ছিল না, তবুও একজন বলিল, রাধাচরণ এলে কি হবে ? দরজায় তো তালা দিতে হবে!

চাবি রেখে যাব সেইখানটিতে।

সেইখানটিতে চাবি রাখিয়া সকলে বাহির হইয়া গেল।

রাধাচরণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দুই ঘরের দরজাতেই তালা ঝুলিতেছে। চাবির জন্য সেইখানটিতে হাত দিয়া দেখিল, চাবি ঠিক আছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার একটি সংকল্প মনে জাগিয়া উঠিল, উহাদের ঘরের চাবিও তো ওই ঘরের মাথাতেই আছে, ঘর খুলিয়া গামলাটা উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিলে কি হয়! গাঁজা একটান টানিয়াই সে আসিয়াছিল দ্বিধা বিশেষ হইল না তাহার। খানিকটা খুঁজিয়াই সে চাবি বাহির করিয়া ফেলিল, ঘর খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া গন্ধে গন্ধে ঠিক গামলার কাছে হাজির হইল। বড়ো চমৎকার গন্ধ উঠিয়াছে কিন্তু! গামলার কিনারায় হাত দিয়া কয়েক মুহূর্ত সে স্তব্ধ রহিল, তাহার পর এক টুকরা মাংস তুলিয়া মুখে দিল। আবার এক টুকরা, সে টুকরাটা বড়ো, তাহার পর গব গব করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বাধা পড়িল। তাহাদের ঘরে বোধ হয় ছেলেরা ফিরিয়াছে, শব্দ উঠিতেছে। হাতটা ভালো করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা গন্ধ পাইলে সর্বনাশ হইবে। দ্রুত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু সম্মুখেই লোক। সে আঁতকাইয়া বলিয়া উঠিল, কে ?

সে লোকটিও আঁতকাইয়া উঠিল, কে ?

রাধাচরণ দেখিল, কালীচরণ, কালীচরণ দেখিল, রাধাচরণ।

রাধাচরণের হাতে মাংসের টুকরা, কালীচরণের হাতে মালপো। কয়েক মুহূর্ত পরে উভয়েই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর মাংসের গামলা, বোতল, গাঁজার কল্কে, মালপো লইয়া দুজনেই বাহির হইয়া গেল। উভয়েই বলিল, মরুক বেটারা। অর্থাৎ উভয়েরই সহচরবৃন্দ।

রাধাচরণ বলিল, আমাদের বাড়ি চলো না, কি রকম মালপো খাওয়াই একবার দেখবে।

কালীচরণ বলিল, মাংস খেতে কিন্তু আমাদের বাড়িও যেতে হবে।

নিশ্চয়। কিন্তু মাংস খাই—একথা বলতে পাবে না কারু কাছে।

কালী, কালী! তাই পারি? মালসা ভোগ খাওয়ার কথা কিন্তু তোমাকেও গোপন রাখতে হবে।

রাধাচরণ বলিল, ওহে রাধাকৃষ্ণের পীরিতি পর্যন্ত গোপনে, সে ভাবনা আমাদের বাড়িতে নেই।

কালীচরণই প্রথম রাধাচরণের বাড়ি গেল। কারণ পাঁঠাবলি দিতে পর্বের প্রয়োজন হয়, মালপো কিন্তু পর্ব না হইলেও চলে। রাধাচরণের বাপ-মা খুব খুশি হইয়া উঠিল, শাক্তের ছেলে বিশেষ করিয়া এই শাক্ত চাটুজ্যে বংশেব ছেলেটিকে মালপোর প্রসাদে মালা ধরাইতে পারিলে সাক্ষাৎ গোবিন্দকে খুশি হইতে হইবে।

রাধাচবণেব মা কন্যা ললিতাকে লইয়া ক্ষীরের মালপো তৈয়াবী শুরু করিয়া দিল। কালীচরণ মালপো মুখে দিয়া বলিল, চমৎকার!

রাধাচরণের মা বলিল, আর দুখানা এনে দিক।

না—না বলিয়া কালীচবণ মৃদু আপত্তি তুলিলেও মা শুনিল না, ললিতাকে ডাকিয়া বলিল, ললিতে, আর দুখানা নিয়ে আয় তো। ললিতার কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। মা বিরক্ত হইয়া বলিল, চোদ্দ বছরের ধাড়ি হারামজাদী নাচতে নাচতে পালাল কোথায় বুঝি! ও ললিতে। এবার সে নিজেই উঠিল। ললিতা উনানশালে বসিয়া ছিল, মা বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, সাড়া দিসনি যে? বিরক্তিভরে ললিতা বলিল, আমি যদি না পারি?

কেন পারবি না কেন, শুনি?

না, ওই হুঁদো মুখলো অসভ্যর সামনে যাব না।

যেতেই হবে তোকে। চল্ বলছি।

রাগে লজ্জায় রাঙা হইয়া ললিতা মালপো লইয়া কালীচরণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কালীচরণ হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, আমার বোনের সঙ্গে তোমাব সই পাতিয়ে দোব ললিতে। সে কিন্তু ভারী কথা বলে, তোমার মতো লাজুক নয়। ভারী পাজী সে। এই লজ্জাই আমি পছন্দ করি, বুঝলেন মা!

রাধাচরণ সেটা নিজেই প্রত্যক্ষ করিল।

কালীচরণের বাড়িতে রাধাচরণ বসিয়া ছিল। কালীচরণ আদার সন্ধানে বাহিরে গিয়াছে, কালীচরণের মা ও বোন শ্যামা রান্না করিতেছিল।

শ্যামা রাধাচরণের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঝাল কেমন দোব, বলো!

রাধাচরণ বলিল, তোমার ঝাঁজ যতখানি, ততখানিই দাও।

শ্যামা বলিয়া উঠিল, ওমা!—বলিয়া সে গালে হাত দিল।

মা বলিলেন, কি হল?

ওই বেড়ালটা।—বলিয়া হাতার বাঁটের সুঁচালো দিকটা উঁচাইয়া বলিল, দোব চোখ খুঁচে, এমন করে দৃষ্টি দিবি তো।

রাধাচরণ হাসিয়া বলিল, যে দুর্নাম করলে তোমার দাদা আমার কাছে, বলে—ভারী কথা কয়, ভয়ানক মুখরা। আমি বলি মুখরা আমার ভারী ভালো লাগে!

ইহার পর বন্ধুত্বটা গাঢ় হইয়া উঠিল। যাওয়া আসা চলিতেই ছিল। কিন্তু পরস্পরের বাপ-মায়ের অগোচরে। তাহারা প্রত্যেক পক্ষই ভাবিত, উহাদের জাতি মারিলাম বুঝি। কিন্তু সহসা ব্যাপারটা ফাঁস হইয়া গেল। উভয় পক্ষ হইতেই ছেলেকে কড়া শাসন করিয়া দিল।

সেবার কিসের একটা ছুটিতে কিন্তু লুকাইয়া রাধাচরণ কালীচরণের বাড়ি আসিয়া হাজির হইল।

কালীর মা খুশি হইয়া বলিল, এসো বাবা এসো। কিন্তু কালী তো মামার বাড়ি গিয়েছে।

রাধাচরণ বিব্রত হইয়া বলিল, তাই তো!

শ্যামা বলিল, কিসের তাই তো? কেন, আমরা কি কেউ নই নাকি?

রাধাচরণ তবু বলিল, না না, মানে—

মা বলিল, তা শ্যামা তো ঠিকই বলেছে বাবা নাই বা থাকল কালী ঘরে, আমরা তো রয়েছি।

রাধাচরণ সবিনয়ে একটু হাসিল। শ্যামা বলিল, এত মান হয় তো বাড়ি যাও। রাধাচরণ ফিক করিয়া হাসিল। শ্যামার মা বলিল, তোর ভারী মুখ কিন্তু শ্যামা।

শ্যামাও এবার ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, মুখরাই রাধুদার ভালো লাগে, মা।

কয়েক দিনের পর দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে শ্যামার মায়ের মনে এই কথাটা হঠাৎ অন্য আকারে মনে পড়িয়া গেল, রাধাচরণের সহিত শ্যামার বিবাহ

দিলে কেমন হয়? এক আপত্তি, উহারা বৈষ্ণব, তাহাতে কি, ও তো মাছ মাংস ধরিয়াছে। এইবার শ্যামার হাত দিয়া গলায় একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া দিলেই তো হইয়া গেল, কন্যাদায় হইতে বিনা পয়সায় উদ্ধার পাওয়া যাইবে। কথাটা আজই স্বামীকে বলিতে হইবে। আর শ্যামাকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার, যে বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া কথা বলে সে। মা উঠিয়া শ্যামার ঘরে আসিয়া দেখিল, শ্যামা নাই। কোথায় গেল? সহসা চাপা গলায় খিল খিল হাসি যেন ভাসিয়া আসিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া শিষ্যদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দুয়ারে আসিয়া সে দাঁড়াইল। হ্যাঁ, এই ঘরেই। দরজার একটা ছিদ্রে চোখ লাগাইয়া দেখিয়া কালীর মায়ের মুখে আর বাক রহিল না। শ্যামা তক্তপোশের উপর বসিয়া আছে, আর রাধাচরণ পায়ের কাছে বসিয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতেছে, প্রিয়ে চারুশীলে! প্রিয়ে শ্যা -মা আমার, চারুশীলে!

সন্তর্পণে পলাইতে পলাইতে মা আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, ক্রোধে আপন কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, এই নে, এই নে, এই নে।

রাধাচরণ চকিত হইয়া দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল শ্যামার মা যাইতে যাইতে কপালে করাঘাত করিতেছে। সে আর দাঁড়াইল না, সটান ওদিকের বাহিরে যাইবার দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আপন গ্রামের পথ ধরিল।

প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া সে সভয়ে দাঁড়াইয়া গেল। কালীচরণ আসিতেছে! সর্বনাশ, দেখা হইলে সে তো ছাড়িবে না! ফিরিতে বাধ্য কবিবে! সে ছাতাটা আড়াল দিয়া সন্তর্পণে চলিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে ছাতার ফাঁক দিয়া দেখিল, কালী হনহন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম দিকে রৌদ্রে পুড়িয়া সে ছাতাটা পুর্ব দিকে ধরিয়া চলিয়াছে কেন? যাহা হউক, নিজে বাঁচিলে বাপের নাম বজায় থাকিবে। পুড়ুক কালীচরণ, রৌদ্রে কেন, আগুনে পুড়ুক।

বাড়ি আসিতেই সে দেখিল তাহার বাপ বাঁশি ছাড়িয়া অসি ধরিয়াছে, বলে, তোকে তো কাটবই তারপর কাটব ওই কেলেকে।

ললিতার দেখা পাওয়া গেল না, মা ভাম হইয়া বসিয়াছিল।

সে চলিয়া গেলে কালী আসিয়াছিল। তারপর ঘরে অন্নপুর্ণা মূর্তির আবির্ভাব মা দেখিয়াছে। ললিতা অন্নপুর্ণা, আর কালীচরণ শিব সাজিয়া বলে কিনা,

একটি চুম্বন ভিক্ষা দাও।

বাবা আর একবার গাঁজা টানিয়া বলিল, অন্নপূর্ণা, শিব! আমার জলে গেল!

রাধাচরণও আগুন হইয়া উঠিল।

ওদিকে কালীচরণ তখন খাঁড়াখানা লইয়া আপন বাড়িতে ঘুরাইতেছিল।

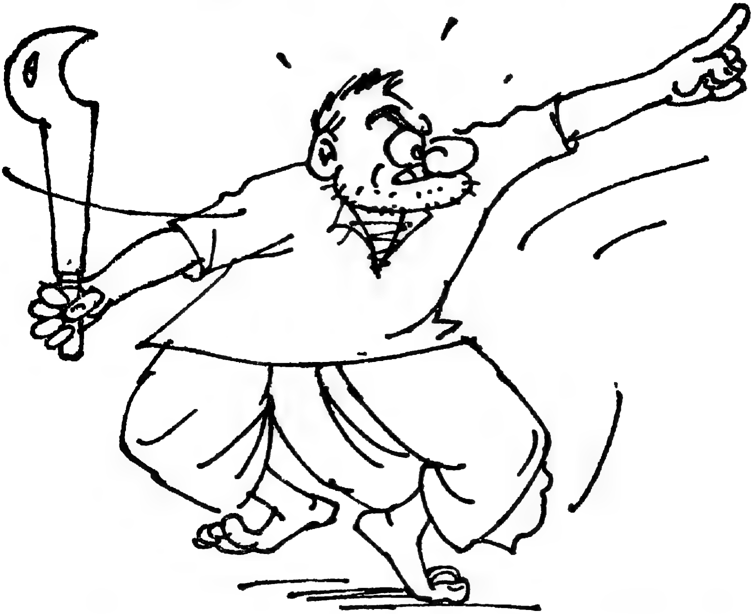

তাহার পর ব্যাপার সংক্ষিপ্ত। দুইজনে দুইজনের ভগ্নীপতি হওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না, হইলও তাই, কিন্তু আপন আপন ভগ্নীর প্রতি অসদ্ব্যবহারে তুষের আগুন উভয়েরই মনে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। আজও তা নেবে নাই। বিশ্বাসঘাতক!

সহসা রাধাচরণ সংবাদ পাইল তাহার শিষ্যের অবস্থা অন্তিমে উপনীত হইয়াছে। একরূপ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে সে আসিয়া শিষ্যের শিয়রে উপস্থিত হইল। ব্যাপার সাংঘাতিক। বিপরীতধর্মী দুই শরিকে সর্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ লড়িয়া উভয়ে উভয়কে ঘায়েল করিয়াছে। ওবাড়ির কর্তাও মর মর হইয়া রহিয়াছে, ইনি খাইয়াছিলেন গাঁজা, উনি খাইয়াছিলেন মদ। প্রথম কলহ বাধে গুরু লইয়া; তাহার পর ধর্ম; তাহার পর ইষ্ট, অবশেষে দুইজনকে

দুইজনে গালি দিল, পরে চড়-চাপড় কিল ঘুঁষি, শেষে লাঠি ও তলোয়ার। লাঠির আঘাতে শাক্তের মাথা দুখানা হইয়া গিয়াছে, বৈষ্ণবের পেটে তলোয়ারখানা আমূল ঢুকিয়া গিয়াছে।

শিষ্য গুরুকে দেখিয়া এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রশান্ত হাসি হাসিল, বলিল, শান্তিতে মরতে পারব এইবার। মনে মনে আপনাকেই স্মরণ করছিলাম।

রাধাচরণের আজ দুঃখ হইল। সে নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। শিষ্য আবার বলিল, আমার সম্পত্তি আর কিছুই নেই। গোবিন্দজীকে আপনাকে দিলাম। ওঁকে আপনি নিয়ে যাবেন আপনার ঘরে। যা হয় সেবা করবেন। ওঁর গায়ের অলংকার—সেও আপনি নিয়ে যাবেন। আপনার হাতে ভার দিয়ে আমি এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব। এই জন্যই বোধহয় আমার মৃত্যু হচ্ছিল না।—অকৃত্রিম বিশ্বাসের সুর তাহার কথাগুলির মধ্যে যেন রণ রণ করিয়া বাজিতেছিল।

কথাটা বোধহয় সত্য, পরদিন ভোরেই সে মারা গেল। তাহার আগের সন্ধ্যাতেই মারা গিয়াছে ওবাড়ির কর্তা। রাধাচরণের চোখ দিয়াও জল গড়াইয়া পড়িল।

রাধাচরণ দুঃখ অপনোদনের জন্য একটান গাঁজা টানিয়া রাধাগোবিন্দকে বেশ করিয়া কাপড়ে বাধিয়া কাঁধে করিয়া রওনা হইল। ছোট মূর্তি, কিন্তু ভারী অনেক।

ক্রোশখানেক আসিয়া সে হাঁপাইয়া পড়িল। একটা গাছের তলায় বসিয়া বলিল, আঃ।

একটু দূরেই ঐ গাছটার তলায় কে বসিয়া? কালীচরণ? হাঁ, কালীচরণ বসিয়া রহিয়াছে। রাধাচরণের বড়ো রাগ হইল, সে উঠিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া বলিল, কি হল বলো তো?

কালীচরণ তাহার মুখের দিকে খানিক কটমট করিয়া চাহিয়া হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ হল, ভালোই হল! মামলা করলে ওরা, আমাদের এল টাকা-পয়সা।

রাধাচরণও এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, তা যা বলেছ। আমাদেরও ঝগড়া মিটে গেল।

কালীচরণ শাসাইয়া উঠিল, খবরদার! কেউ যেন একথা না জানতে পারে।

তুই লাগাবি, আমি ফাঁসাব।

ঘাড় নাড়িয়া সমঝদারের মতো রাধাচরণ বলিল, ঠিক বলেছ। তুমি লাগাবে, আমি ফাঁসাব।

কিছুক্ষণ পর কালীচরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, লোক দুটো কিন্তু না মলেই বেশ হত।

রাধাচরণ একটু ভাবিয়া পরম তত্ত্বজ্ঞের মতোই বলিল, আমরা কে, ভগবান মেরেছে, আমরা কি করব? তারপর, ওরা তোমাকে গয়না সমেত ঠাকুর দেয়নি?

দিয়েছে। কিন্তু বিষম ভারী।

এক কাজ করো।

কি? প্রশ্ন করিয়াই কালীচরণ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, গয়নাগুলো খুলে নিয়ে—

রাধাচরণ বলিল, হ্যাঁ কাছেই নদী, দহের জলে—

অশোক চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৯৮—)

# পীতাম্বর সাণ্ডেল

## এক

সকাল বেলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াই পীতাম্বর ওরফে পিতোমবাবু একটা দেড় বিঘত আন্দাজ হাই তুলিয়া ও সেই সঙ্গে চীনে পট্‌কা ছোঁড়ার মতো তিনটা তুড়ি দাগিয়া স্বগতঃ বলিলেন, "হন্যে হয়ে উঠেছি, কী কুক্ষণেই যে পুন্নাম নরক 'অ্যাভয়েড' করবার জন্যে এ কাজ করতে গিয়েছিলাম—উঃ, কেঁদে, ককিয়ে, গালিয়ে, চেঁচিয়ে গিন্নী যেন মেনিনজাইটিসের মতো মাথার ভিতরটা ছাবখারে দিতে বসেছে, আর ছেলেটা 'আওয়ারে', 'হাফ-আওয়ারে', 'কোয়াটারে' গির্জের ঘড়ির মতো হাঙ্গামা করে ঘুমের পাট একেবারেই তুলে দিয়েছে। এর পর একদিন কিছু একটা করে বসব বলে রাখছি—পিতোম সাণ্ডেল রাগ করে না করে না; কিন্তু করে যখন তখন হুঁ···ম্ ম্।"

পাশের ঘর থেকে নারীকণ্ঠে কে বলিল, "ওগো, এখানে অন্ধকারে সিন্দুকটার ভেতর অবধি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, এটা একটু বারান্দায় বার করে দাও তো, রিং থেকে সেফ্‌টি-পিনটা যে কোথায় খুলে পড়ল—কিছুতে যদি হাতড়ে পাচ্ছি!"

পিতোমবাবু মনে মনে গর্জিয়া উঠিলেন, "অত্যাচার, অনাচার, অরাজকতা! সেফ্‌টি-পিন পাচ্ছ না বলে আমি এখন ঘুমের চোখে তোমার পিতামহের আমলের জাহাজী সিন্দুকটা কাঁধে করে দৌড়াদৌড়ি করি! জাহান্নমে যাক তোমার সেফ্‌টি-পিন।"

বাহিরে মিহি গলায় বলিলেন, "মেধোকে ডেকে বলো না সিন্দুকটা বার করে দিতে; আমার শরীরটা ভালো নেই তেমন।"

নারীকণ্ঠ কিছু উচ্চে উঠিল, "বেলা ছটা হয়ে গেল এখনও বিছানায় শুয়ে গা মোড়ামুড়ি দেওয়া হচ্ছে। আমার খেটে খেটে প্রাণ গেল আর উনি শুধু আরাম করবেন। এসো বলছি শিগগির বাইরে, নইলে কুরুক্ষেত্র হবে!"

পিতোমবাবু একবার নেপথ্যে পরলোকগতা মাতৃদেবীকে স্মরণ করিয়া সুড়-সুড় করিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন, ভাঁড়ারের সিন্দুকটি নিরামিষ চাল

ডাল ও আমিষ ইঁদুর আরশুলায় বেশ পুরা দুই কি আড়াই মন হইবে, পিতোমবাবু তাহা তুলিতে চেষ্টা করিয়া, না পারিয়া তাহাতেই 'কাঁধ দিয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে দরজার আলোর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই আকস্মিক আন্দোলনে ভীত হইয়া একটি নেংটি ইঁদুর এক ছিদ্রপথে সিন্দুক হইতে তড়াক করিয়া বাহির হইয়া পিতোমবাবুর গলার উপর অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার শিরদাঁড়া বাহিয়া নামিয়া গেল। পিতোমবাবু "আরে আরে" বলিয়া ইঁদুরটিকে তাড়াইতে গিয়া একটু বেসামাল হইয়া মেজের উপর গিন্নীর রক্ষিত এক বাটি সরিষার তেলের উপর বসিয়া পড়িলেন।

গিন্নী তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "এক ফোঁটা কাজ করতে এসে অমনি পোয়াখানেক তেল উল্টে বসল! বাবারে বাবা, আমি তো আর প্যারিনে—সেই কোন্ রাজ্যি থেকে নন্থু খুড়োকে সেধে সেধে ঘানির তেল আনাই; তার হয়ে গেল! বলি, রোজ যে এক গঙ্গা গিলে উজাড় করো, তা যায় কোথায়? একটা কাঠের বাক্স নেড়ে সরাতে গিয়ে যে হাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তেলের বাটি উল্টে গোল্লায় গেলে একেবারে!"

পিতোমবাবু "অ্যাডিং ইনসাল্ট্ টু ইন্‌জুরি" বলিয়া কি একটা বলিতে গেলেন; তাহাতে উল্টা উৎপত্তি হইল। গিন্নী আবার হাঁকিয়া উঠিলেন, "আরে রেখে দাও তোমার ইন্‌জিরি—ইন্‌জিরি আদালতে বলো গিয়ে;—এক পয়সার যার দেহে সামর্থ্য নেই সে আবার ইন্‌জিরি বলে, মুখে আগুন অমন ইন্‌জিরির।"

পিতোমবাবু অনুযোগের সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আরে বাবা।" কিন্তু কে সে কথা শোনে? গিন্নী আরও খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, "তোমার বাবাকে যা বলতে চাও, তাঁকে গিয়ে বলো, আমি কিসে তোমার বাবা হলাম শুনি? এক বাটি তেল উল্টে আবার রস করবার চেষ্টা হচ্ছে! দূর হও এখুনি আমার ভাঁড়ার থেকে, নইলে ঐ বাকি তেলটুকুনও মাথায় ঢেলে দেব বলছি।"

পিতোমবাবু দেখিলেন, তাহার প্রিয়তমা পত্নী সত্য সত্যই কিছু উত্তেজিতা হইয়াছেন। তিনি তাই গেঞ্জির উপর তেলের ছোপটুকুকে পরাজয়ের টীকারূপে বহন করিয়া অক্ষত দেহে অবিলম্বে ভাণ্ডার গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

স্নান করিতে করিতে পিতোমবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ কী? স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই যে ব্যবহার, ইহাই কি চিরন্তন? সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, বেহুলা কি তবে পত্নী-সম্মার্জনী-পীড়িত কবির পরিহাস মাত্র? 'পতি পরম গুরু' এ মন্ত্র কি স্ত্রীলোকের মর্মে স্থান না পাইয়া অবশেষে তাহার

চিরুনিতে আশ্রয় লইয়াছে ? দেহগোদের উপর এ কী নিদারুণ বিষফোড়া ! পিতোমবাবু নিজ চিন্তার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া মাথায় ঘটির পর ঘটি জল ঢালিয়া চলিয়াছেন—চৌবাচ্চা নিঃশেষ, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, হঠাৎ স্নানাগারের বাহির হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে বলিল, "খুব যে নবাবী করে সব জলটুকু খরচ করে রাখছ—কলে তো জল নেই—আমরা কি সব শালপাতায় গা হাত পা পুঁছে স্নানের কাজ সারব নাকি ? রাস্তার কল থেকে চার-পাঁচ বালতি জল তুলে তবে তুমি আপিস যাবে, বুঝলে ?"

পিতোমবাবু আতঙ্কে স্নানের জল ছাপাইয়া ঘামিয়া উঠিলেন, তিনি বাহিরে আসিয়া অন্যমনস্কতার দোহাই দিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু নির্দয়া নারী-হৃদয়ে তাঁহার সে বেদনাপূর্ণ আবেদন "ন্যাকামো" বলিয়া অভিহিত হইল। অগত্যা তিনি বালতি হস্তে রাস্তায় জল আনিতে বাহির হইলেন, ভাবিয়াছিলেন মেধোকে উৎকোচ-দানে বশ করিয়া উন্মুক্ত রাজপথে বালতি হস্তে বিচরণ করার অপযশ হইতে আত্মসম্মান রক্ষা করিবেন। কিন্তু মেধো তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া সিঁড়ির পথে "মা ঠাকরুণ ডাকছেন" বলিয়া উপর তলায় উধাও হইয়া গেল। প্রথম দুই বালতি জল পিতোমবাবু লোকচক্ষুর অন্তরালে বাড়ির মধ্যে লইয়া আসিলেন। কিন্তু তৃতীয় বালতি লইয়া তিনি সবে দরজার গোড়ায় পা দিয়াছেন এমন সময় পিছনে কে "হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ,"

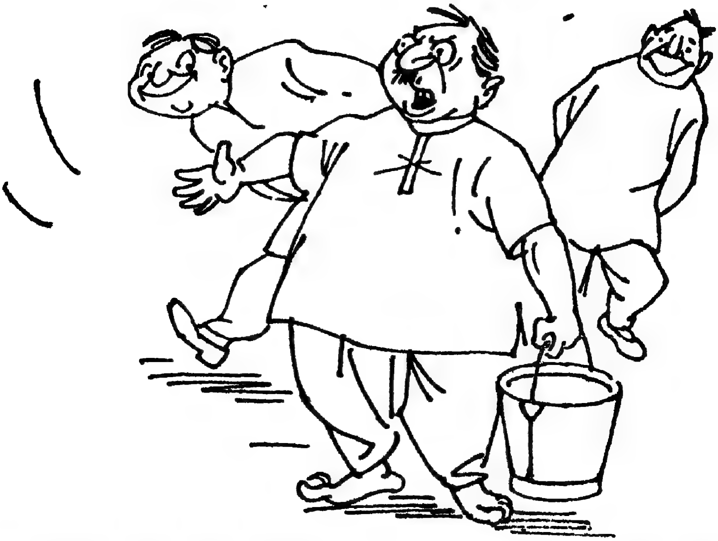

করিয়া অট্টহাস্ত করিয়া উঠিল। পিতোমবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন নেপেন ভাদুড়ীকে। নেপেন ভাদুড়ী তাঁহার সহিত এক আপিসে কাজ করে—এবং সময় পাইলেই অবান্তর কথা বলিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করে, এইভাবে ধরা পড়িয়া পিতোমবাবু লজ্জায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। নেপেনবাবু বলিলেন, "আরে সাণ্ডেল মশাই, দিন দুপুরে জল চুরি করে কোথায় পালাচ্ছেন?"

পিতোমবাবু কোনো উপায়ে আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য বলিলেন, "আর ভাই, চাকর বেটা পালিয়েছে, দুর্দশার পার নেই—বলো কেন?"

উপরের বারান্দা হইতে ঘন কৃষ্ণ দেহখানি অর্ধেকের অধিক বাহির করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেধো চিৎকার করিয়া উঠিল, "বাবু শিগ্‌গির করুন, মা-ঠাকরুণের চানের বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

"হে ধরণী দ্বিধা হও! এ কী নিদারুণ অপমানের আগুনে আমায় পুড়িতে হইল!" পিতোমবাবু এক মিনিটে তিন-চার বার রঙ বদলাইয়া করুণ নেত্রে নেপেনবাবুর দিকে চাহিয়া কোনো কথা না বলিয়া বালতিটা তুলিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেলেন, নেপেনের অট্টহাস্তে পথঘাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে ধ্বনি যেখানে পিতোমবাবু স্ত্রীর নিকট এক বালতি জল কম আনার জন্য জবাবদিহি করিতেছিলেন সেখানেও পৌঁছিল। পিতোমবাবু ক্ষণেকের জন্য কি যেন একটা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "ও আবার কি রকম ঢং করছ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "কিছু না, আপিসের বেলা হয়ে গেছে।"

স্ত্রী বলিলেন, "ঐখানে ভাত বাড়া আছে নিয়ে খেয়ে আপিসে বেরোও। ফেরবার পথে দুটো ডাব কিনে এনো—মেধো বললে, তোমাদের আপিসের কাছে পাওয়া যায়।"

দুই হস্তে দুইটি ডাব লইয়া নিজে আপিস হইতে গৃহাভিমুখে যাইতেছেন ও নেপেন ভাদুড়ী তাঁহার সহকর্মীদিগের নিকট উক্ত ঘটনার সরস ব্যাখ্যা করিতেছেন, এই চিত্র অন্তরে অঙ্কিত করিয়া পিতোমবাবু কম্পিত চরণে আপিসের দিকে রওনা হইলেন।

আপিসে ঢুকিয়াই তিনি দেখিলেন, নেপেন ভাদুড়ী জন দশেক ছোকরা-গোছের কর্মচারী পরিব্যাপ্ত হইয়া কি যেন একটা অভিনয় করিতেছে। পিতোমবাবু বুঝিলেন যে, তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সহিত এ অভিনয়ের খুব নিকট কোনো যোগ আছে। তিনি মুখ ফিরাইয়া কোনো কল্পিত সরলরেখা অনুসরণ করিয়া

সটান নিজের টেবিলে গিয়া বসিলেন। নেপেন ভাদুড়ী যে সকল কর্মচারী-দিগকে লইয়া জটলা করিতেছিল, তাহারা একে একে নিজের টেবিলে গিয়া বসিতে লাগিল, কেহ কেহ পিতোমবাবুর টেবিলের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া, "বাক্ আপ পিতোমবাবু" বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া গেল,—যেন পিতোমবাবু তাহাদের নিকট সান্ত্বনার জন্য কখনও আবেদন করিয়াছিলেন, একজন বলিয়া গেল, "ব্রাদার, তোমার শুনছি বড়ো দুঃসময় চলেছে। আমাদের পাড়ার ভুটানী বাবার একটা মাদুলি যোগাড় করে ধারণ করো না; দেখো অব্যর্থ গ্রহশান্তি হবেই হবে—বলব বাবাকে তোমার কথা?"

পিতোমবাবু নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, "না, না, তোমায় অত পরোপকার করতে হবে না।" বলিয়া ব্যস্ততা দেখাইবার জন্য একটা আধমুনে লেজার টান দিতে যাইয়া টেবিলের ও নিজের ধুতিখানার উপর একটা লাল কালির দোয়াত উল্টাইয়া ফেলিলেন। রাগে ক্ষোভে পিতোমবাবু পাগলের মতো হইয়া উঠিলেন। কাপড়ে কালি লাগা দেখিলে সুভাষিণী, অর্থাৎ পিতোমবাবুর গৃহিণী, তাহাকে কি যে না বলিয়া লাঞ্ছিত করিবেন তাহা পিতোমবাবু ভাবিতেই পারিলেন না। তাঁহার মানসিক অবস্থা যখন পত্নীভয়বিত্রস্ত কোনোও এক আগ্নেয়গিরির ন্যায় ধুমাইত, কম্পিত ও বিচলিত ঠিক সেই সময় নেপেন ভাদুড়ী আসিয়া পিতোমবাবুর থুতনিতে হাত দিয়া গাহিয়া উঠিল—

"দাদা রে আমার,
দরগায় লাগাও শিন্নি,
পীরের কৃপায় হবেন গিন্নী
তোমা পরে সদয়া···ভাইরে সদয়া আ আ...।"

পিতোমবাবু বহু বর্ষের অনভ্যাস ভুলিয়া হঠাৎ পম্পিয়াই বিধ্বংসী ভিসুভিয়সের মতো সংহার-মূর্তি ধরিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। একবার "দি লাস্ট স্ট্র" বলিয়া সিংহনাদ করিয়াই পিতোমবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া টেবিলের নিচ হইতে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা তুলিয়া লইয়া নেপেন ভাদুড়ীকে তীব্র বেগে আক্রমণ করিলেন। নেপেন আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। পিতোমবাবু তাহার পশ্চাতে "রাসকেল, রাসকেল" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া সিঁড়ির নিকট তাহাকে চাপিয়া ফেলিলেন। ধর্ষিত নেপেনের উপর উদ্যত ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেট পিতোমবাবু উদ্যত-বজ্র ইন্দ্রের

ন্যায়ই শোভা পাইতে লাগিলেন। এমন সময় তিনতলার সিঁড়ি বাহিয়া আপিসের ছোট সাহেব নামিয়া আসিলেন। তাঁহার মেমসাহেব সেদিন তাঁহাকে গলদা চিংড়ির সহিত তুলনা করিয়া কি বলাতে তাঁহার চিত্ত কথঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত ছিল। সম্মুখে এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া তিনি ভীষণ চটিয়া গেলেন ও বড়ো বাবুকে ডাকিয়া নেপেন ভাদুড়ীর পাঁচ টাকা ও পিতোমবাবুর দশ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পিতোমবাবু অনেক করিয়া সাধ্য সাধনা করা সত্ত্বেও সাহেবের কঠিন প্রাণে দাগ মাত্র পড়িল না।

## দুই

জরিমানার কথাটা পিতোমবাবু গিন্নীর কাছে অনেকদিন ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মাসান্তে সুভাষিণী যখন তাঁহার নিকট হইতে বেতনের টাকা গুণিয়া লইতে ছিলেন তখন টাকা কম দেখিয়া পিতোমবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, "এ কি ? দশ টাকা কম কেন ?"

পিতোমবাবু, "আমি এই কিনা..." বলিয়া কি একটা বলিতে গিয়া ভুল পথে ঢোঁক গিলিয়া বিষম খাইয়া বসিলেন। তিনি পুনর্বার স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিলে পর গিন্নী আবার তাড়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সত্যি কথা বলো বলছি, নইলে অনর্থ হবে। রেস খেলেছ ? বাজি হেরেছ ? কি করেছ ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "না জরিমানা দিয়েছি। সেদিন কি রকম মাথাটা গরম হয়ে উঠল..."

"তাই কি রাস্তায় মারপিট করেছিলে ? ওমা কি হবে গো! বুড়ো বয়সে শেষকালে মারামারি করে থানা পুলিস করলে! ওগো মাগো, আমায় কিনা এও শুনতে হল!"

পিতোমবাবু যতই বলেন, "আরে, না না, থানা নয়, পুলিস নয়, আপিসে..." গিন্নীর ততই শোক বাড়িয়া চলে, "ওগো তুমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালে শেষকালে—মুখে চুনকালি মাখলে, আমার একি লজ্জা হল।"

এমন সময় নস্থ খুড়া আসিয়া পড়ায় গিন্নী পিতোমকে ছাড়িয়া তাঁহার পায়ের কাছে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ও নস্থ খুড়ো, বুড়ো বয়সে মারপিট!"

নস্থ খুড়ো গর্জিয়া উঠিলেন, "ইস্টুপিড, পাষণ্ড কোথাকার, তুমি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলো।"

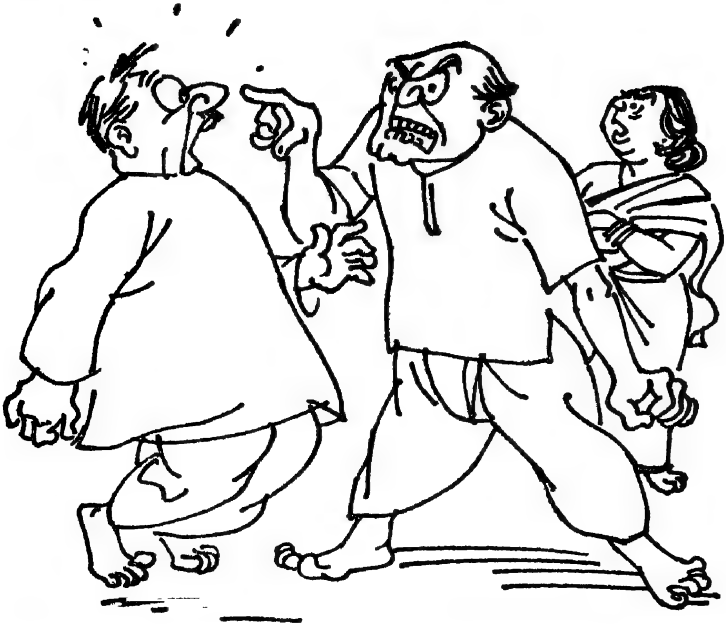

পিতোমবাবু দেখিলেন তিনি ক্রমে গভীর হইতে অতল জলে গিয়া পড়িতেছেন। তিনি এবার প্রাণপণ করিয়া গিন্নীর কান্না খুড়ার গর্জন সব ডুবাইয়া চিৎকার কবিয়া বলিলেন, "পুলিসেও যাইনি সুভাষিণীকেও মারিনি। হ্যাপা ভাদুড়ীকে সিঁড়ির মোড়ে চেপে ধরেছিলাম বলে সাহেব জরিমানা করেছে।"

গিন্নী বললেন, "ও, আপিসে গিয়ে বুঝি ঐ সব করা হয়?"

নস্থ খুড়া বলিলেন, "তা আগে বলোনি কেন?"

সুভাষিণী এতক্ষণ পুলিস-সংক্রান্ত কলঙ্ক ভীতি হইতে সামলাইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি এখন ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছেলেছোকরাদের মতো ধস্তাধস্তি করতে তোমাদের একটু ঘেন্নাও কি হয় না? দশ দশটা টাকা। এখন কি তোমাদের বাঁদুরেপনার জন্যে খোকার দুধ বন্ধ করব, না সকলে নিরিমিষ খেয়ে দিন কাটাব?"

নস্থ খুড়া বিচারকার্যনিয়ত সলোমানের ন্যায় মুখ করিয়া বলিলেন, "না না, শিশুর দুগ্ধপান বন্ধ করা কদাপি উচিত হইবে না। তদ্ব্যতীত পীতাম্বর অনবধানবশতঃ যে অবিমৃষ্যকারিতার কার্য করিয়া ফেলিয়াছে তাহার উপযুক্ত

প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহার উচিত হইবে আগামী এক মাসকাল ট্রামে আপিস যাতায়াত না করিয়া পদব্রজে গমনাগমন করা।”

সুভাষিণী অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে পাইয়া আনন্দে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া বলিলেন, “ঠিক বলেছ নস্যু খুড়ো! হেঁটে হেঁটে আপিস যেতে হলে ওনার রসের কেঁড়ে একটুখানি হালকা হয়ে আসবে—ছ্যাবলামি করাও একটু বন্ধ হবে।”

পিতোমবাবু নস্যু খুড়ার দিকে একবার বিষনেত্রে তাকাইলেন, কিছু বলিলেন না। সুভাষিণী খুড়া মহাশয়ের রায়ে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি খুশি মনে স্বামীকে বলিলেন, “তুমি যাও তো গো ছ-পয়সার কচুরি নিয়ে এসোগে। মেধো খোকাকে খেলা দিচ্ছে। নস্যু খুড়ো একটু বসে চা-টা খেয়ে যাও।”

নস্যু খুড়া একটা নিকেলের ডিবা বাহির করিয়া তাহা হইতে এক টিপ তীব্র-গন্ধ নস্য গ্রহণ করিয়া একটি মাসাধিককাল রজকদর্শন-বঞ্চিত রুমালে নাক মুছিয়া বলিলেন, “বিলক্ষণ, তা তোমরা যদি বলো, তাহা হইলে কি আমি তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি?”

পিতোমবাবু ছয়টি পয়সা হস্তে লইয়া খাবারের দোকানে কচুরি আনিতে চলিলেন। মনে হইল কচুরি না হইয়া যদি নস্যু খুড়ার জন্য বিষ আনিবার জন্য এ যাত্রা হইত তাহা হইলে তাঁহার অন্তরে অন্ততঃ কিছু সুখের সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তি পুরুষ হইয়া উৎপীড়িত পুরুষের বেদনা বুঝে না, বরং তাহার যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার বিষই, কচুরি নহে। হঠাৎ মনে হইল কচুরি খাইয়াও তো কেহ কেহ কলেরা হইয়া মারা যায়—নস্যু খুড়াকেও বাসী দেখিয়া কচুরি খাওয়াইতে পারিলে তাঁহারও হয়তো একটা ভালো মন্দ ঘটিতে পারে। দোকানে পৌছাইয়া পিতোমবাবু বলিলেন, “বেশ ভালো রকম বাসী কচুরি আছে?”

দোকানদার অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; বলিল, “সে কি মশাই—বাসী কচুরি কি আবার কেউ বিক্রি করে নাকি?” যেন কলকাতার ময়রার অভিধানে বাসী বলিয়া কোনো শব্দই নাই।

পিতোমবাবু বলিলেন, “আরে বাপু, কুকুরকে খাওয়াতে হবে—সস্তা-টস্তা করে দাও না থাকে তো।” ময়রা অগত্যা যেন খুব অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে এক ঠোঙা কচুরি বাহির করিয়া দিল। পিতোমবাবু সানন্দে কচুরি লইয়া গৃহে

চলিলেন। মনে মনে বলিলেন, “কলেরা না হোক অন্ততঃ দু-চার দিনের জন্য ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ হবে তো!”

একখানা কচুরি মুখে দিয়াই নসু খুড়া বলিলেন, “থুঃ থুঃ, ছ্যা ছ্যা, এই কি অদ্যকার কচুরী নাকি? বাবাজী, তোমাকে ময়রা ঠকাইয়াছে। এ কচুরি নিদেনপক্ষে তিন দিবসের বাসী মাল।”

গিন্নী বলিলেন, “বলি, তুমি কি চোখের মাথা খেয়ে দোকানে গিয়েছিলে নাকি? যাও শিগ্‌গির খাবারটা বদলে নিয়ে এসো। এদিকে চায়ের জল ফুটে উঠল; কোনোও কাজ কি তোমায় দিয়ে হবে না?”

পিতোমবাবু নিজের সযত্নকল্পিত প্রতিহিংসার পথ এমন করিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইতে দেখিয়া মরিয়া হইয়া বলিলেন, “না, না, ও কিছু তেমন বাসী নয়; হাতে গরম না হলেই কি খাবার বাসী হয়; খান না, খুড়ো মশাই কিছু হবে না।”

খুড়া শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, “না বাবাজী, আমার আর বাসী খাইবার বয়স নাই।”

গিন্নী হাঁকিলেন, “শি…গ্‌গি…র যাও বলছি। নইলে তোমায় রাত্রে ভাতের বদলে ঐ কচুরি খেয়েই থাকতে হবে।”

পিতোমবাবু হতাশ হইয়া পুনর্বার ঠোঙা হস্তে পথে বাহির হইলেন। মুখখানা তাঁহার হস্তস্থিত বাসী কচুরি অপেক্ষাও শুষ্ক, ম্লান।

## তিন

ট্রামের পয়সা না পাওয়াতে আজকাল পিতোমবাবু আপিসে প্রায়ই ‘লেট’ করিতে আরম্ভ করিলেন। বড়োবাবু তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, একথা সাহেবের কানে গেলে মুশ্‌কিল হইবে। পিতোমবাবু তাঁহাকে বলিলেন যে, কোনো ঘোর বিপদে পড়িয়া তাঁহার বর্তমানে ট্রামে যাতায়াত করিবার সংস্থান নাই—কি করিবেন? বড়োবাবু বলিলেন, যেমন করিয়া হউক আপিসে সময়ে না পৌঁছাইলে বিপদ অনিবার্য।

পিতোমবাবু গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, “আপিসে ‘লেটে’ পৌঁছানতে বড়োবাবু শাসিয়েছেন রিপোর্ট করবেন, বুঝলে?”

গিন্নী বলিলেন, “কেন, পথে কি খেলা করো নাকি? দেরি হয় কেন?”

“সকালে বাজার করে, তোমার ফুট-ফরমাস খেটে, ভাত পেতে দেরি হয়।

তারপর যদি ট্রামের পয়সা না পাই তাহলে পাংচুয়াল হতে হলে আপিসে দৌড়ে যেতে হয়।”

সুভাষিণী বিষকণ্ঠে উপদেশ দিলেন, “তবে এ কটা দিন দৌড়েই যেও।”

হতাশা ও গত্যন্তরবিহীনতা পিতোমবাবুকে পাগলের মতো করিয়া তুলিল। তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, “না, ট্রামেই যাব, আল্‌বত যাব !”

গিন্নী আরও জোরে বলিলেন, “অমন করে জানোয়ারের মতো চেঁচাচ্ছ কেন ? মারবে নাকি ?”

পিতোমবাবু বলিলেন, “হ্যাঁ মারব। যদি ফের আমার কথার উপর কথা বলো তো মারই খাবে।”

গিন্নী বোঁ করিয়া ঘুরিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়া দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, “তুমি আজ নিশ্চয় মদ খেয়ে এসেছ। তা নইলে আমায় মারতে ওঠ। থাকো আজ ঐ ঘরে বন্ধ হয়ে। আজ তোমার খাওয়া দাওয়া বন্ধ, নেশা ছুটলে পর আমার কাছে মাপ চাইবে, তবে তোমায় আমি ছাড়ব। ঝাঁটা মারো অমন পুরুষমানুষের মুখে ! চামারের মতো কথা শোনো একবার; বলে কিনা মারবে ! ইত্যাদি ইত্যাদি, ইত্যাদি।”

পিতোমবাবু চিৎকার করিয়া বলিলেন, “খোলো বলছি দরজা, তা নইলে লাথি মেরে ভেঙে ফেলব।”

“ভাঙো না ক্ষেমতা থাকে তো। তারপর বাড়িওলাকে গুণগার দিও।”

পিতোমবাবু দড়াম করিয়া দরজায় একটা লাথি মারিলেন। পায়ে লাগিল বটে, তবে দরজার কিছুই হইল না। ডাকিলেন, “মেধো, মেধো !” শুনিলেন গিন্নী বলিতেছেন “মেধো, ওদিকে যাস তো ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব।”

পিতোমবাবু হতাশ হইয়া একটা বেতের চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। আপিস হইতে ফিরিয়া কিছুই খাওয়া হয় নাই; কি করিবেন ? একখানা ‘প্রবাসী’ পড়িয়াছিল, তুলিয়া লইলেন। প্রথমে চোখে পড়িল একটি প্রবন্ধ ‘নরনারীর সমান অধিকার।’ পিতোমবাবু ভাবিলেন, “হায় রে, সে রকম সুদিন কি আমাদের কখনও হবে ?”

তিন-চার ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়াও সুভাষিণীর কোনোও সাড়া পাওয়া গেল না। একবার তোপসে মাছ ভাজার একটা উগ্র-মধুর গন্ধ দমকা হাওয়ার সহিত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পিতোমবাবুর

রসনায় বান ডাকাইয়া দিয়া আবার মিলাইয়া গেল। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, “ওগো, লক্ষীটি, দরজা খোলো, খিদেয় প্রাণ গেল। আমি দৌড়েই আপিসে যাব, দরজা খোলো।” শুনিলেন ভর্জিত মৎস্য জড়িত জিহ্বায় নস্থ খুড়া সুভাষিণীকে বলিতেছেন, “না, না, খুলিয়া কাজ নাই। মাতাল মানুষ পুনরায় যদি প্রহার আরম্ভ করে, আমি এ বয়সে রোধ করিতে পারিব না।”

দরজা বন্ধই রহিল। পিতোমবাবু ‘প্রবাসী’র গল্প ও প্রবন্ধ শেষ করিয়া বিজ্ঞাপনগুলি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ দেখিলেন একখানা ছবি। একজন লোক আদেশ করিবার ন্যায় ভঙ্গিতে হস্ত প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান। চক্ষু দিয়া তাহার অপূর্ব জ্যোতি নিঃসারিত হইতেছে। তাহার সম্মুখে দলে দলে লোক—কেহ করজোড়ে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া, কেহ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণত। এক পার্শ্বে গুটিকয়েক হস্তী ও অশ্ব উক্তরূপে আত্মসমর্পণ-মুদ্রায় উপস্থিত রহিয়াছে। ছবিটির নিচে বড়ো অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি

পথহারা চলৎশক্তিরহিতপ্রায় পথিক মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ ওয়েসিস্ দেখিতে পাইলে যেমন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে পুনর্জন্মের আশ্বাস পাইয়া পুনর্বার চাঙ্গা হইয়া উঠে, পিতোমবাবু বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া তেমনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, বন্দীদশা, নস্থ খুড়া, তোপসে মাছ সব ভুলিয়া আধভাঙা বেতের চেয়ারখানায় উপর যতটা পারেন, সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার অন্তরে যেন কোটি বিহঙ্গম কোনো এক নূতন উষার আশা-সূর্যের পানে চাহিয়া গাহিয়া উঠিল, “আর ভয় নাই, দুখ হল অবসান।”

পিতোমবাবু পাঠ করিলেন—

অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি

“ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানুষ কী না করিতে পারে? পৃথিবীতে এই যে এত বিফলতার ক্রন্দন, এত উৎপীড়িতের ব্যাকুল আর্তনাদ, ইহার মূলে রহিয়াছে ইচ্ছাশক্তির অভাব বা অশিক্ষিত ভাব। শিক্ষিত ইচ্ছাশক্তি মানুষকে তেমনি করিয়াই ক্ষমতাশালী ও অপরের মনের উপর প্রভাবাপন্ন করিয়া তোলে যেমন করিয়া শিক্ষিত মাংসপেশী কুস্তিগির বা যুযুৎসু-যোদ্ধা অকাতরে অপরের উপর শারীরিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। আমাদের শিক্ষা অনুসারে চলিলে আপনি বর্তমানে যতই পরনির্ভরশীল, কাপুরুষ ও অপরের উপর প্রভাবহীন হউন না কেন, তিন মাসের ভিতর আপনার কথায় লোকে উঠিবে বসিবে;

আপনার চোখের চাহনির সম্মুখে উদ্ধত-ছোরা গুণ্ডাও হটিয়া যাইবে, অদম্য আত্মনির্ভরশীলতা আপনাকে উন্নতির সর্বোচ্চশিখরে আসীন করিয়া দিবে।

"এ শক্তি লাভের জন্য আপনাকে কিছু খাইতে হইবে না, কিছু ধারণ করিতে হইবে না। নিছক মানসিক শক্তির উপযুক্ত ব্যায়ামের দ্বারা আপনি দিনে দিনে অধিক হইতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন।

"এ শক্তি আপনার ভিতরেই আছে। আমরা মাত্র তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিব।

"নিচের ঠিকানায় পত্র লিখুন—

শ্রীপ্রভাবানন্দ স্বামী
পোস্ট বক্স ০৩১৩, কলিকাতা"

পিতোমবাবু ভাবিলেন, "কী আশ্চর্য ; আর আমি একটা সামান্য নারীর দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে কি করব তা ভেবে কুল পাচ্ছি না! কালই আমি স্বামীজীকে চিঠি লিখে সব ঠিক করে ফেলব।"

গভীর রাত্রে ঘরের দরজা খুলিয়া সুভাষিণী দেখিলেন, তাহার স্বামী অঘোরে নিদ্রা দিতেছেন। মুখ তাঁহার কী একটা বিজয়ানন্দের আলোকে উদ্ভাসিত। সুভাষিণী মনে মনে বলিলেন, "মদের এমনই গুণ বটে! পেটে ভাত পড়েনি একটাও, ঘুমের ঘোরে মুখ করেছে যেন ওকে কে লাটের গদিতে বসিয়ে দিয়েছে।"

## চার

প্রভাবানন্দ পিতোমবাবুকে লিখিলেন—

"আপনি যে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে আমি সপ্রশংস সম্ভাষণ করিতেছি। আপনি এই পত্র লিখার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিলাভের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন।

"এখন আপনাকে বলি, ইচ্ছাশক্তি কি। আমরা যখন সজ্ঞানে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করি বা কোনোরূপ ইচ্ছানুসারে কার্য করি তখন একথা আমরা কদাচ মনে করি না যে, আমাদের জ্ঞানের অন্তরালে কোনো কিছু আছে যাহার উপর আমাদের কার্য বা ইচ্ছা কোনোরূপে নির্ভর করে। বস্তুতঃ আমাদের যে মন তাঁহার মধ্যে সজ্ঞানতার ক্ষেত্র অতিশয়ই স্বল্প-পরিসর। আমাদের যে অনভিব্যক্ত অননুভূত মনঃক্ষেত্র তাহা সর্বদাই আমাদের সজ্ঞান চিন্তা ও কার্যকে নানাভাবে

প্রভাবিত করিতেছে। যে ব্যক্তি বহুকাল কোনো কার্য সম্বন্ধে কোনো একপ্রকার মনোভাব পোষণ করিয়াছে সে যদি কখনও জোর করিয়া তাহার বিপরীত কিছু করিতে চায়, তাহা হইলে সজ্ঞানতার ক্ষেত্রে তাহার সেইরূপ কার্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে তাহা করিতে পারিবে না; কারণ, তাহার মনঃক্ষেত্রের প্রত্যেক আপাত অনমুভূত প্রান্ত হইতে সে বিপরীত দিকে আকর্ষিত হইবে। এইজন্য সজ্ঞানে কোনোও প্রকার কার্য চিন্তা বা ব্যবহার উত্তমরূপে করিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদের সমগ্র মনঃক্ষেত্র উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

"আপনি যদি অপরের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অক্ষম হন, তাহার কারণ এই যে, আপনি আজন্ম সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে এই ধারণাই মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন যে, আপনি অপর হইতে অধম। এই মনোভাব আপনাকে দূর করিতে হইবে।

"আপনি পত্রোত্তরে ১৩৷৷০ টাকা আমায় পাঠাইলে আপনাকে আমি মৎলিখিত পুস্তক "অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি" পাঠাইয়া দিব। পুস্তকানুগত নির্দেশ অনুসারে কার্য করিলেই আপনি ক্রমে ক্রমে প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীকে পদতলে আনিতে পারিবেন।"

পিতোমবাবু অবিলম্বে নিজের ঘড়িটি বন্ধক দিয়া পনেরো টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বামী প্রভাবানন্দকে পাঠাইয়া দিলেন। "অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি" আসিল। ছাদের ঘরে লুকাইয়া বসিয়া পুস্তকের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়া পিতোমবাবু বলিলেন, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি আছে অনেক, কিন্তু তাহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই ছত্রভঙ্গ ইচ্ছাশক্তি একত্র করিতে হইলে তাহাকে কোনো কঠিন কার্য প্রত্যহ একাগ্র মনে কিয়ৎকাল ধরিয়া করিতে হইবে। যথা সুতার জট ছাড়ানো। অনেকটা সুতা জট পাকাইয়া তাহা একমনে খুলিতে থাকিলে বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাশক্তি শীঘ্রই ঐ জটের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। পিতোমবাবু গিন্নীর 'ক্রোশে'র সুতার বাণ্ডিল একটি অপহরণ করিয়া ছাদের ঘরে লইয়া খুলিয়া জট পাকাইয়া ফেলিলেন। তারপর জট ছাড়াইবার পালা। পিতোমবাবু যতই একদিক খুলেন উহা ততই অপর দিকে দ্বিগুণ জট পাকাইয়া যায়। তিন দিন ধরিয়া পিতোমবাবু তাঁহার বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাশক্তির কণাগুলি একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াও দেখিলেন সুতায় যে জট সেই জট।

গিন্নী তাঁহাকে ঘন ঘন ছাদের ঘরে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আশেপাশে সব গেরস্ত মানুষের বাড়ি ; বৌ-ঝিরা ছাদে বড়ি দিতে, চুল শুকুতে ওঠে , তুমি ছাদে কিসের জন্য ঘোরাঘুরি করো, বলো তো ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "না ঘোরাঘুরি তো করি না, এই একটু বিশ্রাম হয়।"

সন্দিগ্ধচিত্ত গৃহিণী সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া একদিন হঠাৎ যখন স্বামী এক মনে সুতার জট খুলিতে ব্যস্ত, সেই সময় ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাশিকৃত সুতা দেখিয়া তো তাহার চক্ষুস্থির। তিনি বলিলেন, "ওমা, বুড়ো বয়সে তুমি কি শেষে ঘুড়ি উড়ুতে আরম্ভ করলে নাকি ? ছি, ছি, লোকে বলবে কি ? খবরদার আর তুমি ছাদে উঠে এসব করবে না !"

স্বামী বলিলেন, "ঘুড়ি আবার কোথায় ওড়াই ; একি ঘুড়ির সুতো ?"

"তাই তো এ দেখছি আমার বুনবার সুতো ! এ তুমি কোথায় পেলে ? আমি বলে সুতো নেই দেখে খোকাকে মারধোর করলাম, মেধোকে কত গাল দিলাম। দেখো দিকিন আর তুমি সুতোটুকু নিয়ে এখানে খেলা করছ। ওমা কী ঘেন্না, তুমি ফের যদি আমার সুতোয় হাত দেবে তো দেখতে পাবে।" বলিয়া তিনি জট পাকানো সুতার রাশি লইয়া চলিয়া গেলেন।

পিতোমবাবু অতঃপর আপিসে অবসর সময়ে টোয়াইন সুতা জট পাকাইয়া ও খুলিয়া দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রথম পাঠ শেষ করিলেন।

## পাঁচ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'আমি'।

স্বামীজী লিখিয়াছেন, "আমি কে ? আমি সব। আমি সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণু, আমি পালনকর্তা ব্রহ্মা, আমি সংহারক মহেশ্বর। আমার মধ্যেই সৃষ্টি, আমিই সৃষ্টি, আমিই স্রষ্টা। আমি ছাড়া আর কিছু নাই।"

দ্বিতীয় পাঠের উদ্দেশ্য ছাত্রকে নিজের উপর বিশ্বাসবান করা। উপায় প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে ১০০ হইতে ১০০০ বার 'আমি মাহাত্ম্য'-সূচক কোনো মন্ত্র জপ করা। ইহাতে সজ্ঞানে-অজ্ঞানে সর্বতোভাবে মানসক্ষেত্র আত্মবিশ্বাস-বারিতে সিক্ত সরস হইয়া উঠে।

প্রথম সাতদিন পিতোমবাবু জপ করিলেন, "আমি বেলুন অপেক্ষা ঊর্ধ্বগামী, নায়েগারা অপেক্ষা প্রবল, সমুদ্র অপেক্ষা বিশাল ও গভীর, হিমালয় অপেক্ষা উচ্চ, তুষার হইতে শুভ্র, সূর্য হইতে প্রখর, আমি সর্বাপেক্ষা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।"

তারপর পনের দিন তিনি মনে মনে পৃথিবীর সকল বস্তু ও মানবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমা অপেক্ষা তুমি বহু নিম্নে। হে জলধর, হে পর্বত, হে বৃক্ষ, আমা অপেক্ষা তোমরা ক্ষুদ্র। হে স্যাণ্ডো, হে হাকেনস্মিট, হে গামা ও ইমাম বক্স, তোমরা আমা হইতে বহু স্বল্পবল। হে নেপোলিয়ান, তোমা হইতে আমি বড়ো যোদ্ধা; চাণক্য, আমি তোমাপেক্ষা বিচক্ষণতর রাজনীতিবিদ্; কালিদাস, তোমা হইতে আমি বড়ো কবি; শেক্স্পীয়র, তোমা হইতে আমি বড়ো নাট্যকার। হে ধরণীর অধিবাসী, তোমরা আমার পদে প্রণত হও।"

এইরূপে পিতোমবাবু বহু অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া অবশেষে এই পাঠে আসিলেন, যাহাতে কি করিয়া অপরকে নিজ ইচ্ছানুরূপ কার্য করানো যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমতঃ, যে ব্যক্তিকে বশ করিতে হইবে তাহার অলক্ষিতে তাহার ঘাড়ের ঠিক মধ্যদেশে এককালীন পাঁচ-দশ মিনিট কাল একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে হইবে, ও মনে মনে বলিতে হইবে, "তুমি আমার দাস ( বা দাসী ), তুমি আমার কথামতো কাজ করিবে,—অন্যথা করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। তুমি আমার ইচ্ছাশক্তির অধীন, আমার আজ্ঞাবহ; তোমার নিজের বলিয়া কোনো ইচ্ছা নাই।" তৎপরে ( কয়েক দিবস এইরূপ করিবার পরে ) একদিন তাহার চোখে চোখে চাহিয়া তাহাকে ধীর শান্ত কণ্ঠে, সকল তীব্রতাবর্জিত ভাষায় বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাহার পক্ষে তাহার আদেশমতো কার্য না করা স্বভাবতঃই অসম্ভব। ইহার পর তাহাকে যাহা বলা যাইবে সে তাহাই করিবে।

পিতোমবাবু দিন পনের আড়ালে আড়ালে সুভাষিণী ও মেধোর ঘাড়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহাদের দাসত্বে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন তিনি মেধোকে সিঁড়ির নিকট ধরিয়া একদৃষ্টে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া ধীর শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "হে মাধব, আমি তোমার প্রভু, তুমি আমার দাস। পরমপিতা ভগবান তোমাকে আমাপেক্ষা নিম্নাসন অলংকৃত করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব হে মাধব, তুমি তোমার ভাগ্যনিয়ন্তার নির্দেশ অনুসরণ করো। এই পাদুকা-যুগল বহন করিয়া তুমি আমার কক্ষে স্থাপন করো।"

মেধো বাবুর কথা একটাও বুঝিতে না পারিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া হাঁ করিয়া

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাবু বুঝিলেন, মেধোর ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে ও সে তাঁহারই ইচ্ছায় এবার নড়িবে চড়িবে। তিনি আবার বলিলেন, "মাধব।" মেধো এবার সত্যই ভয় পাইয়া বলিল, "আজ্ঞে বাবু কি বলছেন?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "জুতো জোড়া নিয়ে ঘরে রেখে এসো।"

মেধো তাঁহার পা হইতে জুতো জোড়া খুলিয়া লইয়া ঘরের দিকে চলিল; তাহার পশ্চাতে পিতোমবাবু বিজয়োল্লাস-গর্বিত বদনে বুক ফুলাইয়া অগ্রসর হইলেন।

গিন্নী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিলেন। তিনি জুতা হস্তে ভৃত্য ও তৎপশ্চাতে খালি পায়ে বাবুর এই অপরূপ মিছিল দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপরে পিতোমবাবুকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?"

পিতোমবাবু গৃহিণীর মুখে এরূপ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, সময় হইয়াছে। এইবার তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা পূর্ণ হইবে। তিনি মেধোর হস্ত হইতে চটিজোড়া লইয়া পায়ে দিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "রে নারী, সৃষ্টিতে তোমার স্থান কোথায় তাহা বুঝিয়াছ কি? তাহা আমার পদতলে। আইস

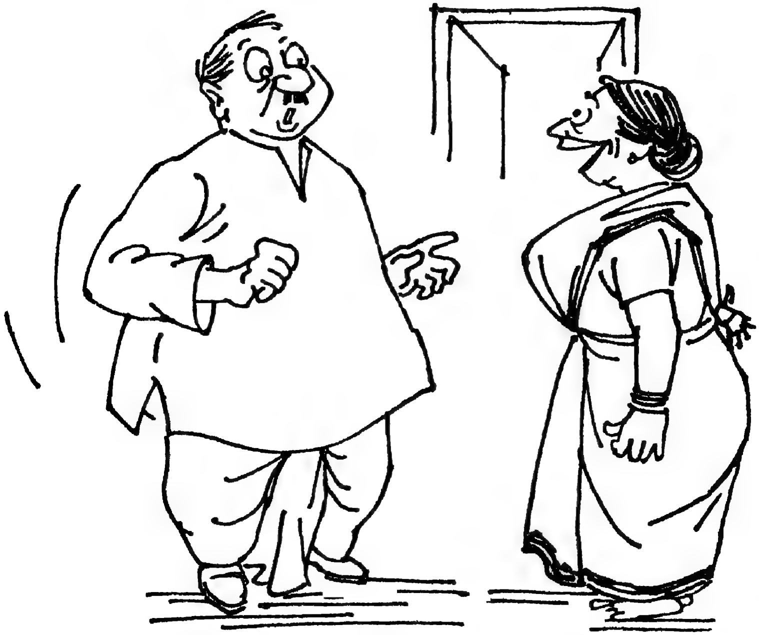

আপন প্রকৃতিদত্ত স্থান পূর্ণ করো। অন্যথা হইবার নহে, তুমি আমার দাসী ; আমার আজ্ঞা পালনেই তোমার জীবনের সার্থকতা।"

সুভাষিণী প্রথম একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন! হঠাৎ তাঁহার মনে হইল স্বামী সম্ভবতঃ কোনো অ্যামেচার থিয়েটারের পালায় নামিয়াছেন, এ তাহারই রিহার্সাল হইতেছে। তাঁহার মেজাজটাও আজ একটু ভালোই ছিল, তাই তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আ মরণ, রস করবার ইচ্ছে তো সঙ্গে চাকর বাকর নিয়ে বেরিয়েছ কেন? চল ঐ ঘরে তোমার পালা শুনিগে।"

পিতোমবাবু বলিলেন, "প্রিয়ে, এ যে-সে অভিনয় নহে। ইহা জীবন-নাট্য। তুমি আমার দাসী চিরকালের - আমার আজ্ঞাপালনেই তোমার পূর্ণতা ও স্থিতি।"

গিন্নী নিজের ভুল বুঝিলেন। বলিলেন, "ও, তাই নাকি? আচ্ছা দেখা যাবে কে কার মনিব।"

পিতোমবাবু একটা ঘরের দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "যাও।"

গিন্নী বলিলেন, "তুমি যাও না।"

পিতোমবাবু হঠাৎ বিকট চিৎকার করিয়া বলিলেন, "যাও বলছি এক্ষুনি।"

গিন্নী ভাবিলেন, হয়তো স্বামী আবার নেশা-টেশা করিয়াছেন তাই আত্মরক্ষার্থে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিলেন।

একাধারে এরূপ দুইটি জয়ের আনন্দে পিতোমবাবু বিভোর হইয়া ছাদে গিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে আপিসের কাপড় পরিবার জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিলেন, দ্বার বন্ধ। বহু চিৎকার করিলেন, বহু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কোনো ফল হইল না। অগত্যা বাসার কাপড়ে ও বাজারের খাবার খাইয়া পিতোমবাবু আপিসে গেলেন। জয়ের মধ্যে পরাজয়ের ভেজাল পাইয়া আনন্দটা তাঁহার কিছু কমিয়া গেল।

বৈকালে গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন বাড়িতে কেহ নাই, শুধু মেধো। সে একটা তালা ও চাবি তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ বাপের বাড়ি গেছেন, আমায় ছুটি দিয়েছেন, আমি চললুম।"

পিতোমবাবু বলিলেন, "সে কি? আর খাওয়া-দাওয়া, তার কি ব্যবস্থা?"

মেধো বলিল, "বাড়িতে চাল-ডাল-নুন-তেল কিছুই নেই ; মা ঠাকরুণ টাকা পয়সাও কিছু দিয়ে যাননি।"

পিতোমবাবু পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন মাত্র সাড়ে তিন আনা পয়সা আছে। তিনি মেধোকে বলিলেন, "তুমি যাও।" মেধো চলিয়া গেল।

উপরে উঠিয়া পিতোমবাবু দেখিলেন, ঘরে বাক্স প্যাঁটরা কিছুই নাই—মায় বিছানাপত্র আয়না চিরুনি সব লইয়া গিন্নী শুধু ঘরে খালি তক্তপোশটা ও একখানা চেয়ার মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ভাঁড়ারে ঢুকিয়া দেখিলেন একটা টিনে কয়েকটা আদা আর শুকনো লঙ্কা রহিয়াছে, আর রহিয়াছে এক ঝুড়ি ঘুঁটে। পিতোমবাবু হতাশ হইয়া সাড়ে তিন আনা পয়সা-পকেটে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বশুরালয় ঠাকুর-পুকুর; ট্রামে ও গাড়িতে অনেক মাইল ও অনেক পয়সার মামলা। দারুণ ক্ষুধা, ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেই পয়সা ক-টা ফুরাইয়া গেল; তারপর পিতোমবাবু যুথভ্রষ্ট কোনো উষ্ট্রের ন্যায় শ্বশুরালয়ের পথে দেহটাকে টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন।

পথে বহুবার বিশ্রামের জন্য ও জল খাইবার জন্য বসিয়া ও শেষের দিকে একটা আলু-বোঝাই গোরুর গাড়ির চালকের কৃপায় তাহার উপর চড়িয়া রাত্রি দুইটার সময় পিতোমবাবু শ্বশুরালয়ে পৌছিলেন। স্বয়ং শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে দরজা খুলিয়া আলো ধরিয়া শয়নাগারের দিকে আগাইয়া দিলেন। শুধু একবার তিনি অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "ছি বাবাজী, অন্ততঃ ছেলেটার মুখের দিকে চেয়েও তোমার ওসব নেশা-টেশা করা উচিত নয়।"

পিতোমবাবু ক্লান্তি ও অবসাদের তাড়নায় তাঁহার কথার প্রতিবাদও করিতে পারিলেন না। মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বহিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "কি গো মুনিব ঠাকুর, এসেছ? বলি হেঁটে হেঁটে তো পায়ের নড়া খইয়ে এসেছ—এখনও কি আমি তোমার দাসী বাঁদী?" পিতোমবাবু সকল ইচ্ছাশক্তি পত্নীর পদে বিসর্জন দিয়া বলিলেন, "না গো না; আর কখনও অমন কথা আমি আর মুখে আনব না। ঘরে কিছু খাবার আছে?"

## ছয়

পিতোমবাবু 'অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি' গ্রন্থটি রাজপথে নিক্ষেপ করিয়া আজকাল আবার ঠিক পূর্বের ন্যায় স্ত্রীর কথামতো ঘুম হইতে উঠেন, বাজারে যান, ছেলেকে খেলা দেন, আপিস যান, মাহিনা আনিয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া দেন, উঠেন বসেন। কিন্তু প্রাণে তাঁহার দারুণ অশান্তি। গিন্নী তাঁহাকে বড়োই কড়া শাসনে রাখেন, তাঁহার সিগারেট খাওয়া বারণ— সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য এক ঘণ্টার অধিক বাহিরে

থাকা বারণ—কোনো প্রকার বদহজমের অর্থাৎ সর্বপ্রকার মুখ-রোচক খাদ্য খাওয়া বারণ, বন্ধু-বান্ধবকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা বারণ, আরও কত কিছু বারণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে মেধোর, খোকার, নস্থ খুড়ার, আরও কত লোকের মন জোগাইয়া চলিতে হয়,—প্রত্যহ শতবার শুনিতে হয় তিনি অকর্মা, নির্লজ্জ, বেহায়া ও নির্বোধ।

মরিয়া হইয়া শেষাবধি পিতোমবাবু একদিন পরমশত্রু নেপেন ভাদুড়ীর শরণাপন্ন হইলেন। বলিলেন, "ভাই নেপেন, জানোই তো ভাই, আমার কেমন করে দিন কাটছে। কি করে ভাই বাড়িতে একটু নিজের মতো সুখে শান্তিতে থাকতে পারি তার একটা উপায় বলতে পারো? তুমি বুদ্ধিমান লোক, ইচ্ছে করলে পারবে একটা উপায় বলে দিতে।"

নেপেনবাবু তাঁহাকে বহু প্রশ্ন করিয়া অবশেষে একটা পরামর্শ দিলেন।

দিন কয়েক পরে একদিন রাত্রে তরকারিতে নুন বেশি হইয়াছে বলায় সুভাষিণী পিতোমবাবুর পাতে একহাতা গরম জল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "এবার খাও কম নুন লাগবে এখন। কাজ নেই কোনো, শুধু খুঁত ধরা বাই হয়েছে। এরপর তুমি হোটেলে গিয়ে চারগণ্ডা পয়সা দিয়ে ভাত খেও।"

পিতোমবাবু রাগ করিয়া না খাইয়া উঠিয়া গেলেন। খাবার ঘরের বাহিরে গিয়াই কিন্তু তাঁহার মুখ কী একটা অপূর্ব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙিতেই সুভাষিণী দেখিলেন, পিতোমবাবু মশারির দিকে পা তুলিয়া "মা মা" বলিয়া ডাকিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষিতেছেন। প্রথমে তিনি তর্জন-গর্জন, গালি-গালাজ দিয়া দেখিলেন কিছুই হইল না। পিতোমবাবু তক্তপোশের উপর চিত হইয়া শুইয়া এক বিরাটাকৃতি দৈত্য-শিশুর ন্যায় হাত-পা ছুঁড়িয়া ক্রমাগত "মা মা" করিতে লাগিলেন। গিন্নী ভয় পাইয়া নস্থ খুড়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

খুড়া আসিয়া টানাটানি করিয়া পিতোমবাবুকে মেঝেতে নামাইয়া দিতেই পিতোমবাবু হামা দিয়া ঘরময় "হুহু কাব" "হুহু কাব" বলিয়া ঘুরিতে লাগিলেন।

গিন্নী এবার সত্য সত্যই ভয় পাইয়া মহাকান্নাকাটি জুড়িয়া দিলেন। নস্থ খুড়া দৌড়াইয়া গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার এরূপ ব্যায়রাম কখনও দেখেন নাই। তিনি নিজ অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য বলিলেন, "অ্যাকিউট নার্ভাস ব্রেক-ডাউন, রোগীকে কোনো প্রকার নাড়াচাড়া বা উত্তেজিত

করিবে না। দুধ চাহিতেছে, দুধ খাওয়াইয়াই রাখো। পরে আসিয়া দেখিব কি হয়।"

সকলে ধরাধরি করিয়া পিতোমবাবুকে খাটের উপর শোয়াইয়া দিলেন। তিনি শুইয়া শুইয়া কখনও হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিলেন, কখনও বা "গ, গ, গ, গ" বলিয়া চিৎকার বা অযথা হাস্য করিতে লাগিলেন। শিশুরা যেমন ক্রমাগত চিত হইতে উপুড়, উপুড় হইতে চিত হইয়া দৈহিক এনার্জির সদ্ব্যবহার করে, পিতোমবাবুও সেইরূপে ব্যায়ামের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। একবার নস্য খুড়া অনবধানবশতঃ পিতোমবাবুর পায়ের কাছে আসিয়া বসাতে ক্রীড়া-নিরত পিতোমবাবুর পদসঞ্চালনে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কেহ দেখিল না যে, পিতোমবাবুর মুখখানা ইহাতে কী এক অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সুভাষিণীর কেশ ধরিয়া একবার পিতোমবাবু সহাস্যবদনে ঝুলিয়া পড়িলেন। সুভাষিণীকে বহুকষ্টে সেই দৈত্য-শিশুর কবল হইতে রক্ষা করা হইল।

খাওয়া লইয়া আর এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। ঘরময় দুগ্ধের ঢেউ খেলিয়া গেল। দুই তিনটি পেয়ালা, তিন চারটি বাটি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া মেঝেতে গড়াইতে লাগিল; পিতোমবাবু সেই দুগ্ধ স্রোতে ছপাৎ ছপাৎ করিয়া হামা দিয়া বেড়াইয়া বিছানার উপর হইতে টানিয়া সুভাষিণীর আদরের লক্ষ্ণৌ ছিটের নূতন লেপখানা সেই দুগ্ধকর্দমে ফেলিয়া মাখামাখি করিয়া এক নব দক্ষযজ্ঞের সূচনা করিলেন। সুভাষিণী আজ জীবনে প্রথম বিপদের মুখে পরাজিত হইয়া ছলছল নেত্রে এই তাণ্ডব অভিনয় নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

সুভাষিণী বাটি করিয়া দুধ খাওয়াইতে না পারিয়া পিতোমবাবুকে অগত্যা খোকার "ফিডিং বটলে" দুধ খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন। নস্য খুড়া নস্য লইতে লইতে বলিলেন, "দুর্গা দুর্গা।"

তিন চার দিন অতিশয় যত্নের সহিত শুশ্রূষা করিয়া পিতোমবাবুকে ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। সকলেই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। সুভাষিণী শয়নকালে তাঁহার পা টিপিয়া দেন। নস্য খুড়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাওয়া করেন। ডাক্তার বলিয়াছেন, "সম্পূর্ণ শান্তি ও আরাম দেওয়া চাই;—নতুবা পাগল হইয়া যাইবার ভয় আছে।"

## সাত

কয়েকদিন হইল পিতোমবাবু আবার আপিস যাইতেছেন। নেপেনবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভায়া আছ কেমন? মনে তো হচ্ছে খেয়ে দেয়ে তোফা ফুলছ।"

পিতোমবাবু নিজের বাম চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত করিয়া বলিলেন, "হুহু।"

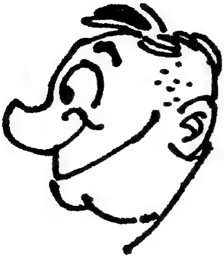

বনফুল ( ১৮৯৯—)

# থিয়োরি অব রিলেটিভিটি

জীবনে নিকটতম দুঃখটাই যে সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক তা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিলাম। আমার ধার আছে, গৃহিণী কুৎসিত, সামান্য কেরানীগিরি করিয়া খাই এবং তাহা লইয়া গর্ব করিয়া বেড়াই, কলেজে আমার অপেক্ষা যে-সব সহপাঠী নিম্নস্তরের ছিল কর্মজীবনে তাহারা কেবল মুরুব্বীর জোরে উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছে—এই প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানারূপ দুঃখ আমার ছিল। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে আমার সর্বাপেক্ষা কষ্টের কারণ হইয়াছে এই বুড়িটা। এই বুড়ি তাহার ময়লা শতছিন্ন দুর্গন্ধ কাপড়টা লইয়া আমার নাকের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে বাঁচি। জানলা দিয়া দেখিতে পাইতেছি, সন্ধ্যার আকাশ বহুবর্ণে বিচিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু এই বুড়িটা না সরিলে···আঃ কী মুশকিল!

পীড়িতা মাসীমার অসুখের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা যাইতেছিলাম। মন্থরগতি প্যাসেঞ্জার ট্রেন, গ্রীষ্মকাল এবং আমার টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং যে কষ্টভোগ করিতেছিলাম—তাহা দুঃসহ হইলেও ন্যায্য—এই জাতীয় একটা সান্ত্বনা মনে মনে গড়িয়া তুলিতেছিলাম, এমন সময় পিছন হইতে অর্ধমলিন পরিচ্ছদধারী এক ভদ্রলোক বলিলেন—"রাস্তাটা থেকে সরে দাঁড়ান একটু। বাথরুমে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করবেন না। একটু সরুন দয়া করে।"

যথাসাধ্য দেহ-সংকোচ করিয়া ভদ্রলোককে পথ করিয়া দিলাম। ভদ্রলোক বাথরুম হইতে প্রত্যাবর্তনের মুখে বলিলেন—"এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন কেন? ওধারে চলুন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওদিকে কি জায়গা আছে?"

"আহা, চলুনই না—"

বুড়ির সান্নিধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিলাম। সুতরাং ভদ্রলোকের অনুসরণ করিয়া কামরাটির অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

ভদ্রলোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে প্রস্তাব করিলেন—"বসুন, আমার এই তোরঙ্গটার ওপরেই বসুন। আসল স্টিল—আপনার মতো দশজন বসলেও এর কিছু হবে

না।" তোরঙ্গটির চেহারা ভালোই বলিতে হইবে। তাহার দৃঢ়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কিছু ছিল না। বস্তুতঃ আমি সন্দেহ প্রকাশও করি নাই। তথাপি ভদ্রলোক বলিলেন—"আমার জিনিস ভালো না দিলে নিস্তার আছে ছগ্‌গনলালের ? তার মনিব হল গিয়ে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।"

আমি ট্রাঙ্কটির উপর বসিয়া ছিলাম।

একটু মৃদু হাসিয়া শুধু বলিলাম—"তাই নাকি ?"

"তাই নাকি মানে ? ছগ্‌গনলালের সাধ্য আছে আমাকে খারাপ জিনিস দেয় ? তার মনিব বৈজুপ্রসাদ হল গিয়ে আমার খাতক।"

ভদ্রলোককে খুশি করবার জন্য আমি আবার বলিলাম—"হ্যাঁ, সুন্দর মজবুত ট্রাঙ্ক আপনার। দেখতেও চমৎকার।"

ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করিয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাম কত হবে আন্দাজ করুন দেখি !"

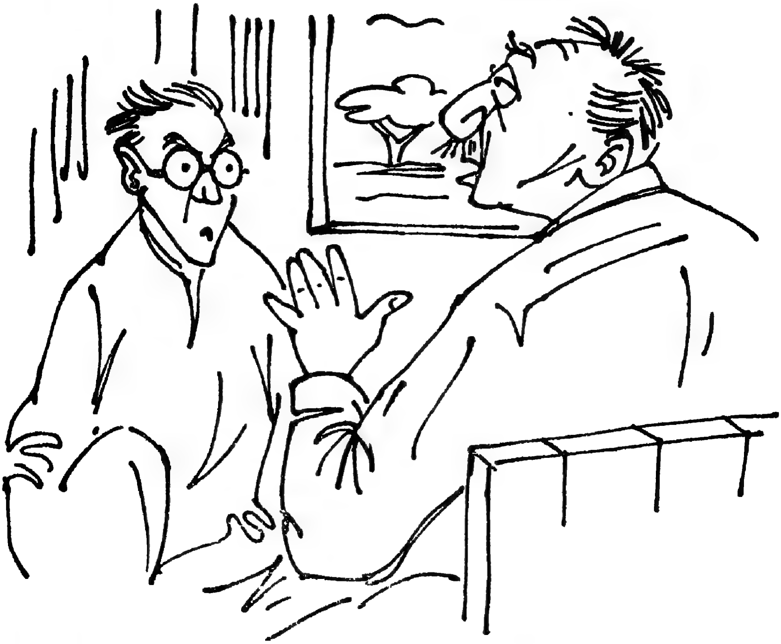

নিরীহভাবে বলিলাম, "টাকা কুড়ির তো কম নয়ই। কত ?"

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হাসি শেষ করিয়া বলিলেন—"আপনার দোষ নেই, হয়তো আসল দাম ওই রকমই হবে। আমি গণ্ডা বারো পয়সা দিয়েছিলাম।"

সত্যই অবাক হইয়া গেলাম।

"বলেন কি? বারো আনা?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "তাও নিতে চায় না। ছগ্‌গনকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা টাকা দিয়েছিলাম, তার থেকেও চার গণ্ডা পয়সা ফিরিয়ে দিলে।"

আমি আর কিছু বলিলাম না। ছগ্‌গনলালের মনিব বৈজুপ্রসাদ যখন ইঁহার করায়ত্ত তখন ট্রাঙ্ক লইয়া ইনি ছিনিমিনি খেলিতে পারেন। বলিবার কিছু নাই। বসিতে পাইয়াছি—বসিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন—"যদিও আমি সাধারণ মানুষ, কিন্তু লোকে আমায় খাতির করে খুবই। এই দেখুন না –" বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া বেঞ্চির নিচে হইতে এক জোড়া ব্রাউন রঙের ভালো ডার্বি শু বাহির করিলেন এবং স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন—"এর দাম কত হবে বলুন তো?"

"পাঁচ-ছ টাকা তো মনে হয়।" ভয়ে ভয়ে বলিলাম।

"রায়মশাই কিন্তু আমার কাছ থেকে চার গণ্ডা পয়সার বেশি কিছুতে নিলেন না। কারণও অবশ্য আছে। রায়মহাশয়ের ছেলের চাকরিটা এক কথায় করে দিলাম কি-না। টমসন সাহেবও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।"

চকিতের মধ্যে বুঝিলাম, এই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক সামান্য ব্যক্তি নহেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। গাড়ির বাতিটা জ্বলিয়া উঠিল। আড় চোখে একবার চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক ঢুলিতেছেন। গাড়ির অপর প্রান্তে দেখিলাম, সেই বুড়িটা বেঞ্চিটার উপর জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া আছে। স্বল্পালোকিত তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে ওই বুড়িটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

## দুই

"ওটা কি পড়ছেন?"

"ও একটা মাসিক পত্র। একটা গল্প পড়ছি।"

ভদ্রলোক কোণে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছিলেন। আমিও পকেট হইতে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া পড়িতে শুরু করিলাম।

ভদ্রলোক হাই তুলিয়া টুসকি দিতে দিতে বলিলেন—"কার লেখা?"

"পান্নালাল চক্রবর্তীর।"

"মেয়েটি লেখে ভালোই। কিন্তু ওর লেখার চেয়ে ওর—"

"পান্নালাল চক্রবর্তী মেয়েমানুষ নাকি ?"

ভদ্রলোকটি একটু মুচকি হাসিয়া উত্তর দিলেন—"মেয়েমানুষ শুধু নয়, একেবারে তন্বী—গৌরী—যুবতী !"

আমি সত্যই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

বিদ্যুতের মতো একটা পুলকিত শিহরণে সমস্ত সত্তা আকুল হইয়া উঠিল। পান্নালাল চক্রবর্তীর লেখা আমার ভালো লাগে। শুধু ভালো লাগে বলিলেই পর্যাপ্ত হয় না, তাঁহার লেখার আমি একজন ভক্ত-পাঠক। যেখানেই পান্নালাল চক্রবর্তীর লেখা দেখিতে পাই, সাগ্রহে পড়িয়া ফেলি। সেই পান্নালাল মেয়েমানুষ—তন্বী—গৌরী—যুবতী !

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"টুনি তো এই সেদিনের মেয়ে! সেদিন পর্যন্ত ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে বেড়িয়েছে। মেয়েটা ছেলেবেলা থেকেই বেশ চালাক চতুর। এক কথায় ও রকম মেয়ে আমি এ দেশে বড়ো একটা দেখিনি—"

বলাবাহুল্য, কৌতূহলী হইয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম ?"

"ওর মতো ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে, সাইকেল চালাতে, গান গাইতে, ফুটবল খেলতে পারে এরকম ছেলেই আমাদের দেশে কম আছে। ভূষণকে বলেছিলাম, স্বাধীন দেশে জন্মালে ও মেয়ে একটা রিজিয়া এলিজাবেথ হত। অন্ততঃপক্ষে একটা নামজাদা সিনেমা-স্টার। ভূষণ কিন্তু বিয়ের জন্যে অস্থির হল—"

উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভূষণ কে ?"

"ভূষণ হল গিয়ে টুনির বাপ। বিয়ে দিলে, তবে ছাড়লে। বিয়ের পরও কলম ধরেছে। তাও একবার লেখার দৌড়টা দেখুন।"

ভদ্রলোক আবার ঢুলিতে লাগিলেন। মনে হইল অস্ফুটস্বরে যেন একবার বলিলেন—"টুনি—পান্নালাল চক্রবর্তী হেঁ!"

একটা স্টেশনে আসিয়া ট্রেন থামিল। আমার ঠিক সামনের বেঞ্চে একদল সাঁওতাল বসিয়াছিল, তাহারা সদলবলে নামিয়া গেল। আমি বেঞ্চটি খালি পাইয়া সটান গিয়া তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক কোণে বসিয়া ঢুলিতেছেন। উপরের বাঙ্কে একজন স্ফীতোদর ব্যক্তি নাক ডাকাইতেছিলেন। তাহার মুখ দেখা গেল না। অনুমান করিলাম, কোনো

মাড়োয়ারী হইবেন।

চক্ষু বুজিয়া শুইয়া আছি। বারংবার একটি কথাই মনে হইতেছে, পান্নালাল চক্রবর্তী তন্বী—গৌরী—যুবতী!

## তিন

ধপাস করিয়া একটা শব্দ হইল।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বাঙ্কের সেই মাড়োয়ারীটি বাঙ্ক হইতে লাফাইয়া নামিয়াছেন, আর কিছু নয়। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার অনুমান ভুল হইয়াছিল। ভদ্রলোক মাড়োয়ারী নয় বাঙালীই। খোঁচা খোঁচা গোঁফওয়ালা স্থূলাকার ভদ্রলোক লাফাইয়া নামিতে গিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সামলাইয়া লইয়া এক জোড়া বড়ো বড়ো সদ্য-ঘুম-ভাঙা লাল চোখ মেলিয়া জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রভাত হইয়াছিল। ফিরিয়া দেখিলাম, তোরঙ্গের মালিক সেই ভদ্রলোকও আর ঢুলিতেছেন না। 'স্টেটস্‌ম্যান' লইয়া "ওয়াণ্টেড" পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। আমি আর একবার শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘুম আসিল না। তথাপি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু চোখও খুলিতে হইল। ট্রেন আসিয়া ব্যাণ্ডেল স্টেশনে দাঁড়াইল। চায়ের আশায় উঠিয়া বসিলাম এবং হাঁকাহাঁকি করিয়া মাটির ভাঁড়ে খানিকটা চা যোগাড় করিয়া ফেলিলাম।

খোঁচা খোঁচা গোঁফের অধিকারী এবং তোরঙ্গের মালিক উভয়েই দেখিলাম চা লইলেন। পান্নালাল চক্রবর্তীর প্রসঙ্গটা আর একবার উত্থাপিত করিব ভাবিতেছি, এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পাতলা ছিপছিপে চশমাধারী একটি যুবক আমাদের গাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "আরে এ কি, পান্নালালবাবু যে! কোথা যাচ্ছেন?"

খোঁচা গোঁফের মালিক মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কোন্নগর।"

"দেখা হয়ে গেছে যখন, তখন আর যেতে দিচ্ছি না আপনাকে। কোন্নগর ও-বেলা যাবেন। এবেলা এখানেই নেমে যান। অনেকদিন সাহিত্যচর্চা করা হয়নি। এ মাসের 'কাহিনী কুঙ্কুম' কাগজে আপনার 'চলতি চাকা' পড়লাম। চমৎকার হয়েছে গল্পটা!"

স্বপ্ন দেখিতেছি না কি?

কিন্তু না, থার্ডক্লাস গাড়িতে উবু হইয়া বসিয়া এক ভাঁড় বিশ্রী চা হস্তে স্বপ্ন দেখাও তো সম্ভব নয়। 'চলতি চাকা' গল্প আমিও কাল রাত্রে পড়িয়াছি এবং 'কাহিনী কুঙ্কুম' এখনও আমার পকেটে আছে।

সবিস্ময়ে শুনিলাম, ট্রাঙ্কের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ও গদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন—"আপনিই প্রসিদ্ধ গল্প লেখক পান্নালাল চক্রবর্তী ?"

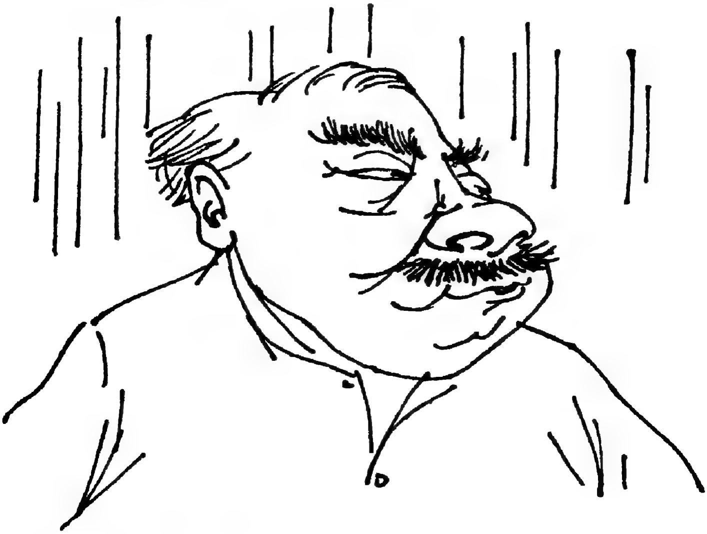

ছিপছিপে ভদ্রলোক সগর্বে বলিলেন—"হ্যাঁ ইনিই।"

ট্রাঙ্কেব স্বত্বাধিকারী বলিতে লাগিলেন —"নমস্কার, নমস্কার, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হল। এতক্ষণ একসঙ্গে এলাম, পরিচয় ছিল না। আপনার ভক্ত-পাঠক একজন আমি। চললেন তা হলে ? আচ্ছা নমস্কার।"

ছিপছিপে পাতলা ভদ্রলোকের সহিত বিখ্যাত গল্প-লেখক পান্নালাল চক্রবর্তী নামিয়া গেলেন। ট্রেনও ছাড়িয়া দিল। মাটির ভাঁড়টা জানালা দিয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিলাম এবং ট্রাঙ্কের মালিকের দিকে রুখিয়া ফিরিয়া বসিলাম। সংক্ষেপেই বলিলাম—"এটা কি রকম হল ?"

"কোন্‌টা ?"

বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোক পাল্‌টা প্রশ্ন করিলেন।

"বাঃ কাল রাত্রে আমাকে আপনি বললেন, পান্নালাল চক্রবর্তী একজন মেয়েমানুষ, তাকে আপনি চেনেন—অথচ—"

নির্বিকারভাবে ভদ্রলোক বলিলেন—"আর কি কি বলেছিলাম ?'

"আর বলেছিলেন আপনার ঐ ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা, জুতোর দাম চার আনা—"

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোক বলিলেন—"যিনি বলেছিলেন তিনি চলে গেছেন। আমি অন্য লোক।"

আমি উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলাম।

"অন্য লোক মানে?"

"অর্থাৎ আমার অ্যাঙ্গল অব ভিশন, মানে কিনা দৃষ্টিকোণ এখন একেবারে অন্য প্রকার।"

' ঠিক বুঝতে পারলাম না—"

সহসা ভদ্রলোকের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এক মুখ হাসিয়া তিনি বলিলেন—"পাঁচ পয়সার মোদকের নেশা কতক্ষণ আর থাকবে বলুন? কাল নেশার ঘোরে মনে হয়েছিল হয়তো পান্নালাল চক্রবর্তী মেয়েমানুষ—ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা—জুতোর দাম চার আনা। এখন নেশা কেটে গেছে, এখন দেখছি পান্নালালের গোঁফ আছে এবং মনে পড়ছে এই ট্রাঙ্ক ও জুতোর দাম যথাক্রমে সাড়ে তেরো ও পৌনে সাত টাকা দিয়েছিলাম। 'থিয়োরি অব রিলেটিভিটি'—বুঝলেন না?"

বুঝিলাম এবং চুপ করিয়া রহিলাম। হঠাৎ গাড়ির অপর প্রান্ত হইতে শুনিলাম—

"আরে বাবুয়া, তু কাঁহা?"

চাহিয়া দেখি সেই দুর্গন্ধ বুড়িটা আমাকে ডাকিতেছে। রাত্রে অত বুঝিতে পারি নাই, এখন চিনিলাম, মাসীমার বাড়ির পুরাতন দাই রুক্‌মিনিয়া। মাসীমারা যখন বিহারে ছিলেন তখন হইতে রুক্‌মিনিয়া মাসীমার বাড়িতে আছে। ছুটিতে দেশে গিয়াছিল, মাসীমার অসুখ শুনিয়া আসিতেছে।

বুড়ির কাছে গিয়া বসিলাম। বুড়ি 'মহাবীরজী'র নিকট পূজা চড়াইয়া আসিয়াছে—মাসীমা যাহাতে ভালো হইয়া যান। মলিন বসনান্তরাল হইতে মহাবীরজীর 'পরসাদ' বাহির করিয়া খাইতে দিল। সানন্দে খাইয়া ফেলিলাম। 'থিয়োরি অব রিলেটিভিটি'ই বটে!

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৯৯—)

# তন্দ্রাহরণ

পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজকুমারী তন্দ্রার মন একেবারে খিঁচড়াইয়া গিয়াছে। মধুমাসের সায়াহ্নে তিনি তাই প্রাসাদশিখরে উঠিয়া একাকিনী দ্রুত পায়চারি করিতেছেন এবং গণ্ড আরক্তিম করিয়া ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম ?

অনেকদিন আগেকার কথা। ভারতীয় রমণীগণের মন তখন অতিশয় দুর্দমনীয় ছিল, মাত্র কয়েক বৎসব পুর্বে কনৌজে সংযুক্তার স্বয়ংবর হইয়া গিয়াছে।

রাজকুমারী তন্দ্রাব বয়স আঠাবো বৎসর। ফুটন্ত রূপ, বিকশিত যৌবন, তথাপি মধুমাসের সায়াহ্নে তাঁহার মন কেন খিঁচড়াইয়া গিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, তাঁহার আসন্ন বিবাহই একমাত্র কারণ।

কিন্তু আঠারো বছবের বিকশিতযৌবনা কুমারী বিবাহ কবিতে অনিচ্ছুক কেন ? একালে তো এমনটা দেখা যায় না! তবে কি সেকালে—

না, তাহা নয়। সেকালেও এমনই ছিল। কিন্তু কুমারী তন্দ্রার আপত্তির কারণ, তাঁহার মনোনীত স্বামী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুবেব যুবরাজ চন্দ্রানন মানিক্য। কথাটা বোধ কবি পরিষ্কাব হইল না। আসল কথা—বব বাঙাল।

যতদিন এই বিবাহ রাজা ও মন্ত্রীমণ্ডলীব গবেষণার বিষয়ীভূত ছিল, ততদিন কুমারী তন্দ্রা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ শিরে সংক্রান্তি আসিয়া পডিয়াছে। যুবরাজ চন্দ্রানন বিবাহ করিবার জন্য দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইয়া সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে রাজধানীতে ডেরাডাণ্ডা ফেলিয়াছেন।

গোডা হইতেই তন্দ্রার মন বাঁকিয়া বসিয়াছে। তবু তিনি গোপনে প্রিয় সখী নন্দাকে পাঠাইয়াছিলেন —চন্দ্রানন মানিক্য লোকটি কেমন দেখিবার জন্য। নন্দা আসিয়া সংবাদ দিয়াছে—যুবরাজ দেখিতে শুনিতে ভালোই, চালচলনও অতি চমৎকার, কিন্তু তাঁহার ভাষা একেবারে অশ্রাব্য। 'ইসে' এবং 'কচু' এই দুইটি শব্দের বহুলপ্রয়োগসহযোগে তিনি যাহা বলেন, তাহা কাহারও বোধগম্য হয় না।

শুনিয়া কুমারী তন্দ্রা একেবারে আগুন হইয়া গিয়াছেন। এ কী অত্যাচার!

তিনি রাজকুমারী বলিয়া কি তাঁহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই? হউক সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ—তবু বাঙাল তো! দেশে কি আর রাজপুত্র ছিল না? আর রাজপুত্র ছাড়া রাজকুমারী বিবাহ করিতে পারিবে না—এই বা কেমন কথা!

কুমারী তন্দ্রা রাজসভায় নিজ অনিচ্ছা জানাইয়া তীব্র লিপি লিখিয়াছিলেন। উত্তরে মন্ত্রীগণ কর্তৃক পরামর্শিত হইয়া রাজা কন্যাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, চন্দ্রানন মহা বীরপুরুষ, উপরন্তু বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে বিবাহে অস্বীকৃত হইলে নিশ্চয় কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের গোঁ অতি ভয়ানক বস্তু। সুতরাং বিবাহ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তদবধি ক্রোধে অভিমানে কুমারী তন্দ্রার চোখে তন্দ্রা নাই। তাই মধু সায়াহ্নে একাকী প্রাসাদশীর্ষে দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে গণ্ড আরক্তিম করিয়া তিনি ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম?

সহসা একটি তীর হাউইয়ের মতো প্রাসাদপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া তন্দ্রার পদপ্রান্তে পড়িল। বিস্মিত হইয়া তন্দ্রা চারিদিকে চাহিলেন। রাজপ্রাসাদশীর্ষে কোন্ ধৃষ্ট তীর নিক্ষেপ করিল? তন্দ্রা ছাদের কিনারায় গিয়া নিম্নে উঁকি মারিলেন।

ঠিক নিচেই জলপূর্ণ পরিখা প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পরিখার পরপারে একটি উষ্ণীষধারী যুবক ঊর্ধ্বমুখ হইয়া গুম্ফে তা দিতেছে। তন্দ্রাকে দেখিতে পাইয়া সে হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিল।

চতুস্তল প্রাসাদের শিখর হইতে যুবকের মুখাবয়ব ভালো দেখা গেল না; তবু সে যে বলিষ্ঠ ও কান্তিমান তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তন্দ্রা বিস্ময়াপন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তীরটি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন তীরের গায়ে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে। লিপি খুলিয়া তন্দ্রা পড়িলেন—

“ছলনাময়ী নন্দা, আর কতদিন দূর হইতে দেখিয়া অতৃপ্ত থাকিব? তুমি যদি আমাকে ভালবাসো, তবে আমার মনস্কাম সিদ্ধ করো; আমার মন আর বিলম্ব সহিতেছে না। যদি আমাকে বঞ্চনা করো, নিজেই পরিতাপ করিবে। পরদেশী বন্ধু কতদিন থাকে?

সদয়া হও—তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। একবার সাক্ষাৎ হয় না?—তোমার অনুগত বন্ধু।”

লিপি পড়িয়া কুমারী তন্দ্রা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে পড়িল, ইদানীং প্রিয় সখী নন্দা যখন তখন ছলছুতা করিয়া ছাদে আসে। এই তাহার অর্থ! ঐ কমকান্তি বিদেশী নন্দাকে দেখিয়া মজিয়াছে; নন্দাও নিশ্চয় তাহার প্রতি আসক্ত। দুইজনে কাছাকাছি হয় নাই, দূর হইতেই প্রণয়। তীরের মুখে প্রেম!

সহসা তন্দ্রার দুই নয়নে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি সন্তর্পণে উঠিয়া গিয়া আবার উঁকি মারিলেন। ধৈর্যশীল যুবক তখনও ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া গুম্ফে তা দিতেছে।

কবরী হইতে কাজললতা লইয়া চুলের কাঁটা দিয়া তন্দ্রা লিপি লিখিলেন, হাত কাঁপিতে লাগিল। লিপি শেষ হইলে তীরের গায়ে জড়াইয়া পরপারে ফেলিয়া দিলেন। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে দেখিলেন, যুবক সাগ্রহে তীর তুলিয়া লইল।

নন্দা ছাদে আসিয়া তন্দ্রাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল, 'প্রিয় সখী, তুমি এখানে?'

তন্দ্রা তপ্তমুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। নন্দা ছাদের এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর বলিল, 'কতক্ষণ এখানে এসেছ?'

তন্দ্রা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; 'নন্দা আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না। হয়তো কাল সকালে উঠে আর আমায় দেখতে পাবি না। সখি, তোর কাছে যদি কখনও অপরাধী হই ক্ষমা করিস।'

নন্দা রাজকুমারীকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ তাহার অশ্রুশিক্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'ছি সখি, ও কথা বলতে নেই। চলো, নিচে চলো। কাজললতা যে পড়ে রইল, আমি নিচ্ছি। চুলের কাঁটাও খসে পড়েছে দেখছি! সখি, উতলা হয়ো না, তোমার ভাগ্যদেবতা তোমায় নিয়ে হয়তো একটু পরিহাস করছেন, দেবতার পরিহাসে কাতর হলে কি চলে?'

শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অশ্রুভরা স্বরে তন্দ্রা কহিলেন, 'নন্দা, আজ রাত্রে আমি একা শোব, তুই যা। আরো দেখ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সেই বর্বরটাকে যদি তোর পছন্দ হয়, তুই নিস।'—মনে মনে বলিলেন, 'অদলবদল।'

নন্দা জিভ কাটিয়া চোখে আঁচল দিল। ওমা ও কী কথা! আমি যে তাঁর

দাসীর দাসী হবার যোগ্য নই।'—বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। নন্দার এই পলায়ন একেবারে প্রাসাদের বাহিরে গিয়া থামিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের যাম-ঘোষণা থামিয়া যাইবার পর, রাজকুমারী তন্দ্রা প্রাসাদের গুপ্তপথ দিয়া পরিখা পার হইয়া বাহিরে গেলেন। তাঁহার বরতনু বেষ্টন করিয়া আছে রাত্রির মতোই নিবিড় নীল একটি উর্ণা।

নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে একটি তরুণ সুদৃঢ় হস্ত আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। কেহ কথা কহিল না; দুইটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল, তরুণ সুদৃঢ় হস্তধারী তন্দ্রাকে একটির পৃষ্ঠে তুলিয়া দিল; তারপর একলম্ফে অপরটির পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল। নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে দুই কৃষ্ণকায় অশ্ব ছুটিয়া চলিল, পৌণ্ড্রভুক্তির সীমান্ত লক্ষ্য করিয়া।

দণ্ড কাটিল, প্রহর কাটিল, কত নক্ষত্র অস্ত গেল। সম্মুখে শুকতারা বিস্ময়াবিষ্ট, জ্যোতিষ্মান চক্ষুর মতো জ্বল জ্বল করিতে লাগিল।

দিগন্তহীন প্রান্তরের মাঝখানে প্রভাত হইল; তখন বল্গার ইঙ্গিত পাইয়া অশ্বযুগল থামিল। কুমারী তন্দ্রা মুখের নীল উর্ণা সরাইয়া পাশে অশ্বারোহী মূর্তির পানে চাহিলেন। দৃষ্টি বিনিময় হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া আছে একটি তরুণ কন্দর্প। পক্ক দাড়িমের মতো তার দেহের বর্ণ। পেশল অথচ পেশীবদ্ধ দেহ, মুখে পৌরুষ ও লাবণ্যের অপূর্ব মেশামেশি!

নবজাত গুম্ফের নিচে একটু কৌতুকহাস্য ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে দেখিতে কুমারী তন্দ্রার চক্ষু দুইটি আবেশে নিমীলিত হইয়া আসিল। দূর হইতে যাহা দেখিয়াছিলেন, এ যে তাহার চেয়ে সহস্রগুণ সুন্দর!

সহসা অনুতাপে তন্দ্রার হৃদয় বিদ্ধ হইল। তিনি লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, 'আর্যপুত্র, আমার ছলনা ক্ষমা করো। আমি নন্দা নই—আমি তন্দ্রা।'

তরুণ কন্দর্প হাসিলেন, গুম্ফে ঈষৎ তা দিয়া সুধামধুর স্বরে কহিলেন,—'ইসে সেডা না জাইনাই কি চুরি কৈরা আন্‌ছি? রাজকুমারী, তুমি বড়োই চতুরা; কিন্তু আমার চৈক্ষে যদি ধূলাই দিতে পারবা তো তোমারে বিয়া করতি আইলাম কিসের লাইগ্যা?'

তন্দ্রা চমকিত হইলেন; বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া স্খলিত স্বরে কহিলেন, 'তুমি —তুমি কে?'

যুবক কলকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, 'আরে কচু—সেডা এখনো বোঝবার পারো নাই? আমি চন্দ্রানন মানিক্য—ইসে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ। হ, সৈত্য কইলাম।'

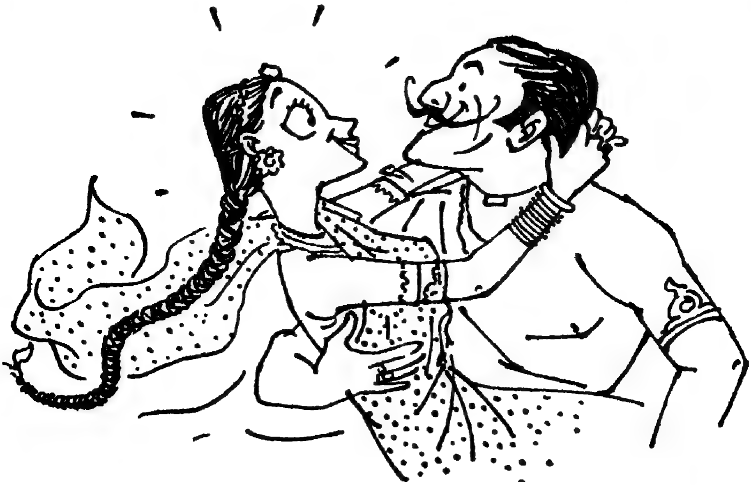

দুইটি অশ্ব অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি মন্থর গমনে পৌণ্ড্রবর্ধনের পথে ফিরিয়া চলিয়াছে। তন্দ্রার করতল চন্দ্রাননের দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ। তাঁহার স্খলিতবেণী মস্তক মাঝে মাঝে যুবরাজের বাম স্কন্ধের উপর নত হইয়া পড়িতেছে।

তন্দ্রা কহিলেন, 'যুবরাজ, কী সুন্দর তোমার ভাষা—যেন মধু ঝরে পড়ছে! কত দিনে আমি এ ভাষা শিখতে পারব?'

চন্দ্রানন তন্দ্রার মণিবন্ধে একটি আনন্দ-গদগদ চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'ইসে—আগে বিয়া তো করি, তারপর এক মাসের মৈধ্যে তোমারে শিখাইয়া ছারমু। তোমাগো:র ও কচুর ভাষা এক মাসে ভুইলা যাইতে পারবা না?'

সুখাবিষ্ট কণ্ঠে তন্দ্রা বলিলেন, 'পারমু।'

### সজনীকান্ত দাস ( ১৯০০— )

# শিকারী

ভোলাহাটের জমিদারবংশ অতি প্রাচীন, একেবারে পাঠান আমলের বুনিয়াদ তাঁহাদের। সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে রানী ভবানীকে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন, ইঁহাদের পূর্বপুরুষ তাঁহাদের একজন। বর্তমানে রাজা মহিমনারায়ণ মহাসমারোহে রাজত্ব করিতেছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, তথাপি সোজা আছেন। সেদিন তাঁহার জমিদারির স্বর্ণজুবিলী হইয়া গেল। একমাত্র পুত্র বালকনারায়ণ পিতার দোর্দণ্ড প্রতাপের মুখে শিশুই রহিয়া গেলেন। বয়স ষাট অতিক্রম করিয়াছে তবুও কুমার বাহাদুর চিররুগ্ন, গেলেন গেলেন করিয়া কোনোক্রমে টিকিয়া আছেন। পিতা মহিমনারায়ণের হালচাল দেখিয়া তিনি হাল ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত আছেন। রাজত্ব করিবার সৌভাগ্য এ জীবনে তাঁহার হইবে না। এ এক রকম ভালো। কিন্তু তাঁহার পুত্র ধূর্জটিনারায়ণ ক্ষেপিয়া আছেন। তাঁহার বয়সও চল্লিশ অতিক্রম করিয়াছে, জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। মোগল আমল হইলে বুড়া মহিমনারায়ণকে মারিয়া অথবা পুরাতন গুমঘরে বন্দী করিয়া রাজত্ব করার শখটা তিনি মিটাইয়া লইতেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বাবার জন্য কোনোও চিন্তা নাই, রুগ্ন শিখণ্ডী মাথায় মুকুট পরিয়া সামনে খাড়া থাকিলেই বা ক্ষতি কি ?

কিন্তু বুড়া জবরদস্ত, নাতির বেচাল দেখিয়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভাতা বাড়াইতে প্রস্তুত নন। ধূর্জটিনারায়ণ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। শিকার আর শখের থিয়েটার লইয়া এ যুগের একটা মানুষ কতদিন কাটাইতে পারে ? একটা সিনেমা কোম্পানি খুলিবার শখ ছিল। পরিচিত তারকা-অভিনেত্রীও দুই চারিজন রাজী ছিল, কিন্তু ম্যানেজারের জবানিতে বুড়া সাংঘাতিক রকম দাঁত খিঁচাইয়াছেন। ম্যানেজারের দাঁত ভাঙিয়া সে রাগ যাইবার হইলে ধূর্জটিনারায়ণ তাহাই করিতেন, তিনি রাগ করিয়া সদলবলে কাশ্মীর গেলেন।

তাহার পরেই বাংলা সাহিত্যে শিকারী ধূর্জটিনারায়ণের আবির্ভাব। বারো ফুট দুইটি সদ্যমৃত রয়াল বেঙ্গল টাইগারের পেটের উপর পা দিয়া শিকারী বেশে

ধূর্জটিনারায়ণের ফোটো দেখিয়া এবং সঙ্গে তল্লিখিত বিচিত্র শিকার কাহিনী পড়িয়া দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টার আমরা লাফাইয়া উঠিলাম। সংবাদ পাওয়া গেল, আসামের জঙ্গলে হাতী, বাঘ এবং বন্য মহিষ শিকার করিয়া কুমাব ধূর্জটিনারায়ণ কলিকাতার গ্রেট ইম্পিরিয়াল হোটেলে অবস্থান করিতেছেন।

সম্পাদকের হুকুম পাইয়া পত্রদ্বারা একটা ইণ্টারভিউয়ের বন্দোবস্ত করিলাম এবং কুমার বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারির নির্দেশমতো একদা সন্ধ্যায় যতদূর সম্ভব ফিটফাট হইয়া বিনীতভাবে গ্রেট ইম্পিরিয়াল হোটেলে দর্শন দিলাম। হোটেলের তিনটি কামরা লইয়া কুমার বাহাদুর তখন সেখানে অবস্থান করিতেছেন; ইয়া ইয়া ফরসি, গড়গড়া, পাঁচ-সাতটা খিদমৎগার—একেবারে আমিরী ব্যাপার। বারান্দায় নামানো সোডার বোতলের সংখ্যা গণিয়া আরও কিছু আন্দাজ করিতে হইল। সেক্রেটারি ভূতনাথ বিশ্বাস বিনীতভাবে আমাকে লইয়া বসিবার ঘরে বসাইল এবং কুমার বাহাদুরের গোসলখানা গমনের বার্তা নিবেদন করিয়া অন্তর্ধান হইল। চারিদিকে সোফা আর সেটি—দামী কার্পেটের উপর একটা গোল টেবিল, তাহার উপর কাশ্মীরী জাজিম পাতা এবং তাহারও উপর অর্ধ-উন্মুক্ত এক সংখ্যা 'লণ্ডন লাইফে'র পাতায় একটি বৈদেশিকী নগ্ন নর্তকীমূর্তি। কাচের আলমারির দিকে দৃষ্টি না পড়িয়াও মনটা ভিজিয়া আসিয়াছিল। বীর কুমার বাহাদুরের কাছে যতদূর সম্ভব নিজেকে প্রেজেণ্টেব্‌ল্ করিবার জন্য ঘন ঘন দম লইয়া মাস্‌কিউলার হওয়ার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় "এই যে" বলিয়া স্বয়ং কুমার বাহাদুর দর্শন দিলেন। ঘরে দুইটা বাতি ইতিমধ্যেই জ্বলিতেছিল, কুমার বাহাদুরের পিছন পিছন ভৃত্য আসিয়া আরও দুইটা বাতি জ্বালিয়া দিল। কুমার বাহাদুর ইঙ্গিতে তামাক দিতে বলিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিলেন। পুরো ছয় ফুট বিরাট চেহারা, গায়ে ঢিলাহাতা ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবি, রঙ কালো এবং রক্তবর্ণ কোটর ছাপানো চক্ষু। আমি সম্ভ্রমে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া লম্বা হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বিনীত নমস্কার করিলাম। কুমার বাহাদুর নিজে একটা সোফায় বসিতে বসিতে বলিলেন, বসুন। বলিয়া 'লণ্ডন লাইফে'র খোলা পাতাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, সময় হাতে নিয়ে এসেছেন তো? একটু সময় লাগবে। হ্যাঁ, আপনি টিটি, না কিছু চলে? লেমনেড একটা? উপেন!

আমার সম্ভ্রম ভক্তিতে পরিণত হইল, হ্যাঁ শিকারী তো এই! বাজে ইয়াকি

নাই, একেবারে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া গুলি ছোঁড়ার মতো কথা বলেন, লাগিবার হইলে দড়াম করিয়া লাগে। আমি এতটুকু হইয়া গিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলাম।

উপেন আসিয়া আমাকে একটা লেমনেড এবং কুমার বাহাদুরকে অপর একটা পানীয় দিয়া সোনার কাজ করা চকচকে রূপার পানের ডিবা তাঁহার দিকে আগাইয়া ধরিল। আর একজন ভৃত্য ততক্ষণে একটা রূপার গড়গড়া হাতে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে উপস্থিত হইয়া সটকাটা তাঁহার হাতে ধরাইয়া দিল। কুমার বাহাদুর চোখের ইঙ্গিতে তাহাদের বিদায় দিয়া দেওয়াল-গাত্রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, দেখছেন তো?

নেহাত দৈনিকের রিপোর্টার আমি, কিছুই দেখি নাই। এক দেওয়ালে নিচের দিকে সারি সারি তরোয়াল আর কিরিচ এবং তাহারই উপরে বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, মহিষের মুখ—ভয়াবহ দৃশ্য। অপর দেওয়ালে কুমির হইতে আরম্ভ করিয়া সলোম শেয়ালের চামড়া, একটা ধনেশপাখির ঠোঁট। ইচ্ছা হইল কুমার বাহাদুরের পায়ের ধূলা লই। কিন্তু তৎপূর্বেই তিনি বলিলেন, রিভলবার, বন্দুক শোবার ঘরে সিন্দুকে আছে। বাইরে রাখা সেফ নয়, দিনকাল বড়ো খারাপ। যাক্ কোথা থেকে শুরু করব? সি, পি, বিক্রমখোল, ঝারসাগুদা, না হাফলং, লামডিং? হাতী না গণ্ডার?

আমি কি বলিব? গণ্ডার শিকারের ছবি পাওয়া যাবে তো? ইলাস্ট্রেটেড আর্টিক্‌ল হলে আজকাল—

কুমার বাহাদুর আমাব কথা শেষ হইতে দিলেন না। অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে সটকায় একটা লম্বা টান দিয়া পুনরায় উপেনকে ডাকিলেন, বলিলেন, সাত নম্বর অ্যালবামটা নিয়ে ভূতনাথকে আসতে বল্।

ভূতনাথ আসিলেই কুমার বাহাদুর অ্যাল্‌বামটা তাহার হাত হইতে স্বয়ং লইয়া আমার দিকে আগাইয়া দিলেন; ভূতনাথ সেক্রেটারি দরজার পর্দাটা ভালো করিয়া টানিয়া দিয়া বাহিরে যাইতেই কুমার বাহাদুর বলিলেন, বেছে নিন, ছবি বাছুন, তারপর শুরু করব।

পানীয় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল, উপেন পুনরায় গ্লাস ভর্তি করিয়া দিয়া গেল।

দেখিব কি? পাহাড়-পথে দল বাঁধিয়া হাতী চলিয়াছে। একটা গণ্ডার মাথা নিচু করিয়া শিং উঁচাইয়া আছে, তিনটা বাচ্চাসমেত এক জোড়া বাঘ। শ্রদ্ধা তখন

আমার কপালে ঘাম হইয়া দেখা দিয়াছে, হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, বাঁশবনে ডোম কানা, গোটা চারেক—

আমার কথা শেষ হইল না, বিস্মিত ভক্তকে বিস্মিততর করিয়া অকস্মাৎ বিপুলকায় কুমার বাহাদুর 'বাবা রে' বলিয়া একটা আর্তনাদ করিয়া সোফা হইতে লাফাইয়া একেবারে টেবিলের উপর উঠিলেন। নগ্নমূর্তিসহ 'লণ্ডন লাইফ'টা ছিটকাইয়া নিচে পড়িল। আমার হাতের অ্যাল্‌বামটাও সঙ্গে সঙ্গে পায়ের কাছে পড়িল। ভাগ্যিস শীতকাল, পাখা ছিল না। বিহার ভূমিকম্পেও কোনো মানুষ এমন চমকাইতে পারে না। পাগলের পাল্লায় পড়িলাম না তো?

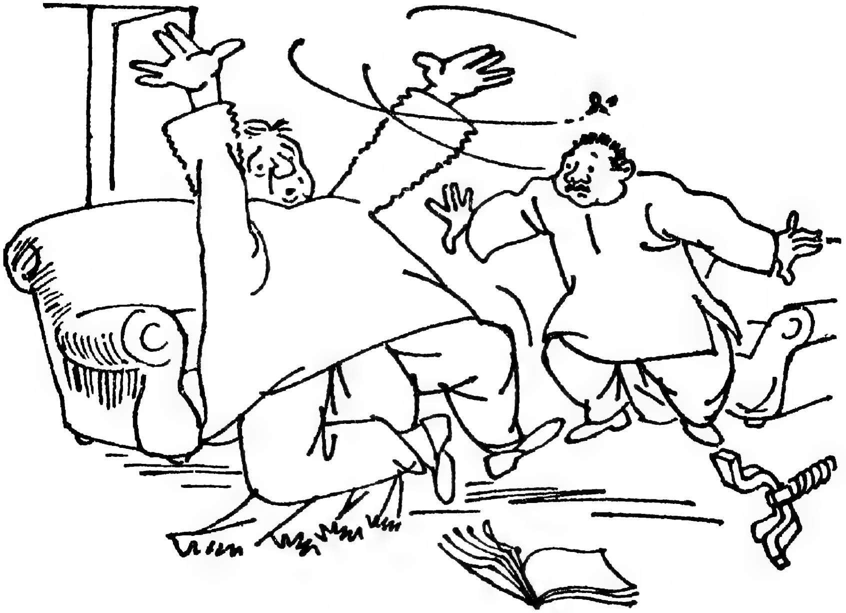

কিংবা অপঘাতে মৃত বাঘ বা গণ্ডারের ভূত? কিন্তু আমাকে ভাবিবার অবসর না দিয়া কুমার বাহাদুর ঘরের একটা কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওই, ওই—বসে বসে দেখছেন কি মশাই? দিন না ওটাকে তাড়িয়ে!

আমি আর তখন আমাতে নাই। একটা আরশোলা কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া দেওয়ালের গায়ে জুড়িয়া বসিয়াছে। কী যে করিব—স্থির করিতে না পারিয়া বোকার মতো দাঁড়াইয়া উঠিয়াছি। কুমার বাহাদুর কাতর কণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি! হার্টফেল করিয়ে মারবেন আমাকে?

মদ, না বীরত্ব—ভাবিতে ভাবিতে রুমাল দিয়া আরশোলাটাকে চাপিয়া ধরিতে

গেলাম। আরশোলা হইলেও তাহার এক জোড়া পাখা ছিল, সে উড়িতে শুরু করিল। কুমার বাহাদুরের নাকের উপর দিয়া, কানের পাশ দিয়া—অতবড়ো প্রলয়-নাচনের ভার লইয়া সেণ্টার অব গ্র্যাভিটি ঠিক রাখা কঠিন—টেবিলটি কুমার বাহাদুরের কাশ্মীরী জাজিম এবং এক জোড়া কাচের গ্লাস সমেত সশব্দে উল্টাইয়া পড়িতেই উপেন, রামদীন যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। আমি বেকুবের মতো ততক্ষণে আরশোলাটা রুমালের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কার্পেটে হোঁচট খাইয়া কুমার বাহাদুর হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছেন, তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিতে গিয়া টেবিলটা উল্টাইয়া ফেলিয়াছি। সকলে শশব্যস্তে কুমার বাহাদুরকে টানিয়া তুলিয়া সোফায় বসাইয়া দিতেই তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। উপেন গ্লাসের ভাঙা টুকরাগুলা কুড়াইতে লাগিল। কুমার বাহাদুর ইঙ্গিতে সকলকে বাহিরে যাইতে বলিয়া কৃতজ্ঞতা-গদগদ চিত্তে আমার হাতটা ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন, বাইরে ফেলে দিয়েছেন তো? বাঁ হাতে তখনও স-আরশোলা রুমালটা ছিল। দিচ্ছি বলিয়া গাড়িবারান্দায় বাহির হইয়া রুমালটা ঝাড়িয়া বেচারী আরশোলাকে মুক্তি দিলাম।

রিপোর্ট আর লিখিতে হইল না এবং অদূর ভবিষ্যতে আমি সংবাদপত্রের রিপোর্টারও আর থাকিলাম না। জগদ্বিখ্যাত শিকারী কুমার ধূর্জটিনারায়ণের যে সচিত্র শিকারকাহিনীগুলি মাসিকের পৃষ্ঠায় মাসে মাসে পড়িয়া আপনারা যুগপৎ পুলকিত, বিস্মিত, ভীত, চকিত, আনন্দিত ও ঘর্মাপ্লুত হইয়া থাকেন, বর্তমানে এই অধমই সেগুলির লেখক এবং আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি ছবি ধরা পড়িবার ভয় থাকিলেও লেখাগুলি অরিজিনাল। নিতান্তই আমার স্বকপোল-কল্পিত। শিশু সাহিত্যে এ বিষয়ে আমার বিশিষ্ট দান এবং 'অবদানে'র কথা আশা করি আপনারা ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হন নাই। খাইতে পাইতাম না। এখন খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া আছি, আমার নালিশ করিবার কিছুই নাই। তবে বেচারা ভূতনাথের জন্য দুঃখ হয়, সে আমার উপরে ঘোরতর চটিয়া আছে; কারণ তাহার বিশ্বাস, আমিই ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারিশিপ ঘুচাইয়া তাহাকে ইসলামপুর মহলের নায়েব করিয়া পাঠাইয়াছি। আসলে যে সামান্য একটি আরশোলা সমস্ত ব্যাপারটির মূলে, বিখ্যাত শিকারী ধূর্জটি-নারায়ণের ভূতপূর্ব প্রাইভেট সেক্রেটারি ভূতনাথ তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই।

মনোজ বসু ( ১৯০১— )

# দিকপাল সরকার

ছোট লাইনের অতি ছোট স্টেশন। প্ল্যাটফর্ম নেই। লোকের পায়ে পায়ে হাত কয়েক জায়গায় ঘাসবন মরে সাফ হয়েছে—যে দু-চারটে মানুষ ওঠা-নামা করে ঐখানেই কুলিয়ে যায় তাদের। সন্ধ্যা হতে না হতে ঝিঁঝির আওয়াজ ওঠে। শেয়াল উঁকি-ঝুঁকি দেয় টিকিট-ঘরের পিছনে কশাড় জঙ্গল থেকে। ব্যাঙ ডাকে বর্ষার সময়টা চারিদিককার খানাখন্দে।

বড়োবাবু ও ছোটবাবু—সাকুল্যে দুজন কর্মচারী স্টেশনের। আর আছে সদাসুখ পয়েন্টস্‌ম্যান। স্টেশনের গেটের সামনেটায় লাইটপোস্ট—সদাসুখ সেখানে কেরোসিন-আলো জ্বেলে দিয়ে ওজন-কলের উপর বসে বসে ঝিমোয়। বড়োবাবু ও ছোটবাবু টেবিলের খাতাপত্র একপাশে ঠেলে দিয়ে দাবার ছক-ঘুঁটি সাজিয়ে বসেন। বাসায় গিয়ে উঠতে পারেন না রাত্রি সাড়ে এগারোটায় একটা গাড়ি থাকার জন্য।

আজও যথারীতি তাঁরা খেলছেন। আর দুজন দু-দিকে বসে জুত দিচ্ছে। রাত্রিবেলা স্টেশনে দু-দুটি অতিরিক্ত মানুষ—এটা নিতান্ত অভাবনীয়। ফড়িংমারি গ্রাম থেকে এঁরা এসেছেন—আলাপ-পরিচয় হয়েছে—একজনের নাম নবকান্ত, আর একজন রাখাল। কাল সকালে এঁদের আপার-প্রাইমারি ইস্কুলে স্পোর্টস—তদুপলক্ষে কলকাতা থেকে দিকপাল সরকার আসছেন—তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছেন। দিকপাল সরকারের নাম শোনেননি—কী সর্বনাশ! কোন্ জগতে থাকেন—অ্যাঁ? রবি ঠাকুরের শূন্য সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী—এই কথা বিজ্ঞাপনে লিখে থাকে। বিজ্ঞাপনের একবর্ণ মিথ্যা নয়।

রাত্রি অনেক হল। দুটো বাজি শেষ হয়ে তৃতীয়টা চলছে এখন। বড্ড জমেছে—এমনি সময় সদাসুখ ঘণ্টা দিল। অর্থাৎ গাড়ির সাড়া পাওয়া গেছে। ছোটবাবু মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন দরজা দিয়ে। না—টিকিটের খদ্দের নেই, পাঁচ-দশ মিনিট চালানো যাবে এখনো।

গাড়ি নিতান্তই যখন হুড়মুড় করে এসে পড়লো, তাঁরা উঠলেন। একবার তবু

মুখ ফিরিয়ে সত্নঃখে ছোটবাবু বললেন, ঘোড়ার কিস্তি দিতাম—বেয়াক্কেলে গাড়ি, মোক্ষম সময়টায় এসে পড়লো !

বড়োবাবু চটে গিয়ে বললেন, ঘোড়ায় মাত হয়ে যেতাম নাকি ? নৌকো কোন্ জায়গায় এসে চেপে বসে আছে, খেয়াল রাখো ? হারামজাদা গাড়ি এক-একদিন রাত কাবার করে আসে, আজকে একেবারে ঘড়ি ধরে হাজির !

এসেছে তাই তো বেঁচে গেলেন—

নবকান্ত ও রাখাল মাঝে পড়ে কলহ থামিয়ে দিল। রাখাল বলে, কাজ সেরে আসুন গে যান। এসে আবার বসবেন। ততক্ষণ আমরা চালাচ্ছি। এমন আসর জুড়োতে দেওয়া হবে না।

কিন্তু আপনাদেরও তো হাঙ্গামা আছে—

রাখাল বলে, তা আছে। আপনারা সঙ্গে করে আনবেন হাঙ্গামাটিকে। বলবেন, বেলা দুপুর থেকে আমরা হা-পিত্যেশ বসে রয়েছি। আপনারা আছেন—গাড়ির ধারে না-ই বা গিয়ে দাঁড়ালাম !

নবকান্তটা এত ভাবে এক একটা চাল দেবার আগে ! গালে হাত দিয়ে ভাবছে, ঘরবাড়ি নিলামে উঠলেও মানুষে এত ভাবে না। হঠাৎ দেখা গেল, বড়োবাবু ও ছোটবাবু ফিরে এসেছেন ভদ্রলোককে নিয়ে।

চললাম। আপনারা চালান এবার সমস্ত রাত। নমস্কার !

ঘাটে পানসি। পানসিতে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত। এখনই ছাড়তে হবে, সময় নেই। তাই পৌঁছতে রোদ উঠে যাবে হয়তো।

কিন্তু পৌঁছলো—তখনও আকাশে পোহাতি-তারা। আবছা দেখা গেল, ছেলের দল বাঁধ ধরে পিলপিল করে ঘাটের দিকে আসছে। সারা রাত্রি ধরে জেগে বসে আছে নাকি খাল-ধারে ? বাচ্চা বাচ্চা মেয়েও কতগুলি শাঁখ বাজাচ্ছে, জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

কিন্তু রাখালের দৃষ্টি সেদিকে নয়, সে ও-পারে তাকিয়ে।

বীরগড়ের ওরা কই ?

নবকান্ত বলে, পুরো সকাল হয়নি তো এখনো ! ঘুমুচ্ছে।

চোখে ঘুম থাকবে কি, চক্ষু যে চড়কগাছ ! আছে ঝোপে-ঝাড়ে কোথাও লুকিয়ে, দেখতে পাচ্ছিনে। ওরা মিটিং করছে আর কাউকে না পেয়ে যশোরের নাদু মল্লিককে সভাপতি করে। হ্যাক—থুঃ ! কালামুখ কোন্

লজ্জায় দেখাবে!

আগন্তুক ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছিলেন। কলরব তুমুল হয়ে উঠলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন।

কি ব্যাপার মশাই?

নবকান্ত সগর্বে বলে, আপনার পায়ের ধুলো পড়লো—ফড়িংমারির কম ভাগ্য! গাঁয়ের সকলে একটু আনন্দ করছে।

রাখাল বলে, এ আর কি দেখছেন! মিটিং-এর সময় জয়ঢাক-জগঝম্প বাজবে। বীরগড়ের কানে তালা ধরিয়ে দেবো। বেটারা ক-দিন ধরে তড়পে বেড়াচ্ছিল—এই ধাপধাড়া জায়গায় দিকপাল সরকার ইয়ে করতে আসবেন! আসেন কি না দেখ্ এইবার নয়ন মেলে।

ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলেন, কোথায় এসেছি বলুন তো? আমি যাব আড়পাংশায়—

নবকান্ত সংশয়িত কণ্ঠে বলে, আপনার নাম—

রাখাল শুনতে দেয় না জবাবটা। তাড়া দিয়ে ওঠে, দিকপাল সরকার। দেশবিশ্রুত নাম। পাঁচ বছুরে ছেলেটা অবধি জানে, তুমি জানো না?

ভদ্রলোক বললেন, না মশাই। ভুল হয়েছে আপনাদের। আমি শ্রীরসময় দাশ—

রাখাল বলে, কক্ষনো না। সভার কাজ সমাধা করে ভালোমন্দ খেয়েদেয়ে স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়ি চাপুন—তারপর আপনি যা ইচ্ছে হোন গে, কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এসে যখন পড়েছেন, আপনিই কবি দিকপাল। নয়তো আমাদের গায়ে থুতু দেবে বীরগড়ের ওরা।

নবকান্ত বলে, ভোলাটা কি করলো বলো তো? দু-দুখানা পোস্টকার্ড ছাড়লো যে দিকপাল সরকার যাচ্ছেন—

রাখাল বলে, ঐ রকম। চিরকাল দেখে আসছি। তোমরাই ভোলা-ভোলা করে মাথায় তুলেছো। ভাগ্যি ভালো, তবু একজনকে পাওয়া গেছে। না পেলে কী কাণ্ড হত, আন্দাজ করো দিকি—

রসময় বললেন, আমি আড়পাংশায় চলে যাব। ভাইএর বিয়ে, মেয়ে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছি সেখানে।

রাখাল বলে, আমাদের দায় মিটিয়ে তার পরে যাবেন। মেয়ে উড়ে পালাবে না, মেয়ের পাখনা গজায়নি।

রসময় কাতর হয়ে বলেন, আচ্ছা বিপদে পড়লাম। আটটা সাতাশ থেকে নটা পাঁচের মধ্যে আশীর্বাদ শেষ করতে হবে। আমিও যেমন—জিজ্ঞাসাবাদ করলাম না, কিছু না—আপনাদের তটস্থ ভাব দেখে মনে করলাম, মেয়েওয়ালারা আগ বাড়িয়ে নিতে এসেছেন। তা কি করে বুঝবো যে কন্যাদায়ের মতো আরও সব দায় আছে!

নৌকার মাঝিকে ডেকে বললেন, আড়াই টাকা—যাক গে, পুরোপুরি তিনই দেবো, আমায় বাপু আটটার মধ্যে আড়পাংশায় পৌছে দিতে হবে।

রাখাল বলে, কে পৌছে দেবে কাকে? ইয়াকি? ঘরে পুরে তালা আটকে রাখলে সেটাই কি বড়ো শোভন হবে মশাই?

রসময় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, কোনো পুরুষে আমি সভা করিনি। বক্তৃতা-টক্তৃতা আসে না।

নবকান্ত আশ্বাস দেয়, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বক্তৃতা এখানকার এরাই কত করবে! হপ্তা দুই ধরে এক নাগাড় সব মুখস্ত করছে। দিকপাল সরকার হয়ে আপনি গলায় ফুলের মালা পরে চুপচাপ বসে থাকবেন শুধু। কিছু করতে হবে না। বক্তৃতা হতে হতে সভাপতির সময় যখন আসবে, দেখতে পাবেন আধ-ডজনের বেশি লোক নেই।

ছেলেরা প্রাণপণে খেলার কসরত দেখালো, বুড়োরা তারপর বক্তৃতার কসরত দেখাচ্ছেন। এমনি সময় এক খণ্ড-যুদ্ধ।

বীরগড়ের জনকয়েক একপ্রান্তে বসেছিল। এক ভদ্রলোক সহসা বলে উঠলেন, দিকপাল সরকার নয়, এ মানুষ জাল।

ভদ্রলোককে বীরগডের একজন প্রশ্ন করে, চেনেন আপনি দিকপালকে?

নিশ্চয় চিনি। আমি প্রমাণ করে দেবো—

কিন্তু সে ফুরসত হল না। রাখাল বিপুল বিক্রমে সভার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে দিল সে ভদ্রলোকের গালে; মাথা ঘুরে তিনি পড়ে গেলেন। বীরগড়ের লোকেরা হৈ-হৈ করে ঘিরে দাঁড়ালো। রাখাল ও ফড়িংমারির ছেলেরা তারপর এলোপাথাড়ি কিল-ঘুঁষি চালাচ্ছে। লাঠিও আছে কারো কারো হাতে। মিনিট চার-পাঁচ চললো এই রকম। তারপর দেখা গেল, ঝপাঝপ খালে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বীরগড়ের লোক।

গণ্ডগোল থামলো। চারিদিক প্রকম্পিত বক্তৃতার হুংকার চললো আবার একটানা।

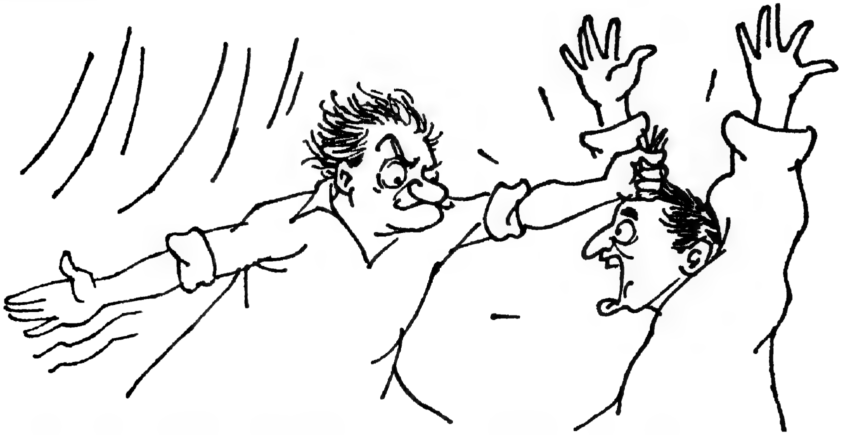

রণ জয় করে রাখাল নবকান্তকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করে, জানলো কি করে হে? কে লোকটা—বীরগড়ের তো নয়!

কেমন দেখতে?

বেঁটে-খাটো-কালো রং। মাথা ফুটবলের মতো গোলাকার।

ঐ তো নাদু মল্লিক। বীরগড়ের সভার জন্য এসেছে। নানান জায়গায় ঘোরে—কোনোখানে দেখে থাকবে দিকপালকে।

স্টেশনে ফিরতি গাড়ি এল। রাখাল ও নবকান্ত রসময়কে সঙ্গে এনেছে। গাড়িতে তুলে দিয়ে তবে ছুটি। গাড়ি একেবারে বোঝাই হয়ে এসেছে, মোটে জায়গা নেই।

মুখের চারিদিকে ব্যাণ্ডেজ-আঁটা একটা লোককে দেখিয়ে রাখাল বলে, ঐ যে নাদু।···খোল দরজা, এই গাড়িতেই তুলে দিতে হবে।

জায়গা কোথা?

না থাকে নাদু বেটাই দাঁড়িয়ে যাক। আমাদের সভাপতি শুয়ে বসে গা এলিয়ে মৌজ করে যাবেন।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মানুষটি এদের দেখে আগেভাগেই উঠে দাঁড়ালেন।

গুঁতোর নাম বাবাজী। পথে এসো বাপধন!

রসময়কে ভালভাবে বসিয়ে দিয়ে রাখালরা স্টেশনের আপিস ঘরে ঢুকলো নিশ্চিন্তে এক হাত দাবা খেলবে।

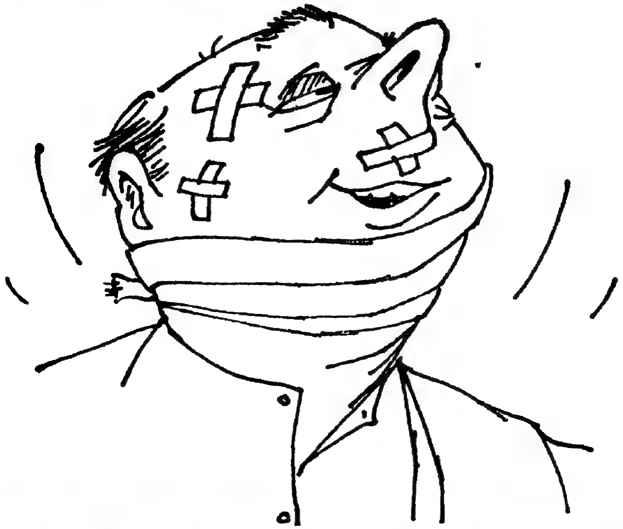

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মানুষটি আলাপ করছেন, সভা তো জবর হল মশাই। খাওয়ালো কেমন ?

আরো ভালো। কিন্তু হলে কি হবে। চার-পাঁচ ঘণ্টা একনাগাড় চেয়ারে বসে থাকা—খাওয়ার শোধ ছারপোকা তুলে নিয়েছে। পিঠের চামড়া যেন খুবলে খুবলে খেয়েছে।

রসময় জামা উঁচু করে দেখালেন।

ভদ্রলোক বললেন, পেটে খেলে পিঠে সয়। আমার অদৃষ্ট দেখলেন তো মশাই ? গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েই যত দুর্ভোগ। জংশনে গিয়ে ঘুম ভাঙলো। সেখান থেকে ছয় মাইল ছুটোছুটি করে সভায় গেলাম। দেখলেন তো সেখানটায় অভ্যর্থনার বহর ?

আপনার নাম ?

দিকপাল সরকার।

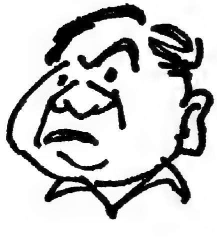

প্রমথনাথ বিশী ( ১৯০২—)

# চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোশ

একদিন বিকালবেলা এক সরাইখানায় চারজন পথিক আসিয়া পৌছিল। সরাইখানার মালিক তাহাদের যথাসম্ভব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। পথিকরা অনেকদূর হইতে আসিতেছে। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, গত রাত্রি তাহাদের সকলেরই বৃক্ষতলে কাটিয়াছে, আজ সরাইখানায় বিশ্রাম ও আহার করিতে পারিবে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহারা একটি কক্ষে বসিয়া আহার করিয়া লইল এবং তারপরে পরস্পরের পরিচয় লইতে লাগিল। তাহাদের কেহ কাহাকেও চিনিত না—এই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

প্রথম পথিক বলিল যে, সে একজন শিক্ষক। এখন বিদ্যালয়ের ছুটি, তাই সে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিল। হিমালয়ের পাদদেশে পশুপতিনাথের পীঠস্থান। কয়েকজন সঙ্গীর সাথে সে সেখানে গিয়াছিল। দেবদর্শন সারিয়া ফিরিবার পথে তাহারা পথ হারাইয়া এক বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। রাত্রে তাহারা এক গাছের তলায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ভোর বেলা যখন সে জাগিল, দেখিল যে তাহার সঙ্গীরা নাই। তৎপরিবর্তে তাহাদের কঙ্কাল কয়খানা পড়িয়া আছে। বোধ হয় কোনো শ্বাপদে খাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে একা বাঁচিল কিরূপে ? তখন তাহার মনে পড়িল যে সে শিক্ষক, সে যে জাতিগঠনের রাজমিস্ত্রি—শ্বাপদ বোধ হয় সেই খাতিরেই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। যদি এ শ্বাপদটা তাহার ভূতপূর্ব ছাত্র হইত, তবে কি আর তাহার রক্ষা ছিল ? কিংবা এমনও হইতে পারে যে, হাজার হাজার ছাত্র শাসাইয়া এমন শক্তি সে অর্জন করিয়াছে—সামান্য শ্বাপদে তাহার কি করিবে ? যাই হোক, আর যে-কারণেই হোক, সে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। সারাদিন চলিবার পরে সে এই সরাইখানায় আসিয়া পৌছিয়াছে। সংক্ষেপে ইহাই তাহার পরিচয়।

তখন দ্বিতীয় পথিক আরম্ভ করিল। সে বলিল যে, সে একজন সাহিত্যিক। গোরক্ষপুরের সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় সেখানে সে গিয়াছিল। একটি বৃহৎ অট্টালিকায় যখন মহতী সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে এমন সময়ে এক কালান্তক ভূমিকম্প শুরু হইল। ফলে

অট্টালিকার ছাদখানি পড়িয়া সকলেই মারা গেল—কেবল সে অক্ষত দেহে রক্ষা পাইয়াছে।

তাহার শ্রোতারা বিস্ময়ে বলিল,—তাহা কিরূপে সম্ভব?

সাহিত্যিক বলিল—আপনারা জানেন না, আর জানিবেনই বা কিরূপে, আপনারা তো সাহিত্যিক নহেন, সাহিত্যিকদের মাথা বড়ো শক্ত। হেন ছাদ নাই খসিয়া পড়িয়া যাহা তাহাদের মাথা ফাটাইতে সমর্থ, হেন ভূমিকম্প নাই যাহাতে তাহারা টলে, হেন অগ্নিকাণ্ড নাই—যাহাতে তাহারা পোড়ে।

শিক্ষক বলিল—তবে অন্য সবাই মরিল কেন?

সাহিত্যিক বলিল—সে মহতী সাহিত্যসভায় আমিই ছিলাম একমাত্র সাহিত্যিক। ইহা শুনিয়া আপনারা বিস্মিত হইতেছেন—কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিয়া রাখুন সাহিত্যসভায় পারৎপক্ষে সাহিত্যিকেরা কখনো যায় না—এক সভাপতি ব্যতীত। তাই তাহারা পিষিয়া মারা গেল—আর আমি যে শুধু বাঁচিয়া রহিলাম তা-ই নয়, আমার মাথায় লাগিয়া একখানা পাথরের টুকরা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া গেল। এই সেই ধূলি।

এই বলিয়া সে পকেট হইতে এক কৌটা ধূলি বাহির করিয়া দেখাইল। তারপরে বলিল—সাহিত্যিকদের বেলায় শিরোধূলি কথাটাই অধিকতর প্রযোজ্য। তারপরে গোরক্ষপুর হইতে বাহির হইয়া পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। ইহাই আমার পরিচয়।

তৃতীয় পথিক বলিল—মহাশয়, আমি একজন চিকিৎসক। হজরতপুরে মহামারী দেখা দিয়াছে শুনিয়া সেখানে আমি গিয়াছিলাম। সেখানে কোনো চিকিৎসক ছিল না। আমি সেখানে গিয়া নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিবামাত্র হজরতপুরের সমস্ত অধিবাসী নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহারা যাইবার সময়ে বলিয়া গেল যে মহামারীর হাতে যদি বা বাঁচি—মহাবৈদ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবে কে?

নগরের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক অতি কুৎসিত ও বীভৎস বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া বলিলাম—তুমি পালাও নাই কেন?

সে বলিল—আমার ভয়েই তো সকলে পালাইতেছে, আমি পালাইতে যাইব কেন? আমার নাম মহামারী। আমি তাহাকে বলিলাম যে, তোমার গর্ব বৃথা, সকলে আমার ভয়েই পালাইয়াছে, আমার নাম মহাবৈদ্য। ইহা শুনিবামাত্র সে প্রাণভয়ে পলায়ন শুরু করিল। কিছুকাল পরে দেখি

হুজরতপুরের নাগরিকগণ মহামারীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলিল—মহামারী আমাদের শত্রু নয়, মিত্র, যেহেতু তাহার কৃপাতেই আমরা অক্ষয়স্বর্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকি। তাহাদের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে আমি দাঁড়াইতে না পারিয়া পরম ভাগবত ইংরাজ সৈন্যের মতো, দৃঢ় পরিকল্পনানুযায়ী পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বন্ধুগণ, ইহাই আমার ইতিহাস।

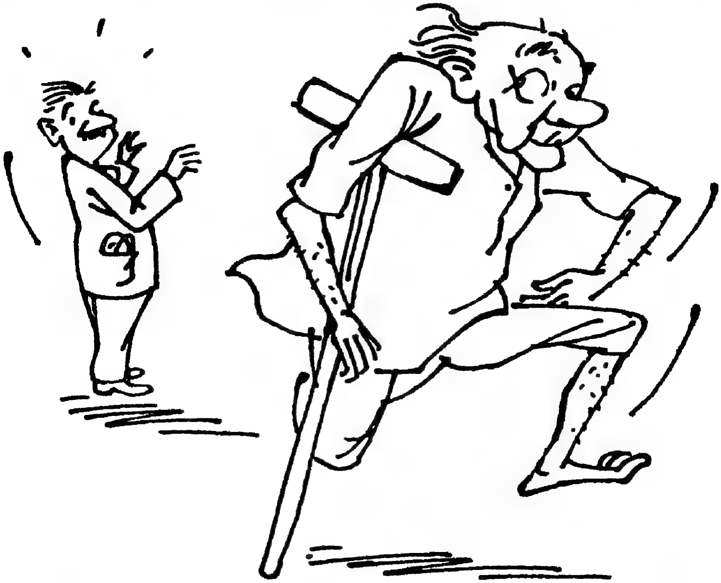

তখন চতুর্থ পথিকের পরিচয় দিবার পালা।

সে আরম্ভ করিল—মহাশয়, আমি গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম। সারাদিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় যখন স্নান করিতে নামিব এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম কে যেন বলিতেছে—বৎস, তুমি যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ—এখন স্নান করো, করিবামাত্র তোমার মুক্তি হইয়া যাইবে, আর তোমাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না।

সে বলিল—মহাশয়, মুক্তি কাম্য ইহা জানিতাম, কিন্তু কখনো সদ্য মুক্তির সম্ভাবনা ঘটে নাই। আমি বিষম ভীত হইয়া পড়িলাম এবং গঙ্গাস্নান না করিয়াই পলায়ন করিলাম। রাত্রে পথ ভুলিয়া গেলাম, কোথা হইতে যে কোথায় গেলাম জানি না—তারপরে ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়া পৌঁচিয়াছি।

তাহার কাহিনী শুনিয়া অপর তিন পথিক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার পরিচয় কি ?

ইহা শুনিয়া চতুর্থ পথিক বলিল—আমি একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা—যাহার বাংলা 'সিনেমা স্টার'।

তখন সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল—তাহার অভিজ্ঞতাই সব চেয়ে বিস্ময়কর—তবে সিনেমা স্টারের পক্ষে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

এইভাবে পরস্পরের পরিচয় সাধনের পালা উদ্‌যাপিত হইলে চারজনে মিলিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিল, চারজনেই আশা করিল যে, রাতটা আমোদ আহ্লাদে ও আরামে কাটাইতে পারিবে। এমন সময়ে সরাইখানার মালিক প্রবেশ করিল। সে অতিথিদিগকে বিশেষ আপ্যায়ন করিয়া সেখানে যতদিন খুশি কাটাইতে অনুরোধ করিল, বলিল—তাহাদের যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে সে দৃষ্টি রাখিবে। তারপরে কি যেন মনে পড়াতে সে একটু হাসিয়া বলিল—এই সরাইখানার সমস্ত ঘরই অধিকৃত—কেবল একটিমাত্র ঘর খালি আছে।

পথিকরা বলিল—একটি ঘরেই আমাদের চলিবে।

সরাইখানার মালিক বলিল—ঘরটি নিচের তলাতে, কাজেই একটু স্যাঁতসেঁতে—

পথিকরা বলিল—তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? ঘরে তক্তপোশ আছে তো ?

মালিক বলিল—তক্তপোশ অবশ্যই আছে—কিন্তু একখানা মাত্র, কাজেই আপনাদের তিনজনকে মেঝেতে শুইতে হইবে, সেই জন্যই স্যাঁতসেঁতে মেঝের উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া আর কোনো অসুবিধা নাই। আপনাদের মধ্যে কে তক্তপোশে শুইবেন তাহা আপনারা স্থির করিয়া ফেলুন, আমি আর কি বলিব ? এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

তখন পথিক চারজন বিব্রত হইয়া পড়িল। কে বা তক্তপোশে শুইবে আর কারা বা মেঝেতে শুইবে! তাছাড়া সেই ঘরটায় গিয়া দেখিল সরাইখানার মালিকের কথাই সত্য। ঘরের মেঝে বিষম ভেজা, তার উপরে আবার এখানে সেখানে গর্ত। ইতস্ততঃ আরশুলা, ইঁদুর, ছুঁচো নির্ভয়ে পরিভ্রমণশীল, এক কোণে আবার একটা সাপের খোলসও পড়িয়া আছে। আর এক দিকে একজনের মাপের একখানা তক্তপোশ—সেটা আবার অত্যন্ত জীর্ণ।

চারজনে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া ছুঁচোগুলা

চিক্ চিক্ শব্দে পলায়ন করিল —যেন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কে তক্তপোশে শুইবে? কাহার শরীর খারাপ? চারজনেরই শরীরের অবস্থা সমান।

তখন শিক্ষক বলিয়া উঠিল—এক কাজ করা যাক। আমাদের মধ্যে যাহার জীবন সমাজের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী—সে-ই তক্তপোশে শয়ন করিবে। অপর তিনজনকে মেঝেতে শুইতে হইবে।

ইহা শুনিয়া তিনজনে যুগপৎ বলিয়া উঠিল—ইহা অত্যন্ত সমীচীন—আর ইহা শিক্ষকের যোগ্য কথা বটে। কিন্তু কাহার জীবন সমাজের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী তাহা কেমন করিয়া বোঝা যাইবে? পরীক্ষার উপায় কি?

তখন সাহিত্যিক বলিল —আমি একটা উপায় নির্দেশ করিতে পারি। আসিবার সময়ে দেখিয়া আসিয়াছি কাছেই একটা গ্রাম আছে। সেখানে আমাদের কেহ চেনে না। আমরা চারজন চার পথে সেই গ্রামে প্রবেশ করিব। নিজেদের অত্যন্ত বিপন্ন বলিয়া পরিচয় দিব—ইহার ফলে গ্রামের লোকদের কাছে যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবে—বুঝিতে পারা যাইবে তাহার জীবনের মূল্যই সর্বাধিক। তক্তপোশে শয়ন করিবার অধিকার তাহারই।

সাহিত্যিকের উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া তিনজনে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

তখন চিকিৎসক বলিল—তবে আর বিলম্ব করিয়া কাজ কি? এখনো অনেকটা বেলা আছে—এখনি বাহির হইয়া পড়া যাক, রাত্রি প্রথম প্রহরের মধ্যেই ফিরিতে হইবে।

সিনেমা স্টার বলিল—আশা করি, আমরা সকলেই নিজেদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ফিরিয়া আসিয়া সত্য কথা বলিব।

ইহা শুনিয়া শিক্ষক বলিয়া উঠিল—হায় হায় যদি মিথ্যা কথাই বলিতে পারিব তবে আজ কি আমার এমন দুর্দশা হইত!

তখন সকলে পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামের দিকে বিভিন্ন পথে প্রস্থান করিল।

## দুই

রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই চার বন্ধু ফিরিয়া আসিল। সকলে একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া নিজের নিজের পরিভ্রমণ কাহিনী বলিতে শুরু করিল।

প্রথমে শিক্ষক বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল—আমি উত্তর দিকের পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। কিছুদূর গিয়া একটি সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ি দেখিলাম —ভাবিলাম এখানেই আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। বাড়ির দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র সেই দয়ালু গৃহস্থ আমাকে বসিবার জন্য একটি মোড়া আগাইয়া দিল। আমি তাহাকে নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলাম। সদাশয় গৃহস্থ আমাকে আপ্যায়িত করিয়া আমার পরিচয় শুধাইল। আমি বলিলাম যে, আমি একজন বিদেশী শিক্ষক—পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।

ইহা শুনিবামাত্র গৃহস্থ চাকরকে ডাকিয়া বলিল—ওরে রামা, মোড়াটা ঘরে তুলিয়া রাখ, বাহিরে থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি পরিত্যক্ত মোড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বলিলাম—আজ আপনার বাড়িতে রাত্রি কাটাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ইহা শুনিয়া গৃহস্থ বলিল -তোমাকে যে আশ্রয় দিব তাহার স্থানাভাব। আমি বলিলাম যে, অন্য জায়গা যদি না থাকে, তবে অন্ততঃ আপনার গোয়াল ঘরে নিশ্চয় স্থান হইবে। ইহা শুনিয়া গৃহস্থ বলিল—গোয়াল ঘরেই বা স্থান কোথায়? দশ-বারোটা গোরু আছে। কোনোটাকে বাহিরে রাখিতে সাহস হয় না -রাত্রে বড়ো বাঘের ভয়। আজকাল গোরুর যা দাম জানো তো?

আমি কহিলাম—গোরুর চেয়ে শিক্ষকের জীবনের মূল্য কম?

সে বলিল—কি যে বলো! একটা যেমন তেমন গোরুও আজকাল পাঁচশো টাকার কমে মেলে না! আর দশ টাকা হইলেই একটা শিক্ষক মেলে। এখন তুমিই বিচার করিয়া দেখো।

আমি বলিলাম, কিন্তু আমরা যে জাতি গঠন করি।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, তার মানে তোমরা গোরু চরাও। কিন্তু রাখালের চেয়ে গোরুর মূল্য অনেক বেশি।

আমি বলিলাম—আপনার ছেলে নিশ্চয়ই শিক্ষকের কাছে পড়ে।

সে বলিল—পড়িত, এখন পড়ে না। একসময়ে তাহার জন্য এক শিক্ষক রাখিয়াছিলাম। সে এখন আমার গোরুর রাখালি করে—কাবণ সে দেখিয়াছে যে, শিক্ষকের চেয়ে রাখালের বেতন ও সম্মান অনেক বেশি। তবে তুমি যদি রাখালি করিতে চাও, আমি রাখিতে পারি - আমার আর একজন রাখালের আবশ্যক। আর তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, গোরুই যদি চরাইবে তবে এমন গোরু চরাও যাহারা দুধ দেয়। দুধ দেয় না এমন মানুষ গোরু চরাইয়া

কি লাভ ? যাই হোক, তোমার ভালোমন্দ তুমি বুঝিবে—তবে বাপু এখানে তোমার জায়গা হইবে না। ইহা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে শিক্ষকের জীবনের কি মূল্য। সেখান হইতে সোজা সরাইখানায় ফিরিয়া আসিলাম। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

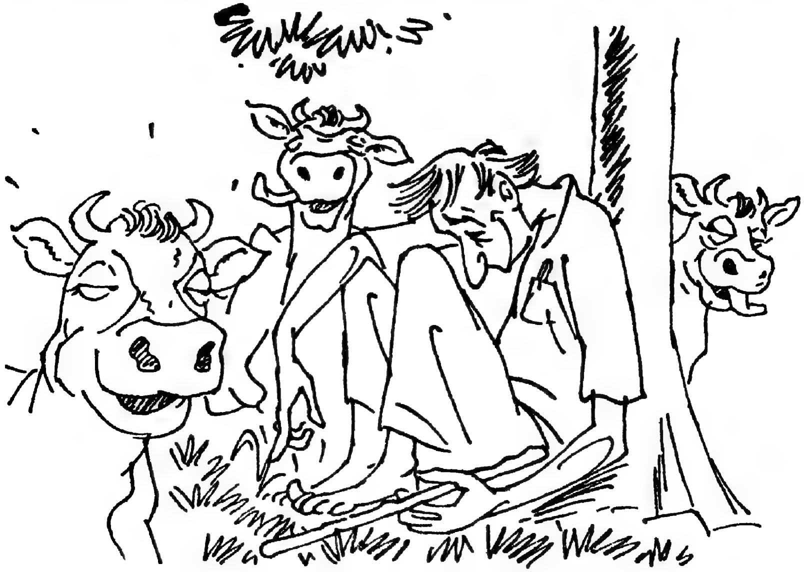

তখন চিকিৎসক তাহার কাহিনী আরম্ভ করিল। সে বলিল—দক্ষিণদিকের পথ দিয়া আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। অনুমানে বুঝিলাম বাড়িটি কোনো ধনীর—কিন্তু বাড়ির মধ্যে ও আশেপাশে লোকজনের উদ্বিগ্ন চলাচল দেখিয়া কেমন যেন সন্দেহ উপস্থিত হইল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি বাহিরে আসিতেছিল, তাহাকে শুধাইলাম—মশাই, ব্যাপার কি ? এ বাড়িতে আজ কিসের উদ্বেগ ?

সে বলিল—আপনি নিশ্চয়ই বিদেশী, নতুবা নিশ্চয়ই জানিতেন। তবে শুনুন, এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল—এই বাড়ি গ্রামের জমিদারের। তাহার একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায়—এখন শেষ মুহূর্ত সমাগত—যাহাকে সাধারণ ভাষায় বলা হইয়া থাকে যমে মানুষে টানাটানি—তাহাই চলিতেছে। বোধ করি যমেরই জয় হইবে।

আমি বলিলাম—এরকম ক্ষেত্রে যমেরই প্রায় জয় হইয়া থাকে—তার কারণ চিকিৎসক আসিয়া যোগ দিতেই যমের টান প্রবলতর হইয়া ওঠে ; ইহার

প্রমাণ দেখিতে পাইবেন যে চিকিৎসক আসিয়া না পৌঁছানো পর্যন্ত রোগী প্রায়ই মরে না। কিন্তু তারপরেই কঠিন।

সে লোকটি বিস্মিত হইয়া কহিল—এ তথ্য আপনি জানিলেন কি করিয়া?

আমি সগর্বে বলিলাম—আমি যে একজন চিকিৎসক।

তখন সে বলিল—আপনার ভাগ্য ভালো, এ গ্রামের চিকিৎসকেরা কেহই রোগীকে নিরাময় করিতে পারে নাই—আপনি গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখুন। সফল হইলে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিবেন।

আমি ভাবিলাম, সত্যই আমার ভাগ্য ভালো। একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। সফল হইলে আর সরাইখানার ভাঙা তক্তপোশে রাত্রি না কাটাইয়া জমিদার বাড়িতেই আদরে রাত্রি যাপন করিতে পারিব।

তখন আমি ভিতরে গিয়া নিজেকে চিকিৎসক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়া রুগী দেখিতে চাহিলাম। আমাকে চিকিৎসক জানিতে পারিয়া জমিদারের নায়েব সসম্মানে বসিতে দিল। সম্যক পরিচয় পাইয়া বলিল—হাঁ, রুগীর অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। তবে আপনি যদি তাহাকে আরোগ্য করিতে পারেন তবে দশ হাজার মুদ্রা ও শরিকপুর পরগনা পাইবেন। আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। তখন নায়েবের আদেশে একজন ভৃত্য আমাকে ভিতর মহলে লইয়া চলিল। পথে অনেকগুলি ছোটবড়ো কক্ষ পার হইয়া যাইতে হয়—একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে পাশাপাশি তিন-চারিটি লোক কাপড় মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে দেখিতে পাইলাম। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা এমন অসময়ে ঘুমাইতেছে কেন?

চাকরটি বলিল—অসময়ে তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহাদের এ ঘুম আর ভাঙিবে না।

সে কি? ইহারা কে?

ইহারা মৃত এবং মৃত চিকিৎসক।

মরিল কেমন করিয়া?

চিকিৎসা করিতে গিয়া।

চিকিৎসায় তো রোগী মরে।

কখনো কখনো চিকিৎসকও মরে—প্রমাণ সম্মুখেই।

এই সব বাক্য বিনিময়ে আমার চিত্ত উচাটন হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম—ব্যাপার কি খুলিয়া বলো।

সে বলিল—বুঝাইবার বিশেষ আবশ্যক আছে কি? হয়তো জীবন দিয়াই আপনাকে বুঝিতে হইবে। জমিদারবাবু বড়োই প্রচণ্ড স্বভাবের লোক, চিকিৎসায় আরোগ্য করিতে পারিলে তিনি চিকিৎসককে প্রচুর ধনরত্ন দিবেন ইহা যেমন সত্য, তেমনি চিকিৎসক ব্যর্থকাম হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন ইহাও তেমনি সত্য—প্রমাণ তো নিজেই দেখিলেন।

আগে আমাকে একথা বলা হয় নাই কেন?

তাহা হইলে কি আপনি চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইতেন?

কিন্তু চিকিৎসক মারিয়া ফেলার ইতিহাস তো কখনো শুনি নাই।

জমিদারবাবুর ধারণা আনাড়ি চিকিৎসক যমের দূত। তাহাদের মারিয়া ফেলিলে যমের পক্ষকে দুর্বল করিয়া রুগীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। কই আসুন—

আমি ততক্ষণে জানালার শিক ভাঙিয়া, পগার ডিঙাইয়া ছুটিয়াছি, আমাকে ধরিবে কে? যদিও পিছনে আট-দশটি পাইক পেয়াদা দৌড়াইয়াছে দেখিতে পাইলাম। এক ছুটে সরাইখানায় আসিয়া পৌঁচিয়াছি। এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিল; তারপরে বলিল—আজ আমাকে এই স্যাঁতসেঁতে মেঝেতেই শুইতে হইবে, তা হোক। আমের কাঠের চেয়ে ভেজা মেঝে অনেক ভালো।

এবার সাহিত্যিকের পালা। সে বলিল—কি আর বলিব। খুব বাঁচিয়া গিয়াছি—বন্ধু চিকিৎসকের মতো আমিও মৃত্যুর খিড়কির দরজার কাছে গিয়া পড়িযাছিলাম—নেহাত পরমায়ুর জোরেই এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি।

সকলে উৎসুক হইয়া শুধাইল—ব্যাপার কি খুলিয়া বলুন।

সাহিত্যিক বলিয়া চলিল—পূর্বদিকের পথ দিয়া গ্রামে গিয়া তো প্রবেশ করিলাম। সে দিক্‌টায় রজকপল্লী। রজকপল্লী দেখিলেই আমার রজকিনী রামীকে মনে পড়িয়া যায়, কোন্ সাহিত্যিকের না যায়। রজক কিশোরীদের লক্ষ্য করিতে করিতে চলিয়াছি - হাঁা –চণ্ডীদাস রসিক ছিল বটে, সজোরে পাথরের উপর কাপড় আছড়াইবাব ফলে দুই বাহু ও সংলগ্ন কোনো কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন সুপুষ্ট হইয়া ওঠে যে, অপরের প্রশস্ত নীল শাড়িও তাহা আবৃত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষ কাপড আছড়াইবার সময়ে উক্ত প্রত্যঙ্গদ্বয় শরীরের তালে তালে শূন্যে বৃথা মাথা কুটিয়া মরিতে থাকে তাহা দেখিয়া কোন্ পুরুষের মন না ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে—সাহিত্যিকদের তো কথাই নাই। এমন সময়ে একটি রজক কিশোরী আমাকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—

ফিরিয়াছে, ফিরিয়াছে।

ফিরিয়াছে? কে ফিরিয়াছে? হ্যাঁ, ফিরিয়াছে বই কি? আমার মধ্যে দিয়া চিরদিনকার চণ্ডীদাস ফিরিয়া আসিয়াছে, রজকিনী রামীর শীতল পায়ে, বুঝিলাম জগতে দুটি মাত্র প্রাণী আছে—আমি চণ্ডীদাস। আর কিশোরী রজকিনী রামী। দেখিতে দেখিতে আমার চারিদিকে একদল কিশোরী জুটিয়া গেল—জগৎ রামীময়, আর তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল জগৎ আমিময়। এরকম অবস্থায় কবিতা না লিখিয়া উপায় কি?

একজন বলিল—ফিরিয়াছে।

( ফিরিয়াছে বই কি! না ফিরিয়া উপায় আছে? )

আর একজন বলিল—অনেকদিন পরে।

( সত্যিই তো! চণ্ডীদাসের পরে আজ কতযুগ গিয়াছে! )

তৃতীয়া বলিল—ঠিক সেই চেহারা; ঠিক সেই হাবভাব।

( এমন তো হইবেই। মানুষ বদলায়, প্রেমিক কবে বদলিয়াছে? )

চতুর্থা বলিল—কেবল যেন একটু রোগা মনে হয়।

( ওগো শুধু মনে হওয়া নয়—এ যে অনিবার্য বিরহসঞ্জাত-কৃশতা। )

পঞ্চমী কিছু বলিল না—কেবল আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিল।

( ওগো বৈষ্ণব কবি, তুমি প্রশ্ন করিয়াছিলে অঙ্গের পরশে কিবা হয়। আজ আমারও ঠিক সেই প্রশ্ন। )

অপরা বলিল—কিন্তু লেজটা যেন কাটিয়া দিয়াছে?

লেজ? কার লেজ? এবার চণ্ডীদাস-থিয়োরিতে সন্দেহ জন্মিল।

এবারে আমি প্রথম কথা বলিলাম—আমি প্রেমিক চণ্ডীদাস।

তাহারা সমস্বরে বলিল—হাঁ গো হাঁ, তাহার ঐ নামই ছিল বটে!

এই বলিয়া একজন একটা কাপড়ের মোট আনিয়া আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিল।

আমি বলিলাম—আমি তো চাকর নই।

তাহারা বলিল—চাকর হইতে যাইবে কেন? তুমি যে গাধা।

আমি গাধা!

বলিলাম—সে কি? আমি যে মানুষের মতো কথা বলিতে পারি।

রসিকা বলিল—অনেক মানুষ গাধার মতো কথা বলে, একটা গাধা না হয় মানুষের মতো কথাই বলিল—আশ্চর্যটা কি?

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—আরে, আরে, আমি যে সাহিত্যিক ?

তবে আর তোমার রাসভত্বে সন্দেহ নাই—কারণ যাহারা মধুর স্বাদ নিজে গ্রহণ না করিয়া কবিতার ব্যাখ্যা করিয়া মরে—তাহারা যদি গাধা না তবে গাধা কে ?

তখন অপর এক কিশোরী বলিল—ও দিদি, এ যে বশ মানিতে চায় না—কি করি !

কিশোরীর দিদি যুবতী বলিল—প্রেমের ডুরিখানা আন তো ?

প্রেমের ডুরি শুনিলেও দেহে রোমাঞ্চ হয়।

দেখিতে পাইলাম একজন মোটা একটি কাছি আনিতেছে।

তবে ওরই নাম প্রেমের ডুরি। ও ডোর ছিঁড়িবার সাধ্য তো আমার হইবেই না—এমন কি পাড়াসুদ্ধ লোকের হইবে না। তখনই ছুট। কিশোরীরা দৌড়ায় বেশ ! প্রায় ধরিয়াছিল আর কি ! উঃ পথ বিপথ লক্ষ্য করি নাই—এই দেখুন হাঁটুর কাছে ছড়িয়া গিয়াছে, কাপড়টা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তবু ভালো যে প্রেমের ডুরিতে বদ্ধ হই নাই।

এই বলিয়া সে থামিল ; তার পরে বলিল—তবু ভালো যে আজ ভিজা মেঝেতে শুইতে পাইব ; প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়িলে গোয়ালে ঘুমাইতে হইত।

তাহার কাহিনী শেষ হইলে সকলে মিলিয়া সিনেমা স্টারের অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চতুর্থ পথিক তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে শুরু করিল।

বন্ধুগণ, আমি পশ্চিমদিকের পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখি একটি পুকুরের ধারে একটি মেলা বসিয়াছে। স্থান কাল পাত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে আমার জীবনের মূল্য বিচারের ইহাই যথার্থ স্থান। আমি তখন পুকুরের জলে নামিয়া ডুবিয়া মরিতে চেষ্টা করিলাম। আপনারা ভয় পাইবেন না। সহস্রবার ডুবিয়াও কি করিয়া না মরিতে হয় তাহার কৌশল আমাদের আয়ত্ত। ডুবিয়া মরিবার চেষ্টা অভিনয় মাত্র। আমি সকলকে ডাকিয়া বলিলাম—আমি ডুবিয়া মরিতেছি, তোমরা আমাকে বাঁচাও। আমার আর্ত আহ্বান শুনিয়া সকলে পুকুরের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কেহ জলে নামিল না।

আমি বলিলাম—আমি ডুবিলাম বলিয়া, শীঘ্র বাঁচাও।

তাহারা বলিল—আগে তোমার পরিচয় দাও তবে জলে নামিব।

আমি বলিলাম—আমি একজন মানুষ। বাঁচাবার পক্ষে ইহাই কি যথেষ্টই নয়?

তাহারা বলিল—আমরা সবাই তো মানুষ। কেবল আইনে বাধে বলিয়া পরস্পরকে মারিয়া ফেলিতে পারিতেছি না—সদয় বিধাতা আইনের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে যখন মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তখন তোমাকে আমরা বাঁচাইতে যাইব কেন?

আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম—আমি শিক্ষক।

তাহারা একবাক্যে বলিল—জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেয়ে তোমার ডুবিয়া মরাই ভালো।

আমি বলিলাম—আমি চিকিৎসক।

তাহারা বলিল—অনেক মারিয়াছ, এবারে মরো।

আমি সাহিত্যিক।

ডুবাতে পারো, আর ডুবিতে পাবো না?

আমি সাংবাদিক—শুনিয়া তাহারা ঢেলা মারিল।

আমি সাধুপুরুষ—শুনিয়া তাহারা হাসিল।

আমি বৈজ্ঞানিক—শুনিয়া তাহারা সাড়াশব্দ করিল না।

আমি গায়ক—শুনিয়া কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আমি খেলোয়াড—শুনিয়া দু-একজন জলে নামিতে উদ্যত হইল।

আমি চলচ্চিত্র অভিনেতা।

তাহারা বুঝিতে পারিল না। তখন বলিলাম—যাহার বাংলা হইতেছে 'সিনেমা স্টার'।

ইহা শুনিবামাত্র মেলার সমস্ত জনতা একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। পুকুরের জল স্ফীত হইয়া উঠিয়া মেলার জিনিসপত্র ভাসাইয়া লইয়া গেল।

সকলেরই মুখে হায় হায়! গেল গেল! দেশ ডোবে, জাতি ডোবে, সমাজ ডোবে, রাজ্য সাম্রাজ্য সভ্যতা আদর্শ ডোবে তাহাতে ক্ষতি নাই—কেবল সিনেমা স্টার ডুবিলে সমস্ত গেল! হায় হায়! গেল গেল!

সকলে মিলিয়া আমাকে টানিয়া তুলিয়া ফেলিল। সকলে অর্থাৎ আবালবৃদ্ধ নরনারী যুবক যুবতী বালক বালিকা কিশোর এবং কিশোরী।

আমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপজোক লইতে আরম্ভ করিয়া দিল। পা হইতে মাথা পর্যন্ত—নানা স্থানের মাপ।

তারপর চুলের রং, ঠোঁটের রং, নখের রং, দাঁতের রং, চোখের রং। এ সব টোকা হইয়া গেলে আমার জীবনেতিহাসের খুঁটিনাটি লইয়া প্রশ্ন শুরু করিল। আমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আগামীকল্য তাহাদের সংবর্ধনা গ্রহণ করিব এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তবে ছাড়া পাইয়া আসিয়াছি।

চতুর্থ পথিকের অভিজ্ঞতা শুনিয়া অপর তিনজন বুঝিতে পারিল আজ রাত্রে তক্তপোশে শুইবার অধিকার কাহার।

চার বন্ধুতে আহারান্তে শয়ন করিল। সিনেমা স্টার তক্তপোশে শুইল—অপর তিনজনে সেই ভেজা মেঝের উপরে।

তক্তপোশশায়ী সিনেমা স্টারের নিদ্রার তালে তালে যখন নাসিকা গর্জন চলিতেছিল, তখন তিনজনে মশা, মাছি, ছুঁচো, ইঁদুর প্রভৃতি তাড়াইয়া বিনিদ্র নিদ্রায় রাত্রি কাটাইতেছিল। সারারাত ছুঁচোগুলো চিক্ চিক্ করিয়া ঘরময় দৌড়িয়া বেড়াইল—তিনজনের কানে তাহা বিদ্রূপের ফিক্ ফিক্ হাসির মতো বোধ হইল। ঘরের একপ্রান্তে একটা সাপের খোলস পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও তাহারা নির্বিঘ্নে রাত্রি অতিবাহিত করিল। কপালে যাহাদের দুঃখ সাপেও তাদের স্পর্শ করে না।

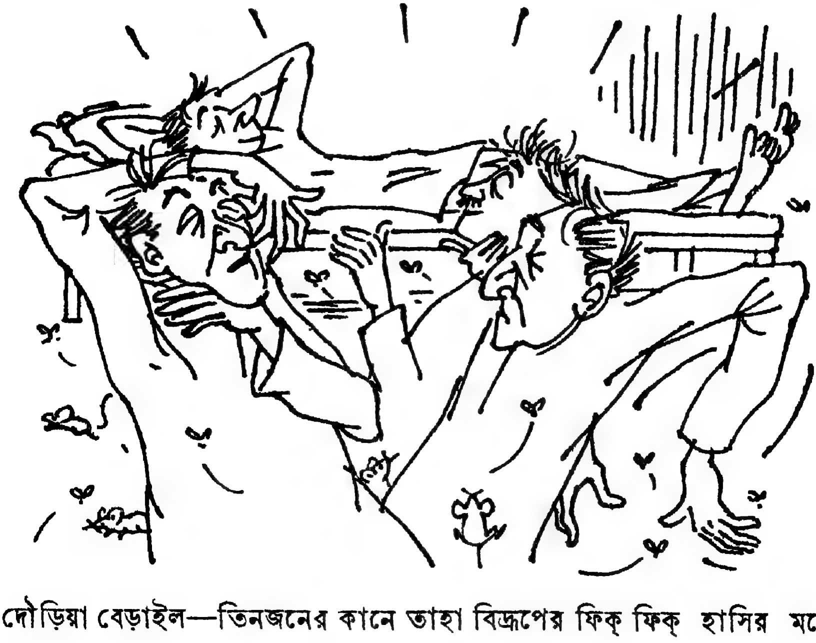

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ( ১৯০৩ – )

# ইনি আর উনি

একই ইস্কুলে পড়তো, আর ঘুরতে-ঘুরতে এসে পড়েছে একই চাকরিস্থলে। গেজেটে যখন দেখলো সুরমা এখানে আসছে, খুশিতে উছলে উঠেছিল শিবানী। আর কে-কে অফিসার সেখানে আছে খোঁজ নিতে গিয়ে যখন জানলো শিবানী আছে, তখন সুরমার আনন্দ আর ধরেনি। কী গলায়-গলায় বন্ধুতা ছিল তাদের। নতুন জায়গায় নতুন জীবনে আবার তাদের দেখা হবে। ভাবতেই কেমন ভালো লাগে।

বুঝতে কারু ভুল না হয়, এখানেই বলে রাখা ভালো, সুরমার স্বামী কৃষ্ণধন মুনসেফ, আর শিবানীর স্বামী কুঞ্জবিহারী সার্কেল-অফিসার।

জায়গাটি চৌকি, গ্রামের উপর একটুখানি শহরের সোনার জল বুলানো। 'মাগো, এ কোথায় নিয়ে এলে!' পাল্কিতে উঠতে যেতে প্রথম গুঁতো খেয়েই সুরমা আপত্তি জানালো, বললে, 'ভাগ্যিস বানী আছে নইলে গিয়েছিলাম আর কি।' ওদিকে ইস্টিশানে ট্রেনের বাঁশি শুনে শিবানী বললে উৎফুল্ল হয়ে, 'ঐ এল ওরা। বাবাঃ, সুরোকে পেয়ে বাঁচবো এত দিনে।'

কিন্তু, সমস্যা বাধলো কে কার সঙ্গে আগে গিয়ে দেখা করে।

এক দিন, দু-দিন, তিন দিন কাটলো।

আদালত থেকে পাওয়া কাঁঠাল কাঠের চেয়ারে বসে কৃষ্ণধন চা খাচ্ছিল। বললে, 'কি গো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে না?'

সুরমা ঝাঁঝিয়ে উঠলো, 'কেন, ও আসতে পারে না আগে?'

কৃষ্ণধন হাসলো। বললে, 'তোমারই তো আগে যাওয়ার কথা। যে অফিসার নতুন আসে তারই যেতে হয়। দেখোনি রেল-ইস্টিশনে, যে ট্রেনটা শেষে আসে, সেটাই আগে ছাড়ে? লাস্ট ইন, ফার্স্ট গো। আগের-আগের জায়গায় তো আগেই গিয়েছো দেখেছি।'

'ওর সঙ্গে কি আমার অফিসারের সম্পর্ক নাকি?' সুরমা আহত অভিমানের সুরে বললে, 'আমি এসেছি শুনেই ও ছুটে চলে আসতে পারতো না? ঐ তো দু-রশি দূরে বাসা। নতুন জায়গায় কি-কি অসুবিধের মধ্যে এসে পড়েছি ও

খোঁজ নিতে পারতো না একটু ? প্রথম দিনটা ওর ওখানে খাইয়ে দিতে পারতো না আমাদের ?'

কৃষ্ণধন বললে, 'সে কথা তো লেখোনি ওঁকে। উনি জানবেন কি করে যে কবে আসছ !'

'আহা, ন্যাকামি শুনলে গা জ্বলে। সাতদিন ধরে সমস্ত শহর সরগরম, হাকিম আসছে, আর উনি জানেন না। পাল্কিতে যখন আসি তখন রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কাতারে-কাতারে, আর উনিই শুধু ওঁর বাইরের বারান্দায় একটু বেরিয়ে আসতে পারেননি ! আমি চিনি ওকে। ওর ভীষণ দেমাক। ছেলেবেলা থেকেই দেমাক। ইস্কুলে ওকে কেউ ওর বাপের নাম জিজ্ঞেস করলে নামের সঙ্গে ডিপটি না বলে ছাড়তো না। কত তো শুনেছিলাম হ্যানো হবে ত্যানো হবে,' সুরমা তার দু-হাতের ভঙ্গিকে চিত্রাকার করে তুললো, 'শেষ পর্যন্ত তো সাবডিপটির উপরে জুটলো না !'

দৃশ্যান্তরে টুর থেকে ফিরে, কুঞ্জবিহারী স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি গো, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল ? কেমন দেখতে ? ছিপছিপে না গোলগাল ?'

'যাও না, নিজে গিয়ে দেখে এসো না।' শিবানী খেঁকিয়ে উঠলো।

'আহা, চটো কেন, এসব খবরগুলো লোকে স্ত্রীর মারফতই জেনে থাকে। আমি নিজে আর যাই কি করে ?'

'তবে আমি যাবো বলতে চাও ?' শিবানী ফুঁসিয়ে উঠলো।

'কেন, উনি আসেননি এখনো দেখা করতে ? আমি তো ভেবেছিলাম লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফিরে এসে হনুমান যেমন সব্বাইর আগে কৈকেয়ীকে দেখতে ছুটেছিল—তেমনি তোমার বন্ধু—'

'তুমি তো চেনো না ওকে, আমি চিনি, হাকিমের বউ হয়ে ওর ভীষণ দেমাক বেড়ে গেছে। আগে এমন ছিল না, যখন বিয়ের আগে ও পেস্কারের মেয়ে ছিল। যে হাকিম ওর বাবার কাছে ছিল বিভীষিকা সেই এখন ওর হাতের মুঠোয়, আর ওকে পায় কে। যেন একেবারে হাওয়ার উপরে উড়ে চলেছে।'

কুঞ্জবিহারী একটা ঢোঁক গিললো। বললে, 'অতটা না-ও হতে পারে। নতুন এসেছেন, গোছগাছে হয়তো সময় পাচ্ছেন না। তুমিই না হয় গেলে ক্ষতি কী !'

'কেন আমার কি মান-সম্মান বলে কিছু নেই ?' শিবানীর গলা অভিমানে

ভারী হয়ে এল, 'মাইনে দু-টাকা কম পাই বলে কি মনুষ্যত্বটাও কম বলতে চাও ?'

শিবানীর বড়ো মেয়ের নাম আভা। বারো-তেরো বছর বয়স। একদিন বিকেলে সে এসে বললে, 'ওদের মালপত্র সব এসে গেছে মা, গিয়েছিলাম দেখতে। গুচ্ছের কতকগুলো বাসন ছাড়া আর কিছু নেই। আমাদের মতন এমন সাজানো ড্রইং-রুম নেই, আর জানলা-দরজায় সব কাপড়ের পাড় সেলাই করে পর্দা করেছে।'

বাঁকা ঠোঁটে আভা হাসতে যাচ্ছিল, শিবানী হঠাৎ তার চুল টেনে ঘাড়ের উপর তীব্র চিমটি কেটে দিল। বললে, 'তোর আগ বাড়িয়ে যাবার কী হয়েছিল শুনি ? ওরা আসে ? ওরা এসেছে আগে ?'

কাজটা যে সমীচীন হয়নি আভা সেটা বুঝতে পেরেছে। এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হলে ও-বাড়ির সমবয়সী গৌরীকে ছলে বলে এ বাড়িতে নিয়ে আসা দরকার।

'যাবো মা, ও বাড়ি ?' গৌরী সুরমার মত চাইতে গেল।

যেতে পারে—সুরমা মনে মনে বিচার করে দেখলো। যেহেতু সাব-ডিপটির মেয়ে আগে এসেছে এ-বাড়ি।

'শোন্, কিছু খেতে দিলে খাসনে যেন। কী পড়িস জিজ্ঞেস করলে বলিস বাড়িতে পড়ি, আর যদি গান গাইতে বলে রেকর্ডের নতুন গান দুখানা শুনিয়ে দিস।' সুরমা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'আবার যেন গলা চেপে গেয়ো না।'

দুপুর বেলা কে একজন ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসেছেন।

সুরমা চিনতে পারেনি। আপ্যায়ন করে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কে ?'

ভদ্রমহিলা সুগম্ভীর মুখে সংক্ষেপে জানালেন যে তিনি জমিদারের এ-এলাকার নায়েবের স্ত্রী—আর তাঁর স্বামীর আয় না বলে জমিদারের আয় বললেন বছরে ষাট হাজার টাকা।

কথায় কথায় ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'সারখেল সাহেবের বৌর সঙ্গে আলাপ হয়নি ?'

প্রথমটা সুরমা বুঝতে পারেনি, পরে বুঝলো সারখেলটা সার্কেলের অপভ্রংশ।

'না কই, সুযোগ হয়নি এখনো।'

'ওমা, সে কি কথা ? আসেনি এখনো ?' ভদ্রমহিলা বিস্ময়ের ভাব দেখালেন।

বললেন, 'হাঁটু-কাটারই তো হাঁটু-ঢাকার কাছে আগে আসা উচিত। মর্যাদা তো একটা আছে!'

'বড়ো জোর গলা-কাটা বা বুক-ঢাকা শোনা গেছে, ও দুটো আবার কী জিনিস?'

'ও! আপনি জানেন না বুঝি?' ভদ্রমহিলা মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, 'ও দুটোর মানে হচ্ছে হাফ-প্যাণ্ট আর ফুল-প্যাণ্ট—বুনো ডিপটি আর কুনো মুনসেফ।'

কথাটা সুরমা উপভোগ করলো, যেহেতু 'হাফ'-এর চেয়ে 'ফুল'-কেই বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললে, 'কই, দেখি না তো আসতে।'

'দেমাক! একে মুটিয়েছে এখানে এসে, তায় শোবার ঘরে হয়েছে টানা পাখা।'

'আমার চেয়েও কি মোটা?' সুরমা হাসলো।

অপ্রতিভ হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আহা, আপনি আবার মোটা কোথায়? এই তো ঠিক ভারভাত্তিক হাকিম-হাকিম চেহারা।'

'টানা পাখা ওর টানে কে?'

'রাত্রে কে টানে বলতে পারি না, দিনের বেলায় টানে মাখন ডাক্তারের বৌ। শুধু পাখা টানে না, পিঠের ঘামাচি গেলে দেয়, মাথার উকুন মারে।'

'কে মাখন ডাক্তার?'

'এখানকার সার্জেন জেনারেল।' ভদ্রমহিলা হাসলেন মুখ টিপে, 'সারখেল সাহেব তার সাইকেলের পেছনে বেঁধে ওকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে নিয়ে খুব পসার করিয়ে দিয়েছে, তাই মাখন ডাক্তারের বৌর গরবে আর গা ধরে না। শুধু কি তাই? গাঁয়ের প্রেসিডেণ্ট সাহেবেরা যখন মাছ দেয়, অর্ধেকই যায় মাখন ডাক্তারের বাড়ি। বাড়ি যেমন গায়ে-গায়ে, ভাবও তেমনি গলায়-গলায়।'

'কেন, ওর বাড়িতে হয় কী দিনের বেলা?'

'তাস খেলা হয়। কোনোদিন গোলাম-চোর, কোনোদিন টুয়েনটিনাইন। মাখন ডাক্তারের বৌর খেলা-টেলা আসে না, তাই বসে বসে পাখা টানে।'

'আর কে কে আসে ওখানে?'

'অনেকেই। চণ্ডী ঘোষের বৌ, পতিতপাবনবাবুর শালী—'

'ওঁরা কে?'

‘ওঁরা এখানকার উকিল।’

‘উকিল?’ সুরমা এমন একখানা মুখ করলো যেন যুদ্ধের সময় মিত্র-দেশ হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে নাম লিখিয়েছে।

‘কেন, উকিলরা ও-বাড়িতে কেন?’

‘তা কী করবে বলুন। আপনার আগে যিনি হাকিমগিন্নী ছিলেন, তাঁর বারো মাসই দশ মাস ছিল। রুই-পোনার ঝাঁকের মতো অগুনতি কাচ্চা-বাচ্চা, চুপ করে বসতে পারতো না এক দণ্ড। নিজেরো ছিল নিত্যি অসুখ। সকাল-সন্ধ্যেয় মারতো কেবল চোঁয়া ঢেঁকুর, ভসভসিয়ে-ওঠা জল খেত খালি। লোকে আড্ডা গাড়বে কি করে?’

তারপর ভদ্রমহিলা যথাসময়ে হাজির হলেন গিয়ে শিবানীর দরবারে।

‘গেছলুম মুনসেফের বৌকে দেখতে। কী ধুমসো মোটা! যেন একটি আলকাতরার পিপে। ছেলেপিলেগুলো কালো কিটকিটে—ঠিক যেন ধানসিজে হাঁড়ির তলা। ভাবি এই চারে মাছ এল কী করে?’

‘পেস্কারের মেয়ে যে। শুনেছি, পাছে হাকিম এসে খপ করে পকেটে হাত দেয় সেই ভয়ে ওর বাপ মাথায় পাগড়ি বেঁধে তার মধ্যে পয়সা গুঁজে রাখতো।

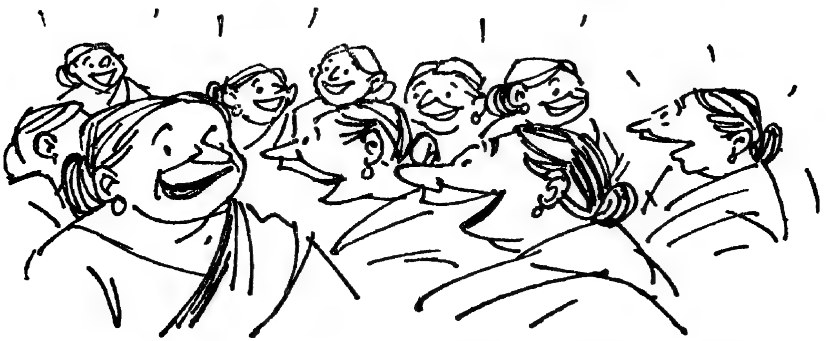

একদিন এজলাসে উঠে হাকিমের কাছে কী পেশ করবার সময় টানা-পাখার বাড়ি খেয়ে পাগড়ি যায় খসে। মেঝের উপর ঝন ঝন করে ছিটিয়ে পড়ে টাকা সিকি আধুলির টুকরো। হাকিম নিজে উঠে কুড়িয়ে কুড়িয়ে গুনে দেখলো আঠারো টাকা। বেলা তখন একটা। এগারোটা থেকে একটা—দু-ঘণ্টায় যার আঠারো টাকা রোজগার. ভাবুন তার অবস্থাটা। মাছ তবে টোপ গিলবে না কেন?’ শিবানী চোখ ঘোরালো।

‘ধরে ফেলে হাকিম কি বললে?’

বললে, পাগড়িটা খুব নিরাপদ নয়, এবার থেকে সনাতন ট্যাঁকেই গুঁজো— যদিও তাতে ভয় আছে—তোমার ধুতির যা বহর, ক্রমশই সেটা ছোট হতে হতে হাঁটুর উপর উঠে বসবে।' শিবানী হাসতে লাগলো।

'সেই বংশেরই তো ঝাড়।' ভদ্রমহিলা মুখ বেঁকালেন। 'ভদ্রতা শিখবে কোত্থেকে? এখানকার মতো এ রকম গদিওলা চেয়ার আগের মুনসেফেরও ছিল না বটে, তবু তার বৌ তার খাটের উপর নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। কিন্তু এ শুধু দিলে একটা মাদুর পেতে। আর, কী কৃপণ বাবা বলিহারি, মাছ সাঁতলাতে নিশ্চয়ই তেল দেয় না, নইলে দেখো না একটা পান দিয়েছে খেতে। তাতে চুনের বংশ পর্যন্ত নেই। আর কী বলবো বলুন,' নায়েবানী তার ডান হাতের তালুটা দেখতে লাগলো, 'পাখা করতে করতে হাতে কড়া পড়ে গেছে।'

'ওদের এমনি টানাপাখা নেই বুঝি?' এক কোণে বসে দড়ি টানতে-টানতে মাখন ডাক্তারের স্ত্রী বললে।

'একটা চেয়ার নেই বসবার— সব আদালতেরটা দিয়ে চালায় তার আবার টানা পাখা!' নায়েবানী তার নাকটাকে উপরের দিকে ঠেলে তুললো, 'আর কী দেমাক যদি দেখতেন! বলে কি, সারখেল অফিসারের বৌ মর্যাদায় আমার চেয়ে অনেক নিচু, আগ বাড়িয়ে আমি কখ্‌খনো যাবো না ওদের বাড়ি। এমন ঠেকার-দেয়া কথা কখনো শুনেছেন জীবনে?'

রাগে শিবানী তার সর্বাঙ্গ ফুলিয়ে রইলো।

কৃষ্ণধন নাজিরকে ডেকে পাঠালো। নাজির বললে, এজলাসের পুরনো একটা পাখা আছে। সারিয়ে নিতে হবে।

লাফ দিয়ে সুরমা বললে, 'তা দেবেন সারিয়ে।'

নাজির গম্ভীর হয়ে গেল। ঘরের দৈর্ঘ্যটা একবার অনুমান করে বললে, 'কিন্তু পাখাটা বড্ড বড়ো হয়ে পড়বে মনে হচ্ছে।'

'তা হোক। আপনাদের দেশে গরমটাও এমন কিছু ছোট নয়। আর শুনুন, যতদিন মাখনের বৌকে না পাই, আপনাদের স্টাফ থেকে একটা পাঙ্খাপুলারও দিতে হবে চালিয়ে।'

নাজির মনে করল, মাখনের বৌ বুঝি কোনো ঝি। বললে, 'ঝি যদি চান, সুধীরের মাকে দেওয়া যেতে পারে।'

সুরমা ঝলসে উঠল, 'সম্প্রতি যে পাঙ্খাপুলারটা আপনার বাড়িতে চাকর খাটে

তাকে পাঠিয়ে দেবেন।'

শোবার ঘরে পাখা খাটানো হল—এ দেয়াল থেকে ও-দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। বাতাস গেল রুদ্ধ হয়ে।

কৃষ্ণধন বললে, 'তুমি তো হরতন-রুহিতন চেনো না, তুমি আড্ডা জমাবে কিসের?'

'তাস না হয় জানি না, কিন্তু দশ-পঁচিশ জানি, গোলকধাম জানি, ষোলো ঘুঁটি মোগল-পাঠান জানি—আড্ডা জমাতে বেগ পেতে হবে না। নিদেনপক্ষে লুডো চলবে। তুমি এক কাজ করো!'

কৃষ্ণধন চশমা কপালে তুলে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলো।

'আর কিছু নয়, চণ্ডীবাবুর স্ত্রী আর পতিতপাবনবাবুর শালীকে শুধু জোগাড় করো—'

'তার মানে।'

'তার মানে, চণ্ডীবাবু আর পতিতপাবনবাবুর দিকে একটু হেলে দাঁড়াও, একটু ঢিল দাও, একটু চোখ ঠারো। ওদেরকে টেনে নিয়ে এসো বৈঠকখানায়। আর, জানো তো কান টানলে মাথাও এসে উপস্থিত হবে।'

কৃষ্ণধনের অত কিছু করতে হল না। চণ্ডী আর পতিতপাবন দ্বারপ্রান্তেই বসেছিল প্রস্তুত হয়ে, হাতছানি দিতেই উঠে বসলো তক্তপোশে। আর, একবার যে বসলো, শিকড় মেলে ছায়া ফেলে বসলো। মক্কেল বাড়িতে গিয়ে দেখা পায় না কোনো সময়। যখনই যায় তখনই নাকি শোনে, হাকিমের বাড়িতে আছে। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে তারপর মক্কেল যদি উঠে চলে যায়, তবে সে আর কোথাও যায় না, যায় আরও মক্কেল ডেকে নিয়ে আসতে। কেননা, তার বিশ্বাস, সমস্ত সকাল যে হাকিমের বাড়িতে, তুড়িতেই সে সব উড়িয়ে দিতে পারবে।

ভিতরে সব অর্ধাঙ্গিনীরা।

'এত দিনে ফের জলের মাছ জলে এলুম।' চণ্ডীবাবুর স্ত্রী বললে, 'আপনার আগে যেটি ছিল সেটি একটি চীজ। সব সময়ে নাক টান। যেমন ছিল কর্তাটি কাঠখোট্টা তেমনি তার পরিবার। এক ভস্ম আর ছার দোষগুণ কব কার।'

'তাই বুঝি সব বেপাড়ায় গিয়ে বাসা নিয়েছিলেন।' সুরমা টিপ্পনি কাটলো।

'কী করি বলুন। দুপুর বেলাটা একটু তাস-ফাস না খেলতে পেলে যে হাঁস-ফাঁস করি।'

'কিন্তু আমি যে তাস জানি না।'

'তাতে কি ? আগডুম-বাগডুম খেলবো, তবু বেপাড়ায় যাবো না।'

'তাই বলো দিদি', চণ্ডীর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে পতিতপাবনের শালী বললে, 'এদিকটাই আমাদের লাইন। শত হলেও তো আমরা আইন আদালত নিয়েই আছি -উকিল তার হাকিম। টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। লাগাম ছাড়া যেমন ঘোড়া নেই, তেমনি উকিল ছাড়াও হাকিম নেই। আমাদের সবাইর এক জায়গায় তাই একই হওয়া উচিত—আমরা যারা গাউন পরি। কী বলেন ?'

স্থরমা বললে, 'তা পতিতপাবনের স্ত্রী একথা বলতে পারতেন। আপনি তো—'

'উনিই এখন পতিতপাবনের স্ত্রী।' চণ্ডীর স্ত্রী সংশোধন করলো, 'আগে শুধু শালী ছিল, এখন দিদির মৃত্যুর পর সমৃদ্ধিশালী হয়েছে।'

চণ্ডীর স্ত্রীর গায়ে আদুরে একটা ধাক্কা দিয়ে পতিতপাবনের শালী বললে, 'কী যে তুমি বলো দিদি—'

'দেখো', চণ্ডীর স্ত্রী গম্ভীর মুখে বললে, 'এখানে ইনি ছাড়া আমাদের আর কেউ দিদি নেই। উনি আমাদের হাকিম দিদি।'

স্থরমার ঘাড়ে তিনখানা ভাঁজ পড়লো।

একে একে সবাইকে টানা গেল, কিন্তু মাখনের বৌকে নড়ানো গেল না। কৃষ্ণধনের ছোট মেয়েটার অসুখ করলো, ডাক পড়লো শ্রীধর ডাক্তারের, মাখন দেখেও দেখলো না। বললে, 'মুনছুব দিয়ে আমার কী হবে। এমনি ভিজিট তো দেবেই না, তবে পিরীত জমিয়ে লাভ কী ?' স্ত্রীকে বললে 'তুমি টেনে যাও পাখা। একটু জোরে টেনো যাতে আগুনটা বেশ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।'

'ওদের আজকাল কী দুর্দশা হয়েছে যদি দেখো, হাকিম দিদি', পতিতপাবনের শালী বললে একদিন হেসে হেসে, 'তোমার নিজেরই কষ্ট হবে। ওদের আড্ডা গিয়েছে ভেঙে—ছি-ও সাহেবের বৌ আর মাখন ডাক্তারের বৌ এখন হাত ধরাধরি করে নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'পাড়ে ঘুরে বেড়ায় ?' স্থরমা গরজে উঠলো, 'আমরা মাঝখানে ঘুরে বেড়াবো। জুন মাসের গোড়াগুড়ি আদালতের নৌকা এসে যাবে, তাতে করে আমরা বেরুবো প্রত্যহ, দেখি আমাদের সঙ্গে ওরা পারে কী করে ?'

মফস্বল থেকে ফিরে এলে কুঞ্জবিহারীকে শিবানী জিজ্ঞেস করলে, 'ওদের

আড্ডাটা ভেঙে দেবার কী করলে ?'

কুঞ্জবিহারী তার চশমার ভিতর থেকে চোখ দুটো ছোট করে বললে, 'বেশি দেরি নেই, চণ্ডী আর পতিতপাবনই শুধু এখানে উকিল নয়। চিঠি এরি মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি দুখানা।'

মৃণালিনী এখানকার মহিলা সমিতির সম্পাদিকা, বেকার অর্থাৎ অবিবাহিতা। সুরমার সামনে খাতা মেলে ধরে বললে, 'আপনাকে মেম্বর হতে হবে।'

'মেম্বর ?' সুরমা একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলো। তার অর্থ শুধু মেম্বর ? ইচ্ছে করলে কত কী হতে পারি।

'হ্যাঁ, আপনাকে ছাড়া চলবে না আমাদের সমিতি।'

'কী হয় আপনাদের সমিতিতে ?'

'ফর্টনাইটলি সিটিং হয় ঘুরে ঘুরে এক এক মেম্বরের বাড়িতে। হাতে লেখা একটা কাগজও চালাই মাসে মাসে। নাম, অনাগতা। আসলে, কিছুই হয় না, শুধু চেষ্টা হয়।' মৃণালিনী হাসলো। পরে মুখে গাম্ভীর্য এনে বললে, 'সার্কেল অফিসারের স্ত্রী সমিতির প্রেসিডেণ্ট, তারপর আপনাকেও যদি আমরা পাই, তবে এখানকার মেয়েদের মধ্যে খুবই একটা চাঞ্চল্য নিয়ে আসতে পারবো।'

সুরমা হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে খাতাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, 'ওসব বাজে কাজে আমার সময় হবে না।'

মৃণালিনী স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। বুঝলো না, বেলুনের কোন্ জায়গায় ছুঁচ ফুটলো।

'আমাকে ছাড়াও চলবে আপনাদের সমিতি। আমার মতো হেঁজেপেঁজি লোক কত পাবেন আপনি এখানে।' বলে সুরমা মৃণালিনীকে সেই ঘরে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য ঘরে চলে গেল। আর বেরুলো না।

খোঁজ নিয়ে জানলো, মৃণালিনী উকিলের মেয়ে নয়, কবিরাজের মেয়ে। অতএব সুরমার এলাকার বাইরে।

'তাতে কি ? আমরাও একটা সমিতি করবো।' চণ্ডীর স্ত্রী বললে, 'এদেরটা বসে পনেরো দিন অন্তর, আমাদেরটা বসবে হপ্তায় হপ্তায়।'

'কিন্তু হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা ?' সুরমা কি ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

'তাও বার করব আমরা।' বললে চণ্ডীর স্ত্রী।

‘কিন্তু হাতে কে লিখবে অত সব?’ সুরমার মুখে আবার সেই হতাশার ভাব উঠলো ফুটে।

‘তা আপনি ভাববেন না। হরিশ মাস্টারের মেয়ে হেনারানীর সঙ্গে মৃণালিনীর তো ওই নিয়েই ঝগড়া। হেনার হাতের লেখাটা ভালো বলে তাকে দিয়ে মৃণালিনী লিখিয়ে নিতে চেয়েছিল তার ‘অনাগতা’, হেনা বললে, সম্পাদকী করবে তুমি আর আমি করবো নকলনবিশি? নামের বেলায় তুমি, আর ঘামের বেলায় আমরা?’

‘তারপর?’ সুরমার মুখে সেই হতাশার ভাব গেল কেটে। বললে, ‘মাস্টারের মেয়ে যায়নি তো ও-দলে?’

‘না, তাকে সম্পাদিকা করে দিলে সে খুশি হয়ে লিখে দেবে আগাগোড়া!’

‘বাঃ সম্পাদিকা হবেন তো দিদি।’ পতিতপাবনের শালী মৃদু আপত্তি করলো।

‘দিদি হবেন সমিতির প্রেসিডেন্ট। সব কিছুর উপরে। কী বলেন?’

সুরমার সম্পূর্ণ নীরবতা তাই সমর্থন করলো।

‘সবই তো হল, কিন্তু লেখা পাবো কোত্থেকে?’ সুরেশ ওভারসিয়রের স্ত্রী বললে।

‘কেন, যারা এখন লিখছে ‘অনাগতা’য়, তাদেরকে ভাঙিয়ে আনবো’, বললে চণ্ডীর স্ত্রী।

‘দরকার নেই। আমার মাসতুতো ভাই কলকাতায় খবরের কাগজের আপিসে কাজ করে, তাকে বললে কত নাম-করা লেখকের লেখা পাঠিয়ে দেবে, তাক লেগে যাবে ওদের।’

সুরমা আরেকটা গর্বিত ভঙ্গি করলো। বললে, ‘কিন্তু পত্রিকার নাম হবে কী?’

‘নবাগতা।’ বললে চণ্ডীর বৌ। ‘ওদেরটা এখনও আসেনি, আমাদেরটা নতুন এসেছে।’

‘ঠিক হবে।’ পতিতপাবনের স্ত্রী উল্লসিত হয়ে বলে উঠলো, ‘দিদির সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে। দিদিও আমাদের নবাগতা।’

সুরমা হেসে বললে, ‘কিন্তু থাকবো এখানে ধরুন তিন বছর, সব সময়েই আমি নতুন থাকবো নাকি?’

‘কে বলে থাকবেন না। নিশ্চয়ই থাকবেন।’ চণ্ডীর বৌ জোর দিয়ে বললে।

‘কিন্তু যখন আমি থাকবো না এখানে? যখন বদলি হয়ে যাবো?’

'তখন পত্রিকার নাম বদলে দেব, 'তিরোহিতা'। আপনাকে ভুলতে পারবো না কিছুতেই।'

গম্ভীর হয়ে অনেকক্ষণ কী ভাবলে সুরমা তার চলে যাবার পর পত্রিকার নাম তিরোহিতা হবে এ অসম্ভব, অথচ তার চলে যাবার পর আর কেউ নবাগতা নামের বন্দনা নেবে এ-ও অসহ্য। তাই সে বললে, 'পত্রিকার নাম এখন থেকেই 'তিরোহিতা' রাখুন। শুধু আসেনি নয়, এসে চলে গেছে। ঢের বেশি কঠিন অর্থ কথাটার।'

হেনা এসে বললে, 'অত ঘোরপ্যাঁচে লাভ কী। আমাদের পত্রিকার নাম হবে সুরমা। সমিতির নাম হবে, সুরমা-মহিলা-সমিতি।'

'তা হলে তো কথাই নেই।' সুরমাই প্রথম বললে।

'তা হলে তো কথাই নেই।' বললে আর সবাই।

কিন্তু এই নামের মধ্যে যে কী বিপদ প্রচ্ছন্ন ছিল বুঝতে পারেনি কেউ। 'অনাগতা' অবিশ্যি উঠে গেল, কষ্টেসৃষ্টে একবার বেরিয়ে 'সুরমা'-ও আর চললো না।

সেদিন রাখহরিবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে হেনা আর মৃণালিনীর ঝগড়া হয়ে গেল মুখোমুখি।

'কি গো, উঠে গেল তো পত্রিকা।' হেনা ঘাড় দুলিয়ে চোয়াল বেঁকিয়ে বললে।

'আর তোদেরটাই বা চললো কই?' বললে মৃণালিনী, কাঁচকলা দেখিয়ে।

'তোদের ধ্বংস করবার জন্যই তো আমাদের আবির্ভাব। তোরা মরেছিস তাই আমাদেরও কাজ ফুরিয়েছে।'

'অনাগতা কখনো মরে না, তার পথ চিরদিনের জন্য খোলা। মরে, মরেছে তোর সুরমা। বলিস গিয়ে তোর মুনসেফানীকে, সে-ই অক্কা পেয়েছে, সে-ই চললো না এখানে।'

হেনা শেষ পর্যন্ত বললে গিয়ে সুরমাকে। সুরমার বুঝতে বাকি রইলো না, সমস্তটাই শিবানীর গায়ের জ্বালা, সে-ই শিখিয়ে দিয়েছে মৃণালিনীকে রাষ্ট্র করে বেড়াবার জন্যে। সুরমা এই ভেবেই এখন পুড়তে লাগলো, পত্রিকার নাম সে বুদ্ধি করে শিবানী রাখেনি কেন? তা হলে সেটা শুধু এমনি উঠে যেত না, সমারোহে চিতায় গিয়ে উঠতো। আর হেনা গিয়ে বলতো মৃণালিনীকে, 'ছোট ডাবটির মুখে আগুন।'

পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে মেয়ে ইস্কুলে পুরুষচরিত্রহীন একটা নাটিকার অভিনয় হবে। নতুন হেডমিসট্রেসটি এসব বিষয়ে খুব উদ্যোগী, সব সময়েই দৃষ্টি কি করে কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বেন, যদিও বহু উদ্যোগেও আজ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েননি।

হেডমিসট্রেসকে ডেকে পাঠালো শিবানী। আদ্ধেক রাস্তা এসে হেডমিসট্রেস ইস্কুলে ফিরে গেল, ছাতাটা সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু ভ্যানিটি ব্যাগটা ফেলে এসেছেন ভুলে। দুটো এক সঙ্গে না থাকলে চেহারায় যেন তেমন সম্পূর্ণতা আসে না।

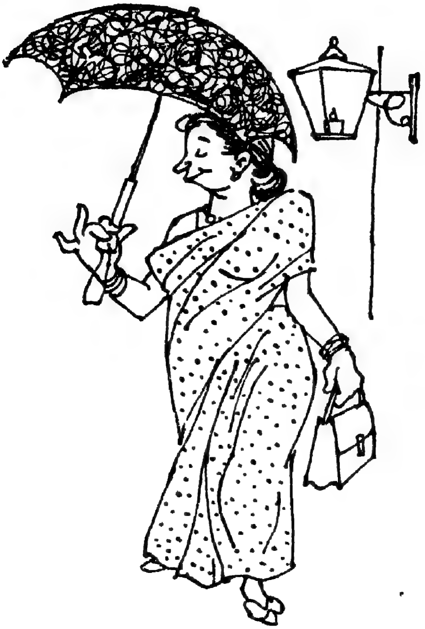

শিবানী ঝলসে উঠলো, 'হিরোয়িনের পার্টটা আভাকে দেননি যে ?'

প্রথমটা হেডমিসট্রেস কিছু আয়ত্ত করতে পারলো না, মুখখানা গোলাকার করে রইলো। পরে বুদ্ধিটা একটু তরল হয়ে আসতেই মুখে হাসি টেনে বললে, 'নাটকে হিরোই নেই, তার আবার হিরোয়িন কী ?'

'হেডমাস্টার না থাকলেও হেডমিসট্রেস এসে থাকে ইস্কুলে।' শিবানী তুরুক জবাব দিল, 'সে কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে মেনপার্ট আভাকে না দিয়ে মুনসেফের মেয়ে' গৌরীকে দিয়েছেন কেন ? সার্কেল-অফিসার যে আপনার ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট তা কি আপনার মনে নেই ?'

এক নিমেষে হেডমিসট্রেস নির্বাপিত হয়ে গেল। বললে, 'আমি অতশত ভেবে দেখিনি। রঙ্গমঞ্চের কথাই ভেবেছি, নেপথ্যের কথা ভাবিনি। গৌরীর উচ্চারণগুলো ভালো আর মেয়েটি বেশ স্টেজ-ফ্রি, তাই'—

'স্টেজের আপনি কী দেখেছেন আর ফ্রিডমেরই বা আপনি জানেন কী! যান, নাটকের থেকে আমার মেয়ের নাম কেটে দেবেন, গানও সে একটি গাইতে পারবে না বলে দিলুম। আর, বেহালা-ব্যাঞ্জো যা দেবো বলেছিলুম তা-ও পারবো না দিতে। দেখি, কি করে চলে। দেখি—' শিবানী শত্রুকে পশ্চাদ্বর্তী মনে করে চাবির গোছাসুদ্ধ আঁচলের প্রান্তটা পিঠের দিকে সবলে নিক্ষেপ করলো, 'কালেক্টারের কানে তুলি একবার কথাটা।'

সুরমাও হেডমিসট্রেসকে তলব দিল। আদ্ধেক রাস্তা এসে হেডমিসট্রেস ইস্কুলে ফিরে গেল, ভ্যানিটি ব্যাগটা সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু বেঁটে ছাতাটা নিয়ে আসেনি, দুটো এক সঙ্গে না থাকলে চেহারায় কেমন মর্যাদার অভাব ঘটে।

সুরমা জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'নাটকে গৌরীর একটাও গান নেই কেন? আপনার কী ধারণা গৌরী গান গাইতে জানে না?'

'তা কেন?' এবারেও হেডমিসট্রেস প্রথমে হাসতে চেষ্টা করলো। তোয়াজ করে বললে, 'গৌরীর যে হিরোয়িনের পার্ট!'

'গৌরী হিরোয়িন হবে না তো হবে ঐ ছি-ওর মেয়ে!' সুরমা চোখ পাকিয়ে উঠলো, 'যত গান সব গাইবে ঐ আভা আর আমার গৌরী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে? তার বেহালা নেই বলে কি সে একেবারে বেহাল?'

'তা আমি কী করবো বলুন,' হেডমিসট্রেস সবিনয়ে বললে, 'তার জন্যে নাট্যকারকে দোষ দিন। নায়িকার পার্টে গান সে দেয়নি একেবারে।'

'তবে অমন বই সিলেক্ট করেছেন কেন?' সুরমা মুখিয়ে উঠলো। 'আজকাল সিনেমায়-থিয়েটারে হিরোয়িনেরাই তো কথায় কথায় গায়, যেখানে সেখানে গায়, কেউ মরেছে শুনলে কান্নার আগে তাদের গান বেরিয়ে আসে। এমন দিনে ঐ সৃষ্টিছাড়া বই আপনাকে কে বাছতে বলেছিল?'

'বেশ তো, গৌরীকে দিয়ে যদি গান গাওয়াতে চান, তবে আভার সঙ্গে ওর পার্টটা বদলে নিলেই তো চলে যায়।' হেডমিসট্রেস সরল বিশ্বাসে বললে।

সুরমার ভঙ্গিটা হঠাৎ তেজস্কর হয়ে উঠলো। বললে, 'তা হলে আপনি বলতে চান আভা হবে হিরোয়িন আর গৌরী হবে তার সখী! তার আগে গৌরী যেন গোমুখ্খু হয়ে বাড়িতে বসে থাকে, তার যেন ইস্কুলে গিয়ে পড়তে না হয়।'

'কিন্তু এর তবে ব্যবস্থা কী ?' হেডমিসট্রেস ফাঁপরে পড়লো।

'এর শুধু এক ব্যবস্থা।' সুরমা তর্জনী তুলে একটা দৃপ্ত ভঙ্গি করলো। মনে হল মেয়ের বদলে সেই বুঝি হিরোয়িনের মহড়া দিচ্ছে।

আশ্বান্বিত হয়ে তাকালো হেডমিসট্রেস।

'এক ব্যবস্থা। তা হচ্ছে এই, মাঝে মাঝে জায়গায় জায়গায় হিরোয়িনের পার্টের মধ্যে গান ঢোকাতে হবে। যে সব গান গৌরীর শেখা আছে রেকর্ড থেকে, অন্ততঃ সে ক-খানা।'

'তা কি করে হতে পারে ?' হেডমিসট্রেসের মুখে হাসিটা কষ্টেরই একটা বিকৃতির মতো দেখালো, 'একদম খাপ খাবে না যে।'

'রাখুন আপনার অহংকারের কথা। কত বড়ো বড়ো বায়োস্কোপে চিতা জ্বলবার সময় গান গায়, মোটর চাপা পড়ার পর কেত্তন ধরে, আর এই মেয়েদের নাটকে একটা কিছু গান ধরলেই যত মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল।' সুরমা একটা সংক্ষিপ্ত হুংকার করলো।

'কিন্তু গৌরী যে ভালো গাইতে পারে না—'

'যত ভালো গাইতে পারেন আপনি আর আপনার ছি-ও সাহেবের বৌ।' সুরমা এবার একেবারে ফেটে পড়লো। 'বেশ, নাটক থেকে নাম কেটে দেবেন আমার মেয়ের। দেখি, ইস্কুল কেমন চলে। দেখি আপনি শেষ কী গান গান।'

বলাবাহুল্য নাটক আর অভিনীত হল না। হেডমিসট্রেস ছুটির দরখাস্ত করলো।

ভ্রাম্যমান একটা সিনেমা কোম্পানি এসেছে শহরে। পরিত্যক্ত একটা পাটের গুদাম-ঘর ছিল, তাতেই আস্তানা গেড়েছে।

খুব উৎসাহ চতুর্দিকে। ছবিতে কথা কয়, শব্দ করে, হাসে, ঘুঙুর বাজিয়ে নাচে—কেবল ধরতে গেলেই যা ধরা যায় না। ছেলে-বুড়ো সব চঞ্চল।

'ওরা সব যাচ্ছে, আমরাও যাবো।' কৃষ্ণধনের ছেলেমেয়েরা নাকে কেঁদে উঠলো।

'সব ?' সুরমা প্রশ্ন করলো। 'আভার বাবা-মাও ?'

গৌরী 'হ্যা' বললেও সে বিশ্বাস করতে চাইলো না। আর্দালি পাঠিয়ে ও-বাড়ির চাকরের কাছ থেকে গোপনে খবর আনলো, কথাটা সত্যি।

'ওগো, ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলো, আজ একটু বায়োস্কোপে যাই।' সুরমা কৃষ্ণধনকে প্রথমে অনুরোধ করলো।

অভ্যাসবশেই কৃষ্ণধন 'না' বললে। 'যেমন কদাকার ঘর তেমনি কদাকার ভিড়। এক রিলের পর পাঁচ মিনিট অন্ধকার। তার উপর ডাইনামোর যা শব্দ, তাতে কথা আর কিছু শুনতে হবে না।'

'কিন্তু ও-বাড়ির কর্তা-গিন্নী আজ যাচ্ছে যে।'

'তাই নাকি?' কৃষ্ণধন লাফিয়ে উঠলো। সেটা আর কালহরণ করা কর্তব্য নয়, এমনি একটা সংকল্পের ভঙ্গি।

সব চেয়ে মর্যাদাবান আসনের দাম কত খবর নিতে পাঠালো আর্দালিকে। আর্দালি এসে বললে, সবাইর জন্যে বড়ো এক বাক্স তৈরি করে দেবে, ষোলো টাকা চায়, অনেক কষাকষি মাজামাজি করার পর দশ টাকায় রাজী হয়েছে।

কৃষ্ণধনের মুখ-চোখ শুকিয়ে উঠেছিল, সুরমা ধমকে উঠলো। 'ঐশ্বর্য যদি না দেখাবে তো টাকা রোজগার করে সুখ কী! বিদেশে থার্ড ক্লাসে ট্রাভেল করো কিংবা তীর্থস্থানে গিয়ে ধর্মশালায় থাকো, বুঝতে পারি, কিন্তু নিজের জায়গায় নিজের মান রাখতে হবে তো। তা ছাড়া ওদের চেয়ে যে আমরা উঁচু সেটা না দেখালে চলবে কেন?'

লৌহবর্মাবৃত সর্বঘাতসহ যুক্তি। কৃষ্ণধন দাড়ি কামাতে বসলো।

বায়োস্কোপ-ঘরের সামনে এসে পৌঁছুতে ভিড়ের মধ্যে ভয়ংকর হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—তাদের পথ করে দেবার জন্যে। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ম্যানেজার এল হাঁ-হাঁ করে, বিনয়ে আভূমি নত হয়ে, খাতির করে নিয়ে গেল ভিতরে। সুরমার এই ভেবে দুঃখ হল যে, অভ্যর্থনার এই দৃশ্যটা ওরা দেখলো না।

ওরা দেখবে কি। ওরা আগে থেকেই আরেকটা বাক্স সাজিয়ে বসে আছে। একেবারে পাশাপাশি দুটো বাক্স, মাঝখানে শুধু কঞ্চিতে জড়ানো লাল সালুর পর্দা। এমন গা ঘেঁষে এক লাইনে ওরা বসবে এ যেন অসহ্য! কিন্তু পাল্লা দিতে গিয়ে যদি বেশি পয়সা খরচ করে বসে, তবে সেই বেকুবিকে কী বলা যাবে? ল্যাজে ময়ূরের পাখা গুঁজলেই তো দাঁড়কাক ময়ূর হয় না।

'তোরা বুঝি টিকিট করে এসেছিস।' আভা সম্বোধন করলো গৌরীকে। পরে কতক স্বগতঃ কতক পরতঃ ভাবে বললে, 'ঠিকই তো। টিকিট না কাটলে ঢুকতে দেবে কেন? চেনে কে এখানে?'

'আর তোরা? তোরা এসেছিস বুঝি ভিক্ষে করে, পায়ে ধরে?' স্বগতঃ

পরতঃ ভাবে গৌরীও বললে, 'ঠিকই তো। হাঁটু গেড়ে মিনতি না করলে ঢুকতে দেবে কেন? এমনিতে বাক্সে বসার তোদের মুরোদ কোথায়?'

'আজ্ঞে না। আমাদের পাস দিয়েছে, ফ্যামিলি পাস।' আভা চোখ টান করে বললে, 'বাবাকে আর লাইনবাবুকে পাস না দিলে বায়োস্কোপ এখানে চলবে কী করে? লাইসেন্স দেবে কে? বুঝলি, আমাদের নিজে থেকে আসতে হয় না, আমাদের নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে আসে। তবে বোঝ মুরোদটা কার বেশি।'

পাস শুনে গৌরীর মুখ চুপসে গিয়েছিল বটে, তবু সে আশ্চর্য রকম সামলে নিল নিজেকে। বললে, 'তোদের পাস হচ্ছে ভিক্ষার ছাড়পত্র আর আমাদের টিকিট হচ্ছে ধনীর মানপত্র। তফাৎটা বুঝলি?'

'দ্রাক্ষাপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে শৃগালও তাই বলেছিল বটে।' বললে আভা।

'সিংহবর্মাবৃত গর্দভ এখন কী বলে তাই হয়েছে ভাবনা।' গৌরী উত্তর দিল।

বাড়ি ফিরে এসে সুরমা বাঘাটে গলায় বললে, 'তুমি সইবে এ অপমান? সিনেমা-কোম্পানির নামে তুমি একটা ড্যামেজ সুট করে দাও।'

কিন্তু 'কজ অব অ্যাকশন' কী হবে, কৃষ্ণধন ঘাড় চুলকোতে লাগলো।

দুটি দিনও অপেক্ষা করতে হল না। চণ্ডীবাবু তার মক্কেল ধরলক্ষ্মণ কুণ্ডুকে দিয়ে এক ইনজাংকশনের মামলা রুজু করে দিয়েছেন। যে জমিতে সিনেমা কোম্পানি তাদের ডাইনামো বসিয়েছে সেটা ধরলক্ষ্মণের, তার থেকে অনুমতি না নিয়েই নাকি বসিয়েছে তারা যন্ত্রটা। তার ফলে শুধু অনধিকার প্রবেশই হয়নি, সম্পত্তির অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা হয়েছে। অতএব অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা একটা এখুনি জারি হওয়া দরকার।

আর যায় কোথা! কলমের একটি আঁচড়ে সিনেমা-শো বন্ধ হয়ে গেল।

সুরমার নর্তন-কুর্দন তখন দেখে কে! ও-বাড়ির মুখোমুখি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'ফ্যামিলি পাস পেয়েছেন! যাও না এবার ফ্যামিলি নিয়ে। শো কেমন জমেছে দেখে এসো গিয়ে।'

তারপর এখানে একদিন একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠলো—সত্যিকারের ঝড়। অনেক গাছ পড়লো। নৌকো ডুবলো, বাড়ি-ঘর ধূলিসাৎ হল, গ্রামবাসীদের দুর্দশার আর সীমা রইলো না।

দেশের ডাকে মৃণালিনীর সঙ্গে হেনারানী হাত মেলালো। তাদের পুরনো

মহিলা-সমিতির তরফ থেকে একটা রিলিফ ফাণ্ড বা ত্রাণ-ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। চাঁদার খাতা নিয়ে ঘুরছে তারা বাড়ি-বাড়ি।

ক্রমান্বয়ে তারা শিবানীর দ্বারস্থ হল। তালিকার উপর একবার চোখ বুলিয়েই শিবানী ছুঁড়ে ফেললো খাতাটা। ঝাঁজালো গলায় বললে, 'লিষ্টিতে আমার নাম চতুর্থ কেন? চণ্ডীবাবুর স্ত্রী দ্বিতীয়, পতিতপাবনবাবুর শালী তৃতীয়—বলতে চাও তারাও কি আমার চেয়ে বেশি মানী?'

মৃণালিনী আমতা-আমতা করে বললে, 'লিষ্টিটা হেনা তৈরি করেছে। এককালে ও—'

'লিষ্টিটা আমি কিছু ভেবে করিনি।' হেনা সপ্রতিভের মতো বললে, 'একের পর এক নাম লিখতে গেলে ক্রমিক নম্বর একটা দিতেই হয় লিষ্টিতে। ওটা গুণানুসারে বা পদমর্যাদায় তারতম্য অনুসারে লেখা হয় না। অন্ততঃ এক্ষেত্রে হয়নি।'

'হয়নি তো সুরমাসুন্দরীর নামটা সব শেষে ঢুকিয়ে দাওনি কেন? তার নামটা কেন সবাইর মাথার উপর এনে বসিয়েছ?'

'সেটাও আকস্মিক। নইলে যদি গুণ বিচার করে নাম সাজাতে হয়, তাহলে এক হয়তো হয় একাত্তর আর চার হয় চুরাশি।' খাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে হেনা ছুট দিল।

বাইরে বেরিয়ে এসে মৃণালিনী বললে, 'বলে দেব এককে তুই একাত্তর করেছিস।'

'বলিস। চুরাশির উপরে থাকলেই সে খুশি।'

দেখা গেল আপত্তি শুধু একা শিবানীর নয়। অনেক উকিল গৃহিণীও গাল ফুলোচ্ছে। তাদের স্বামীদের সিনিয়রিটি অনুসারে তাদের নাম সাজানো হয়নি। ত্রিপুরাবাবুর স্ত্রী কেন চণ্ডীবাবুর স্ত্রীর নিচে যাবে? চণ্ডীবাবু তো সেদিনের ছোকরা আর ত্রিপুরাবাবুর চুল পেকেছে। কিন্তু ত্রিপুরাবাবুর স্ত্রীটি যে তৃতীয় পক্ষের। চণ্ডীবাবুর স্ত্রীর চেয়ে বয়সে যে সে অনেক ছোট এ-যুক্তিটা মোটেই শ্রোতব্য নয়। তেমনি মাখন ডাক্তারের স্ত্রী খগেন ডাক্তারের স্ত্রীর নিচে কিছুতেই যেতে পারে না। মাখন ডাক্তার ক্যাম্বেলের, আর খগেন ডাক্তার হোমিওপ্যাথি।

রাগ করে লিষ্টিটা হেনা কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেললো। ত্রাণ পেল সবাই। মৃণালিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোনো ফল হল না।

মৃণালিনীকে হেনা বললে, ‘কুটনি।’
হেনাকে মৃণালিনী বললে, ‘ঢিপির মাকাল।’
ঝগড়াটা যে ঘরের কোণেই আবদ্ধ হয়ে নেই তা বলা বাহুল্য মাত্র। এখন যা দাঁড়িয়েছে, কৃষ্ণধন আর কুঞ্জবিহারী কেউ কারু মুখের দিকে তাকায় না। কোনো সভায় এ সভাপতি হলে ও যায় না, ও সভাপতি হলে এর অসুখ করে। সব চেয়ে বিপদ দাঁড়ালো অফিসার্স ভার্সেস বারের বার্ষিক ফুটবল খেলার দিন। কৃষ্ণধন আর কুঞ্জবিহারী পাশাপাশি ফরোয়ার্ড খেললেও কেউ কাকে একটা পাস দিলে না। অথচ যে-কেউ একজন যে ব্যাকে কি হাফব্যাকে খেলে খেলাটা বাঁচাবে তারও কোনো চেষ্টা নেই। যে ব্যাকওয়ার্ড খেলবে অন্যের কাছে তারই তো অপমান।
কিন্তু ব্যাপার চরমে দাঁড়ালো প্রদোষবাবুকে নিয়ে।
প্রদোষ এখানকার একমাত্র গাইয়ে। ফেয়ারওয়েল পার্টিতে বলো, শোভাযাত্রায় বলো, সেই এখানকার একশ্চন্দ্র। আভা ও গৌরীর সে গানের মাস্টার।

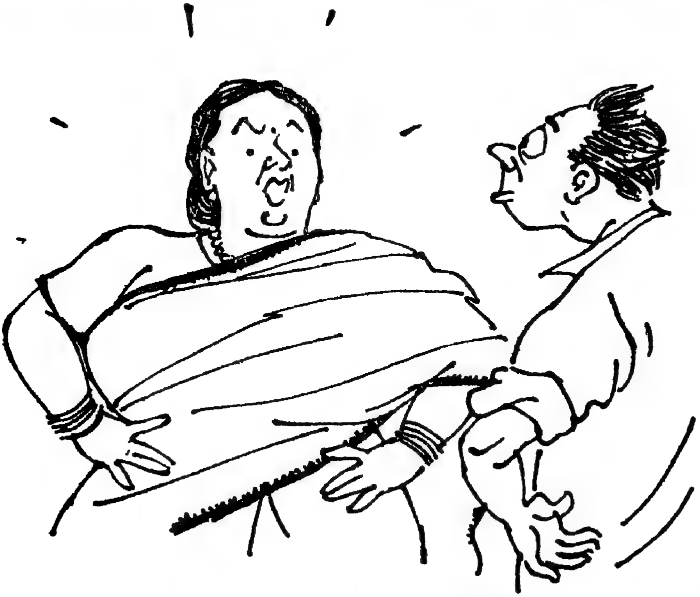

আভার মাস্টার আছে বলেই গৌরীর জন্যেও রাখতে হয়েছে, নচেৎ গৌরী গ্রামোফোনের রেকর্ড চালিয়েই যা মুখস্থ করে এসেছে এতকাল। প্রদোষ গৌরীকে শেখাতে আসতো সকালে, আভাকে বিকাল বেলা। ইদানীং চাহিদা তার খুব বেড়ে গেছে বলে টাইম-টেবলটা তার কিছু অদল-বদল করতে

হল। যার ফলে আভা থাকলো ঠিক তার আগের জায়গায় পাঁচটা থেকে ছটা, আর গৌরী ছিটকে পড়লো সকাল থেকে সন্ধ্যেয়, সাড়ে-ছটা থেকে সাড়ে-সাতটায়।

সুরমা মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'ককখনো না।'

প্রদোষ বললে, 'আমাদের পাড়ার কয়েকটা জুটে গেছে সকালের দিকে। তাই এ পাড়ার সবগুলিই বিকেলের দিকে রাখতে চাই।'

'তা রাখুন, তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে গৌরীকে পাঁচটা থেকে ছটা করে দিন, আর আভাকে নিয়ে যান তারপরে। আভাকে আগে শিখিয়ে এসে গৌরীর বেলায় আপনার গলার আর জোর থাকবে না।'

প্রদোষ হাসলো, জানালো, সময়ের এই সামান্য হেরফেরে তার আপত্তি নেই।

কিন্তু আপত্তি হল শিবানীর। সে বললে 'বাঃ, তা কেন? আভা যেখানটায় আছে সেখানেই থাকবে—পাঁচটা থেকে ছটা! সকালে আপনার অসুবিধে হচ্ছে, গৌরীকে আপনি যেখানে খুশি নিয়ে যান দিন-দুপুর থেকে রাত-দুপুরে। আমার জায়গা থেকে আমি নড়তে পারবো না একচুল। শেষকালে গৌরীর উচ্ছিষ্ট এনে আভাকে দেবেন তা হবে না।'

প্রদোষ পড়লো বিপদে। পরে ঠিক করলো প্রথমে যা ঠিক করেছি, তাই ঠিক থাকবে। এতে চাকরি যায় তো যাবে, কুছ পরোয়া নেই।

জানালো গিয়ে সুরমাকে। রাগে সুরমার ঘাড়টা হঠাৎ উবে গেল। মুখ ফুটে কিছু সে বলতে পারলো না। কেননা, প্রদোষই এখানকার আদি ও অকৃত্রিম গানের মাস্টার।

সেদিন আভাদের বাড়িতে গান ধরেছে প্রদোষ, হঠাৎ সে একটা প্রচণ্ড গোলমাল শুনতে পেল। গলার গোলমাল নয়, বাজনার গোলমাল। ব্যাগপাইপের বাজনা নয়, ক্যানেস্তারা পেটার বাজনা। হারমোনিয়াম ফেলে বেরিয়ে এল প্রদোষ। দেখলো কৃষ্ণধনের বাড়ির গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে কোর্টের পিওনরা সমান তালে ক্যানেস্তারা পিটছে। জগঝম্পও ভালো, এ ব্যাঘ্রঝম্প।

কুঞ্জবিহারীও নিতে জানে প্রতিশোধ। যত ইউনিয়ন ছিল তার এলাকায় নিয়ে এল তাদের সব চৌকিদার আর দফাদার। নীল কুর্তা পরে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে গেল সব কোমরবন্দ এঁটে। গৌরীদের বাড়িতে প্রদোষ তখন সবে গলা ছেড়েছে, সবাই এক সঙ্গে ঘা দিয়ে উঠলো সাত-সাতখানা টিনের উপর।

সুরমা বললে, 'না, থামবেন না, চালিয়ে যান—'

'আপনি পাগল হয়েছেন ?' প্রদোষ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো, 'শেষকালে রাজায়-রাজায় যুদ্ধে উলুখড়ের প্রাণ যাবে ?'

প্রদোষ আর এ-মুখো হল না।

বড়োদিনের ছুটিতে দু-পক্ষই কলকাতা যাবে বলে রব উঠেছে। সুরমা বলছে, সেকেণ্ড ক্লাসে যেতে ওরা যাতে নাগাল না পায়। শিবানী বলছে সেকেণ্ড ক্লাসে যেতে, ওরা যা ভাবতেও পারে না। কৃষ্ণধন আর কুঞ্জবিহারী বলছে অযথা কতগুলি টাকার শ্রাদ্ধ। লম্বা ঢালা প্রকাণ্ড ইণ্টার ক্লাস দেয়, অনেক সহযাত্রী পাওয়া যাবে এ-সময়, কিছু ভাবনার নেই, চুপচাপ চলে যাওয়া যাবে ঠিকঠাক।

জমিদারের কাছারিতে ঝিনুকের কাজ করা পাল্কি ছিল একখানা। দু-পক্ষ এসে আবেদন করতেই জমিদারের নায়েব পাল্কিসহ বেহারাদের পাঠিয়ে দিলে আরেক কাছারিতে।

সবচেয়ে ভালো যে গোরুর গাড়িখানা জোগাড় হয়েছে তা কৃষ্ণধনের জন্যে। গ্রামান্তর হতে কুঞ্জবিহারী আরেকখানা জোগাড় করে আনলো যার বলদ দুটো অনেক বেশি জোয়ান, ছইটা অনেক বেশি উঁচু, এক হাত মোটা যাতে খড় বিছানো। গ্রামান্তরের খবর কৃষ্ণধন জানে কী!

ইণ্টার ক্লাসের জানালার দিককার দুটো ধার দু-পক্ষ অধিকার করে বসলো। সৈন্যবলে দু-পক্ষই প্রায় সমান, অস্ত্রশস্ত্রেও বিশেষ তারতম্য দেখা গেল না। দু-পক্ষেরই সেই জলের কুঁজো, মিষ্টির হাঁড়ি, তরকারির বাস্কেট। যার-যার এলাকায় যার-যার লাইন ঠিক রাখবার জন্যে যে-যে ব্যস্ত। কেউ কারু দিকে অপাঙ্গস্ফুরণও করছে না।

গাড়ি তো ছাড়লো।

কুঞ্জবিহারী ধরালো সিগারেট, কৃষ্ণধন ধরালো চুরুট ; শিবানী পড়তে বসলো ইংরেজি খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে, সুরমা বাক্স থেকে খুলে আনলো একটা মোটা ইংরেজি অমনিবাস ; খুব টান-করে চুল বাঁধা আভা গান ধরলো—শতেক বরষ পরে, আর টাই-বাঁধা ব্লাউজ গায়ে গৌরী গান ধরলো—তার বিদায়বেলার মালাখানি।

অথচ কারু দিকে কারু ভ্রূক্ষেপ নেই।

একটা বড়ো স্টেশন থেকে গাড়ি বদল করে এক দঙ্গল লোক ঢুকে পড়লো কামরাতে। অনেক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছিল এরা, অনেক গুটিয়ে নিতে হল। তবু সবাইর জায়গা করা গেল না।

মেয়েদের বসা অর্থ পুরুষের অর্ধশোয়া। তাই একদল প্রস্তাব করলে, 'ওঁদের দুজনকে একপাশে দিয়ে দিন না, তা হলেই দুজনের বসবার জায়গা হবে।'

কিন্তু যে উঠে যাবে অন্য পাশে তারই যে পরাজয়, তাই সুরমা আর শিবানী দুজনেই প্রাণপণে মাটি কামড়ে পড়ে রইলো।

'আরে আপনারা সবাই পাগল হয়েছেন নাকি?' কে আরেকজন কৃষ্ণধন আর কুঞ্জবিহারীকে যুগপৎ সম্বোধন করলো।

'অন্ধকারে দেখতে পাননি বুঝি? পাশেই তো ইণ্টার ক্লাস ফিমেল। একদম ফাঁকা গাড়ি। ওঁদেরকে ওখানে পাঠিয়ে দিন না।'

'ঐ দেখছেন না, দেয়ালের মাঝখানে ফোকর।' কে আরেকজন ছিদ্র খুলে দেখিয়ে দিল ও-দিকের ঘরটা।

'আরে মশাই, আপনারা তো এক স্টেশন থেকে আসছেন। তবে তো ওঁদের কোনোই অসুবিধে নেই এক কামরায় বসবাস করতে।' কে আরেকজন বললে।

'দেয়ালের মাঝখানে ফোকর, সঙ্গে ছেলেপিলে, এক জায়গার বাসিন্দা, চেনাশুনো—এ তো মশাই সোনায় সোহাগার উপর আরো কিছু।' কে আরেকজন বললে, 'গাড়ি ছাড়ার এখনো ঢের দেরি, আস্তেসুস্থে ওঁদেরকে চালান করে দিন ও-ঘরে। এখানে থাকলে ওঁরাও স্বস্তি পাবেন না। আমাদেরও ত্রিশঙ্কুর অবস্থা।'

নির্বন্ধাতিশয্যটা ক্রমশই গা-জুরির মতো দেখাতে লাগলো।

কুঞ্জবিহারী আর কৃষ্ণধনের সাধ্য নেই বশ্যতা স্বীকার না করে পারে। আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিটা যে অকাট্য তাতে আর সন্দেহ কী।

সুরমা ফোঁস করে উঠলো, 'তখনই বলেছিলাম সেকেণ্ড ক্লাস করো।'

ও-পার থেকে শিবানীও উঠলো ঝামটা মেরে, 'সেকেণ্ড ক্লাস বলতে যেন মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছিল।'

আর অস্ফুটস্বরে কৃষ্ণধন আর কুঞ্জবিহারী যুগপৎ বললে, 'সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িও মোটে একখানা এ-লাইনে। সেকেণ্ড ক্লাস হলেও দেখা হবার সেই সমান সম্ভাবনা ছিল দেখা যাচ্ছে।'

কেউ কারু দিকে না তাকিয়ে সুরমা আর শিবানী দুই দরজা দিয়ে নেমে গেল এবং পাশের ঘরে গিয়ে তাদের রণক্ষেত্র বিস্তৃত করলে।

গাড়ি আবার ছাড়লো।

পুরুষদের গাড়িটা লোকে-লোকারণ্য। ভিড়ের চাপে কোণঠাসা হয়ে কৃষ্ণ আর কুঞ্জ দু-বেঞ্চিতে বসে আছে চুপচাপ। দুজনেরই চোখ দূরবর্তী দেয়ালের মধ্যেকার ছিদ্রাবরণের দিকে। ডাকিনী যোগিনীরা কী না-জানি ভীম-ভৈরব কাণ্ড বাধিয়েছে এতক্ষণে।

কৃষ্ণের ইচ্ছে করে, আবরণ অপসারণ করে দেখে নেয় চেহারাটা, কিন্তু ভিতরের বস্তু সব তার নিজের নয় ভেবে সাহস পায় না। কুঞ্জেরও যে সমান ইচ্ছে তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু তারো ভয়, একটা না আবার ইনজাংকশান জারি হয়ে যায়।

কারু দিকে কারু দৃষ্টিপাত নেই অথচ কাষ্ঠাবরণটুকুও নড়ে না।

প্রায় মাঝরাতে কি একটা স্টেশনে, হঠাৎ খুলে গেল সেই কাঠের ঠুলি। প্রায় একই সঙ্গে দেখা গেল দুটো মুখ—প্রথমে আভার, পরে গৌরীর। দুজনেরই চাউনি ভয়-বিহ্বল। দুজনেরই কণ্ঠে এক স্বর—"বাবা শিগগির এসো।"

কী না জানি সর্বনাশ হয়ে গেছে। কুঞ্জ আর কৃষ্ণ এবার একই দরজা দিয়ে অবতরণ করলো।

মেয়েদের কামরায় ঢুকে দুজনেরই চক্ষুস্থির।

দেখলো সুরমার কোলে মাথা রেখে কাত হয়ে শান্তিতে চোখ বুজে শুয়ে আছে শিবানী।

কুঞ্জবিহারী ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে, "কী, শরীর খুব অসুস্থ বোধ করছে নাকি? স্ট্রেচার এনে নামাতে হবে নাকি?"

শিবানীর চুলে হাত বুলুতে বুলুতে সুরমা বললে, "ব্যথা একটা উঠেছিল খুব। এখন আবার জুড়িয়ে গেছে। বোধ হয় এটা ফল্‌স্।"

"কোন্‌টা?" বললে কৃষ্ণধন।

"পেন্‌টা, আমার এই সেবাটা নয়।"

কুঞ্জবিহারী আর কৃষ্ণধন একসঙ্গে তাকালো চারদিকে। দেখলো দু-দলেরই ছেলে-মেয়েগুলো লাইন ভেঙে, আল-বেড়া ডিঙিয়ে এখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছে; একই কমলালেবু থেকে কোয়া খুলে খুলে খাচ্ছে গৌরী আর আভা, আর বুকের কাছে শিবানীর মুঠির মধ্যে সুরমার একটা হাত ধরা।

"কী বলেন, নামিয়ে নেব নাকি এখানে ?" কুঞ্জবিহারীর প্রশ্নটা এবার সুরমার প্রতি স্পষ্টীভূত হল।

"দরকার নেই। উলটে বিপদ বেড়ে যেতে পারে এখানে। শুভেলাভে কলকাতা পৌঁছে যেতে পারবো আশা করি।" অসংকোচে বললে সুরমা।

শিবানী চোখ মেলে ঈষৎ সলজ্জ ও স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "সুরো যখন আছে কিছুই আর আমার ভয় নেই।" সুরমার হাতখানা আরো সে টেনে আনলো নিকটে। বললে, "ভাগ্যিস ওকে পেয়েছিলাম।"

"চুপ কর, বানী", সুরমা স্নেহে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বললে, "মেয়ে হয়ে মেয়ের এই দুর্দিনে কেউ কখনো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে ? নে ওঠ, খা কিছু।"

মিষ্টির হাঁড়ি দুটো একাকার হয়ে গেল। জলের কুঁজোর জাত বাঁচানো গেল না।

সুখী পরিবার--ভাবলে কুঞ্জবিহারী, ভাবলে কৃষ্ণধন।

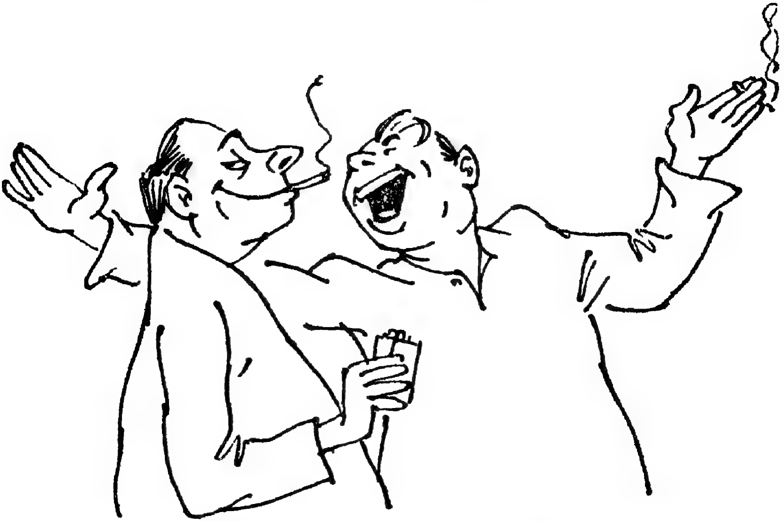

কুঞ্জবিহারী সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরলো কৃষ্ণধনের দিকে। বললে, "মে আই —"

কৃষ্ণধন সিগারেট একটা নিয়ে সজোরে কুঞ্জবিহারীর কাঁধ চাপড়ে দিল, বললে, "কনগ্র্যাচুলেশনস্ ওল্ড বয়।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র ( ১৯০৪—)

# একটি অমানুষিক আত্মত্যাগ

খবরের কাগজ যাঁহারা নিয়মিতভাবে পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, ১৯৪৫ সালের ৩রা ভাদ্র তারিখের বঙ্গবাণী পত্রিকার সাতের পাতায় তৃতীয় কলমের ৩০ লাইন পরে একটি বিস্ময়কর সংবাদ বাহির হইয়াছিল। স্মরণশক্তি যাঁহাদের সবল নয় তাঁহাদের জন্য উক্ত সংবাদটি এখানে যথাযথভাবে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

### গৌহাটি নগরে বিষম চাঞ্চল্য

### রাজপথে ব্যাঘ্রের আবির্ভাব

> গতকল্য সন্ধ্যার পর কেমন করিয়া একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র নগরের ভিতর প্রবেশ লাভ করে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত শহরের নানা স্থানে বহু ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ভীত হয়। ব্যাঘ্রটিও শহরের ভিতর হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়! সকাল বেলা জনৈক শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর বাড়ির নিকট দিয়া যাইবার সময় উক্ত ভদ্রলোকের বন্দুকের গুলিতে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। সুখের বিষয় নগরের কোনো ব্যক্তির তাহার দ্বারা কোনো অনিষ্ট হয় নাই।
> ২রা ভাদ্র, গৌহাটি।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা একবাক্যে চিরকাল প্রচার করিয়া আসিয়াছেন যে, নিশ্চয় কোনো ঘটনাই অকারণ বা নিরর্থক নয়। সুতরাং গৌহাটি শহরে এই ব্যাঘ্র প্রবরের আবির্ভাবেরও কোনো না কোনো দিক দিয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল।

সে প্রয়োজন যে কি তাহা বুঝিবার পুর্বে কিন্তু আমাদের আত্মনাথের জীবন বৃত্তান্ত কিছু জানা আবশ্যক।

আত্মনাথ বিংশ শতাব্দী অপেক্ষা বয়সে বছর আটেকের ছোট হইলেও কল্পনায় চিন্তায় তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষের মোটরকারের মডেল অপেক্ষাও সে ঝকঝকে, তকতকে, আধুনিক। কলিকাতা নগরীতে এমন কোনো সভা-সমিতি বা সম্মিলনী হয় না যেখানে আত্মনাথকে তাহার রূপা

বাঁধানো ছড়ি, গগলস চশমা ও মাদ্রাজী চাদর সমেত দেখা না যায়। তাহার কবিতা বাংলার প্রায় সমস্ত মাসিকেরই পাদপুরণ করিয়া থাকে এবং এদেশের

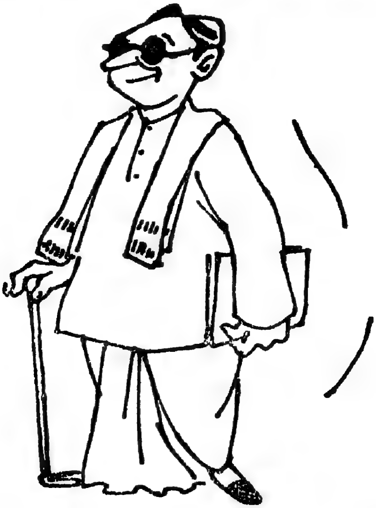

যে কোনো স্বল্পায়ু পত্রিকা খুলিলেই দেখা যায় আত্মনাথের রচিত গল্প তাহার শোভা বর্ধন করিতেছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পূর্বে আত্মনাথ কখনও ইলেকট্রিক লাইট দেখে নাই এবং তাহাদের পদ্মাতীরস্থ গ্রামের মৈনুমাঝির 'গহনার' নৌকা ছাড়া কোনো বাহন ব্যবহার করে নাই। সেই জন্যই কলেজে পড়িবার জন্য প্রথম কলিকাতায় আসিয়া আত্মনাথ শহরের ঐশ্বর্যে ও আড়ম্বরে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। এবং দুই বৎসরের মধ্যে আত্মনাথকে আর চিনিবার উপায় রহিল না। পরিবর্তন যে শুধু তাহার বেশভূষায় ও আচরণে ঘটিল তাহা নয়, তাহার মনোজগতেও সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। আত্মনাথের সে উৎকট উৎকর্ষের পরিচয় কিন্তু আমরা দিতে অক্ষম, পাঠকদের অনুমানের উপরই তাহা ছাড়িয়া দিলাম।

কলেজে পড়িতে আসিয়া প্রথম প্রথম আত্মনাথ ছুটিতে দেশে যাইত, কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল কলিকাতাতে তাহার কাজ এত বেশি যে দেশে যাইবার তাহার অবসর নাই, অন্ততঃ মা চিঠির পর চিঠিতে তাহাকে আসিতে লিখিয়া ওই কথাই জবাব পাইতেন।

আত্মনাথের দেশের প্রতি বিরাগের কারণ ছিল। তাহার পিতা সেকেলে লোক, একালের প্রয়োজনে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিতে দিয়াছিলেন বটে,

কিন্তু তাহার রীতিনীতির পরিবর্তন সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

আত্মনাথ যতবড়ো আধুনিকই হোক না, রাশভারী পিতার মুখের উপর কথা কহিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারে নাই। দেশে গিয়া তাহার নব্যরুচি ও মতামত প্রতিক্ষণেই ক্ষুণ্ণ হইত।

সেখানে সকালে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের পূজার আগে আহার নিষেধ। সেখানে রাতদিন জামা গায় দিয়া থাকা অনাবশ্যক বিলাস, সেখানে পানীয় হিসাবে চায়ের কোনো মূল্য নাই এবং সেখানে জুতার স্থান একমাত্র বাহিরের ঘরে। শুধু তাই নয়, সেখানে নিত্য-নিয়মিত ভাবে গৃহের পুরোহিতকে প্রতিদিন প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইতে হয়।

আজকালকার দিনে কোনো সংসারের এমন নিষ্ঠার কথা শুনিলে যদি বাড়াবাড়ি মনে হয় তাহা হইলে আমি নাচার। আত্মনাথের পিতৃভাগ্য এমনি।

দেশে থাকিতে আত্মনাথ এ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে পারে না। সেজন্য এ সমস্ত এড়াইবার সহজ উপায় স্বরূপ সে দেশে যাওয়াই বন্ধ করিয়াছে।

আত্মনাথ কয়েক বৎসর এমনি করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া আধুনিকতা যতখানি আয়ত্ত করিল, বিদ্যাটা তেমন করিয়া পারিল না। বি-এ পরীক্ষায় বার দুই ফেল করিয়া আরো পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো মস্তিষ্কের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে পিতার প্রদত্ত মাসহারার আশা ও কলিকাতায় থাকাও ছাড়িতে হয়, একথা আত্মনাথ জানিত। উপায়ও সে একটা করিল। ইতিপূর্বে খ্যাত অখ্যাত নানা মাসিকে ও সাপ্তাহিকে বাংলা সাহিত্যকে কয়েক যুগ আগাইয়া দিবার সে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে—তাহারই জোরে একটি বাংলা কাগজে তাহার কাজ জুটিয়া গেল। এবং সংবাদটা আত্মনাথের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কোনো রকমে দেশে পৌঁছিল।

পুত্রের চাকরির সংবাদে খুশি হওয়া দূরে থাক পিতা পত্রে লিখিলেন, ‘তোমার লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়ার সংবাদে দুঃখিত হইলাম। যাহাই হউক এই পত্র পাওয়া মাত্র দেশে চলিয়া আসিবে। তোমার চাকরির কোনো প্রয়োজন নাই। এখনও রায় পরিবারের যাহা আছে তাহাতে তাহাদের বংশের কাহাকেও চাকরি করিতে হইবে না।’ মাতা সে চিঠির সঙ্গে একটি ছোট কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন, ‘তোমার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছি,

কলিকাতায় আর তোমার থাকিবার দরকার নাই।'

বলা বাহুল্য আত্মনাথ কোনো পত্র পাইয়াই খুশি হইতে পারিল না। চাকরি করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও কলিকাতায় বাস তাহার না করিলেই নয়। দেশে সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য যাহাই থাক, তাহার মনের উৎকর্ষের উপযোগী চিন্তা ও সৃষ্টির আবহাওয়া নাই। সেখানে সে কোনো মতেই আর বাস করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জীবনের সঙ্গিনীরূপে যে মানসীকে সে এতদিন ধরিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, মাতার পছন্দ করা পাড়াগেঁয়ে মল ও নোলক পরা মেয়ের সহিত তাহার কোনো দিক হইতে মিল হইবে না, সে জানে। আত্মনাথ নানা রকম ওজর আপত্তি তুলিয়া দেশে যাওয়া ও আসন্ন বিবাহ, উভয় বিপদই কোনো রকমে ঠেকাইয়া রাখিল। কিন্তু বেশিদিন এমন করা চলিল না।

মাতার সাংঘাতিক অসুখের তার পাইয়া আত্মনাথ দেশে গিয়া দেখিল বিবাহের আয়োজন চলিতেছে।

এই প্রবঞ্চনায় আত্মনাথ চটিল, কিন্তু পিতার সামনাসামনি প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। বিবাহ তাহাব হইয়া গেল।

যেমনই হোক বিবাহের রাত্রের বোধহয় একটা নেশা আছে। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেও আত্মনাথের আগাগোড়া ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগিতেছিল বলা যায় না, শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটিকে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিয়াও চেহারার খুঁত সে বিশেষ বাহির করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত হয়তো সব ভালোই হইত কিন্তু বাসর ঘরে শ্যালিকা সম্পর্কীয়া গ্রাম্য মেয়েরা তাহার মেজাজ একেবারে চটাইয়া দিল। বাংলাব আধুনিক চিন্তা ও শিল্পজগতের একজন উদীয়মান দিকপালের কোনো সম্মান তাহারা রাখিল না। নানাপ্রকার অসভ্য, অভদ্র, ইতরজনোচিত রসিকতা করিয়া তাহাকে একেবারে নাকাল করিয়া তুলিল। ইহার উপব আবার তাহার নববিবাহিতা বধূ নীলিমা একসঙ্গে তাহার লাঞ্ছনায় ঘোমটাব তলাতেও হাসি চাপিতে না পারিয়া তাহার মন একেবারে বিষ করিয়া দিল।

নীলিমার ভাগ্য মন্দ। ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী তাহার সহিত কথাই কহিল না এবং তাহার পবদিন যখন সে শুনিল যে আত্মনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় পলাইয়া গিয়াছে, তখন তাহার লজ্জা ও দুঃখের অবধি রহিল না।

ইহার পর আর বহুদিন আগুনাথ ও নীলিমার দেখা হয় নাই। আগুনাথের পিতা অত্যন্ত তেজস্বী লোক। পুত্রের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া তিনি তাহার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়াছেন। আগুনাথ আর দেশেও যায় না। যাইবার তাহার বিশেষ ইচ্ছাও নাই। আদ্যনাথ কলিকাতায় না থাকিলে বাংলার সাহিত্য যে কানা হইয়া যায়।

নীলিমার পিতা জামাইকে দেশে আনিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আগুনাথের মন গলে নাই। যে সব অসভ্য অশিক্ষিত মেয়েদের হাতে সে অমন অভদ্রভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহাদেরই অনুরূপ একটি নোলক-পরা গ্রাম্য মেয়ের প্রতি তাহার মনে কোনো করুণা নাই।

ইতিমধ্যে আগুনাথ ও নীলিমার মধ্যে মাত্র দুইটি চিঠি লেখালেখি হইয়াছিল। স্বামীর অবহেলায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া লজ্জার মাথা খাইয়া সখীদের অনুরোধে নীলিমা একবার একটি চিঠি লিখিয়াছিল।

আগুনাথ তাহার উত্তরে যাহা লিখিয়াছিল তাহা আমরা প্রকাশ করিয়া দিলাম।

আগুনাথ লিখিয়াছিল, 'তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি আমার পত্রের উপর "শ্রীচরণেষু" কেন লিখিয়াছ বুঝিতে পারিলাম না। তুমি আমার ক্রীতদাসী নও যে আমার চরণ বন্দনা করাই তোমার কাজ। তাছাড়া আমার শুধু চরণেই তুমি যদি শ্রী দেখিয়া থাকো তাহা হইলে আমার পক্ষে সেটা গৌরবের কথা নয়। "শ্রীচরণেষু" বানান করিতেও তুমি ভুল করিয়াছ। তোমার পত্রে বানান ভুল ওই একটি নয়, আরও যথেষ্ট আছে। ভালো করিয়া লেখাপড়া না শিখিয়া চিঠি লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমাকে প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করিতে তোমার কোন্ সখী শিখাইয়াছে জানি না, কিন্তু এইটুকু বুঝিতে পারি যে, কোনো সভ্য মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয় নাই। ফুল-আঁকা লাল চিঠির কাগজ ব্যবহার করিতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।'

ইহার পর তাহারা কেহ কাহাকেও চিঠি লেখে নাই। এমন করিয়া কতদিন যাইত বলা যায় না, কিন্তু ইহার ভিতর গৌহাটিতে বড়োগোছের একটা সম্মিলনী বসিল এবং আগুনাথকে তাহার কাগজের তরফ হইতে বিশেষ সংবাদদাতা-রূপে সেখানে যাইতে হইল।

সম্মিলনী শেষ হইয়াছে। আদ্যনাথ কলিকাতায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় হঠাৎ রাস্তায় আশ্চর্যভাবে তাহার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। শ্বশুর

মহাশয় আকাশের চাঁদ হঠাৎ ধূলির ধরণীতে নামিয়া আসিয়াছে—এমনি ভাব দেখাইয়া বলিলেন, 'তুমি এখানে ? ক-টার ট্রেনে এলে ? আজ বড়ো জরুরী কাজে একটু সকালে বেরুতে হয়েছিল, নইলে দেখা হয়ে যেত।'

সে তাঁহাদের বাড়িতেই আসিয়াছে, এমন ভুল করার ধৃষ্টতার জন্য শ্বশুরের উপর চটিয়া আত্মনাথ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, 'আমি আজ আসিনি, আমি যাচ্ছি ; এখানকার সম্মিলনীতে এসেছিলাম গত রবিবার।'

পলকের মধ্যে শ্বশুরের মুখে গভীর পরিবর্তন দেখা গেল। অত্যন্ত ক্ষুণ্নস্বরে তিনি বলিলেন, 'এখানে এতদিন এসেছ, আর আমাদের সঙ্গে দেখা করোনি ?'

আত্মনাথ এবার সত্য কথাই বলিল, 'আপনারা এখানে এসেছেন তা কেমন করে জানব ?'

'বাঃ, আমি যে এখানে বদলি হয়েছি আজ তিন মাস তা জানতে না ?'

না জানিবারই কথা। গত কয়েক মাস শ্বশুরবাড়ির চিঠিব প্রতি বিশেষ মনোযোগ সে দেয় নাই। আত্মনাথ চুপ করিয়া রহিল।

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, 'বেশ, এখন তো জানলে, আজ আর না দেখা করে যেতে পারবে না।'

একা থাকিলে রূঢ়ভাবে হোক বা যে কোনো ওজর আপত্তি তুলিয়া হোক আত্মনাথ এ নিমন্ত্রণ এড়াইয়া আসিতে পারিত। কিন্তু সঙ্গে কলিকাতার জন দুই বন্ধু ছিল। ইহাদের কাছে তাহার বিবাহের সংবাদ গোপন করিয়া রাখার দরুন অমনিই সে এখন বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্বশুর মহাশয়ের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল তিনি প্রয়োজন হইলে শেষ অস্ত্র হিসাবে ইহাদের কাছে জামাইয়ের নিদারুণ ঔদাসীন্য সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। আত্মনাথ 'না' বলিতে পারিল না, কিন্তু রাস্তার মাঝে হঠাৎ এমনভাবে আবির্ভূত হইয়া তাহার সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া বন্ধুদের কাছে অপ্রস্তুত করিবার জন্য শ্বশুর এবং তাঁহাব সমস্ত পরিবারবর্গেব উপর বিষম বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল।

এতদিন বাদে জামাতার আগমনে তাহার আদর আপ্যায়নের যেরূপ ঘটা হইল তাহাতে আর কিছু না হোক আত্মনাথের অহংকার তৃপ্ত হইবার কথা। সাহিত্য জগতে তাহাব মূল্য যে কত তাহার একটা হিসাব আত্মনাথ মনে মনে করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সে মূল্য এখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে কেহ দেয় নাই। এই একটি বাড়িতে পৃথিবীর এত লোকের মাঝে তাহাব জন্যই এতখানি সম্মান

যে জমা হইয়া আছে তাহা জানিতে পারিয়া আত্মনাথ হয়তো সম্পূর্ণভাবে খুশিই হইত, কিন্তু সে খুশির মাঝে একটি খুঁত রহিয়া গেল।

বাসর ঘরে তাহাকে যাহারা অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছিল তাহাদেরই অধিনায়িকাকে এ বাড়িতে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মন দমিয়া গেল। জানা গেল মলিনা সম্পর্কে তাহার স্ত্রীর মামাতো বোন, কয়েক দিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে।

মলিনা প্রথমটা নিরীহ ভালো মানুষের মতো যে ভাবে আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিল তাহাতে আত্মনাথের আশঙ্কা অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই নিজের ভুল সে বুঝিতে পারিল।

শ্বশুরের বিস্তর অনুরোধ অনুযোগ সত্ত্বেও জরুরী কাজের অজুহাত দেখাইয়া আত্মনাথ, সন্ধ্যার পরই তাহাকে কলিকাতায় যাইবার জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়াছিল, জামাতা যদি বা অনেক কষ্টে একবার আসিয়াছে তাহাকে বেশি থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া চটাইতে শ্বশুর মহাশয়ের সাহস হয় নাই। আত্মনাথ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। এমন সময় শাশুড়ী ঠাকরুণ প্রসন্নমুখে আসিয়া বলিলেন, ‘তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে এলাম বাবা, তোমাদের বাড়িতে যে নিয়মের কড়াকড়ি, রাত্রে তুমি মাংস খাবে তো?’

আত্মনাথ অবাক হইয়া বলিল, ‘মাংস! রাত্রে তো আমি খাব না, আমায় খানিক বাদে কলকাতা যেতে হবে যে।’

মলিনা সঙ্গেই আসিয়াছিল। শাশুড়ী একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, ‘বাঃ এই যে মলিনা বললে—তুমি থাকতে রাজী হয়েছ।’

আত্মনাথকে কোনো কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া মলিনা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ‘আহা, এখন আবার লজ্জা দেখানো হচ্ছে! অত ভণ্ডামি কেন বাপু, এই মাত্র আমায় কি বললে?’

লজ্জায় রাগে আত্মনাথের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। মলিনা আবার বলিল, ‘তুমি যাও না, পিসিমা। দু-বছর গা ঢাকা দিয়েছিলেন; তাই এখন লজ্জা হয়েছে বুঝতে পারছ না!’

শাশুড়ী ঠাকরুণ চলিয়া গেলেন। আত্মনাথ গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

ফুলশয্যার রাত্রের পর স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম দেখা!

আত্মনাথ ঘরে ঢুকিতেই নীলিমা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসিটি ভারী

মিষ্ট। কিন্তু আত্মনাথের মন তখন মলিনার শঠতায় তিক্ত হইয়া আছে। নহিলে সে শুধু হাসি নয়, অনেক কিছুই দেখিতে পাইত। দুই বৎসরে নীলিমার শ্রী অনেক ফিরিয়াছে। তাহার বেশভূষায় যে গ্রাম্যতা সম্বন্ধে আত্মনাথের বিরূপতা, তাহারও আর কোনো চিহ্ন নাই। ফিকে নীল একটি ব্লাউজের উপর চওড়া কস্তাপাড় শাড়িটিতে তাহাকে চমৎকার মানাইয়াছে। আত্মনাথ কোনো দিকেই নজর না দিয়া গম্ভীর হইয়া খাটের একধারে গিয়া বসিল। কিন্তু স্বামীর ঔদাসীন্যে অভিমান করিবার অবসর আর নীলিমার নাই। এই দুই বৎসরে সে অনেক দুঃখ পাইয়াছে। নিজেই অগ্রসর হইয়া সলজ্জভাবে স্বামীর একটা হাত ধরিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, 'তুমি আমার উপর রাগ করেছ?'

আত্মনাথ হাতটা ছাড়াইয়া লইল, উত্তর দিল না। নীলিমার চোখে হয়তো জল আসিল, তবু সে নিরস্ত হইল না। আর একবার স্বামীর হাত ধরিয়া সে বলিল, 'আমার কি দোষ বলো?'

আত্মনাথ তিক্ত কণ্ঠে বলিল, 'তোমরা সব সমান, ওই মলিনার তো তুমি বোন। আর, এ রকম জুয়াচুরি করে আমায় একদিন ধরে রেখে খুব লাভ হবে মনে করেছ!'

কথাটা বড়ো রূঢ়। তবু নীলিমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'দিদির কি দোষ বলো, আমাদের জন্যেই তো করেছে। তোমার নিজের কি একদিন থাকার ইচ্ছে হয় না?'

আত্মনাথ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'না।'

নীলিমা এবার অত্যন্ত আহত হইল। আজ সে অনেক আশা করিয়া স্বামীর দেখা পাইবার জন্য বসিয়া ছিল। শোবার ঘরের কুলুঙ্গিতে তাহার বই খাতা সাজানো। এই দুই বৎসর স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে কি ভাবে পড়াশুনা করিয়াছে, কতখানি নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে লিখিতে শিখিয়াছে, তাহার বড়ো আশা ছিল সমস্তই সে স্বামীকে দেখাইবে। এই রূঢ় আঘাতে সমস্ত আশা চুরমার হইয়া তাহার একটু রাগই হইল। বলিল, 'তা হলে তুমি না থাকলেই তো পারতে।'

স্বরে ঈষৎ কাঠিন্যের পরিচয় পাইয়া আদ্যনাথ একটু অবাক হইয়া বলিল, 'তাই নাকি।'

নীলিমা আরও কঠিন স্বরে বলিল, 'নিশ্চয়, তোমাকে তো কেউ জোর করে ধরে রাখেনি।'

আদ্যনাথ বিছানা হইতে উঠিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, 'বটে! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি রাখতে চাও।'

নীলিমা বলিয়া ফেলিল, 'আমার দায় পড়েছে!'

'আচ্ছা, তা হলে চললাম'—বলিয়া হঠাৎ গট্ গট্ করিয়া দরজার কাছে গিয়া আদ্যনাথ খিল খুলিয়া ফেলিল। মুখ দিয়া রাগের মাথায় অমন একটা কথা বাহির হইয়া পড়িবে ও তাহার পরিণতি এমন হইবে নীলিমা ভাবে নাই। সে ভীত হইয়া একবার আদ্যনাথকে বারণ করিতে গেল। কিন্তু 'আর কখনো দেখা হবে না, মনে রেখো' বলিয়া চক্ষের নিমেষে আদ্যনাথ দরজা খুলিয়া তখনই বাহির হইয়া গেছে।

অন্ধকার রাত। দরজার বাহিরে তারের বেড়ায় ঘেরা একটি বাগান অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছিল। বাগানের কাঁকর দেওয়া পথ খানিকটা পার হইয়া লোহার গেট।

আদ্যনাথ অন্ধকারের ভিতর হাতড়াইয়া গেটের হাতল খুঁজিয়া পাইয়া আশ্বস্ত হইয়া দেখিল, গেট বন্ধ নয়। কিন্তু গেট খুলিতে গিয়া মুশ্‌কিল হইল। অন্ধকারে মনে হইল, একটা গোরুই বোধ হয় গেটের গায়ে হেলান দিয়া শুইয়া আছে, তাহাকে না উঠাইলে গেট খোলা যায় না।

আদ্যনাথ গোরুটাকে উঠাইবার জন্য বলিল, 'হেট্ হেট।' গোরুটা তবু উঠিল না। আদ্যনাথ অসহিষ্ণু হইয়া গেটটা নাড়িয়া তাহার গায়ে আঘাত করিয়া আবার বলিল, 'হেট্ হেট্, ওঠ্ বেটা।'

হঠাৎ গোরুটা একটু গা নাড়া দিয়া অদ্ভুত এক আওয়াজ করিল। গোরুর গলা হইতে এমন আওয়াজ আদ্যনাথ কখনও শোনে নাই। একটু বিস্মিত হইয়া আর একবার গেট নাড়া দিতেই গোরুটা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আদ্যনাথের মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। হাজার অন্ধকার হইলেও গোরু কখনও এমন আকৃতি লাভ করিতে পারে না।

যেটুকু সন্দেহ আদ্যনাথের মনে ছিল, তথাকথিত গোরুর আর একটি আওয়াজেই তাহা দূর হইয়া গেল। আর গেট খুলিবার সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এক ছুটে সে একেবারে বাড়ির রকে গিয়া হাজির। কিন্তু এখন উপায়? যে জানোয়ারটিকে সে গেটের ধারে দেখিয়া আসিয়াছে তাহাকে কল্পনার ছায়ামূর্তি বলিয়া উপেক্ষা করিবার সাহস তাহার নাই। শহরের ভিতর গৃহস্থ-পল্লীর মাঝখানে বিশালকায় ব্যাঘ্রের আবির্ভাব সাধারণ যুক্তিতে যত অসম্ভবই

মনে হউক, নিজের চোখকে সে অবিশ্বাস করে কি করিয়া? এ গেটের বাহিরে যাওয়া তাহার পক্ষে আজ অসম্ভব। কিন্তু অমন করিয়া তেজ দেখাইয়া চলিয়া আসার পর স্ত্রীর ঘরে সে ফিরিবেই বা কেমন করিয়া? কথাগুলি

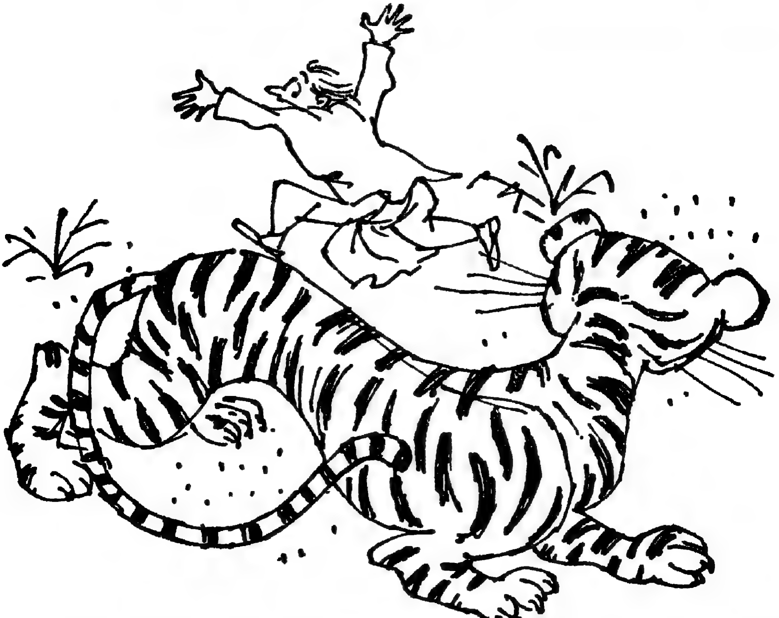

লিখিতে যত বিলম্ব হইল আদ্যনাথের চিন্তা অবশ্য তাহা অপেক্ষা আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

বাহিরের গেটের কাছে ভূতপূর্ব গোবৎসের নড়িবার শব্দ পাইয়া আদ্যনাথ এক মুহূর্তে ঘরের ভিতর গিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল, তারপর ফিরিয়া দেখিল, মলিনা তাহার রোরুদ্যমানা স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে।

অবস্থাটা একটু অস্বস্তিকর। কিন্তু আদ্যনাথের আর যাহাই হোক উপস্থিত বুদ্ধির অভাব ছিল না।

মলিনা তাহার দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, 'কিগো বীরপুরুষ, স্ত্রীকে ফেলে পালিয়েছিলে কোথায়?'

সদ্য সদ্য যে ঘটনাটি ঘটিয়া গিয়াছে, বীরপুরুষ সম্বোধনটা সেই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই করা হয় নাই, তবু আদ্যনাথের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। স্বচক্ষে সে যাহাই দেখিয়া ফিরিয়া আসুক, মলিনার কাছে সে কাহিনী বলিলে তাহার লাঞ্ছনার যে অবধি থাকিবে না—একথা সে অনেক আগেই জানে। না, আত্মসম্মান বজায় থাকে এমন একটা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গত কারণ তাহার

বাহির করিতেই হইবে।

মলিনার কথার উত্তরে প্রথমটা সে বোকার মতো একটু হাসিল। মলিনা আবার বলিল, 'বীরপুরুষ, হাঁপাচ্ছ যে বড়ো।'

আদ্যনাথ বলিল, 'তোমরাও তো দেখি ফোঁপাচ্ছ।'

'বাঃ, এই যে মুখে কথা ফুটেছে! কিন্তু ছেলেমানুষকে এইরকম করে ভয় দেখানোতে কি বাহাদুরি আছে বাপু? ও তো কেঁদেই সারা! আমি যত বলি—কক্ষনো চলে যায়নি, দেখো এক্ষুনি আসবে।—ওর কান্না কি থামে?'

বলা বাহুল্য অকূলে কূল পাইয়া তাহার চলিয়া যাওয়ার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আদ্যনাথ বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিল না। মনে মনে অদূর ভবিষ্যতে মলিনা মেয়েটি সম্বন্ধে তাহার মতামত যথাসম্ভব সংশোধন করিবে এমন একটা সংকল্পও সে করিয়া বসিল। দরজার খিলটা ভালো করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা আর একবার দেখিয়া তাহার পর সে প্রসন্ন মনে বিছানার ধারে গিয়া বসিল।

সেই এক রাত্রে—স্বামী-স্ত্রীর কি আলাপ হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা গেল তাহার পরের দিনও আদ্যনাথের কলিকাতায় যাইবার বিশেষ তাড়া নাই এবং পরের দিনও আদ্যনাথকে গৌহাটি ত্যাগ না করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। এবং নীলিমা, মাত্র বোধোদয় পর্যন্ত পড়িয়া কি করিয়া আদ্যনাথের কল্পনালোকের মানসীকে হার মানাইল তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধির অতীত।

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ক-দিনে তার নিজের খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িবার উৎসাহও আদ্যনাথের হয় নাই।

তাহাদের দাম্পত্য জীবনের বিরোধ ঘুচাইবার জন্য যে মহাপ্রাণ ব্যাঘ্র জঙ্গল ছাড়িয়া লোকালয়ে আসিয়া প্রাণবিসর্জন দিল, তাহাকে সে নিজের বিকৃত কল্পনাপ্রসূত কল্যাণকর বিভীষিকা বলিয়াই আজও জানে।

অন্নদাশঙ্কর রায় ( ১৯০৪— )

# গাধা পিটিয়ে ঘোড়া

আমি বয়সে তরুণ না হলেও আমার মনটা তরুণ এবং আমার লেখনী তারুণ্যের লক্ষণান্ত। তাই দশটা তরুণ লেখকের নাম করতে বললে লোকে আমার নামটাই করে সব আগে, আর গালাগাল যখন দেয় তখন আমাকেই দেয় সবচেয়ে বেশি। তা দিক, নিন্দায় আমার আয়ু কমে না, তাই মনটাও তরুণ থাকে। উপরন্তু আমার নামটা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বিনা পয়সায় আমাকে বিজ্ঞাপিত করে। আমার কার্টুন যা ছাপে তা আমার চেহারার চেয়ে দেখতে ভালো। ট্রামে ট্রেনে বাসে মেসে আপিসে চায়ের দোকানে আমার নাম যতবার ওঠে কোনো ঠাকুর-দেবতার নাম ততবার ওঠে না। এখানে বলে রাখি আমি যে ঠাকুর-দেবতার প্রতি কটাক্ষ করলুম তাঁরা সশরীরে বর্তমান। না, আরো খোলসা করে বলব না। সুখ্যাতি ও অখ্যাতির মধ্যে প্রভেদ যাই থাক উভয়েই খ্যাতি। আমি খ্যাতি ভালবাসি। পথে যেতে যেতে যখন কানে পড়ে কেউ ফিস্ ফিস্ করে অন্য কাউকে বলছে, "ইনিই তরুণ সাহিত্যিক মহেশ মহলানবীশ" তখন আমি অনেক কষ্টে আনন্দ সংবরণ করে গাম্ভীর্য রক্ষা করি।

আমাকে খ্যাতির চেয়েও যা উৎফুল্ল করে তা তরুণ সাহিত্যিকদের খাতির। তাদের সকলে যে সাহিত্যিক এটা একটু বাড়িয়ে বলা, হয়তো বানিয়ে বলা। কিন্তু তারা সকলেই তরুণ—বয়সে তরুণ। সন্ধ্যাবেলা তারা কম্পাসের দশটা দিক থেকে উনপঞ্চাশ বায়ুর মতো আবির্ভূত হয় এবং আমার বৈঠকখানায় বসে আমার চা-সিগারেট উজাড় করতে করতে আমার গল্প উপন্যাস নিয়ে যতটা মেতে ওঠে ঠাকুর-দেবতাদের কথা শুনলে ততটা তেতে ওঠে। আমি যে তাদের একজন এই আমার গূঢ়তম সুখ। তারা যে আমাকে দাদা বলে, মামা কিংবা খুড়ো বলে না, এই আমার আতিথেয়তার চরম পুরস্কার। তারা আমাকে তাদের নিজের নিজের রচনা দেখতে দেয়। আমি আগাগোড়া পড়বার ফুরসত পাইনে, পেলেও তন্দ্রা বোধ করতুম। তবু ঐ সব একসারসাইজের দু-চার জায়গায় দাগ দিয়ে মনে রেখে দিই, কথায় কথায় উদ্ধার করে লেখকদের

উদ্ধার করি। ওরা অবাক, কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, ওদের রচনার যেটুকু ওদের স্বকীয়, যেটুকু ওদের তারুণ্য, ওটুকু আমি চোখ দিয়ে আত্মসাৎ করি। কারুর আইডিয়া, কারুর ভঙ্গি, কারুর শব্দ-চাতুরী। তবে গল্পের প্লট যখন চুরি করি তখন জানিয়ে শুনিয়ে চুরি করা নিরাপদ জ্ঞান করি। "ওহে শৈলেশ, তোমার ঐ গল্পটা আমার এমন ভালো লেগেছে যে, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই — তুমি তোমার প্লটটি আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।" শৈলেশ বোধকরি ওটা কোনো কন্টিনেণ্টাল নভেল থেকে টুকেছে। ও কাজ করতে তার কুণ্ঠা নেই। আর আমিও ব্যস্ত মানুষ। কন্টিনেণ্টাল নভেল পড়ি কখন। এতে আমি কিছু অন্যায় দেখিনে। প্লটের গায়ে কপিরাইট লেখা নেই। কন্টিনেণ্টালরাও যে কার কাছ থেকে সরিয়েছে কে বলতে পারে। স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়ার দু-হাতে প্লট লুট করেছেন। "পূর্ণ শশী মাখে মসী কালো বলুক দেখি?" শেক্‌স্‌পীয়ারের বেলা কোনো শ্বশুরপুত্র অপহরণের অপবাদ দেয় না।

আমার তরুণ ভাইগুলির মধ্যে স্মরজিৎকে আমি একটু বিশেষ স্নেহ করি। ও আমার প্রশংসা করে ক্ষান্ত হয় না। ও আমার চোরাই প্লটের উপর বাটপাড়ি করে ভাষা নকল করে, শিরোনামা জাল করে। আর তামাশা দেখুন, আমার হাতে দিয়ে বলে, "দাদা একবারটি দেখে দিন।" আমি তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলি, "সাবাস", সে যদি সত্যি সত্যি আমার ভাত মারতে পারতো তা হলে আমি তাকে ধমকে দিতে ইতস্তত করতুম না। আমি জানি আমার একটি গুণ আছে যা বাংলা দেশের অন্য কোনো সাহিত্যিকের নেই। আমি অবচেতন মনের মনীষী। কিন্তু দেশের নাড়ি নক্ষত্র তো জান্‌তে আমার বাকি নেই। ওরা ভাজে ঝিঙে, বলে পটল। আমিও তুলি পাঁক, কিন্তু তার অঙ্গে একটু গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়ে দিই। আমার গল্পের গন্ধ শুঁকে পাঠক ভাবেন পুণ্যার্জন করছেন। কারণ পাপকে আমি ঘৃণ্যভাবে দেখাই সমাজকে পাপমুক্ত করতে। আমার বইয়ের শেষ পাতাটা আগে পড়বেন। দেখবেন পাপের শাস্তি আছেই। অন্ততঃ পাপীর ব্যর্থতা আছে, ভয়ংকর ব্যর্থতা। এই তত্ত্বটি স্মরজিৎ আবিষ্কার করেনি। তার যেমন মোটা বুদ্ধি করতে পারবেও না। তাই তার বইয়ের বিক্রি হবে না। পরন্তু সমালোচকরা তাকে বলবে মহেশ মহলানবীশের নকলনবীশ।

স্মরজিৎকে আমি বিশেষ স্নেহ করি তার আর একটা কারণ আছে। সে হল কানাই বাচস্পতির ছেলে। "উল্টারথ" প্রণেতা প্রাচীনতত্ত্বের পুরোধা কানাই বাচস্পতিকে কে না চেনে? দৈনিক পত্রে প্রতিদিন ওঁর দেড় কলম বরাদ্দ। লাইন পিছু এক আনা পায়। তা হলে বুঝুন ওর মাসিক আয় কত। আমার এতবড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী আর নেই। আর কিছু না হই আমি একজন এম-এ। আর কানাই হচ্ছে ঝুটো বাচস্পতি, পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়ে কোনো এক পরীক্ষা পরিষৎ থেকে উপাধি সংগ্রহ করেছে। অথচ কানাই শুধু যে মোটর কেনবার মতো টাকাটা পাচ্ছে তা-ই নয়, তার নাম আজ গ্রামে গ্রামে। তারপর কানাই আমাকে অকারণে ঠুকেছে। আমাকে ঠুকেছে, আমার তরুণ ভাইদের ঠুকেছে। আমাদের যা বাণী তাকে খোঁটা দিচ্ছে, খোঁচা দিচ্ছে। আমরা নাকি এই সনাতন সমাজের মরা গাঙে পাশ্চাত্ত্য সমুদ্রের কর্দমাক্ত জোয়ার আনছি। আমরা নাকি বাংলার পুরুষকে বিলাসী হতে, বাংলার কুললক্ষ্মীকে কুলটা হতে উদ্দীপনা দিচ্ছি। আরো কত কী! তবে রক্ষা এই যে, কানাই রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত কারুর মুণ্ডপাত করতে ছাড়ছে না। ও যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কৌটিল্যগর্বী ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা বিংশ শতাব্দীর সমাজের স্কন্ধে ভর করেছে। ওর ছেলে স্মরজিৎ আমার কাছে ওর নিন্দা করে, ওর জীবদ্দশায় ওর শ্রাদ্ধ করে। এতে আমি বাস্তবিক ভারী খুশি। খুশি না হওয়াটাই অস্বাভাবিক হত। একবার ভেবে দেখুন কানাই লিখছে জামাই ষষ্ঠী সম্বন্ধে বিস্তর বাজে কথা। পরকে আপনার করা, পরের ছেলেকে ঘরের চেয়ে সমাদর করা, বাংলার সনাতন বৈশিষ্ট্য, আর্যজাতির ধর্মঃ সনাতনঃ। তার স্থানে স্থানে দেখি গায়ে পড়ে আমাকে দিয়েছে কিলটা চড়টা। কথা নেই বার্তা নেই প্রবন্ধের মাঝখানে আমার নামটা চাপা রেখে, (তাও যদি নামটা উল্লেখ করতো!) আমাকে নিয়েছে একহাত। "তথাকথিত তরুণ লেখক কেহ কেহ বাঙালীর পরম কল্যাণীয় জামাতা বাবাজীবনকে লইয়া পঙ্ক-হোলি খেলিয়াছেন। নিজের কলুষিত কল্পনার পিচকারীতে ছোপাইয়া স্নেহ-দুর্বলতাময়ী শ্বশ্রূমাতাকে জামাতার নায়িকা করিতে এই কুক্কুরগুলার কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হয়?"

স্মরজিৎ বাপকে জানিয়েই আমার কাছে আসে, কেয়ার করে না। বলে, "দাদা, আপনার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সেইটে সত্য। ওঁর সঙ্গে যেটা সেটা আকস্মিক।" আমি বলি, "তোমার নাম স্মরজিৎ, আমার নাম মহেশ। কী রকম অর্থৈক্য। তুমি বই লিখলে লোকে ভাববে আমিই ছদ্মনাম নিয়েছি।" স্মরজিৎ ইঙ্গিতটা

বোঝে না। ওর বাপের মতো ওর বুদ্ধিটা স্থূল। কেন এবং কেমন করে ও বিপক্ষের শিবিরে এসে বিভীষণ হল, সেইটে আমার আশ্চর্য ঠেকে। এমনও হতে পারে যে, ও অপর পক্ষের চর। সরলতার ভান করছে। কিন্তু আমি ওকে প্রায় এক বছর কাল পরখ করে দেখলুম। সত্যিই ওর মনটা সাদা, মনটা সাদা বলে গড়নটা মোটা। চুলগুলো কোঁকড়া কোঁকড়া, নাকটা বোঁচা, হাঁটে থপ থপ করে। ওর সর্বদা বিগলিত ভাব। ওর যখন পিঠ চাপড়ে দিই তখন মনে হয় ও যদি পুষি বেড়াল হত তবে মোলায়েম স্বরে ঘড় ঘড় শব্দ করত।

তরুণদের সঙ্গে সাহিত্য-চর্চা করতে করতে আমি তাদের যে কয়জনের ব্যথার ব্যথী হতে পেরেছিলুম, স্মরজিৎ তাদের অন্যতম। তারা সুযোগ পেলেই তাদের পারিবারিক কাহিনী আমাকে ভেঙে বলে। তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্পে আমাকে কখনো ঘুম পাইয়ে দেয়, কখনো স্বপ্নলোকে নিয়ে যায়। তাদের প্রেমের উপাখ্যান শুনে যখন আমি বিশ্বাস করি তখন বলি, "এমন ঘটনা আমার জীবনেও ঘটেছে, আমি এটা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব ঠিক করে রেখেছি।" আর যখন বিশ্বাস করতে পারিনে তখন বলি, "কোন্ বইতে পড়েছ, বলে ফেলো।" কিছুক্ষণ প্রতিবাদ করবার পরে যখন প্রেমিক পুরুষ স্বীকার করেন যে, সবটা ঘটেনি, কিন্তু এই বলে তর্ক করেন যে, যা ঘটতে পারত তাও ঘটনার সামিল। আমার এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আমি আর কিছু না পেরে থাকি এটুকু জানতে পেরেছি যে, আমাদের অধিকাংশ তরুণ নিউরোটিক। আমার কাছে যারা আসে তাদের অধিকাংশই বায়োস্কোপ দেখে ও নভেল পড়ে তথাবর্ণিত কাল্পনিক জগৎকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করে ও নিজেদেরকে সেই জগতের মানুষ বলে ভাবতে ভাবতে সত্যি সত্যি তাই হয়ে যায়। গোলমাল বাধে যখন নভেল না পড়া পাঁচী কিংবা খেঁদি—যাদের ভালো নাম সুলতা কিংবা আরতি—তাদের অনুরাগ আকর্ষণ করে। অথবা পাস হতে না পারলে বাবা কঠিন কথা বলেন। অথবা পাস হলেও মার্চেন্ট আপিসে পর্যন্ত আবেদন না-মঞ্জুর হয়। সাহেবের সঙ্গে একবার ইণ্টারভিউ পেলে শৈলেশ কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যে নব অভ্যুদয় সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবার ছল পেত না? দুটো কোটেশন ও দশটা অ্যালিউশন দিয়ে নিজের বক্তব্যটা বিশদ ও উদ্দেশ্যটা সফল করত না?

স্মরজিৎ ঠিক নিউরোটিক না হলেও কালের হাওয়া তাকেও স্পর্শ করেছে।

সে আমাকে পিছু ডেকে বলে, "দাদা, আপনাকে বিরক্ত করতে সত্যিই চাইনে, কিন্তু একটা খবর না দিয়ে বিদায় নিতেও পারিনে।" আমি অগত্যা চেয়ার টেনে নিয়ে আবার বসি এবং ঠাকুরকে বলি সবুর করতে। স্মরজিৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, "এগারোটা। কিন্তু এতক্ষণ ওরা সব ছিল, ওদের কাছে কি বলা যায়?"

"কী কথা?"

স্মরজিৎ গৌরচন্দ্রিকা বিস্তার করে। আমি থামিয়ে দিই। আমার কাছে লজ্জা কিসের? আমি তো ওর স্বনামা। আমিও তো তরুণ।

স্মরজিৎ প্রেমে পড়েছে।

এতদিন পড়েনি কেন তার কৈফিয়ৎ দিক্।

কাউকে এতদিন মনে ধরেনি।

মনে মনে বলি, স্মরজিতেরও মনে ধরবার দাবি আছে, যদিও আর কারুর মনে ধরা দুর্ঘট। তারপর?

তারপর স্মরজিৎ কবিতা লিখতে শুরু করেছে। কিন্তু কেউ দেখিয়ে দেবার লোক নেই। এই বলে সে এক তাড়া কাগজ বার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে। সবগুলিই মুক্ত বন্ধ। ভাবের তাড়নায় মুক্তকচ্ছ ভাবে ধাবমান।

ব্যাঙ কয়, হে আমার ব্যাঙানি
ঠ্যাং দুটি
প্রতিদিন তোমার গলির পথে
পেণ্ডুলাম সম।
তুমি থাকো জেনানার জানালা আড়ালে
তোমার ঘ্যাঙানি
কানেই শুনিনি শুধু শুনেছি প্রাণে।

তার স্পর্ধা আমাকেও ঈর্ষান্বিত করলে। আমি এত কিছু পারলুম, কিন্তু কোনো মতে মিল জোটাতে পারিনি বলে কবিতা লিখতে পারলুম না। স্মরজিৎ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে। আমি পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গেলুম—

তুমি যে উর্বশী নও
নও বিয়াট্রিস
আফ্রডিটি নও

নও হেলেনা যে
তাই তুমি সত্যতর
তাই তুমি আমার
প্রেয়সী
তোমার ঘ্যাঙানি
কানেই শুনিনি শুধু শুনেছি প্রাণে।

আমি নিজের সবজান্তত্ব প্রকট করবার জন্যে জায়গায় জায়গায় বদলে দিলুম। পরিবর্তিত সংস্করণ এইরূপ হল—

"হে আমার ব্যাঙানি"—ব্যাঙ কয় -
"ঠ্যাং দুটি প্রতিদিন পেণ্ডুলাম সম।"
"কোন্‌খানে?"
"তোমার গলির পথে"—ব্যাঙ
মক মক করে।
"তোমার ঘ্যাঙানি"—ব্যাঙ মুখ ফুটে বলে না—
"কানেই শুনিনি শুধু, শুনেছি প্রাণে।"
তারপর মুখ ফুটে—( বলে )—
"তুমি থাকো জেনানাব জানালা আড়ালে।"

এরপর আমিও কবিতা লেখা ধরলুম। কাগজে যখন দুটি একটি ছাপা হল কোনো কোনো সমালোচক এগুলির নাম দিলে "গবিতা" এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরা বানালো প্যারডি। এই তো আমি চাই। সুনাম সকলের অদৃষ্টে জোটে না, কিন্তু দুর্নাম জোটে ক-জনের অদৃষ্টে? আমার মতো ক্ষণজন্মা পুরুষের। আর দুর্নামে আমার হার হল কই? কাগজওয়ালাবা আমার গল্প আর কবিতা চেয়ে বিনামূল্যে ওদের পত্রিকা পাঠাচ্ছে। দাম দেবে না সেটা জানি। কিন্তু নাম তো হবে।

ইতিমধ্যে স্মরজিতের পায়ের পেণ্ডুলাম সুনলিনীদের পাড়ায় আন্দোলিত হতে হতে আন্দোলন তুলেছে। তাকে একদিন পাকড়াও করে সুনলিনীর বাবা তার বাবার নাম ঠিকানা আদায় করে কানাই বাচস্পতিকে চিঠি লিখেছেন। স্মরজিং পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপকে ধরা দিচ্ছে না। তবে আমার এখানে হাজিরা দিয়ে যায়। বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করে,—"দাদা, ব্যাঙানির বাড়ি

ঠ্যাঙানি খেতে ভয় করিনে। কিন্তু ব্যাঙানিকে না দেখতে পেলে বাঁচবো না।"

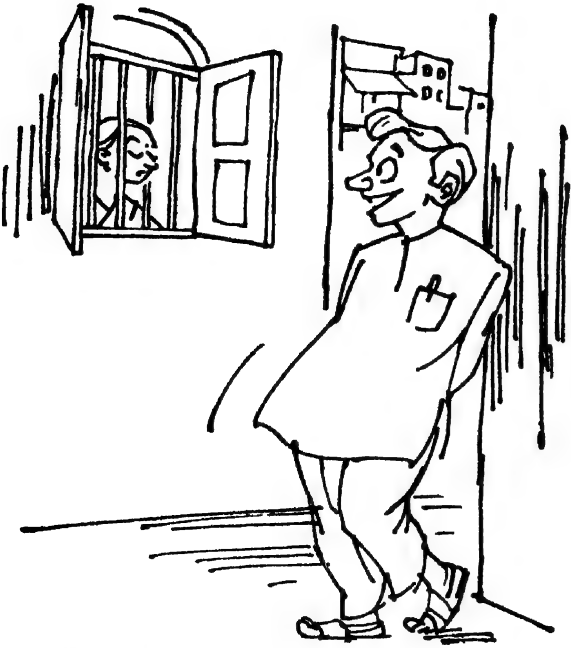

আমি দায়িত্বহীন প্রেম বরদাস্ত করতে পারিনে। যে বলে, "বাঁচবো না", আমি তাকে ক্ষেপিয়ে বলি, "বেশ তো, আমি তোমার শবদাহ করতে নিয়ে যাবো।" শুধু দায়িত্বহীনতা নয়, মিথ্যাও বটে। প্রাণ দিয়ে ফেলা কবিতা লেখার মতো সোজা নয়। আমার ব্যাঙানির গোঙানি শুনতে শুনতে আমিই কতবার আত্মহত্যার সংকল্প করেছি। তারপর সে সংকল্প ত্যাগ করে ওর শুশ্রূষা করতে লেগে গেছি।

ওকে বললুম, "মিতা, আমাকে কবিতা লিখতে তুমিই প্রবর্তিত করলে। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তুমি যদি একটু মানুষের মতো হও তো আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করি।"

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা আমার পেশা নয়। আমি ইস্কুল মাস্টার নই। তবু স্মরজিৎকে হাতে নিলুম। কানাই বাচস্পতির উপর শোধ তুলতে হবে, স্মরজিৎ আমার অস্ত্র। ওকে বললুম আমার এইখানেই উঠতে। তারপর সুনলিনীর বাপের কাছে নিজেই গেলুম ঘটকালি করতে।

তিনি গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়িয়ে দুজন ভদ্রলোককে শোনাচ্ছিলেন। আর ডান হাত উঠিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করে টেব্‌লের উপর চাপড় মারছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, "আমারই নাম তিনকড়ি, বসুন।"

আমি প্রথমটা বুঝতে পারলুম না এই সকাল বেলা গান বাজনার এ আয়োজন কেন। তারপর তিনি নিজেই আমার সংশয় ভঞ্জন করলেন।

"এই আমাদের নিউ মডেল। কেমন পরিষ্কার আওয়াজ। কেমন মজবুত মেশিন। দাম মোটে দুশো দশ টাকা। আমার কাছে কিন্‌লে দশ পারসেণ্ট কমে পাবেন।" এই বলে আমার দিকেও তাকালেন।

আমি ছাড়া যে দুজন আগন্তুক বসেছিলেন তাঁদের একজন মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বললেন, "হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ --আমাদের অন্য একটু কাজ ছিল। আগে এঁর পরিচয় দিই। ইনি হলেন পণ্ডিতরাজ কানাই বাচস্পতি।"

তিনকড়িবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "এতক্ষণ বলেননি। না জেনে বড়ো অপরাধ করেছি। ওরে ও ফেলি, পান নিয়ে আয়।" হাত জোড করে বাচস্পতিকে মস্ত একটা নমস্কার করে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই রইলেন। বাচস্পতি মৃদু হাস্য করতে থাকলেন। আমিও বাচস্পতিকে অবহিত হয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকলুম। দিব্য বলীবর্দের মতো আকার ও আকৃতি। মুণ্ডিত মস্তকে বিল্বপত্রমণ্ডিত শিখা। পায়ে পণ্ডিতী চটি ও গায়ে কোরা চাদর।

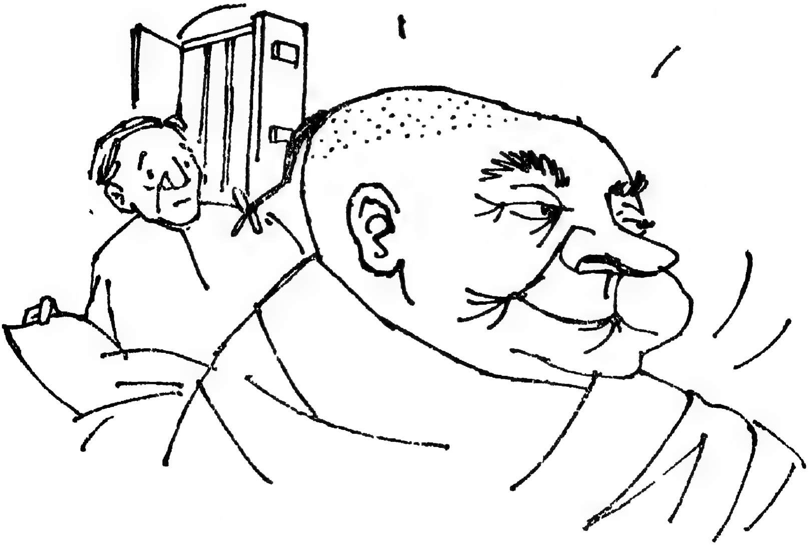

বাচস্পতির সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল সেটি বোধ করি তাঁর আপিসের কেউ হবে। সে বললে, "এই যে—এই আপনার কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়ে বাচস্পতি মশাই একান্ত বিচলিত হয়েছেন। তিনি দেশকে যে বাণী দিনের পর দিন শুনিয়ে যাচ্ছেন এক কথায় সেটি হচ্ছে এই যে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। স্বধর্ম কাকে বলি? না, যা স্বদেশের ধর্ম। আর ধর্মই বা কাকে বলি? না, যা লোকাচার। তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্বন্ধে আপনি যে অভিযোগ এনেছেন তার থেকে অনুমান হয় যে, তাঁর নিজের গৃহেই পরধর্ম—ম্লেচ্ছাচার বিজাতীয় কোর্টশিপ প্রবেশছিদ্র অন্বেষণ করছে।"

বাচস্পতি মৃদু হাস্য করতেই থাকলেন। দেখে মনে হল না যে, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত।

সেই লোকটি নিশ্বাস নিয়ে তাঁর বক্তৃতার অনুবৃত্তি করলে, "বাচস্পতি মশাই স্বনামধন্য সমাজরক্ষী। তিনি আভ্যন্তরিক শত্রুর ভয়ে নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করছেন। তাঁর মতে এর একমাত্র প্রতিকার পুত্রের মতি পরিবর্তন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের মতি তিরস্কার বা সদুপদেশের বাধ্য নয়। অতএব নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি প্রস্তাব করছেন যে—"

বাচস্পতি অমনোযোগের ভান করলেন। আমি মনোযোগের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলুম। গ্রামোফোনের এজেণ্ট তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে হাঁ করে সেই লোকটির কথাগুলি গিলতে থাকলেন।

"প্রস্তাবটা বেশি কিছু নয়। বাচস্পতি মশাই যখন বিপত্নীক ও মেয়েটি বিবাহযোগ্য তখন আপনার দিক থেকে আপত্তি না থাকবারই সম্ভাবনা। থাকলে কিন্তু আমরা আপনার উপর পীড়াপীড়ি করতে অনিচ্ছুক।"

তিনকড়িবাবু স্তম্ভিত। আমিও তদবস্থ। বাচস্পতি তখনো মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকলেন। আর সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। পান হাতে করে ঘরে ঢুকে সবাইকে নমস্কার করলে একটি সতেরো-আঠারো বছর বয়সের তন্বী। সুন্দরী নয়, কিন্তু সপ্রতিভ। পান দিয়ে এক পাশে চুপ করে দাঁড়ালো তার বাবার আদেশের অপেক্ষায়। তিনকড়িবাবু বোধ করি তার সঙ্গে বাচস্পতিকে মনে মনে মিলিয়ে দেখছিলেন। আমিও তাই করছিলুম। বাচস্পতির স্বপক্ষে একটি পয়েণ্ট তার গায়ের রং ধবধবে সাদা। সুনলিনীর বিপক্ষে তেমনি একটি পয়েণ্ট তার গায়ের রং মলিন শ্যাম। সে গা মেজে আসার সময় পায়নি, পেলে হয়তো মলিনের স্থলে উজ্জ্বল লিখতে পারতুম।

তিনকড়িবাবু মেয়েকে যাবার অনুমতি দিয়ে বাচস্পতির বাঙ্ময় প্রতিভূকে বললেন, "এ আমার আশাতীত। কল্পনাতীত। ধারণাতীত। তাই মনঃস্থির করতে গৃহিণীর সহায়তা লাগবে। বুঝলেন কিনা এসব তো গ্রামোফোনের ব্যাপার নয়—"

প্রতিভূটিকে অভিজ্ঞ ঘটক বলে মনে হল। তিনকড়ি দরদস্তুর না করে মেয়ে ছাড়বেন না। এটা আঁচতে তার দু-মিনিট লাগল না। "বেশ আপনিও চিন্তা করুন, আমরাও। মহেশ মহলানবীশের সাকরেদ হয়ে ছেলেটা বকেছে। নইলে বাচস্পতিদার এমন কী গরজ!" কিছুক্ষণ নীরব থেকে সশব্দে—"আমি মশাই পশুর মতো স্পষ্টবাদী। সারা জীবন গ্রামোফোন চিন্‌লেন, মানুষ চিন্‌লেন না। বাচস্পতিদার চরণে চর্ম পাদুকা ও গাত্রে উত্তরীয় দেখেছেন, বাইরে যে তাঁর নিজের কেনা অস্টিন দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখেননি। তালতলা গলিতে যে তাঁর নিজের করা দ্বিতল ইষ্টকালয় আছে সেটা দেখেননি। তাঁর পকেট নেই বলে তিনি যে মাসের পয়লা তারিখে গড়ে তিনশো টাকা কোনখান দিয়ে নিয়ে যান তাও অনুমান করতে পারেন না। আর ঐ তো আপনার মেয়ে। বয়স পঁচিশের কম হবে না। আর বাচস্পতিদার মোটে চুয়াল্লিশ বছর বয়স। তার মধ্যে তেরো বছর বিপত্নীক।"

আমি একখানা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকিয়েছিলুম। মহেশ মহলানবীশের কার্টুন কে না দেখেছে? ওরা যে এতক্ষণ চিনতে পারেনি এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে ওরা একটু পরে চিনতে পারবে না।

তিনকড়ি দমে গেলেন। তোতলাতে তোতলাতে বললেন, "ৎ-ৎ-তা আমার পাঁচটি নয় সাতটি নয় ঐ একটিমাত্র মেয়ে। এ-এ-এইবার আই-এ দেবে। গ-গ-গরীব হলেও আমার যে একেবারে কিছুই নেই তা নয়। সোজাসুজি না বলছিনে, শুধু কিছু সময় চাইছি, কী নাম আপনার?"

"গিরিজাপতি—"

"গিরিজাপতিবাবু।"

কানাই তার বিরাট বপু নিয়ে উপবেশন সুখ উপভোগ করছিল, গিরিজাপতি তাকে ঠেলা দিয়ে বললে, "উঠুন বাচস্পতিদা, উঠুন। আপনার সময় এত স্বল্পমূল্য নয় যে, চাইলেই দান করে ফেলবেন। কাল্‌কের কাগজেই তিনকড়িবাবুর মেয়ের কোর্টশিপ কাহিনী ছাপা হবে। আর আপনি তো ঘেঁটু পুজার উপর লিখতে যাচ্ছেন, ওরই এক জায়গায় একটু কলমের

খোঁচা—"

বলতে বলতে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মোটরে উঠে বসল। তিনকড়িবাবু কাঁদো কাঁদো হয়ে আমাকে আবিষ্কার করে বললেন, "দেখলেন তো মশাই গুণ্ডামি।"

আমি অসহায় বোধ করছিলুম। কানাইয়ের হাতে দৈনিক পত্রের শিলনোড়া দৈনিক একটা করে তিনকড়ির দাঁত ভাঙবে। তিনকড়ি মামলা করতেও রাজী হবে না, পাছে পারিবারিক প্রাইভেসি ক্ষুণ্ণ হয়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, "কই মশাই, কনক দাসের একসেট রেকর্ড দেখালেন না? আমি কখন থেকে বসে রয়েছি।"

তিনকড়ি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, "এই যে," "এই যে" করতে করতে রেকর্ডের বাক্স ঘাঁটতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পেলেন না। তাঁর মন ছিল অন্যত্র। বোধ হয় অন্দরে, গৃহিণীর আঁচলে। আমি দয়া করে উঠলুম। বললুম, "থাক মশাই, অর্ডার দেওয়া রইল। ঠিকানাটাও দিয়ে যাই। সময়মতো পাঠিয়ে দেবেন।"

আমার কার্ড পড়ে তিনকড়িবাবু দাঁত বার করে হাসলেন।—"কী সৌভাগ্য, স্নুনলিনী আপনাকে কতবার দেখতে চেয়েছে। আপনার সমস্ত বই ওকে কিনে দিতে হয়েছে। একটু অনুগ্রহ করে বসতে আজ্ঞা করেন তো ওকে বলি চা করে আনতে।"

আমি ঘাড় নাড়লুম। অন্য একদিন আসব। এ পাড়া ও পাড়া।

স্মরজিৎকে ডাক দিলুম। সে রাশি রাশি "মুক্তকচ্ছ" নিয়ে বিরহ উদ্‌যাপন করছিল। আমার ডাক শুনে খাতাসুদ্ধ উপস্থিত হল। আমি টান মেরে বললুম, "ওসব রাবিশ রাখো। কাজের সময় কাজ, লেখার সময় লেখা।"

ও খুব ভয় পেলে। আমি একটু নরম হয়ে বললুম, "তোমার বাবা স্নুনলিনীকে বিয়ে করবেন বলে ক্ষেপেছেন। এ বিয়ে বন্ধ করা চাই-ই।" আমি জানতুম তিনকড়ি দু-দিন পরে বাচস্পতির পায়ে না ধরে পার পাবে না।

স্মরজিতের মুখ শুকিয়ে গেল। তার চোখে জল দেখা দিল। তার হাত থেকে কবিতার খাতা মেঝেতে পড়ে হাওয়ায় উড়ল। সে একবার বললে, "ও হো হো," তারপর বললে, "আমি বাঁচব না।"

আমি ধমকে দিয়ে বললুম, "আলবৎ বাঁচবে। ও মেয়েকে বিয়ে করতে হবে

তোমাকেই।"

স্মরজিৎ কাঁদতে কাঁদতে বললে, "ক্ষমা করুন দাদা, বাবা যার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন সে আমার মা। মাতৃগমন মহাপাপ।"

আমি দেখলুম রাগ করাটা এক্ষেত্রে ভুল পলিসি। তা হলে স্মরজিৎ হাতছাড়া হবে। কানাই জিতে যাবে।

আমি স্মরজিতের মাথায় হাত বুলিয়ে বললুম, "সে-ই বীর যে ঠিক সময়ে ঠিক কর্তব্যটি করে। সে-ই পুরুষ যে নারীকে অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করতে ইতস্তত করে না, অন্যায়কারী যেই হোক।"

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা কি একদিনের কাজ? হপ্তাখানেক পরে স্মরজিৎকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলুম যে, সে সুনলিনীকে যেমন করেই হোক বিয়ে করবে। ওদিকে কানাই তিনকড়িকে দিয়ে বিয়ের তারিখ ফেলেছে। আমার কাছে কন্যাপক্ষের একখানা নিমন্ত্রণ পত্রও এসেছে। কানাই যে খুব ধুমধাম করে বৌ আনতে যাবে এ গুজব আমি তার আপিস থেকে আনিয়ে নিয়েছি। বিনাপণে বিয়ে করে দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে সে। বিশ্বস্তসূত্রে এই সংবাদ পেয়ে এজন্যে তাকে অভিনন্দন করে এক প্যারাগ্রাফ ইতিমধ্যেই তার কাগজে বেরিয়েছে। আমারও রোখ চেপেছে কিছুতেই এ বিয়ে আমি হতে দেবো না। আমার ভক্ত পাঠক-পাঠিকা কানাইয়ের হাতে পড়ে আমার নিন্দা শুনতে থাকবে? অসম্ভব! একালের কলেজে পড়া মেয়ে একটা "রাজভাষা" পড়ে ইংরাজি শেখা ছাত্রবৃত্তি পাস টিকিওলার ঘর করবে? অসম্ভব! যেখানে বয়সের সামঞ্জস্য নেই, শিক্ষার সামঞ্জস্য নেই, রুচির সামঞ্জস্য নেই, সেখানে সুখেরও আশা লেশমাত্র থাকতে পারে না।

বিয়ের দিন স্মরজিৎকে ডেকে চুপি চুপি বললুম, "রাঁধুনি বামুন সেজে সুনলিনীর বাড়ি বহাল হতে হবে। ওর বাবা তোমাকে বাবুবেশে দেখেছেন, খালিগায়ে দেখলে চিনতে পারবেন না। ওদের বাড়িতে কাল বিয়ের হৈ চৈ, কে কার খোঁজ রাখে। এক সময় সুনলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বোলো সাড়ে নটায় আমি মোটর নিয়ে গলির মোড়ে প্রতীক্ষা করব। তোমরা এলে তোমাদের এখানে এনে সেই রাত্রে বিয়ে দেবো।"

রাঁধুনি বামুন সাজতে ওর লজ্জা, সুনলিনীর সঙ্গে দেখা করতে ওর শঙ্কা এবং সুনলিনীকে বিয়ে করতে ওর বাসনা, এই ত্রৈটানায় পড়ে ও কেমন হয়ে গেল। হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। ন যযৌ ন তস্থৌ। আমি ব্যঙ্গ করে বললুম,

"কী হে, ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে। ঐ সাহসের একটি কণা দেখালে বিয়েও করবে। শ্বশুরের গ্রামোফোনের টাকাও পাবে, হয়তো মাঝারি লেখকও হয়ে দাঁড়াতে পারো।"

ওকে তালিম দিলুম। ওর নাম ক্ষেত্রমোহন। ওর বাড়ি পুরুলিয়া। কলকাতায় নতুন এসেছে কাজ খুঁজতে ; কে ওকে বলেছে এ বাড়িতে বিয়ে। ওর রান্নার নমুনা দেখুন। শ্রীযুক্ত মহেশ মহলানবীশ ওর রান্নার প্রশংসা করে ওকে সুপারিশপত্র দিয়েছেন !

ওকে কয়েকটা রান্নাও শিখিয়ে দিতে হল। কানাইয়ের চিরদিন এই সমৃদ্ধি ছিল না। কানাই যখন ভিক্ষে করে খেতো তখন স্মরজিৎকেই রান্না করতে হত। সে সব সে একেবারে ভুলে যায়নি, তবে ভোলবার ভান করছে। তাই আমিও শেখাবার ভান করলুম।

বলিদানের পাঁঠার মতো থমকে থমকে ওঠে। একবার এগোয়, একবার থমকে দাঁড়ায়, একবার ফেরে। ওকে তিনকড়িবাবুর গলির মাথায় পৌঁছে দিয়ে আমি একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে জোরে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলুম।

ওর উপর আমার ভরসা ছিল না। শেষ পর্যন্ত ও হয়তো তিনকড়ির তিন তাড়া খেয়ে পিটটান দেবে। তিনকড়ি ওকে চিনে ফেলতেও পারেন। গেলুম আমার এক পুলিস বন্ধুর কাছে। খুলেই বললুম। না বললেও চলতো কেননা কানাইয়ের কাগজ ওকেও ঠুকেছে, ওর রাগ আছে কাগজের কর্তাদের উপর। ও বললে, "কিছু করতে হবে না। কানাইকে আমি চিনি। অমন ভীতু লোক ভূ-ভারতে নেই। আমি ওর আপিসে ফোন করে জানাচ্ছি, খবর পাওয়া গেছে ওর লেখা পড়ে মুসলমানেরা ক্ষেপেছে। ও যেন এক্ষুনি কলকাতা ছাড়ে।"

শুধু ওইটুকুতে কি ফল হবে ? আমার সংশয় গেল না। কিন্তু তারিণী বললে, "ফলেন পরিচীয়তে। তুমি সবুর করে দেখো, এ ঠিক মেওয়া ফলবে।"

গলিতে ঢুকে শুনতে পেলুম একজন আরেকজনকে বলছে, "আবার বাধল।"

"কী বাধল, মশাই ?"

"হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। শোনেননি কানাই বাচস্পতির ভুঁড়িটা ফাঁসিয়েছে ?"

আমি পুলকে শিউরে উঠলুম। নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি রেখে হর্ন বাজালুম। স্মরজিৎ ও তার বধূ আসে না। বিবাহসভায় উপস্থিত হয়ে দেখলুম দক্ষযজ্ঞের মতো ব্যাপার। পাড়ার অর্ধেক খালি হয়ে গেছে, কলকাতা ছেড়ে উধাও।

বাড়ির চাকর বাকরেরাও বলছে, "আমাদের ছেড়ে দিন, কর্তা। আমরা পালিয়ে বাঁচি।" ভিতর থেকে মহিলাদের কান্নার রোল কানে আসছে। আর আমাদের স্মরজিৎ রাঁধুনি বামুনের বেশে পেণ্ডুলামের মতো একটি রেখা ধরে একবার অন্দরের দিকে ছুটে যাচ্ছে, একবার সভার দিকে ছুটে আসছে। আমি তার গতিরোধ করে দাঁড়ালুম। বল্‌লুম, "কী ঠাকুর, কী হয়েছে?"

সে কেঁদে ফেলে বললে, "দাদা গুজবটা কি সত্যি? বাবাকে ওরা জবাই করেছে?"

তাকে নেপথ্যে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে বললুম, "Mind your own business. নিজের কাজ কত দূর?"

এখনো সে সুনলিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পায়নি। অকর্মণ্য। কলকাতা ছাড়বার জন্যে নিশ্চয় সুনলিনী ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। এই তো সুযোগ। তাকে তাড়া দিলুম, "যাও, দেখা করে বলো তুমি ওকে উদ্ধার করতে এসেছ।"

সে কি শোনে? শুধু বলে, "হায় হায় বাবা!"

আমি প্যারডি করে বললুম, "হায় হায় হাবা!" তারপর তাকে ধরে নিয়ে আমার গাড়িতে তুলে দিয়ে এলুম। সে যেন আমার বাড়ি গিয়ে সেখানে অপেক্ষা করে। তার বাবার খবর নিতে যেন নিজেদের বাড়িতে যায় না। সেটা গুণ্ডারা ঘেরাও করেছে।

"এই যে শ্রীযুক্ত মহলানবীশ।" তিনকড়িবাবু উন্মাদের মতো বললেন, "ওসব বিশ্বাস করবেন না, বুঝলেন। মাথার উপর ভগবান থাকতে এ কখনো হতে পারে? আমার দশাটা একবার ভেবে দেখা তো ভগবানের উচিত?"

আমি মনে মনে বললুম, ভগবানকে যত বড়ো ভাবুক লোকে মনে করে তিনি তত বড়ো ভাবুক নন। মহেশ তাঁর উপর খোদ্‌কারী করবে। দেবেই আজ রাত্রে স্মরজিতের বিয়ে।

খবর নিতে তিনকড়ি যাকে পাঠিয়েছিলেন সে এসে পড়ল। বললে, "বাচস্পতি গুম হয়েছেন।"

তিনকড়ি কপালে চাপড় মেরে ডাক ছাড়লেন, "হা ভগবান, গুণ্ডার হাতে গৈবী খুন।"

ভিতরে বামাকণ্ঠের সানাই বেজে উঠল।

দাঙ্গা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে যে ক-জন বাকি ছিল তারাও সরে পড়তে লাগল। পাড়ার ছোকরাদের উপর এতদিন তিরস্কার বর্ষণ হচ্ছিল তারা নিষ্কর্মা বলে।

এখন তারাই হল পাড়ার ভরসা। দেখতে দেখতে অনেকগুলি হকি স্টিক ক্রিকেট ব্যাট টেনিস র‍্যাকেট বারবেলের ডাণ্ডা কাঠের মুগুর নির্গত হল।

বাপ মরলে ছেলের বিয়ে সেই রাত্রে হতে পারে না। আমার শেষ চাল ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি তিনকড়ির বাড়ি থেকে তারিণীকে ফোন করলুম। মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে কানাইয়ের খুনের গুজব রটেছে। কে জানে এই অবলম্বন করে শেষ কালে একটা সত্যিকার দাঙ্গা বেধে বসবে। তারিণীও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, বললে, "আসছি।"

ইতিমধ্যে সকলে তিনকড়িকে ধরাধরি করে একখানা তক্তপোশের উপর শুইয়ে দিয়েছিল। পুলিসের লোক দেখে তাঁর চেতনা ফিরল। তারিণী বললে, "তিনকড়িবাবু, আপনি বিবেচক ব্যক্তি। পুলিসের কাছে খবরটার সত্য মিথ্যা যাচাই না করে চট করে বিশ্বাস করে ফেললেন যে, বাচস্পতি মশাই খুন?"

"শুনলুম তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।"

"অদৃশ্য হয়তো তিনি স্ব-ইচ্ছায় হয়েছেন। অমন একটা গুজব শুনলে কে না অদৃশ্য হয়ে যায়?"

এইবার আমার পালা। তিনকড়ি ও তাঁর দাদা রাখহরিবাবু আমাকেই মুরব্বী পাকড়ালেন। "শ্রীযুক্ত মহলনাবীশ, বিবাহ তো স্থগিত থাকতে পারে না।"

'তা তো পারবেই না।" আমি এতক্ষণ মনে মনে মহলা দিচ্ছিলুম। মহলানবীশের মহলা। বললুম, "হয় আজ রাত্রেই বাচস্পতি মশাইকে খুঁজে বার করতে হবে, নয় পাত্রান্তরে কন্যা সম্প্রদান করতে হবে।" তিনকড়ি ও রাখহরি মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। হয়তো ভাবলেন মহলানবীশ নিজেই কেন বরের পিঁড়িতে বসে যান না? কানাইয়েরই সমবয়সী, তফাতের মধ্যে আছে এক চির শয্যাগত স্ত্রী। না থাকারই সামিল।

আমি প্রলোভন দমন করলুম। সুস্থকায়া স্ত্রী পেলে আমি তো আর অবচেতন মনের মনীষী রইব না, আমার পেশা যাবে, বাংলার সাহিত্য আমার বিশিষ্ট দান থেকে বঞ্চিত হবে।

বললুম, "দেখুন, বাচস্পতিকে আজ রাত্রে কলকাতায় পাবেন না। প্রাণ আগে না পরিণয় আগে? তা বলে বাচস্পতি ছাড়া কি পাত্র মেলে না? এই তো বাচস্পতিরই ছেলে স্বরজিৎ রয়েছে—"

তিনকড়ি কথা কেড়ে নিয়ে ভারী উষ্মার সহিত বললেন, "সেই হতভাগাটার জন্যেই তো বিপদ। দু-বেলা সামনের গলিতে ঘুর ঘুর করত। ফেলির

পড়াশুনায় মন বসত না, তাই জানিয়েছিলুম বাচস্পতি মশাইকে। কী কুক্ষণেই জানিয়েছিলুম। শ্রীযুক্ত মহলানবীশ তো স্বচক্ষে দেখেছেন সে কী জুলুম।”

“ও কথা ভুলে যান তিনকড়িবাবু।” আমি প্রবোধ দিয়ে বললুম, “উপস্থিত বিবেচনা করুন আজকের এই অর্ধেক খালি কলকাতা শহরে স্মরজিৎকে মেয়ে দেবেন কি অন্য কাউকে খুঁজতে বেরোবেন। স্মরজিৎ বি-এ পাস, এইবার ল’ দেবে। আপনার মতো মুরুব্বী আমার মতো হিতৈষী পেলে ও যে ভবিষ্যতে দ্বিতীয় রাসবিহারী কি তৃতীয় আশুতোষ হবে না কে এ কথা জোর করে বলবে। যৌবনকালে কত মহাপুরুষ কত কীর্তি করেছেন। ও তো শুধু নিজে পায়ের জুতো খইয়ে আপনার বাড়ির সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছে।”

তিনি একবার গৃহিণীর সঙ্গে পরমর্শ করে এসে বহুবিধ কাতরোক্তি করতে করতে বললেন, “সেই মেয়ে পাগ্‌লাকেই মেয়ে দেবো। এখন তাকে পাই কোথায়?”

সে ভার আমি নিলুম। গেলুম স্মরজিৎকে আনতে। ভগবানের চেয়েও বড়ো ভাবুক আছে। সে মহেশ। সেই মহলানবীশের মহলা বিধির বিধানকে পরাজিত করে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে পারে সেই মহলানবীশ।

কিন্তু কোথায় স্মরজিৎ? রয়েছে একখানা চিঠি—“দাদা, পিতার ঈপ্সিতাকে পত্নী করতে পারব না। আমার মরণ শ্রেয়ঃ। চললুম মরণের সন্ধানে। ইতি। অভাগা স্মরজিৎ।”

এইখানে গল্পটি শেষ করে দিলে পাঠক হয়তো স্মবজিতের মরণে অশ্রুপাত করবেন। সেটা অনর্থক। স্মরজিৎ দিব্যি বেঁচে আছে, তবে আমি ও আমার নবীনা স্ত্রী তার মুখদর্শন করিনে।

**কপিল ভট্টাচার্য ( ১৯০৪— )**

# প্রিন্স

মদ আমি ছেড়ে দিয়েছি, সত্যিই ছেড়ে দিয়েছি। কারণ, মদে যে নেশা হত, সে নেশার আর আমার প্রয়োজন নেই।

না, হোটেলের নামটি আমি বলব না, আপনাবা চিনে ফেলবেন যে। কলকাতা শহরেই সে হোটেল, দিন রাত্রি ময়দানের পানে তাকিয়ে রয়েছে, দূরে ঐ ওয়্যারলেস-এব উঁচু থাম ক-খানির পানে তাকিয়ে বয়েছে, ওখানে সারা পৃথিবীর বহু সংবাদ নিত্যি নিত্যি ধরা পড়ে। গঙ্গার বুকে জাহাজের মাস্তুলগুলোও দেখা যায়, ঐ সব জাহাজেই তো সারা পৃথিবী ঘুরে আসা যায়।

ও হোটেল যে খুব ভালো মদ দেয়, তা আমি বলছি না। ভালো মদের আমার কোনোদিন দরকার ছিল না। সোডার জলে ভালো হুইস্কি পেলেই, ব্যস আমি খুশি। ভালো সোডার জল আর ভালো হুইস্কি তো সর্বত্রই পাওয়া যায়। তার জন্যে অবশ্য ও হোটেলে গিয়ে থাকবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আর তাব জন্যে আমি ওখানে থাকতামও না।

ভালো মিউজিক? হ্যাঁ, ওদের অর্কেস্ট্রা মন্দ নয়। কিন্তু আগেকার মতো কি আর জমে? কেল্লায় হাইল্যাণ্ডার গ্যারিসন এলে অবশ্য আলাদা কথা, আজকাল তারা আর এদিকে আসে কই?

ঐ সব গ্যারিসনের ছোকরা লেফ্‌টেনাণ্টবা ছোট ছোট টেবিল দখল করে বসবে, সমস্ত হলখানা গম-গম করবে, দু-চাবটে মদের গেলাস ঠুং ঠাং ভাঙবে, অট্টহাস্যে আর মাঝে মাঝে অর্কেস্ট্রাব সুর ধবে দু-এক কলি সঙ্গীতে হলখানা মুখরিত করবে, তবে না? তা না হলে অর্কেস্ট্রাব মিউজিসিয়ানরা ইন্স্‌পিরেশন পাবে কোথা থেকে?

বডোদিনের সময়েই অবশ্য জমতো সবচেয়ে বেশি। ঐ তো কলকাতার মরশুম। বড়োলাটকে দিল্লী চালান দিলে হবে কি, ঘোডদৌড় তো আর দিল্লীতে চালান দেওয়া যাবে না। দিল্লীতে কি বাংলার দুর্বাঘাস গজাবে? সুতরাং ভাইসরয়েজ কাপ খেলতে বডোলাট সাহেবকে কলকাতায় আসতেই হবে। আর রাজা মহারাজ? তাদের বাপ পিতামহ কলকাতাতেই আসতেন, বংশানুক্রমিক

ধারা বজায় রাখতেই তো বংশ মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। ওদের কলকাতা আগমন তো বংশ মর্যাদার লক্ষণ।

আমার হোটেলও বড়োদিনে জমতো।

শীতের কনকনে শুকনো হাওয়া গড়ের মাঠ, ইডেন গার্ডেন আর চৌরঙ্গীর উপর দিয়ে খেলে বেড়ায়, সে সময়ে আফগানিস্থানের আমীরও ছদ্মবেশে কলকাতায় বেড়াতে আসেন। আমি বর্তমান আমীরের কথা বলছি না, এর আগে সেই যে শৌখিন আমীর ছিলেন তাঁর কথাই বল্‌ছি। তিনি তো শুনেছি আজকাল রিটায়ার করে নরওয়ে না সুইডেন কোথায় ছবি আঁকছেন। আমার সঙ্গে ছদ্মবেশী আমীর সাহেবের সঙ্গে অবশ্য কোনোদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, তবে তার দু-একজন ওমরাও-এর বন্ধুত্ব লাভ করবার সুযোগ লাভ করেছিলাম।

না, টাকা ধার করিনি! আফগান ব্যাঙ্কের সুদের হার বড়ো বেশি। বেশি সুদ দেওয়া আমি ভালবাসি না। যেখানে কম সুদে টাকা পাওয়া যায়, আমি সেখানেই টাকা ধার করি। ধার না করলে কি ভদ্রলোকের চলে? সম্পত্তি বন্ধক দিলে অনেক জায়গায় অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়া যায়।

আজকাল? আজকাল আর ধারের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। মদ খাই না তো টাকার দরকার কিসের? ভাত রুটি খেতে কি আর টাকা পয়সা লাগে নাকি? ও তো বাংলাদেশে যেখানে সেখানে পাওয়া যায় একটু আত্মীয়তার পরিচয় বার করলেই হল।

বনেদী বংশে জন্ম তো বটেই। মেদিনীপুরে আমাদের ফ্যামিলিকে চেনে না কে? ভাস্কররাও বর্গীকে আমাদের পূর্বপুরুষই তো প্রথম আটকায়! তখনকার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গাধ্যক্ষ হলওয়েল সাহেব সে খবর রাখতেন। কৃতজ্ঞতা সহকারে একখানি চিঠিতে তিনি তা লণ্ডনে লিখে পাঠিয়েছিলেন। অন্ধকূপ হত্যা ডেসপ্যাচের তলায় সে চিঠি চাপা পড়ে গিয়েছিল। তারই জোরে তো একসাইজ্ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর চাকরি আমায় ঘরে ডেকে দেয়।

হ্যাঁ, সে কথা অবশ্য খুবই সত্যি যে আবগারি চাকরির কল্যাণে হোটেলের ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আলাপ থেকে পরিচয় আর তাই থেকে ঘনিষ্ঠতা এত গাঢ় হয়ে দাঁড়ালো যে আমার আর চাকরি করা পোষাল না। 'দূর হোক্ গে ছাই' বলে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে হোটেলে ডেরা গাড়লাম। এই আমার হোটেলবাসের আসল কারণ।

পেনসন্ পেতাম বৈকি! মনি অর্ডারে প্রতি মাসে ম্যানেজারের কেয়ারে

পেনসনের টাকা এসে পৌঁছতো। তাতেই হোটেল ভাড়া আর খাওয়ার খরচ কুলিয়ে যেত—শুধু হুইস্কির বিলটার জন্যে যা ধার করতে হত।

না, ইওরোপে আমি কখনও যাইনি, যদিও ইওরোপিয়ানদের আমি বড়ো ভালবাসি। ওদের সঙ্গে মিশেছি ঢের—এমন মানুষ দেখা যায় না। ওদের কাছে গল্প শুনে পোর্ট সৈয়দের কসমোপলিটান লাইফ, লণ্ডনের হাইড পার্ক, প্যারিসের প্লাস পিগাল, মস্কৌ-এর লেনিন মসোলিয়াম সবই আমি এমন ধারা জেনে গিয়াছি যে মনে হয় যেন ওসব নিজের চক্ষে দেখেছি।

আমার কোষ্ঠীতে জলে ফাঁড়া আছে যে, জলযাত্রা নিষেধ।—এরোপ্লেন? রামঃ, মাটি ছেড়ে কখনও হাওয়ায় উড়তে আছে। বিধাতার যদি তাই অভিপ্রায় হত তো মানুষের পাখনা থাকতো।

জলযাত্রায় লোভ ছিল আমার বরাবরই—কোষ্ঠীর নিষেধে সম্ভব হল না। ওটা মানি।

এই জন্যেই তো হুইস্কি খেতাম। নেশা যখন জমত, সমুদ্রে জাহাজে যেমন দোলানি দেয়, তেমনি ধারা মাথার ভিতরটা দুলতো।

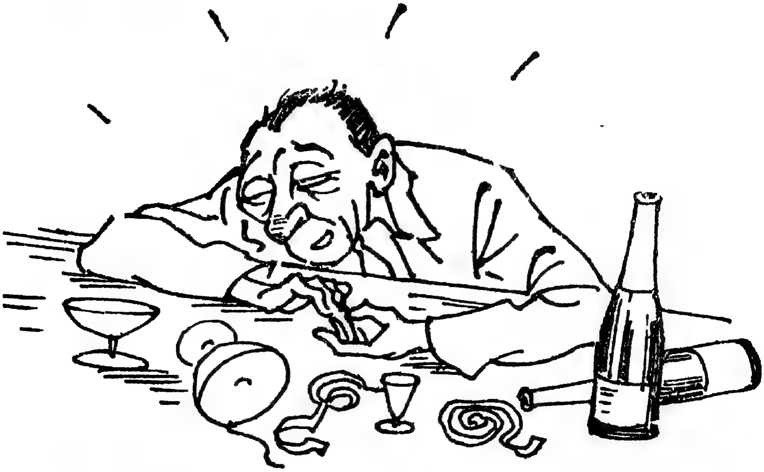

হ্যাঁ, মদ ছেড়ে দিয়েছি, সত্যিই ছেড়ে দিয়েছি। জলযাত্রার তো একটা শেষ আছে? বন্দরে পৌঁছে গেলে কে আর জাহাজে থাকে।

আমার বন্দরে পৌঁছবার কাহিনীই তো বলছি। তার আগে সমুদ্রযাত্রার বিবরণ শুনবেন না?

হ্যাঁ, অনেক ভালো ভালো ইওরোপিয়ানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মাবার প্রতিবন্ধক

হয়েছে আমার কালো রং। কালো বলে তো কালো নয়, এ যে একেবারে কোকিল পক্ষীকেও হার মানায়। লোকের ঠোঁট জোড়া তবু লালচে থাকে আমার এ জোড়া যে গাঢ় বেগুনে। অবশ্য পোশাক আমি চিরদিনই ভালোই পরি—কলকাতায় এক হপেন্সের বাড়িতেই এমন স্যুট কাটতে পারে। লণ্ডন থেকেও দু-একটা স্যুট কাটিয়ে এনেছি। এদেশী বাপ্তার বা তফেতার কাপড় কিনে দিয়ে লণ্ডনের স্যুটের নমুনা দিলে, হপেন্স কাটে মন্দ নয়। চলে যায়! ডায়াসে অর্কেস্ট্রা চলছে, ডাইনিং হল সাহেব মেমে ভরে গিয়েছে, যে যার টেবিলে, আমায় কত সন্ধ্যা আমার টেবিলে একাই কাটাতে হয়েছে। বড়োই নিঃসঙ্গ ঠেকত, সাইফন থেকে একাই সোডার জল ঢেলে গেলাসে মিশিয়ে ঢক্ ঢক্ করে হুইস্কির বোতল উজাড় করেছি। কী করব বলুন? আমার যে কালো রং, অনেক মহদন্তকরণ ইওরোপিয়ান এদিক পানে আসতে আসতেও ঘুরে চলে গেছেন।

নেশা হয়তো এত জমে গিয়েছে যে টেবিলে মাথা রাখতে হয়েছে—সবাইকার তখন খানা শেষ! অর্কেস্ট্রার মিউজিকের সঙ্গে ওয়াল্ট্জ্ নাচ শুরু হল, আমেরিকান জাজ-এর ফ্যাশানও খুব! সাহেব মেমগুলো খুব নাচত, টেবিলে মাথা রেখে তাই দেখতাম, নেশার ঘোরে, মাথা তুলি সে সাধ্য নেই।

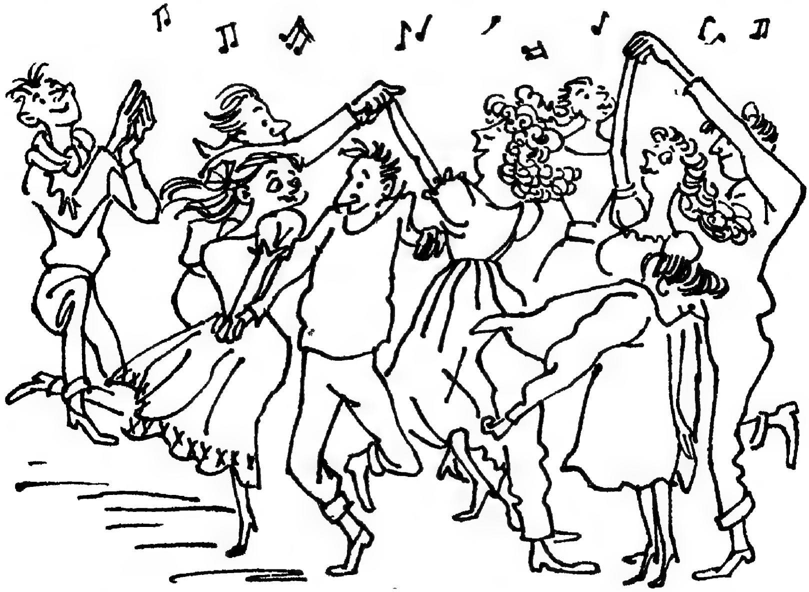

গড়ের মাঠের ওপারে জাহাজের মাস্তুলের ইম্প্রেশনটা মনের মধ্যেই থাকত

কিনা, খানিক পরেই তাই আমার মনে হত আমি যেন জাহাজে চড়ে সমুদ্র পথে পাড়ি দিচ্ছি! ভিড়ের মধ্যে মিউজিকের তালে তালে মেমদের নিতম্ব সরে সরে যাচ্ছে, টেবিলে আমার মাথা। সমান্তরাল রেখায় সেই সারি-সারি দোদুল্যমান নারী-নিতম্ব আমার চোখে সমুদ্রের স্ফীত তরঙ্গমালা বলেই ভুল হত।' দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়তাম। হেড-বয় জনি আমায় বড়ো ভালবাসত, তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিত।

ও বছর বড়োদিনের সময়ে আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ চলছিল, না?

ইটালিয়ানদের মতলব যে কি তা তো বলা যায় না, তাই এখানকার কেল্লার হাইল্যাণ্ডার গ্যারিসন বদলি হয়ে গেল সাইপ্রাস দ্বীপে, মেডিটেরানিয়ান সীর ঘাঁটিটা আগলাতে। দু-একজন ছোকরা লেফ্‌টেনাণ্ট আমার টেবিলে হুইস্কি খেয়েছে তাদের মুখে আমি এ খবর পেয়েছিলাম। ছোকরাগুলো বেশ ছিল, কলেজে আমরা প্রক্সি দিয়ে ক্লাস পালাতাম, তারাও তেমনি মাঝে মাঝে কেল্লা থেকে সটকাত। হয়তো দশ মিনিট পনেরো মিনিটের জন্যে। হোটেলে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিক দেখে নিত। কিছুই তো বলা যায় না। হয়তো গ্যারিসনের অ্যাডজুটাণ্ট সাহেবই ওখানে আড্ডা দিচ্ছেন! ধরা পড়লেই—ফেটিগ্‌।

আমায় দেখতে পেলেই তারা লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার টেবিলের কাছে এগিয়ে আসতো। ধপ্‌ করে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে আমার বোতল থেকে খানিকটা খাঁটি হুইস্কি ঢেলে নিয়ে ঢক্‌ ঢক্‌ করে গিলেই—দে পিট্টা—ন।

বড়োদিনের ঠিক আগেই এ দলটা সাইপ্রাসে বদলি হয়ে গেল। প্রত্যেক বছর এই সময়ে এক আধখানা মানোয়ারী জাহাজ কলকাতার পোর্টে এসে লাগে, সে বছর তাও লাগল না। সুতরাং সেলার সাহেবদেরও একান্ত অভাব। হোটেলের ম্যানেজার যথাসময়ে দাড়ি কামানো ছেড়ে দিলে, সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ির ওপর হাতের আঙুল বুলাতে বুলাতেই আমাকে ডেকে বললে, “এ বছর দেখছি বসিয়ে দিলে, মিস্টার কিষ্টোধন।”

আমার নাম কৃষ্ণধন দে, গায়ের রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নামকরণ হয়েছিল। আমাকে মিস্টার দে বলে ডাকলেই আমার পছন্দ হত বেশি, ম্যানেজার কিন্তু কিষ্টোধন বলে ডাকতেই ভালবাসত। টু মাচ ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রীড্‌স কন্‌টেম্পট্‌ আর কি।

দেখতে দেখতে বড়োদিনটাই এসে গেল। তখনও হোটেল প্রায় খালি। খদ্দেরের আশায় পাঁচতলার ট্যাঙ্কে অনেক জল ভরা হত রোজই। হোটেলের নিজেরই টিউব-ওয়েল আছে কিনা, সকালে মেকানিক এসে পাম্প চালিয়ে দিত। এদিকে ম্যানেজারের যাচ্ছিল মেজাজ বিগড়ে, রোজ এত জল ভরা আর ফেলে দেওয়া—অথচ ইলেক্‌ট্রিকের ইউনিটের খরচা তো বাড়ছে! ম্যানেজারের ধমক খেয়ে মেকানিক পাম্প চালানো বন্ধ করে দিলে, ফলে ট্যাঙ্কে বাসী জল জম্‌লো!

তার মানে বুঝতে পারছেন তো? অ্যানোফেলিস লাড্‌লোয়াই! তারপরে খবরের কাগজে পড়েছিলেন তো—অমুক হোটেলে টাইফয়েড!

যাক যে কথা বলছিলাম। বড়োদিনের ঠিক আগের দিন রাত্রি। অনেকগুলো বাক্স প্যাটরা এল, ম্যানেজারের মুখে হাসি ফুটলো। আফগানিস্থান লিগেশনের অতিথি। মোটা খদ্দের। ম্যানেজার তাঁদের তিনতলার একটা উইঙ্গই ছেড়ে দিলেন।

সানন্দে আমি দু-বোতল হুইস্কি নিয়ে আমার টেব্‌লে বসলাম। এদিন সবাইকারই মেজাজ বেশ খুশি থাকে, কিছুই তো বলা যায় না, কখন কে আমার কাছেই এসে বসবে?

হলটা প্রতি বছরের মতোই সাজানো হয়েছে অর্কেস্ট্রাও পূর্ণ উদ্যমে মধুর মিউজিক বাজাচ্ছে, ফুলের মালায় আর আলোয় যা শোভা খুলেছিল, তা আর কি বল্‌বো। সামনের গাড়ি বারান্দায় ছাদে ক্রীষ্টমাস তরু দেখবার জন্যে দেশীয় লোকের ভিড় জমেছিল প্রচুর।

আমি গেলাসে অল্প একটু হুইস্কি ঢেলে তাতে অনেকখানি সোডার জল মেশালাম। গেলাসটা একবার মুখে ঠেকিয়েই টেবিলে নামিয়ে রাখলাম। তাড়াতাড়ি কি? একটু প্রতীক্ষাই করা যাক না।

একটি ফুটফুটে মেম দিব্যি সেজেগুজে ভিতরে ঢুকল একলা! ভারী চমৎকার দেখতে তাকে, আমি তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। বয় এগিয়ে গিয়ে তার ফারকোটটা খুলতে সাহায্য করলে।

আমার টেবিলের সামনে মেঝের কার্পেটে মেম বার কয়েক এদিক-ওদিক ঘুরলো—ঠিক যেন গ্রীক অক্ষর সাইমা, ওমেগা আর থিটা তিনটে বার বার কাল্পনিক রেখায় এঁকে ফেললে। তারপরে ভুরু দুটো বিরক্তিতে কুঁচকিয়ে আমার কাছে এসে প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠলো, "অমন ড্যাব ড্যাব করে

দেখছ কি ? মেয়েমানুষ কখনো দেখোনি।”

প্রথমটা আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম বটে, কিন্তু আমার সামলে নিতে দেরি হল না। হেসে ধবধবে সাদা দাঁতের পাটি দেখিয়ে বললাম, “মেয়েমানুষ দেখেছি বৈকি মেমসাহেব, কিন্তু এমনটি কখনও দেখিনি —এমন সৌন্দর্য থেকে কি চোখ ফেরানো যায় ?”

এমন সপ্রতিভ উত্তরে কে না খুশি হয় ? বিশেষতঃ ইওরোপিয়ানরা—ওরা যতটা হিউমার আর রেডি উইটের সমঝদার এমন আর কে বলুন। তন্বী মেম হেসে ইওরোপিয়ানদের দলে মিশে গেল। আমি মনে মনে ফাদার আব্রাহামের নাম জপ করতে লাগলাম ( দুর্গানাম অনেকদিনই ছেড়েছিলাম )—বছরকার দিন আর একটু হলেই মাটি হয়েছিল আর কি !

এক পেগ হুইস্কি গলাধঃকরণ করে বিচলিত মনটাকে শান্ত করলাম।

হলের সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন পৌনে সাতফুট দৈর্ঘ্যের একটি বিশালকায় পুরুষ, ইওরোপিয়ান পরিচ্ছদে সুসজ্জিত। এতদিনে বুঝলাম, হোটেলের দরজাগুলো এত প্রকাণ্ড কেন, পৃথিবীতে এমন প্রকাণ্ড মানুষও আছে ? সাহেব হন হন করে আমার টেবিলের দিকেই এগিয়ে এলেন, তাঁর পদভারে হলখানা যেন থর থর করে কাঁপছিল।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, তাঁর সঙ্গে একটি অপরূপ রূপসী মেয়ে ছিল মেমের পোশাক পরা, দেখলেই কিন্তু বোঝা যায়, খাঁটি ইওরোপিয়ান ইনি নন। বিশালকায় সাহেবটির আড়ালে তাঁর তনুরূপ যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাহেবের সঙ্গে তিনি যখন আমার ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর ডাগর চোখদুটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বিশালতায় মানুষ খানিকক্ষণ বিস্মিত হতে পারে বটে, কিন্তু সুন্দরী রমণীর রূপ মনে যা তন্ময়তা এনে দেয়, তাব তুলনা হয় না।

সাহেব আমার টেব্‌লেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, তার ওজনে চেয়ারখানা মড-মড করে উঠলো। মেয়েটিও তাঁর পাশে একটি চেয়াবে বসলেন।

আমার দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে হেসে সাহেব বললেন, “আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি কি স্যার ?”

আমি আনন্দে বিগলিত হয়ে গেলাম—চট্‌পট বার পাঁচেক বলে ফেললাম, হাঁ, হাঁ, হাঁ, হাঁ, হাঁ এবং তাডাতাড়ি একটা গেলাসে হুইস্কি ঢেলে তাঁর দিকে

এগিয়ে দিলাম। তিনি কোনো ফর্মালিটির অপেক্ষা না রেখে ঢক্ ঢক্ করে এক চুমুকে সেটা পান করে ফেললেন। আমি অবাক হয়ে রইলাম। সঙ্গে রয়েছেন একজন লেডী, তিনি কোনো ওয়াইন আস্বাদ করবেন কিনা, তার খোঁজ নেই, অথবা আমার সঙ্গে 'স্বাস্থ্য' বিনিময়ও করা নেই!

গেলাসটা টেবিলে রেখে রুমালে মুখ মুছে আমায় সাহেব বললেন, "আফগান লিগেশন তো এই হোটেলেই উঠেছে না? আমি সটান কান্দাহার থেকে আসছি, ওরা কাবুল থেকেই বরাবর চলে এসেছে কিনা, তাই ওদের ধরতে পারিনি। আমার সঙ্গিনী এটি, তুর্কী মেয়ে কামাল আতাতুর্কের দেশের প্রজা,—ইনিই আমার সেক্রেটারি—"

আমি মেয়েটিকে অভিনন্দন করলাম, মেয়েটি তাঁর আয়ত চোখদুটির হাস্যমধুর দৃষ্টি একবার আমার পানে নিক্ষেপ করলেন। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, গভীর এবং আন্তরিক বিনয় সহকারে—"আপনাকে কোনো মিষ্টি মদ আনিয়ে দেব কি?—ইটালীয় ভারমুথ? পুরুষদের হুইস্কি খেতে অনুমতি দিচ্ছেন তো?"

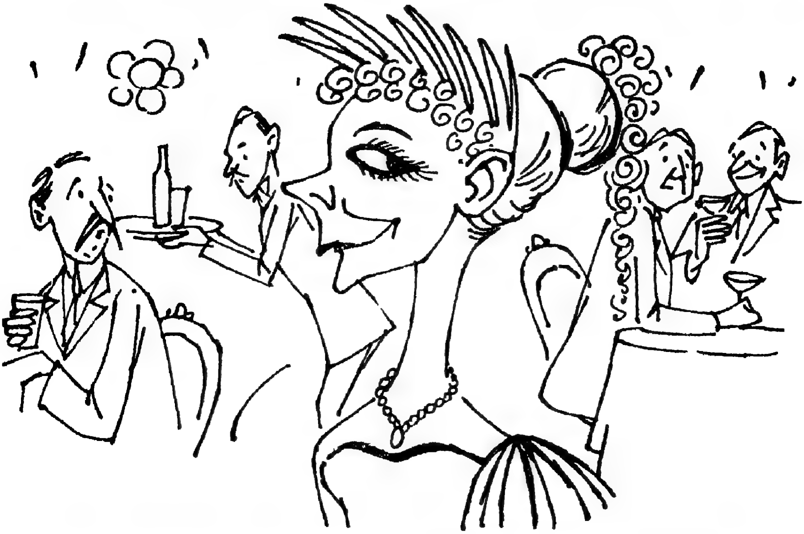

আফগান-সাহেব অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভাষায় বলে উঠলেন "আপনি এখনও ইটালীয় জিনিস ব্যবহারের কথা ভাবতে পারেন? আপনার দেশের উপর তাদের অত্যাচার?"

অমন একজন বিশালকায় মানুষকে রাগান্বিত দেখলে কে না ভড়কে যায়? যদিও তাঁর কথার ঠিক অর্থ বুঝতে পারলাম না, তথাপি সায় দিয়ে বললাম,

"হ্যাঁ, ইটালিয়ানরা আমাদের দেশের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে!"

তিনি বলে চললেন, "জিবুটির রেলপথ তো সমস্তই অধিকার করেছে, আসমারা ওদের কবলে, আদ্দিস-আবাবা তো নিলে বলে—"

দাঁড়ান! আফগান সাহেব দেখতে পাচ্ছি আমায় আবিসিনিয়ার হাব্‌সী বলে ভুল করেছেন। আমার কালো রঙের মহিমা আর কি! মনে মনে ভাবতে লাগলাম, প্রতিবাদ করে ভুল ভেঙে দেব, না, দেখাই যাক্ না?

আফগান সাহেব এতক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলছিলেন, কিন্তু আবিসিনিয়ার কথা বলতে বলতে তিনি এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে শেষ পর্যন্ত কান্দাহারের ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা শুরু করে দিলেন। ইতিমধ্যে একটা হুইস্কির বোতল টেনে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে পান করে ফেলে দড়াম করে খালি বোতলটা টেবিলে রাখলেন। অমন তীব্র লিকরটা কেমন করে যে তাঁর গলা দিয়ে অবলীলাক্রমে নেমে গেল জানি না। তিনি শুধু একটু মুখবিকৃত করেছিলেন। জার্মান সাহেবরা যে ঢক্ ঢক্ করে বিয়ার খায়, তারাও এর চেয়ে বেশি সময় নেয়।

তুর্কীসুন্দরী আমার পানে তাকিয়ে মুচকে মুচকে হাসছিলেন। আমি তাঁকে চাপা গলায় বললাম, "আসল কথাই চাপা পড়ে যাচ্ছে—আপনাকে তা হলে কোনো ফরাসী মদ আনিয়ে দেব? না হয় একটু শ্যাম্পেন খান!"

সুন্দরী মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আমি তক্ষুনি জনিকে ইশারায় ডেকে এক বোতল শ্যাম্পেনের অর্ডার দিয়ে দিলাম, একটা রূপোর বালতিতে বরফ ভরে তাইতে শ্যাম্পেনের বোতল বসিয়ে বয় নিয়ে এল। ম্যানেজার দেখতে পাচ্ছি বড়োদিনের জন্যে রূপোর বালতিগুলো বার করেছে।

হুইস্কির বোতল নিঃশেষ করে আফগান সাহেবের কিছুক্ষণের জন্য তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছিল। তাঁর উত্তেজনাও কমে গিয়েছিল! তিনি হাস্যমুখে আমায় বললেন, "ওঃ ও বোতলটায় আপনার জন্যে একটুও রাখিনি। আসুন অন্য বোতলটা খোলা যাক।"

বড়োদিন, বচ্ছরকার দিন। আমি সানন্দে হুইস্কির অপর বোতলটি সাহেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে স্বয়ং শ্যাম্পেনের বোতলটি খুলে দিলাম—হুস করে তার ভেতর থেকে তরল সফেন মদ খানিকটা টেবিলক্লথের ওপর পড়ে গেল। সুন্দরীর গেলাসটিও আমি শ্যাম্পেনে ভরে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "আসুন!"

ইতিমধ্যে সাহেব দু-গেলাসে হুইস্কি ঢেলেছেন। আমায় বললেন, "আসুন,

আসুন—আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসির স্বাস্থ্যপান করা যাক !"

কাজে কাজেই তাঁর সঙ্গে হাবসী সম্রাটের স্বাস্থ্যপান করলাম। আমার বেশ কৌতুক বোধ হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও হচ্ছিল যথেষ্ট। এতদিনে আমার কৃষ্ণবর্ণ সার্থক হল। ভাগ্যিস্ আফগান সাহেব আমাকে হাব্সী বলে ভুল করেছেন তাই তো আজ এই বচ্ছরকার দিনে এমন রূপসী তুর্কী মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে পেলাম। এই কালো রঙের জন্যে জীবনটাকে বহুবার ধিক্কার দিয়েছি, আজ প্রথম সুযোগ হল তাকে কনগ্র্যাচুলেট্ করবার !

সাহেব হুইস্কি নিঃশেষ করুক গিয়ে—আমি ততক্ষণ সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করি। কণ্ঠ অতি মিষ্ট করে সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার কৌতূহল মার্জনা করবেন—তুরস্কের প্রগতি হয়েছে যথেষ্ট! এই তো সেদিন পর্যন্ত ওখানকার নারী বোর্খা ধারণ করেছিলেন। আপনারা তো সেগুলো ত্যাগ করলেন। আচ্ছা, দেশসুদ্ধ মেয়ের ব্যবহৃত অতগুলো বোর্খার কি হল ? সব পুড়িয়ে ফেললেন বুঝি ?"—

তরুণী মধুর হেসে উঠলেন, "হাউ রিডিকিউলাস! বোর্খা পোড়ানো হবে কেন ? অতখানি কাপড় কি নষ্ট করে ? ন্যাশন্যাল ওয়েল্থের অপচয় !"

বললাম, "তাহলে বুঝি বোর্খা কেটে বল্-নাচের গাউন তৈরি করালেন ?"

সাহেব সুন্দরীর সঙ্গে আমার আলাপ জমতে দিলেন না। আমায় অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "আচ্ছা, আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী আপনার কে হন ? নিশ্চয় কোনো নিকট আত্মীয় ?"

এরূপ প্রশ্নের আমি প্রত্যাশা করিনি। খানিকক্ষণ আমি যেন বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। দুঃখের বিষয় আবিসিনিয়ার বিষয়ে আমি খুব কম সংবাদ রাখি। ইওরোপীয় দেশগুলোর সংবাদ রাখি। ইওরোপীয় দেশগুলোর সব সংবাদই রাখতাম, কিন্তু আবিসিনিয়া যে এ ভাবে আমার জীবনে আচম্বিতে প্রবেশ করবে, এ কথা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। যুদ্ধের খবরের জন্যে সংবাদপত্র কি মন দিয়ে পড়তাম ছাই !

হোটেলের ম্যানেজার ইটালিয়ান, হেড-কুকও ইটালিয়ান। তাদের মুখে যা দু-চার কথা শুনতাম। আমি ধরে রেখেছিলাম, ইটালি অবশ্যই আবিসিনিয়া জয় করে ফেলবে, সুতরাং যুদ্ধের দৈনন্দিন গতি নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাতাম না।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে সাহেব আবার বললেন, "প্রিন্স, সম্রাট হাইলে-

সেলাসী আপনার কে হন আমায় বলতে বাধা কি? জানেনই তো আফগানিস্থান চিরকালই আপনাদের বন্ধু!"

প্রিন্স! আফগান সাহেব আমায় নিতান্তই হাইলে-সেলাসীর আত্মীয় বলে সাব্যস্ত করে নিয়েছেন। সুতরাং আর উপায় কি? মৃদুস্বরে তাঁকে জানালাম, "আমি সম্রাটের এক সম্পর্কে ভাগিনেয়, আর এক সম্পর্কে ভায়রা-ভাই।"

মিথ্যে যদি বলতে হল তো বেশ জমাটি মিথ্যা বলবো না কেন? আর হতেই তো পারে আমাদের সঙ্গে পুর্বপুরুষের সঙ্গে আবিসিনিয়ার সম্রাটের আত্মীয়তা ছিল। আমি সেই বহু পুবাতন দিনের কথা মনে করছি যখন আর্যাবর্তের এক প্রান্তে আমাদের পুর্বপুরুষ রাজত্ব করতেন। এখন সেই অঞ্চলই তো মেদিনীপুর। শুনেছি জিওলজিতে আছে, আজ যেখানে আরব্যসাগর, ওটা এক কালে ভূখণ্ড ছিল, আর্যাবর্ত, মহেঞ্জোদাবো, আরব, ইজিপ্ট, আবিসিনিয়া এ সমস্ত রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। তা না হলে কোথায় আবিসিনিয়ার লোকের গাত্রচর্ম কৃষ্ণবর্ণের আব আমাবই বা গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ হবে কেন?

এবার আফগান সাহেব চাপা গলায় এক অবোধ্য ভাষায় আমায় কি বলতে লাগলেন, আমি কিছুই বুঝতে পাবলাম না, বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে আমি ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে আয়তনয়না সুন্দবীর পানে তাকাতে লাগলাম। সাহেব বারবার অবোধ্য ভাষায় সেই একই কথা বলতে লাগলেন।

আমি আন্দাজ করে নিলাম, ইনি নিশ্চয় হাব্‌সী ভাষায় আমায় কিছু বলছেন। যথাসম্ভব সাহসে বুক বেঁধে চোস্ত ইংরাজিতে তাকে বললাম, "শুনুন স্যার, এখানে আবিসিনীয় ভাষা ব্যবহার করবেন না।"

এবারে আফগান সাহেবের ফ্যাল ফ্যাল করে তাকানোর পালা। তিনি সত্যিই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমায় আবার ইংরাজিতে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন আবিসিনিয়ান্‌ কথা বলতে নিষেধ করছেন কেন, প্রিন্স? বহুদিন পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা—আমি আফগান সম্রাট আমীর আমানুল্লার আমলে আদ্দিস-আবাবায় অ্যামব্যাসাডর ছিলাম যে, আমায় আপনি চিনতে পারলেন না? অথচ আপনাকে আমি রাস্তা থেকে চিনতে পেরেছি।"

এতক্ষণে বুঝলাম ইনি কেন হোটেলে ঢুকেই সটান আমার টেবিলের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন এবং কোনো ফর্মালিটির অপেক্ষা না রেখে ঢক্‌ঢক্‌ করে আমার হুইস্কি পান করেছিলেন।

কিন্তু এ বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার হই কি করে ? দুশ্চিন্তায় সেই ডিসেম্বরের শীতেও আমার অঙ্গ বেয়ে গল্‌গল্‌ করে ঘাম বেরুচ্ছিল।

সাহেব বলে চললেন, "হাবসী ভাষায় দুটো মনের কথা বলতে পারতাম! এখানে কেউ বুঝতে পারবে না! আপনি কতদূর কি করলেন? ভাইসরয় তো বড়োদিনে দিল্লী এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন নাকি? আদ্দিস আবাবায় তো ভারতবর্ষের অনেক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। নিজামও তো এখন কলকাতায়, তিনি না হাব্‌সী সৈন্য-বাহিনী রাখেন?"

সত্যই বড়ো বিপদে পড়লাম! এঁর সঙ্গে কথা চালানো তো আমার পক্ষে অসম্ভব। হুইস্কির গেলাস ভর্তিই পড়ে রইলো, সাহেবের সে দিকে নজর নেই। আবিসিনিয়ার রাজনৈতিক সংবাদ নিতেই তিনি এখন বিশেষ ব্যগ্র। এ যে দেখছি নিতান্ত বেগতিক।

যা হোক মাথায় একটা বুদ্ধি উপস্থিত হল। আমি ধীরস্বরে চাপা গলায় বললাম, "দেখুন এ হোটেলে আবিসিনিয়া প্রসঙ্গে কথা বলা মোটেই নিরাপদ নয়। এখানে কেউ জানে না যে আমি একজন হাব্‌সী প্রিন্স। এ হোটেলটা ইংরাজের হলেও এর ম্যানেজার এবং হেড-কুক হচ্ছে ইটালিয়ান্‌। জানেনই তো ইওরোপিয়ানরা কি রকম ইটালিয়ান রান্নার পক্ষপাতী।"

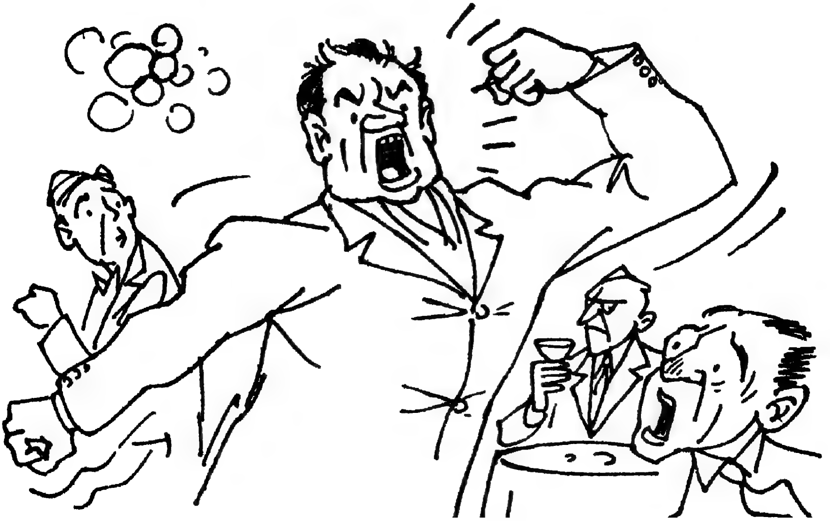

হিতে বিপরীত হল। হোটেলের ইটালিয়ান ম্যানেজার শুনেই তিনি হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং ফুটবল হাই কিক্‌ করার মতো এমন ভাবে লাথি

ছুঁড়লেন যে আমাদের টেবিলটা তার চোটে খানিকটা উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে যখন আবার-নামলো, তখন বোতল গেলাসগুলি সব কার্পেট আশ্রয় করেছে !

হলের সমস্ত লোকের দৃষ্টি আমাদের পানে আকৃষ্ট হয়ে গেল। এমন কি ডায়াসের উপরকার অর্কেস্ট্রার মিউজিক পর্যন্ত থেমে গেল।

আফগান সাহেব চিৎকার করতে লাগলেন, “আপনি আবিসিনিয়ান্ প্রিন্স হয়ে ইটালিয়ানদের হোটেলে বাস করছেন !”

আয়তনয়না সুন্দরীও তাঁকে কিছুতেই থামাতে পারলেন না।

বহু ইওরোপিয়ান সাহেব মেম জডো হয়ে গেল। ম্যানেজারও নিজে এসে দাঁড়ালো। আফগান সাহেবের কথা শুনে রক্ত-মুখে সে আমায় বললে, “মিস্টার কিষ্টোধন ! তুমি হাব্‌সী গুপ্তচর—এখনই আমার হোটেল থেকে বেরিয়ে যাও !”

কী মুশ্‌কিল ! কাকেও বোঝাতে পারলাম না। আমাকে তাড়ানোর আয়োজনে সব ইওরোপিয়ানই দেখলাম একজোট।

সত্যিই আমার তখনই হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে হল। আফগান সাহেব ও তুর্কী সুন্দরী যথেষ্ট সাহায্য করলেন, আমার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে দিতে।

সেই থেকে আমি মদ ছেড়ে দিয়েছি। সত্যিই ছেড়ে দিয়েছি। ও নেশার আর প্রয়োজন হয় না—মনে মনে যখনই ভাবি আমি একজন আবিসিনিয়ার প্রিন্স, মন আমার আপনিই কী অপূর্ব নেশায় মশ্‌গুল হয়ে যায়। মদের নেশার প্রয়োজন কি ?

সৈয়দ মুজতবা আলী ( ১৯০৪ — )

# দাম্পত্য জীবন

যাঁদের ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছি—অর্থাৎ ‘পঞ্চতন্ত্র’ তৈরি করছি তাঁদের সঙ্গে দেশের পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র স্থাপন করার বাসনা এ অধমের প্রায়ই হয়। তাঁদেরই একজন আমার এক চীনা বন্ধু। সত্যকার জহুরী লোক—লাওৎসে, কনফুৎসিয়ে টে-টম্বুর হয়ে আছেন। তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হলেই শাস্ত্রবচন ওষ্ঠাগ্রে। আমি যে পদে পদে হার মানি সে কথা আর রঙ-ফলিয়ে, তুলি-বুলিয়ে বলতে হবে না।

ক্লাবের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি নিম গাছের তলায় বসে তিনি আপিস ফাঁকি দিয়ে চা পান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এন্তার এলেম হাঁসিল করেছি—তারই একটা আপিস ফাঁকি দেওয়া। কাছে পৌছতেই একগাল হেসে নিলেন—অর্থ সুস্পষ্ট—ছোকরা কাবেল হয়ে উঠছে। আর ক-দিন বাদেই আপিস যাওয়া বিলকুল বন্ধ করে পুরো তনখা টানবে।

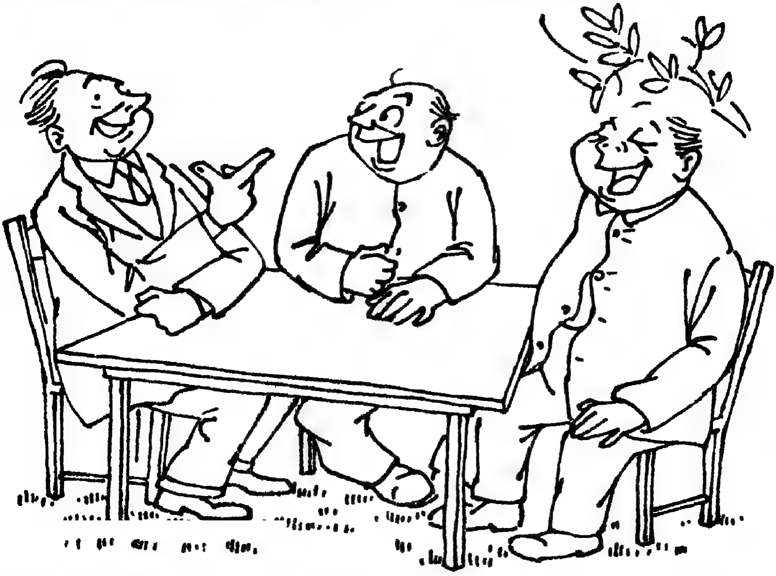

ইতিমধ্যে এক ইংরেজও এসে উপস্থিত।

রসালাপ আরম্ভ হল। কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা।

সায়েব বললে, "লণ্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিঙটিঙে হাড্ডিসার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই ছ-ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরৎ দুমদুম করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে এক ছ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না। চলো বাড়ি।' সুড়সুড় করে ছোকরা চলে গেল সেই খাণ্ডার বউয়ের পিছনে পিছনে।"

আমার চীনা বন্ধুটি আদবমাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন। সায়েব খুশি হয়ে চলে গেল।

গুটিকয়েক শুকনো নিমপাতা টেবিলের উপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিলক্লথের উপর আল্‌পনা সাজাতে সাজাতে বললেন, "কী গল্প! শুনে হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশি।" তারপর চোখ বন্ধ করে বললেন—

"চীনা গুণী আচার্য সু তাঁর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীন দেশের পেপিং শহরে অত্যাচার-জর্জরিত স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য, কি প্রকারে নিপীড়িত স্বামীকুলকে তাঁদের খাণ্ডার খাণ্ডার গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?

"সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওলা অধ্যাপক মাওলীকে। ঝাড়া ষাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল গিন্নীর হাতে অশেষ অত্যাচার ভুঞ্জেছেন সে কথা সকলেরই জানা ছিল।

"ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বজ্র নির্ঘোষে বক্তার পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের অত্যাচারে দেশ গেল, ঐতিহ্য গেল, ধর্ম গেল, সব গেল, চীন দেশ হটেনটটের মুল্লুকে পরিণত হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে। ধন-প্রাণ, সর্বস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে। এসো ভাই এক জোট হয়ে—

"এমন সময় বাড়ির দরোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, 'হুজুরেরা এবার আসুন। আপনাদের গিন্নীরা কি করে এ সভার খবর পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া করে আসছেন।'

"যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়। জানলা দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে, এমন কি ছাত ফুটো করে দেয়াল কানা করে দে ছুট, দে ছুট! তিন সেকেণ্ডে

মিটিং সাফ—বিলকুল ঠাণ্ডা!

"কেবলমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শান্ত গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। দরোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বারবার প্রণাম করে বলল, 'হুজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন তাঁর সামনে চেঙ্গিস খাঁনও তসলিম ঠুকতেন, কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার সামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনের সক্কলের পয়লা রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে। আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।' সভাপতি তবু চুপ। তখন দরোয়ান তাঁকে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। হার্টফেল করে মারা গিয়েছেন।"

আচার্য শু থামলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে 'সাধু সাধু' 'সাবাস সাবাস' বললুম। করতালি দিতে দিতে নিবেদন করলুম, "এ একটা গল্পের মতো গল্প বটে।"

আচার্য শু বললেন, "এ বিষয়ে ভারতীয় আপ্তবাক্য কি?"

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসুলকে স্মরণ করলুম, পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না। শেষটায় মৌলা আলীর দয়া হল।

হাত জোড় করে বরজলালের মতো ক্ষীণ কণ্ঠে ইমন কল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিরাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার কোণে। খবর পেয়ে প্রধান মন্ত্রী এসে শুধালেন, 'মহারাজের কুশল তো?' মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী বিস্তর পীড়াপীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, "ঐ রানীটা—ওঃ কী দজ্জাল, কী খাণ্ডার! বাপরে বাপ! দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।"

মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন, "ওঃ! আমি ভাবি আর কিছু। তাতে অত বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ! বউকে তো সব্বাই ডরাই—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো আর কেউ এ রকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে না।"

রাজা বললেন, "ঐ তুমি ফের আর একখানা গুল ছাড়লে।" মন্ত্রী বললেন, "আমি প্রমাণ করতে পারি।" রাজা বললেন, "ধরো বাজি।" "কত মহারাজ?" "দশ লাখ।" "দশ লাখ?"

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে হুকুম জারি হল—বিষ্যুৎবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের

দেয়ালের বাইরে জমায়েত হয়। মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, "মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।"

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরুর পালের মতো, কাল বৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মতো সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষে, দলে, থেঁতলে—তিন সেকেণ্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মধ্যিখানে লিকলিক করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এ রকম দাঁড়াবে তিনি তা কল্পনাও করতে পারেননি। মন্ত্রীকে বললেন, "তুমিই বাজি জিতলে। এই নাও দশ লখা হার।" মন্ত্রী বললেন, "দাঁড়ান মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে।" মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এসে বললেন, "তুমি যে বড়ো ওদিকে দাঁড়িয়ে? বউকে ডরাও না বুঝি?"

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "অতশত বুঝিনে হুজুর, এখানে আসবার সময় বউ আমাকে ধমকে দিয়ে বলেছিল, 'যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।' তাই আমি ওদিকে যাইনি।"

আচার্য স্যূ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, "ভারতবর্ষেরই জিত। তোমার গল্প যেন বাঘিনী বউ। আমার গল্প ভয়ে পালালো।"

তবু আমার মনে সন্দ রয়ে গিয়েছে। রসিক পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন্ গল্পটাকে শিরোপা দিই?

শিবরাম চক্রবর্তী ( ১৯০৫— )

# ধার ঘেঁষার ভারী ফ্যাসাদ

পৃথিবীর অনেক কিছুই সার বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তারা অসার। ঠিক সারমেয়ের মতন। নির্জন আড্ডাঘরের এককোণে আরামচেয়ারে এলায়িত হয়ে সবেমাত্র বিশ্বসংসার বিস্মৃত হতে চলেছি, চোখের পাতা বুজেছি, কি বুজিনি, এমন সময়ে ভুঁইফোঁড় দৈত্যের ন্যায় দীপেন আমার সামনে এসে প্রত্যক্ষ হল।

"বনস্পতিকে দেখেছ ?" খোঁজ করল সে—একটু খাপছাড়া ভাবেই।

"নাঃ। চারধার সাফ। কোনো শঙ্কা নেই।" আমি তাকে অভয় দিলাম।

"এসেছিল কি আসেনি ?" দীপেন তথাপি নাছোড়।

"আমি তাকে চোখেও দেখিনি, কানেও শুনতে পাইনি—এখানে আসা অবধি।" আমি জানালাম।

দীপেন বসে পড়ল। "তাহলে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।" বলল সে, "অন্ততঃ একবারটির জন্যেও সে এখানে আসবে। গল্প করবার জন্যেও অন্ততঃ। রোজই তো আসে—না কি ?"

আমি একদৃষ্টে দীপেনের দিকে তাকাই। "তুমি অপেক্ষা করবে—ওর জন্যে ?" আরামচেয়ারের আওতায় যাও বা একটু ঘুমঘুম এসেছিল ওর কথার ঝটকায় সে আমেজ কেটে যায়—ষোলো আনা সজাগ হয়ে উঠি, "অ্যাঁ ? তুমি কার খোঁজ করেছিলে বললে ? বনস্পতির না ?"

"হ্যাঁ।" গম্ভীর মুখে ও ঘাড় নাড়ল। "বনস্পতির সঙ্গে আমার দেখা হওয়া জরুরী দরকার।"

আমি ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হই। ওর কথার মর্ম আমার মর্মে ঢোকে না। আমার নিরেট মাথায় ঠেকে ঠেকে ধাক্কা খায়।

সত্যি বলতে, ওর কথার কোনো অর্থ হয় বলে আমার মনে হয় না।

"তুমি দেখা করতে চাও—বনস্পতির সঙ্গে ? এই কথাই বললে না ?" আমি ওর বিবৃতির ছিন্ন সূত্রগুলি আমার মানসপটে পরের পর সাজাই। শ্রুতি আর স্মৃতি আর সেই সূত্রদের জোড়াতাড়া দিয়ে পরম্পরায় সাজিয়ে পরস্পর সম্বন্ধ

বার করার চেষ্টা করি। রহস্যটা পরিষ্কার করতে চাই।—"তুমি ওর দেখা পেতে চাও, সত্যি বলছো ?"

"ঠিক যে চাই তা নয়—" দীপেন শুদ্ধিপত্র সংযোগ করে, "তবে তার সঙ্গে দেখা না করলেই আমার নয়।"

"কেন ?" স্পষ্টবাক্যে আমি জানতে চাই, "হেতু ?"

"বললে পরে বুঝবে।" দীপেন বলে, 'ক-দিন আগে গোটা পঁচিশেক টাকার আমার দরকার পড়েছিল হঠাৎ। অর্থোপায়ের মানসে এই আড্ডায় এলাম। বন্ধুবৎসল কোনো বন্ধুর দেখা পেয়ে যাই যদি। কিন্তু বনস্পতি ছাড়া তখন আর কেউ এখানে ছিল না। বাধ্য হয়ে ওকেই আমায় হাতড়াতে হল।"

ধার করা দীপেনের এক বিলাসিতা। সেকালের বীরকেশরীদের যেমন হরিণ শিকার করে স্ফূর্তি হত, দীপেনের তেমনি এই ঋণস্বীকার। এক রকমের মৃগয়াই বৈকি।

এবং এই মৃগয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে অশ্বমেধ। দীপেনের কথায় আমার একটা কথা মনে পড়ে যায়।—"পরশুদিন শনিবার ছিল বুঝি ?" আমি না জিজ্ঞেস করে পারি না।

দীপেন তানা-নানা করে। পরশুর শনিত্বকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে চায়, করতে পারলে বাঁচে, কিন্তু কাজটা নিতান্তই ক্যালেণ্ডারবিরুদ্ধ বলে তেমন সুষ্ঠুরূপে পারে না।

"কি রকম ? কিছু সুবিধে হল মাঠে ?" আমার পুনরপি প্রশ্ন। মৃগয়ার টাকাগুলো গয়ায় গেল কিনা আমার জ্ঞাতব্য। দীপেন কিন্তু এ-জেরাটাকেও এড়াতে চায় —"ও কথা আর বোলো না।"

সে কথা বলবার নয় তা জানি। দীপেন যে-ঘোড়াকে ধর্তব্যের বাইরে জ্ঞান করে সেই ঘোড়াই হাসতে হাসতে জিতে যায়। যাদের বাজে মনে করে তারা হেঁটে গেলেও বাজি মারে। আর দীপেন যাদের ওপর বাজি ধরে তারা চার পা মায় লেজ তুলে দৌড়েও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি চতুর্থও হয় না—শেষ পর্যন্ত সেই 'অলসো র‍্যান' হয়ে দাঁড়ায়। মুখেই কেবল 'অলসো র‍্যান্', আসলে তাদের রান্ করা তো নয়, শুধু হয়রান করা, দীপেনের মতো হতভাগ্যদের নাজেহাল করা না-হক্। নির্ঘাত জেতার বাজিও যে কি করে ডিগবাজি খায় সে এক রহস্য—দীপেনের কাছে এবং আমাদের কাছেও। অতএব কথাটা অকথ্যই বাস্তবিক—ভেবে দেখলে !

এই অকথ্যতার জন্য কতবার ওকে আমরা বলেছি, দীপেন টাকাগুলো ঘোড়ার পশ্চাতে এভাবে অপব্যয় না করে আর কোথাও ওড়াও। আমাদের কথা বলছিনে—তবে মেয়েদের পেছনে ওড়ালেও তো পারো! দীপেনের জবাব, চেনা মেয়েরা নাকি ওড়াবার বা উড়বার মতো নয়। তাদের জন্য খরচান্ত হওয়া পোষায় না। আমি বলি, না হয় অচেনা, অর্ধচেনাদের জন্যেই করলে, ঘোড়ারাও তোমার কিছু পরিচিত নয় তো? মনের মতো মেয়ে নাই বা পেলে, দেখতে পরীর মতো হলেই তো হয়। তখনই দেখবে—পূর্ব জন্মের পরিচয়! প্রথম দর্শনেই টের পাবে। পুনঃ পুনঃ ঘনিষ্ঠতায় আরো বেশি করে মালুম হবে। তা ছাড়া, ঘোড়াদের জন্যে তুমি বহুৎ করেছো কিন্তু তার কোনো প্রতিদান পেয়েছ কী?—ওর এক-চতুর্থাংশ যদি মেয়েদের যজ্ঞে দিতে, যোগ্য ফল পেতেই। ঘোড়াদের কাছ থেকে তুমি কোনো সদ্ব্যবহার লাভ করোনি—এত টাকা ঢেলেও এতদিনে ওদের একটাকেও উইন্ প্লেস কোথাও পাওনি, কিন্তু মেয়েদের বেলা তার অন্যথা দেখতে। নেহাত তাকে উইন্ করতে না পারো (তোমার বরাত!) তবে প্লেসে তাকে পেতে নিশ্চয়। সিনেমায় কি রেস্তোর্ঁায় সে না এসে যেত না। তারপর তোমার হাতযশ! হৃদয় যদি নাও পাও, এমন নির্দয়তা পেতে না।

এর জবাবে দীপেন মুখখানা যেন কি রকম করেছে, বিষাক্ত পৃথিবীতে বিষণ্ণ প্রতিভারা যেমন করে থাকে। সামান্য মানুষরা না বুঝলে বা একান্তই ভুল বুঝে দোষ করলে মহাপুরুষদের যেমন করা দস্তুর। কিংবা হয়তো—শেলীকে আমি কখনো চোখে দেখিনি—শেলীর মতোই মুখখানা করেছে হয়তো। সেই দৃশ্য শেলের মতো আমার বক্ষস্থলে বেজেছে।

তার ভাবখানা ভাষান্তরে এই দাঁড়ায়: বৎসগণ, তোমরা পাঁড় বেকুব! দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? অশ্বতৃষ্ণা কি অন্য সুধায় মেটবার?……আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। অশ্বাহত দীপেনের দিকে তাকাতে পারিনি। ঘোড়ার চাট ঘোড়াতেই সইতে পারে। আর—আর পারে দীপেন। ও আমাদের কম্মো না।

তবে দীপেনের চাট্ মাঝে মধ্যে যে আমাদের সইতে হয় না তা নয়। একদিনের কথা বলি। আমার নিজের কথা, মনে আছে এখনো। বর্ষাকাল, কোনো এক রাস্তার মোড়, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। এক মাসিক পত্রিকায় গল্প বেচে কড়কড়ে দশটি মুদ্রা নিয়ে ফিরছি—প্রথম লেখক জীবনের দশম দশায় ওই

সম্বল! এমন সময় দীপেন এসে পাকড়ালো, "ভাই ভারী বিপদ, গোটা দশেক টাকা আমায় দিতে পারো? ধার চাচ্ছি।" ওর চোখমুখ উদাস, চুল উস্কু খুস্কু, বৈরাগ্যের চেহারা।

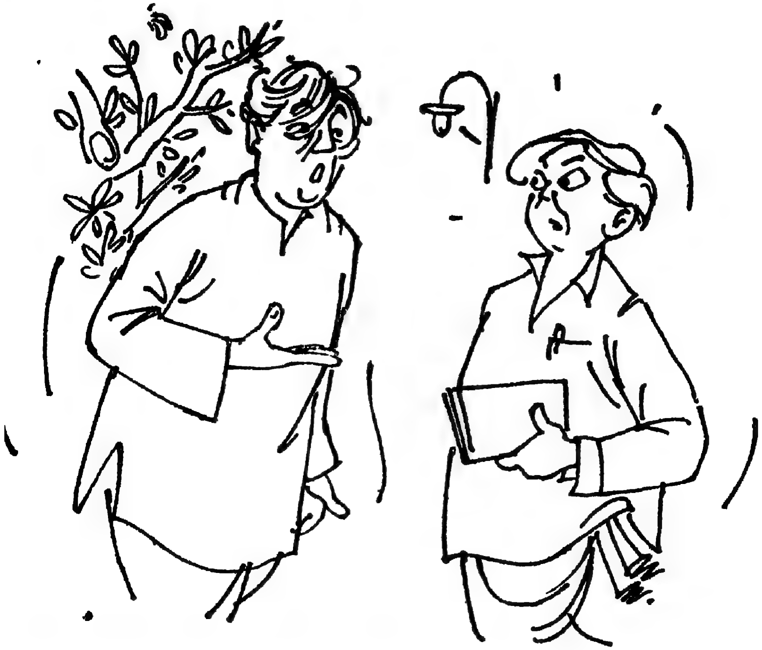

"পাঁচ টাকা দিতে পারি।" আমি বললাম। এবং দুখানা নোটের থেকে একজনকে ছাড়িয়ে এনে দীপেনের হাতে সমর্পণ করলাম।

দীপেন নোটখানাকে আলগোছে নিয়ে পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে তার মধ্যে রাখল। অবহেলাভরে সেই তাড়ার মধ্যে চোখ দিল। বৈরাগ্যবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত—সন্দেহ কি? কিন্তু খলতার এই দৃষ্টান্ত দেখে আমার চোখ কপালে উঠে গেছে: "অ্যাঁ, অ্যাতো টাকা! তোমার আবার টাকার দরকার?"

"বাঃ কাল শনিবার না! জানো না বুঝি?" সে জবাব দিয়েছে।

তখনো শনিবারের রহস্য, আরো অনেক রহস্যের মতো আমার অজানা। হিউম্যান্ রেস্ আর হর্সরেসের মাঝখানে দীপেন যে একটা মস্ত যোগসূত্র সে কথা পরে অবশ্যি জেনেছিলাম।

জেনেছিলাম পুরাকালীন অশ্বমেধের আধুনিক সংস্করণ কী। সেকালের বীরত্বের বিশ্বব্যাপী পরাকাষ্ঠাদের মাঠময় একালীন রূপান্তর দেখতেও বাকি ছিল না।

শনিবারের আগে দীপেনকে দেখেছি—দেদীপ্যমান – এবং শনিবারের পরেও দেখেছি – অশ্ববল্লীকষায় সেবনের পূর্বে ও পরে। কিন্তু পরে আর সেই আগের দীপেনকে দেখতে পাইনি। সেই দীপ্তি আর দেখা দেয়নি। তার বদলে আমার সম্মুখে ভাষান্তরিত (এবং ভাবান্তরিত) The Pain কেই প্রকটিত হতে দেখা গেছে।

তার বেদনায় আমরা ব্যথিত ছিলাম না তা নয়। আমরা বন্ধুবান্ধবরা আমাদের সাধ্যমতো তার অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতে কুণ্ঠিত হইনি, কার্পণ্যও করিনি, কিন্তু দীপেন অশ্বমেধ করেছে কি অশ্বরা দীপেনমেধ করেছে, আমাদের পক্ষে তা ঠিক করা একটু কঠিনই ছিল বোধহয়। অবশেষে একালের অশ্বমেধকে আমার রাজসূয় বলেই ভ্রম হয়েছে—দীপেন তো ছার। এমন কি, রাজ-রাজড়াদেরও শুইয়ে দেয়। এমনি ব্যাপার।

দীপেনকে শোয়ানোর একটা গল্প শুনেছিলাম, দীপেনের কাছ থেকেই। এক শনিবার ঘোড়াদের নিকটে বিড়ম্বনা লাভ করে মাঠের দুঃখ ঘাটে ভুলবার সে মনস্থ করলো—সটান্ লেকে গিয়ে জলাঞ্জলি যাবে এই বাসনা। কিন্তু জলপথ তো একটি নয়—দুঃখ ভোলানোর আরো অনেক জলপ্রণালী আছে। রকমফের করে দুঃখ টুথখ ভুলে—ভুলতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গেছে। এদিকে বাড়ির পথও দীর্ঘতর আর টলটলায়মান হযেছে দীপেনের কাছে। অগত্যা করে কি? কোথায় শোয়? পাহারোলার হাতে না পডে রাতটা কাটায় কী করে? হঠাৎ সামনে ঘোড়াদের একটা জলাধার দেখতে পেয়ে এবং নিজলা দেখে তার মধ্যেই কুঁকডে সুঁকড়ে কোনোরকমে সেঁধিয়ে গেছে।

তারপরে যে ঘটনার কথা সে বলে, সেটা স্বপ্ন বলেই আমার মনে হয়। অনেক ভালো ভালো গল্প পডতে পডতে শেষটায় স্বপ্ন হয়ে যায় দেখা গেছে। দীপেনের উক্তিতে, অনেক রাত্রে ছ্যাকৃরা গাডির কয়েকটা ঘোড়া সেখানে নাকি জল খেতে এসেছিল। ঘোড়াই বটে, কিন্তু গাডি টানতে টানতে আধা গাধা বনে গেছে এমনি চেহারা! তাকে সেখানে দেখে তারা যা আশ্চর্য হল তা বলবার নয়। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগলো, "দেখেছো এই লোকটার দশা? চিনতে পারছ একে? আমরা যখন টালিগঞ্জের মাঠে দৌডাতাম তখন এই লোকটা আমাদের কতই না উৎসাহ দিয়েছে! নাম ধরে ধরে কত না আমাদের ডাকাডাকি! হায়, আবার যে আমাদের এইভাবে পুনর্মিলন হবে কে জানতো? অদৃষ্টের পরিহাস দেখো? আজকে আমরা এই

ছ্যাকরা গাড়িতে বাঁধা, আর সেই লোকটা কিনা এইখানে।”

দীপেন বলে, “দেখেছো ঘোড়ারা কখনো ভোলে না, হারিয়ে দেয়, হারিয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখে, মেয়েদের চেয়ে ঢের ভালো।”

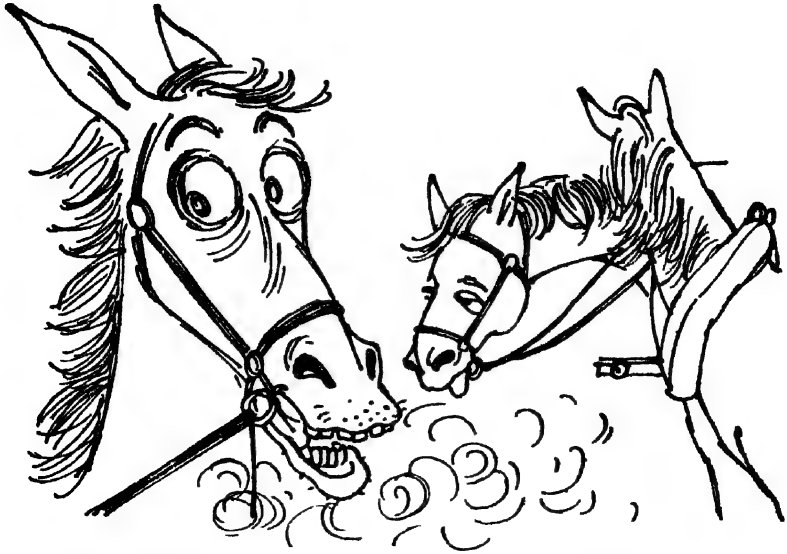

কিন্তু আমার ধারণায়, ও দুটি ঘোড়া নয়। রাত্রের ওঁরা। অশ্বজাতীয়াই হয়তো—তবে অন্যরূপা, দীপেনের নাইটমেয়ার।

“তা হাতড়ে পেলে কিছু? বনস্পতির ট্যাঁক থেকে?”

“পেলাম” অধোবদনে বলল দীপেন, “তিনটে বাজতে দশ মিনিট তখন চেয়েছিলাম, আর পাঁচটা বেজে কুড়ি, তখন পেলাম।”

“অনেক বলতে হল বুঝি?”

“আমি? না আমি না। আমাকে কিছু বলতে হয়নি—ঐ টাকাটা একবার মুখ ফুটে চাওয়া ছাড়া”--দীপেন সকাতরে জানায়—“একটা কথাও আমাকে বলতে হয়নি।”

“খুব বকুল বুঝি? তোমার এই অশ্বরোগের জন্যেই বোধহয়?”

“বকুল বলে বকুল। যেমন বকুনি তেমনি বুকুনি—তেমনি আবার বর্ণনা। তবে ঘোড়া টোড়ার ধার দিয়েই না। বনজঙ্গলের ব্যাপার সব।”

আমি বুঝতে পারি। বনস্পতি প্রকৃতিরসিক। বিশ্বপ্রকৃতির লীলায় সে মাতোয়ারা। গাছপালা ঝিল্‌জঙ্গল বন-বাদাড় তার অন্তরঙ্গ। এমন কি, যখন সে বনমুখো নয়, তখনো সে বনের বিষয়ে মুখর। ওর বনস্পতি নামডাক তো

এই জন্যেই।

পরের বনকে সে নিজের মতো মনে করে। অবশ্যি, সেরকম ধারণা অনেকের থাকে, তারা প্রথম সুযোগেই সাত পাকে সেটাকে বদ্ধমূল করে একেবারে নিজস্ব করে নেয়—তারপরে আর তারা বোন থেকে বোনান্তরে ধাওয়া করে না। কিন্তু এত বনে এত পাক মেরেও আজও ওর বন্য লালসা গেল না। এখনও অন্য বনের—আরও পরবর্তী বনের স্বপ্ন দেখে। ওকে শোনা মানেই বনমর্মর শোনা।

“তোমায় এখানে একলাটি পেয়ে খুব বুঝি বলে নিল? ওর সব বন্য-অভিযান কাহিনীই বুঝি?”

“শুধুই কি বন্য অভিযান? কত কী। বনের লাবণ্য পর্যন্ত। আর বললে বলে বলল। সে কী কথা—আর কথার কী তোড রে বাবা! যেমন করে তুবড়ি ফাটে তেমনি যেন কথারা তার ভেতর থেকে ছিটকে বেরুতে লাগল। চাওয়ামাত্র এক কথাতেই টাকাটা দিতে রাজী হয়েছিল বলে শেষ পর্যন্ত সব আমায় সইতে হয়েছে।”

বেচারার প্রতি আমার মায়া হয়। আমি বুঝতে পারি।…বনস্পতির প্রাকৃতিক রস কিছু কিছু আমাকেও চাখতে হয়েছে। ওর অনেক গাছপালা। আমার ভেতর শেকড় গাড়তে না পারলেও, তাদের শাখা-প্রশাখা আমার নাককানের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে দ্বিধা করেনি। স্বভাবতঃই দীপেনের প্রতি আমার সহানুভূতি না হয়ে পারে না। এমন কি, কবেকার আমার সেই পাঁচ টাকার শোক আজ আমি ভুলতে পারি।

আমি বলি, “আহা!” এবং আরো বলি, “তাহলে তো ঐ পঁচিশ টাকা তুমি উপার্জন করেছ বলতে হবে। কায়ক্লেশেই উপার্জন করেছ। কানের ক্লেশে বালকেরা বিদ্যা অর্জন করে, তুমি অর্থ উপায় করলে। একে তো ধার বলে না। তুমি ওকে কান দিয়েছ – তোমার কানের কি একটা দাম নেই? তার বদলি ওটা তোমার ন্যায্য পাওনা। হাতের খাটুনির চেয়ে কানের খাটুনি কিছু কম নয়—তার দ্বারাও কাজ দেয়া যায়। সেই কাজ দিয়ে তার বিনিময়ে ঐ টাকা তোমার ওই রোজকার রোজগার।”

“কাজ! কেবল কাজ? এমন কষ্টকর কাজ আমি জীবনে করিনি। পঁচিশ টাকা উপায় করতে এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণা কখনও আমার পোহাতে হয়নি। এর বদলে খনির গর্তে সেঁধিয়ে কয়লা কেটে আনতে হলেও আমার ঢের বেশি

আরাম ছিল।" দীপেনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

"তাহলে ফের আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন?" আমার আরো আশ্চর্য লাগে।

বিস্ময়ের বিষয় বাস্তবিক। অশ্বমেধের জন্যেই ওর গর্দভমেধ হলেও, দীপেন এক গাধাকে দু-বার বধ করে না। পাত্ররা জবাব দেয় বলে নয়, একবারের জব্দকে দু-বার জবাই করতে কোথায় যেন ওর বাধে। চক্ষুলজ্জাতেই কি না কে জানে। একবার ধার করলে আর সে ধার মাড়ানো ওর স্বভাব নয়। পারতপক্ষে তাকে ভুলে যাওয়াই ওর অভ্যেস। এক হিসেবে সেটা ভালো—হতভাগ্যদেরও ভুলতে সময় দেওয়া হয়। সময়ের মতো শোকঘ্ন কি আছে? তাছাড়া গাধাও তো অগাধ!

এক এক সময়ে আমি ভেবেছি যে, ইনকাম ট্যাক্‌সোওয়ালাই মরে বুঝি দীপেন হয়। কিন্তু পরক্ষণেই বিচার করে দেখেছি—না, তা তো না। তাদের বারংবার—দীপেনের একবার; তাদের একজনকেই পুনঃ পুনঃ; দীপেনের প্রত্যেক জনকে একান্তে; তাদের হল স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্—আর ওর কামারসুলভ এক ঘা। বিবেচনা করলে দুজনের টেক্‌নিক—নেবার কায়দা স্বতন্ত্র। একজনের ক্ষত রেখে যাওয়া, আরেকজনের খতম করা, আসলে ওদের ধর্মই আলাদা—ট্যাক্‌সোওয়ালাদের অর্থকামের নিবৃত্তি নেই, কিন্তু দীপেনের একেবারে মোক্ষম।

তবে কি ও স্বভাব বদ্‌লেছে? আগের শিকারকে পরে স্বীকার করা, একবারের বলির প্রতি আরেকবার বলিষ্ঠ হওয়া কোনোদিন ওর কুষ্ঠিতে ছিল না—ওর চরিত্রের সেই কুষ্টব্যাধি কি তাহলে সেরে গেল? তা না হলে বনস্পতিকে ও আবার খোঁজে কেন?

"মানে, কাল বুঝি আবার শনিবার? তাই না?"···আমি জানতে চাই, "না, তাই বা কি করে হয়? পরশুদিনই তো একটা শনিবার গেল। নয় কি?" —এবার আমার অবাক লাগে। বারটা যতই বাঞ্ছনীয় হোক্ এত ঘন ঘন আসবার তো নয়। জীবনে এবং রেসকোর্সে বারংবার এলেও, সপ্তাহে সেই একটি বারই তার আসা। তাহলে এখনই আবার বনস্পতিকে ফের কেন?

দীপেন ঘাড় হেঁট করে থাকে। কোনো উচ্চবাচ্য করে না। স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করতে হলে স্বভাবতঃই যে সংকোচ সকলের হয়ে থাকে তারই প্রতিচ্ছায়া যেন ওর মুখে দেখি। আমি বুঝতে পারি। "মানে, আর কারো কাছ থেকে কিছু

বাগাতে পারোনি বুঝি? তাই এমন করে দাবানলে ঝাঁপ দিতে—জলন্ত বাণপ্রস্থে যেতে প্রস্তুত হয়েছ? আহা, আমিই তো তোমায় দিতে পারতাম" —বলেই ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য নিজের মনে নিজের কান মলে দিই—"কিন্তু এমনি হয়েছে ভাই, দুঃখের কথা কী বলব! ক-দিন থেকে টাকাকড়ির মুখ একদম দেখতে পাচ্ছিনে—"

"সত্যি কথা শোনো।" বাধা দিয়ে দীপেন বলে, "টাকাটা ওকে আমি ফেরত দিতে এসেছি।"

"অ্যা-া-া-া-া-?" আমি চম্‌কে উঠি, দীপেন এসেছে পরিশোধ করতে। পরীদের থেকে নিলেও যে পরিশোধ করে না, সে এসেছে পরের টাকার প্রতিদান দিতে। তার এই অযাচিত অপ্রত্যাশিত আগমনী—Ripley-র Believe it or not-এর reply বলেই আমার মনে হতে থাকে। ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো?

"সত্যি টাকাটা আমি ওকে ফিরিয়েই দেব।" দীপেনকে মরিয়া বলে মনে হয়।

"তাহলে মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলেই তো পাবো। তোমার কানের মায়াতেই আমি বলছিলাম"—আমি বাতলাই, "সেইটাই কি ভালো হত না? ভালো এবং নিরাপদ?"

"উঁহু, তার চেয়েও ভালো পন্থা আমি পেয়েছি!" দীপেন উদ্দীপ্ত।

"বটে?" আমি তাকাই ওর মুখে।

"ভেবে দেখো," দীপেন ব্যক্ত করে, "ও আমার কাছে পঁচিশ টাকার ঢের বেশি পায়। সমস্ত আমি স্বদে আসলে শোধ করব—একেবারে কড়ায় গণ্ডায়। বনজঙ্গলের বিষয়ে আমার বেশি জানা নেই, তবে বাহান্নটা গোপালভাঁড়ের কেচ্ছা আমি মুখস্থ করে এসেছি। সমস্ত বনস্পতিকে শোনাব। তার ওপরে আমার ছোট ছেলেটা—সবে তার কথা ফুটেছে—সারাদিন ধরে যা যা বলে আমার স্মৃতিপটে গাঁথা হয়ে থাকে। সেই সব আবোল তাবোলও ওকে শুনতে হবে। তারপর এই দ্যাখো—" পকেট থেকে বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা বার করে দীপেন—"এর থেকে একটার পর একটা সমস্ত শব্দরূপ আমি আওড়ে যাব।"

শব্দরূপের সামনে বনস্পতির জব্দরূপ আমি মনশ্চক্ষে দেখি। আমার মনে হয় ওই যথেষ্ট। দীপেন কিন্তু সেখানেও থামে না।

"—তারপরে এই দ্যাখো," বলে আরেক পকেট থেকে আরেক প্রস্ত সে বার করে "এই দ্যাখো তিপ্পান্নটা স্ন্যাপ্‌শট্‌। সারা জীবন ধরে যত জায়গায় আমি ঘুরেছি তার নিদর্শন! এইগুলি একে একে ওকে দেখতে হবে। আর এদের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যত ভূগোল আর ইতিহাস জড়িত রয়েছে তার সব বৃত্তান্ত শুনতে হবে ওকে। বাহান্নটা গোপালভাঁড়, তার ওপরে এই তিপ্পান্নটা ছবি—কেমন হবে?" দীপেনের চোখে মুখে জিঘাংসার ছবি।

"যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। মন্দ হবে না।" আমার উৎসাহ জাগে।—"এরই নাম প্রতিশোধ—যাকে বলে কড়ায় গণ্ডায়।"

ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বারপথে বনস্পতির ছায়া দেখা গেল। আমরা চোখ তুলে তাকালাম বনস্পতিই বটে।

"মাভৈঃ!" দীপেনের কানে কানে অভয় দান করে আস্তে আস্তে সেখান থেকে আমি সরে পডলাম। কায়দা করে।

বনস্পতির পাশ কাটিয়ে—ওর বনদেব মায়াপাশ এড়িয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

দু-ঘণ্টা বাদে আড্ডায় উঁকি মারতে গিয়ে দেখি, দীপেন নিঃঝুম মেরে আছে। আছে কি নেই বোঝাই যায় না। চেয়ারে বেবাক্ পর্যবসিত হয়ে রয়েছে কিন্তু বনস্পতির চিহ্ন নেই কোথ্‌থাও।

"কী? কদ্দূর? কিরকম শোধ নিলে?" আমি জিজ্ঞেস করি। "মানে, শোধ দিলে, সেই কথাই বলছি।"

হাতি দয়ে পড়লে কিরূপ হয় কখনো দেখিনি। কিন্তু দীপেনের কিম্ভূত-কিমাকার থেকে তার কিছুটা আঁচ পেলাম। ঘাড় তুলে পাগলের মতো চোখে ও তাকালো।

"না ভাই।" গোঙাতে গোঙাতে ও বলল, "দিতে পারিনি। বল্‌ব কি, তার নোট পাঁচখানা ফেরত দেবার পর্যন্ত ফুরসতও পেলাম না।"

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ( ১৯০৬— )

# বাঘা তেঁতুল

তৃতীয় শ্রেণীর একখানি কামরা গুলজার করে তুলেছে দশ-বারোজন কলেজের ছাত্র—মফস্বলের ছেলে। একসঙ্গে বন্ধুবান্ধব মিলে ট্রেনে চলবার সুযোগও তাদের খুব কমই ঘটে। সেকেণ্ড ইয়ার আর ফোর্থ ইয়ারের ছেলেদের টেস্ট শুরু হয়েছে, তাই দিন দশেকের মতো পেয়েছে ওরা ছুটি। কলকাতা দেখবার লোভটা অনেকেরই প্রবল হয়েছিল, কিন্তু টাকার অঙ্কের দিকে খেয়াল হওয়ায় মতলবটা বদলে স্থির হল দেওঘর বেড়িয়ে আসা। তিন-চার দিন তাই নিয়েই জল্পনা কল্পনা চলছিল, তারপর সেটাও গেল ভেস্তে ; সে-ও অনেক খরচ। সুতরাং চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নান্নুর দেখে আসাই সমীচীন। দেখবার মতো জায়গা,—অত বড়ো লেখকের জন্মস্থান। চণ্ডীদাসের মতো কবি ক-জন জন্মেছে এ দেশে ! তাছাড়া খরচ মাত্র একটাকা ন-আনা। ওদিকটা পায়ে হেঁটেই পাড়ি দেওয়া যাবে।

যাক, যা বলছিলাম। দশ-বারোজন ছাত্রের কোলাহলমুখর রহস্য আলাপে কামরাটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। হলই বা পল্লীগ্রামের কলেজ ; তবু তো তারা কলেজের ছেলে ! জীবনে লেগেছে সদ্য বসন্তের ছোঁয়া, তার ওপর—সম্মুখে প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ, উজ্জ্বল স্বপ্ন। ছুটিটার তলানি পর্যন্ত নিঃশেষে পান করবে বলেই তারা কাব্য আর সাহিত্যের বাছাই করা সম্পদগুলি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। সেই সঙ্গে ছোট দুটি পিকলু বাঁশি, আর দু চার সেট ব্রিজ কার্ডস্ নিতেও ভুল করেনি।

একদিকে শরৎবাবুর শ্রীকান্ত আর রবীন্দ্রনাথের গোরা নিয়ে রীতিমতো আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে ; অন্যদিকে পিকলুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে কয়েকজন গজল ভাঁজতে শুরু করেছে ! কামরায় অন্য কোনো যাত্রী নেই। শুধু একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে একপাশে চুপচাপ বসে তাদের আলোচনা আর উন্মাদনা উপভোগ করছিলেন।

গুস্‌করা স্টেশনে ট্রেনখানা থামতেই ওদের কোলাহল একটু কমে এল। তরুণের দল তখন বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পাণ্ডা সমর সেন আর কালিদাস দত্ত

হাত পা ছড়িয়ে মশগুল হয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি। এইবার তিনি আঙুলের সংকেতে একজন ছাত্রকে ডাকলেন। অজয় বোস প্রসন্নমুখে এগিয়ে গেল। এক বেঞ্চ থেকে অন্য বেঞ্চে বৈ তো নয়, তবু প্রতি পদক্ষেপে কলেজে পড়ার আত্মপ্রসাদ ফুটে উঠল অজয় বোসের দেহে ও মনে।

'কোথায় চলেছ তোমরা?' প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি স্মিতমুখে প্রশ্ন করলেন।

'নান্নুর চণ্ডীদাসের জন্মভূমি।' অজয় সগৌরব দৃষ্টিতে তাঁর মুখপানে চেয়ে রইল।

সম্ভ্রান্ত চেহারা; নাকটি টিকল, গোঁফদাড়ি কামানো। চুল দশআনা পেকেছে, বাকি কালো।

মৃদু হাসির সঙ্গে চাপা উচ্ছ্বাসের একটু স্পর্শ দিয়ে বললেন তিনি—

'মহাত্মাজী বলেন, You are the salt of the nation; তোমরাই জাতির প্রাণ। সত্যি।'

অজয়ের বুকের ভিতরটা গর্বে ভরে ওঠে।

'শুধু তাই নয়। দেশের সাহিত্যকেও তোমরা ভালবাসো দেখছি। খুব ভালো এটা। তোমরা যদি বাংলা সাহিত্যকে না ভালবাসো, না আদর করো, তবে কি বিদেশীরা করবে?'

'আজ্ঞে হাঁ, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের যুগে আমাদের সাহিত্যে যে সমৃদ্ধি গড়ে উঠেছে, তা পাশ্চাত্যের চেয়ে কম নয়। ওরা যদি বাংলা পড়তে জানত, তা হলে ওরাও আজ স্বীকার না করে পারত না এ-কথা।'

ততক্ষণে সকলেরই দৃষ্টি পড়েছে এদিকে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বয়সোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন—'সে কথা বলতে পারো। সাহিত্যের সত্যিকারের পৃষ্ঠপোষক তো তোমরাই। এখন থেকে তোমাদের একটু আধটু লেখার চর্চা করা দরকার; লিখতে লিখতেই লেখক হয়। তোমরা কবিতা-টবিতা লেখো না?'

অজয়ের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মাথাটা নিচু করে অস্পষ্ট গলায় বলল—'আজ্ঞে, ওই অল্পস্বল্প কখনো সখনো—'

'বাঃ এই তো চাই। গল্প, উপন্যাস—প্রবন্ধ, না আর কিছু? আর কে কে লেখেন ওঁদের মধ্যে?'—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

অজয় মৃদু হেসে বলে—'আরও দু-একজন লেখেন—কবিতা গল্প ইত্যাদি যখন

যা আসে ; একটু আধটু চেষ্টা করা যায় আর কি ।'

'চমৎকার ! লিখবে, লিখবে । এই তো সময় হে, এর পর আর বিশেষ সুবিধে হবে না ।'

দেখতে দেখতে কালিদাস দত্ত, সমর সেন—একটি একটি করে সবগুলি তরুণ এসে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে ঘিরে বসল ।

মুরুব্বিয়ানার চরম সুযোগটুকু তিনি ছাড়লেন না । পরের স্টেশনে গাড়িতে আরও দু-চারজন যাত্রী উঠল । নিতান্ত সাদাসিধে সংসারী লোক তারা, কাব্য সাহিত্যের ধার ধারে না । ভদ্রলোকটি এপাশ ওপাশ ভালো করে চেয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'যতদিন মা বাপ আর শ্বশুর শাশুড়ী বেঁচে আছেন, ততদিনই কবিতা মক্‌স করবার সময় । তারপর আপনিই চলবে, বুঝলে না । কতকটা নেশা অভ্যাস করার মতো পরের পয়সার সুযোগ নিয়ে আরম্ভ করতে হবে ; তারপর আপনা আপনিই চলে ।'

কালিদাস দত্ত হো হো করে হেসে উঠল । সে কবিও নয়, ওসবের ভক্তও নয় । কালিদাসের রকম সকম দেখে অজয় মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখ ফুটে কিছু বলল না, পাছে অপ্রীতির সৃষ্টি হয় ।

অল্পক্ষণের আলাপেই ভদ্রলোকটির বুঝে নিতে দেরি হল না যে, এরা সবাই পাড়া-গাঁয়ের ছেলে ; মফস্বল কলেজে পড়ে, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এরা বেশি দূর যায়নি । শরৎবাবুর খুব ভক্ত, অথচ তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য এদের একজনেরও হয়নি !

এত বড়ো সুযোগ জীবনে সব সময় মেলে না । অজয় বোসের ঘাড়ে একটু সস্নেহ স্পর্শ দিয়ে বললেন—'বসো হে বসো । তোমাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলেও আনন্দ পাওয়া যায় । ভাগলপুর পর্যন্ত একা চুপচাপ বসে যাওয়া যে কত বড়ো শাস্তি, তা তোমরা ভাবতেও পারবে না ।'

'আপনি বুঝি ভাগলপুরেই থাকেন ?' অজয় একপাশে বসল ।

'এখন আর থাকি না ; তবে যাই মাঝে মাঝে । কথা বলবার লোক না থাকলে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে বাপু । তোমরা এমন হৈ চৈ করে চলেছ দেখে তোমাদের কামরায় এসে একবার বসবার লোভটা সামলাতে পারলাম না ।'—পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন তিনি ।

সমর সেন বলে উঠল—'খুব ভালো করেছেন মশাই । একা না বোকা ; most tedious লাগে । বাপস্‌— !'

'ঠিক বলেছ। তোমরা হলে তো হাঁপিয়েই উঠতে। এতজন মিলে চলেছ, তাও তোমাদের উপন্যাস, বাঁশি, তাস—আরও কত কি দরকার হয়েছে। নয় কি ?'

'আমাদের কথা ছেড়ে দিন স্যার।'—কালিদাস দত্ত আবার হো হো করে হেসে উঠল।

এবার অজয় বোস চটে গেল। কী ভীষণ অসভ্য কালিদাসটা! কথায় কথায় হো হো করে হাসি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি চোখদুটো টেনে, কপালটা একটু কুঁচকিয়ে বললেন—'সে কথা থাক। তোমরা তখন শ্রীকান্ত নিয়ে কি যেন বলছিলে ?'

'ওসব আমরা এমনি আলোচনা করছিলাম! শ্রীকান্ত নাকি শরৎবাবুর জীবনের কথা নিয়েই লেখা।'—অজয় বোস সমরের মুখপানে চাইল।

সমর একটু উত্তেজিত হয়ে বলল—'নিশ্চয়ই। সকলেই তাই বলে।'

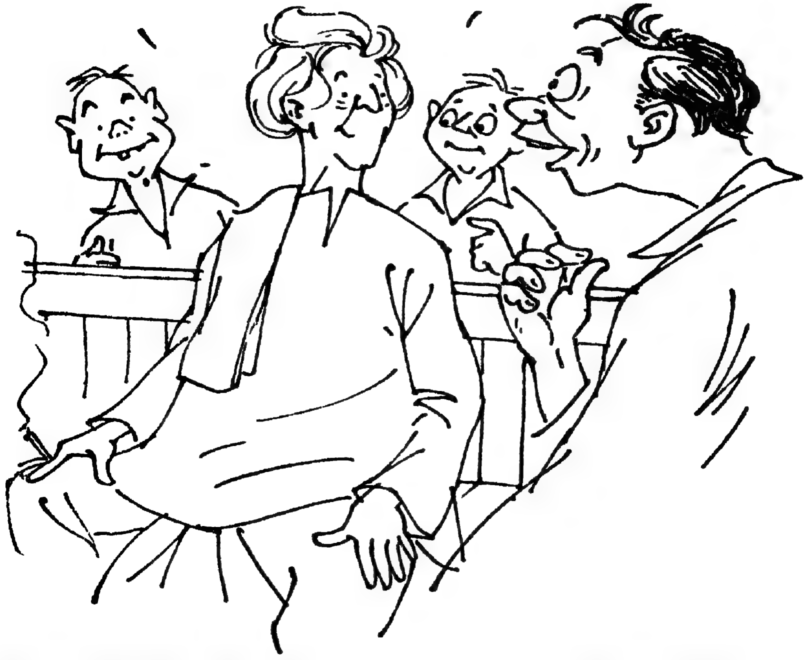

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বাধা দিয়ে বললেন, 'কথাটা যে একেবারে মিথ্যে, তা ঠিক নয়। তবে ওটা আমার জীবন কাহিনীও নয়। অনেকে যদিও বলে থাকেন ওকথা—'

কথাটা শুনে হঠাৎ চকিত হরিণের মতো ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে

লাগল।

ভদ্রলোক চোখদুটি তন্দ্রাচ্ছন্ন করে আবার বললেন—'তোমরা তো দেখছি আমার প্রায় সব বই পড়েছ, কিন্তু কোন্‌টা ভালো লেগেছে সবচেয়ে? শ্রীকান্ত, দেবদাস, না চরিত্রহীন—?'

ছেলেরা যেন মুহূর্তে বিহ্বল হয়ে গেল!—অ্যাঁ!—হঠাৎ কোলের উপর আকাশের চাঁদ খসে পড়তে দেখলেও বোধ হয় তারা এত বিহ্বল হত না।—শরৎচন্দ্র! সাহিত্যসম্রাট!—তাদের সঙ্গে এক কামরায় পাশাপাশি বসে শরৎবাবু! শ্রীকান্তের লেখক—দেবদাস—চরিত্রহীন—চন্দ্রনাথ—রামের সুমতি! সমর সেন আর অজয় বোস তাড়াতাড়ি শরৎচন্দ্রের পায়ের ধুলো মাথায় নিতেই ছেলেরা হুড়োহুড়ি করে তাঁকে প্রণাম করতে লাগল। এত বড়ো সৌভাগ্য ক-জনের ঘটে? তখনই যদি হোস্টেলে ফিরে যাওয়া যেত!—একটা ক্যামেরা থাকলে—

শরৎচন্দ্র প্রসন্নমুখে সকলের মাথায় হাত দিচ্ছিলেন।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই ছেলেরা ছুটোছুটি করে পান, সিগারেট, লেমনেড ইত্যাদি নানা দ্রব্যসম্ভার এনে হাজির করল।

আসর বেশ জমে উঠল। প্রত্যেকটি ছেলের বুক যেন গর্বে সাত ইঞ্চি উঁচু হয়ে উঠেছে। আনন্দের আতিশয্যে তারা আজ আত্মহারা। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এভাবে কথা বলা,—একি যেমন তেমন সৌভাগ্য! তাদের সঙ্গে বসে গল্প করছেন সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়!

শরৎবাবু মাঝে মাঝে কাঁচা-পাকা চুলগুলির ভিতর আঙুল চালিয়ে চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে জীবনের অভিনব সুবর্ণসুযোগ উপভোগ করছিলেন! ছেলেরা সেই অবসরে এক একবার কানাকানি করছিল—এবার তাঁর জন্যে কি কি কিনতে হবে। অজয় বোস আর সমর সেন অতি অকারণে মাঝে মাঝে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিচ্ছিল।

উভয় পক্ষের কুড়িয়ে পাওয়া চোদ্দ-আনা গৌরব কায়েমী স্বত্বে সাড়ে যোলো আনা আত্মপ্রসাদের দাবি করে বসে ছিল।

পরের স্টেশনে আবার তাড়াহুড়ো শুরু হল সিগারেট, চুরুট ইত্যাদি এনে শরৎচন্দ্রের সামনে সাজিয়ে দেবার অক্লান্ত চেষ্টায়। হতভাগ্য স্টেশনগুলোর দারিদ্র্য দেখে ছেলেরা মনে মনে রেলকোম্পানির বাপান্ত করে। এমন একটা কিছু মেলে না, যা দিয়ে শরৎচন্দ্রের হাতে তারা একটা স্মৃতিচিহ্ন তুলে দেয়।

স্টেশনের পর স্টেশন উজাড় করে ছেলেরা শরৎ-সংবর্ধনা করে চলেছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির প্রথম যে শঙ্কিত আড়ষ্টতা ছিল, সেটা এখন কেটে গেছে। কয়েকটি স্টেশন পার হতে পারলেই নির্বিঘ্নে বিদায় অর্ঘ্য নিয়ে চলে যাওয়া যাবে। আর দুটো স্টেশন পরেই ছেলেরা নেমে যাবে।

বোলপুর এসে গাড়িখানা থামতেই এক ভদ্রলোক তিনটি তরুণীসহ সেই কামরায় উঠলেন। চমৎকার চেহারা ভদ্রলোকটির। যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি বড়ো বড়ো গোঁফ। এ রকম চেহারা বাঙালীর খুব কমই দেখা যায়। পোশাক পরিচ্ছদ আর চালচলনে বেশ ফুটে ওঠে তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা আর বুনিয়াদি ভিত্তি। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না যে, ওঁরা এই কামরায় ওঠেন ; কিন্তু ছেলেরা মনে মনে খুব আশান্বিত হয়ে উঠল,—এই অরুণিতা তরুণীদের সামনে নিজেদের শরৎ-সৌভাগ্য প্রকাশের চান্স পাবে বলে। এ তো যে-সে কথা নয় !

অনেক কিছু উঁকি ঝুঁকি দেয় ছেলেদের বুকের তলায়। নবাগত ভদ্রলোকটি বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকেন ওদের পানে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে নিয়ে ওদের যে ব্যস্ততা, তার কারণ ঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। আবার ট্রেন ছাড়ল।

ছেলেদের শ্রদ্ধাপুর্ণ পরিচর্যা দেখে তিনি অনুমান করেন—হয়তো উনি ওদেরই কলেজের প্রোফেসর। চলেছেন কোথাও এক্স্‌কার্সনে। কিন্তু পরক্ষণেই সে ধারণা বদলে যায়। প্রোফেসরকে চুরুট সিগারেট উপহার দেওয়া, ছাত্রদের পক্ষে স্বাভাবিক কি ?

ইচ্ছা হলেও তরুণীরা সেদিকে চাইতে পারেন না, কেমন সংকোচ হয়। অতগুলি উচ্ছ্বসিত তরুণের সামনে হাঁ করে চেয়ে থাকতে বিশ্রী লাগে।

ওঁরা গাড়িতে উঠবার পর থেকেই শরৎচন্দ্র একটু সমীহ করে কথাবার্তা বলছিলেন। কিন্তু ছেলেরা চেপে রাখতে পারছিল না তাদের স্বপ্নাতীত সৌভাগ্যের গৌরব। ওঁদের শুনিয়ে দেওয়া দরকার, তরুণীরা অবাক হয়ে যাবে—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাদের এই ঘনিষ্ঠতা,—এ কি সোজা !

তারা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে চায়—'আপনার শ্রীকান্ত,—আপনার দেবদাস, গৃহদাহ, দত্তা, শেষপ্রশ্ন, বিপ্রদাস,– ভারতবর্ষে আধখানা বেরিয়ে থেমে যাওয়া উপন্যাসটা ! বিচিত্রার সঙ্গে সম্পর্ক'—ইত্যাদি নানা কথা।

নবাগত ভদ্রলোকটি প্রথমে তেমন গা করেননি। ওদের কথাগুলো কানে যেতেই

মুহূর্তে ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। চমৎকার ব্যাপার! একবার মনে হল—'যাক্'; আবার ভাবলেন -'না, ছেলেগুলো নেহাত বেচারা।'

তিনিও সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। ছেলেরা একটু থামতেই, তাড়াতাড়ি উঠে এসে শরৎবাবুর সামনে বসে, গায়ের কোটটা খুলে মাথায় চাপালেন।

শরৎবাবু একবার সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা জ্বালাবার জন্যে অন্যমনস্কভাবে দেশলাই জ্বালালেন।

নবাগত ভদ্রলোকটি এবার হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে বিনীত স্বরে বলে উঠলেন—'নমস্কার শরৎদা! ভালো আছেন তো?'

শরৎবাবু হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেন, তাই তো একি হল! তাঁর মুখে কোনো কথা যোগাল না।

ভদ্রলোক আবার বিনয়ের সঙ্গে বললেন—'শরৎদা বোধ হয় চিনতে পারেননি আমায়? তা, না পারবারই কথা, আমরা তো তেমন সুপরিচিত লেখক নই। আপনি হলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।'

শরৎদার বুকের ভিতর যেন নিশ্বাসটা আটকে আসছিল। কম্পিত স্বরে বললেন—'না আমি ঠিক চিনতে পারিনি। তবে—'

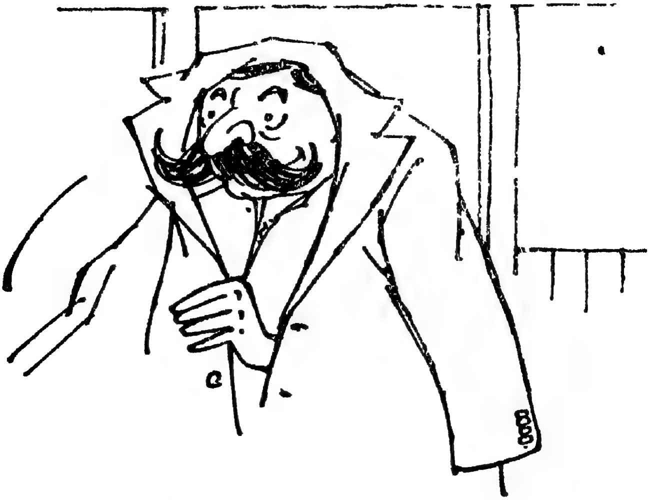

'হ্যাঁ সে আমি আগেই বুঝেছি। আপনার সঙ্গে তেমন আলাপ তো হয়নি কোনোদিন। দু-একবার মাত্র সভা-সমিতিতে দেখা।'—ভদ্রলোক একটু হাসলেন।

শরৎদা একটু আশান্বিত হয়ে উঠলেন—তা হলে বোধ হয় এ যাত্রা উৎরে যাওয়া যাবে। চেষ্টা করে মুখে একটু হাসি টেনে এনে জিজ্ঞেস করলেন—'নামটা? বললেই বুঝতে পারব।'

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি কোটটা ঘোমটার মতো মাথার ওপর টেনে দিয়ে প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়াটায় চাড়া দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন—'আজ্ঞে আমি প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।'

( ভদ্রলোকের গোঁফ জোড়াটা দেখে উনিশ শো চোদ্দ খ্রীষ্টাব্দের কাইজারকে মনে পড়ে। )

—অ্যাঁ! শরৎদার আপাদমস্তক ঝিমঝিম করে উঠল।

ছেলেগুলো ঝুঁকে পড়ে ভদ্রলোকের সামনে—'কী বললেন?'

'কিছু না। পুরনো আলাপ কি না!'

ভদ্রলোক প্রসন্নমুখে গোঁফে তা দিতে লাগলেন।

ট্রেনটা হুইশিল দিচ্ছে। আর একটা স্টেশনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। স্পীড কমেছে ডিস্‌টাণ্ট সিগন্যালের কাছে এসে।

আশাপূর্ণা দেবী ( ১৯০৯– )

# প্রস্তাব

বেঁটে ছাতা, ‘বাটা’র দুই রঙা হাই হিল শু, শান্তিনিকেতনী ভ্যানিটি ব্যাগ, আর বিদঘুটে রঙচঙা শাড়ি, সব মিলিয়ে মিস অণিমা ঘোষ। অণিমা ঘোষ আছেন—অথচ এসব নেই এ দেখবেন না আপনি।

প্রমাণ পেতে চান?—পার্কের ওই উত্তর পূর্ব কোণটায় নজর করুন—লোহার বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে আছেন মিস ঘোষ, কোলের উপর পোষা বিড়াল ছানাটির মতো সযত্নে শোয়ানো আছে বাটিকের কাজ করা ভ্যানিটি ব্যাগটি, বেঁটে ছাতাটি আছে রেলিঙের গায়ে হেলানো, আর অদ্ভুত রঙদার ছাপা শাড়িখানা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে আছে অণিমা ঘোষের খাটো খাটো নিটোল দেহখানিকে।

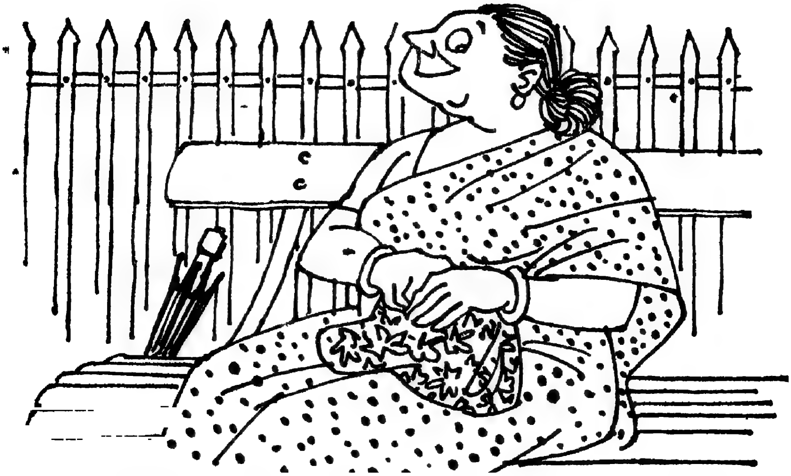

সন্ধ্যা ছ-টা থেকে সাতটার মধ্যে—যে কোনোদিন ইচ্ছে—দেখে আসতে পারেন। প্রত্যহ আপিস ফেরত একঘণ্টা করে হাওয়া খেয়ে যাবেন তিনি, এই নিয়ম। আগে বোধকরি কোনো মেয়ে-স্কুলের ‘দিদিমণি’ ছিলেন—যখন ‘দিদিমণি’ হওয়া ছাড়া সত্যিই আর গতি ছিল না মেয়েদের, এখন চাকুরি নিয়েছেন—‘বেকারের বারানসী’ সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে।

মিস অণিমা ঘোষের বয়স জানতে চান? ওটা চাইবেন না, ভারী চটে যান ভদ্রমহিলা; আর রাগ করেই বলে ফেলেন,—"ত্রিশ পার হতে চললো যে"—নিন্দুকে কিন্তু অন্য কথা বলে।

একটি ঝি আর একটি ভাইঝি, এই তার সংসার। আজীবন এই রকম নিঃসঙ্গ কাটালেন বেচারা।

কিন্তু আশ্চর্য এই—তার জন্যে মুষড়ে পড়েননি কোনোদিন। চোখের কোণে আর ভ্রূর উপর সরু তুলির একটু আঁচড়, ফ্যাকাশে ঠোঁটে একটু লালিমার প্রলেপ, স্নো ক্রীম পাউডারের সুরুচিসম্মত নির্ভুল ব্যবহার কৌশল, এর ব্যতিক্রম ঘটে না কোনোদিন—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

বেশ চলছিল—হঠাৎ বাচ্চা ভাইঝিটা বাধিয়েছে গোল। ও নাকি কিছুতেই আর ফ্রক পরতে রাজী নয়—শাড়ি না ধরে ছাড়বে না। কিন্তু শাড়ি ধরালে 'চোদ্দর গণ্ডি'র ভিতর আটকে রাখা চলে কি করে? সত্যি—মা বাপ মরা মেয়ে, যাকে তিনিই হাতে করে মানুষ করলেন সে হঠাৎ সাবালিকা হয়ে উঠলে তিনি কোথায় গিয়ে ঠেকেন? প্রায় চার বছর ধরে যাকে 'চোদ্দ' বলে চালিয়ে আসছেন—খাটো ফ্রক আর আঁটো বডিসের দৌলতে—শাড়ি ব্লাউস দিলে যে সে একদিনেই আঠারো বছরের মেয়ে হয়ে বসবে—এও তো কম ভাবনার কথা নয়।

কেন যে এই অদ্ভুত শখ!

মিস অণিমা ঘোষ ভাবেন—আরো কিছুদিন করুক না ছুটোছুটি, লাফালাফি ফ্রক পরে আর বো বেঁধে। বড়ো হওয়ার সাধ! আশ্চর্য! মেয়েদের এই পাকামি দু-চক্ষের বিষ।···হঠাৎ একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসেন মিস ঘোষ। সামনে বেঞ্চে সেই ছোকরা এসে বসেছে।

কিছুদিন থেকে তিনি লক্ষ্য করছেন এটা। ঠিক এই সময় সামনের ওই বেঞ্চে এসে বসবে ছোকরা, ঘন ঘন তাকাবে মিস ঘোষের দিকে, উশখুশ করবে, নড়বে, রুমাল নিয়ে হাওয়া খাবে, অথচ শেষ পর্যন্ত উঠে যাবে কিছু না বলে।

প্রথম প্রথম তিনি আমলে আনেননি এটা—কিন্তু এখন ক্রমশঃ এমন দাঁড়িয়েছে যে ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করা চলে না। লক্ষ্যবস্তু যে মিস ঘোষ, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। পর পর কয়েক দিন মিস অণিমা বাড়ি ফিরেই আয়নার সামনে দাঁড়ালেন···নিটোল গোলগাল মুখ, বয়সের রেখা পড়েনি

কোথাও, যতটা পথ পার হয়ে এসেছেন তার চিহ্ন নেই কোনোখানে।

আজ একটু অবহিত হয়ে বসলেন মিস ঘোষ, অসম্ভবই বা কি? পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কথাটা সত্যিই আছে নাকি? ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস—চোখের কোণে একটু সলজ্জ প্রশ্রয়—ক্ষতি কি তাতে?

লীলাচ্ছলে ক্ষুদে রুমালটি নেড়ে বাতাস খাবার একটা অভিনয় করে সশব্দ মন্তব্য করলেন—উঃ কী গরম!

ও পক্ষ নীরব।

আবো কিছুক্ষণ কাটলো।

উশখুশনি আবম্ভ হয়েছে ছোকরার, মুখ চোখে কিছু একটা 'বলি বলি' ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।...হ্যাঁ, আজই সে বলে ফেলবে যা থাকে কপালে, প্রেমের ক্ষেত্রে ভয় আর লজ্জা করে কে কবে জয়ী হয়েছে?...উঠে দাঁড়িয়ে—একটু কেশে, একটু পা ঘষে এগিয়ে এল মিস ঘোষের কাছে।

দাঁড়ালো মুখোমুখি।

—কয়েক দিন থেকে আমি এখানে আসছি...।

—যা গরম বাড়িতে টেঁকা দায়—কথাটা বলে নিজে বেঞ্চের এক পাশে সরে বসে—পাশে বসতে বলার প্রায় স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন অণিমা ঘোষ।

ছোকরা একটু ইতস্ততঃ কবে বসেই পড়ে।

মিস অণিমা ঘোষেব আটত্রিশ বৎসরেব পাকা হার্টও একটু কেঁপে ওঠে।

—আপনাকে রোজই দেখি—

—আমিও তো দেখি—অণিমা ঘোষ খিল খিল করে হেসে ওঠেন।

ছোকরা অপ্রতিভ হয়ে হেসে ফেলে।

হাসিটি চমৎকার। অণিমা ঘোষ ভাবেন।

—আপনার ব্যাগটি চমৎকার তো।

—হ্যাঁ আমার একটি বন্ধু—মানে বান্ধবী আমার জন্মদিনে প্রেজেণ্ট করেছিল। কথাটা অবশ্য কাল্পনিক হওয়া বিচিত্র নয়—কিন্তু যাক।

—আপনার বন্ধুর মানে বান্ধবীর টেস্ট আছে। মেয়েদের যে কোন্ জিনিসটা কাজে লাগে মেয়েরাই বোঝে—আমরাই পড়ি মুশ্‌কিলে উপহার নির্বাচনের সময়।

—ওর আর কি—মিস ঘোষ আশান্বিত হয়ে ওঠেন—কীই বা কাজে লাগে না মেয়েদের? ধরুন শাড়ি? সবচেয়ে সোজা।

—তা, বটে—আপনি বুঝি 'এইট-এ'তে আসেন?

—হ্যাঁ—এতেই আমার স্থবিধে।

কী চমৎকার লাজুক ছেলে—মিস অণিমা ঘোষ মনে মনে ভাবেন—আজে বাজে কথা কইছে, অথচ—।

—কুপার স্ট্রীটের মোড়ের ওই সাদা বাড়িটার দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন তো আপনি?

এবার চমৎকৃত হন অণিমা ঘোষ নিজেই।…এতদূর?

—কী আশ্চর্য! আপনি জানলেন কি করে?

ঈষৎ অন্তরঙ্গ হয়ে বসেন তিনি।

ছোকরা কিন্তু সংকুচিত হয়ে কোণ ঠেসে বসে।

—প্রায়ই দেখি কি না—ওই বাড়ি থেকে বেবোন। একলাই থাকেন বুঝি?

—একরকম একলাই।

মুখখানি করুণ করে তোলেন মিস অণিমা ঘোষ—শুধু একটা বাচ্চা ভাইঝি—নেহাতই বাচ্চা—মাত্র সেইটুকুই আমাব জীবনের অবলম্বন। এত শিশু আর মিষ্টি মেয়েটা—ও যদি না থাকতো—উঃ।

—ও—ইয়ে মানে—কিছুদিন থেকেই ভাবছি আপনাব সঙ্গে আলাপ করবো কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে পাবছি না।

—এতে আর সাহসের প্রশ্ন কেন? আমি তো ভয়ংকব একটা কিছু নই? কি বলেন ভয়ংকব নাকি?

—না না, সে কি, আপনাকে আমাব খুব ভালো—মানে বেশ লাগে।

নাঃ সন্দেহের আর কিছু নেই।

মিস অণিমার কুমারী হৃদয় আবেগে দুলে ওঠে। হয়তো বা গালের ওপব দেখা দেয় ঈষৎ লালেব ছোপ।

—আপনাকে একটা কথা বলবো—মানে বলতে চেষ্টা কবছি যদি আপনি ভরসা দেন—মানে একটা প্রস্তাব—।

এবার অণিমা ঘোষও ঘেমে ওঠেন।

একেবারেই বিবাহের প্রস্তাব। কী সুন্দব আবেগপ্রবণ সবল হৃদয়!

আবছা পড়ন্ত বেলাব সোনালী আলোটা ঠিক মুখের ওপবই পড়েছে বোধহয়? বাঁকা সিঁথিতে—আঁকা ভুরুতে—আব বাঙানো অধবে?…

ছাপা শাড়িগুলো চমৎকার জিনিস—পরলে অন্ততঃ পনের বছর বয়স কম লাগে।……

ছোকরা কোঁচার খুঁটটা তুলে নিয়ে আঙুলে জড়াতে শুরু করেছে। কী মিষ্টি এই লজ্জার ভঙ্গিটুকু।…সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন মিস ঘোষ।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষায় কাটলো।

—কী মুশ্‌কিল, কি বলতে চান বলুন না? অপাঙ্গে একটু হেসে শিথিল ভঙ্গিতে ডান হাতখানা সামান্য এগিয়ে দিলেন মিস অণিমা। বুকের ভিতর দস্তুরমতো ‘ঢিপ ঢিপ’ শুরু করেছে।

কবিরা বোধকরি একেই ‘পুলক নর্তন’ বলে থাকেন।

কিন্তু আশ্চর্য লজ্জা ছেলেটির, পুরুষমানুষ হয়ে। কোনো নভেলে ও কি কখনো পড়েনি এ ক্ষেত্রে কি বলা উচিত অথবা কি করা? করপল্লবের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে উঠেই দাঁড়ালো? মিস অণিমা ঘোষকেই কি ফরোয়ার্ড হতে হবে?

—আপনার মতো লজ্জা তো দেখিনি।

—না লজ্জা নয়—মানে লজ্জা আর কিসের—আপনি যখন ভরসা দিচ্ছেন। বলেই ফেলছি—ইয়ে মানে আপনি—মানে আপনাকে অর্থাৎ আপনার কাছে একটা—।

—কি? বিয়ের প্রস্তাব করতে চান—এই তো?

বিলম্বিত প্রতীক্ষায় আর থাকতে পারেন না মিস অণিমা ঘোষ, এই সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষার শেষে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ—খুশিতে উপচে পড়ে ছোকরা —আপনার ভাইঝি ঠিকই বলেছিল যে, ‘পিসিমা কক্‌খনো অমত করবেন না—’, মীনাকে—মানে আপনার ভাইঝিকে আমি—মানে তার সঙ্গে আমার—।

—থাক্ মানে—বলে বেঁটে ছাতাটি তুলে নিয়ে—(না মেরে দিলেন না) গট্ গট্ করে চলে যান মিস ঘোষ, ভ্যানিটি-ব্যাগটি ভুলে ফেলে রেখে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ( ১৯০৯—)

# দুর্ঘটনা

সেভ্‌ন্‌ আপ দিল্লী এক্সপ্রেস—ডাকনাম যাহার তুফান মেল—তাহারই একখানা থার্ডক্লাস কামরায় আমাদের নাটকের আরম্ভ এবং সেইখানেই যবনিকা।

গাড়িতে সেদিন কি কারণে জানি না, অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেরই কিছু কিছু লোক হরেক রকমের মোটঘাট লইয়া কামরাগুলিকে একেবারে ভরাইয়া তুলিয়াছিলেন এবং প্রবেশপথের অবস্থা চক্রব্যূহের অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অবস্থার মধ্যেও শেষ-মুহূর্তে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক যখন সকলকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া, সকলের তারস্বর প্রতিবাদে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, তখন যে আমরা সকলেই বিরক্ত হইয়াছিলাম তাহা বলাই বাহুল্য।

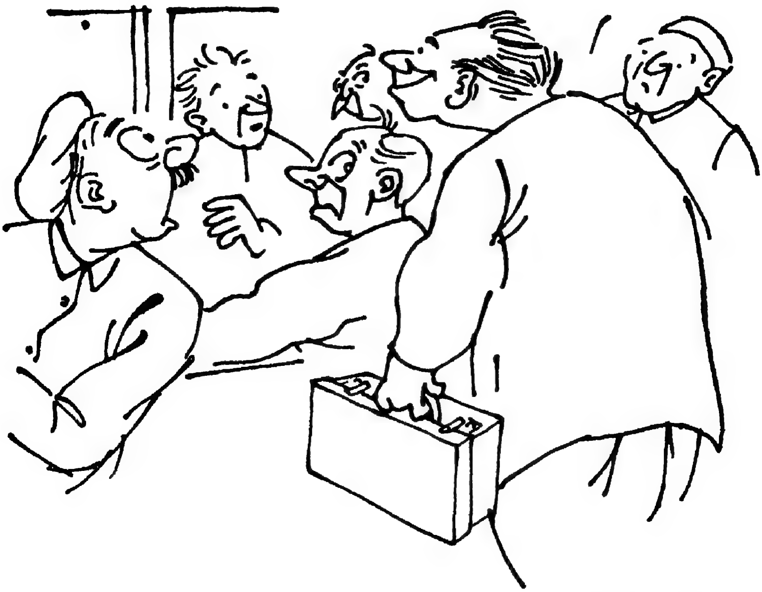

সুবিধার মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে মোটঘাট বিশেষ ছিল না, একটি স্যুটকেস মাত্র হাতে করিয়া তিনি উঠিলেন, কিন্তু বাক্স বা মেঝে কোথাও ব্যাগটি রাখিবার

তিলমাত্র স্থান না দেখিয়া হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং চারিদিকের মিলিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া চাদরের খুঁটে ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

ট্রেন ছাড়িবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই সহসা তাঁহার নজরে পড়িল ওধারে একটি ভদ্রলোক জানালার উপরে হাত রাখিয়া কনুইটি বাহির করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, 'ও মশাই! শুনছেন, ও দাদা—দয়া করে কনুইটা ভেতরে টেনে নিন, আমি হাত জোড় করছি।'

কনুইয়ের মালিক হাত ভিতরে টানিয়া লইলেন বটে, কিন্তু অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উপস্থিত অন্য সকলেরও প্রায় সেই অবস্থা; তাঁহার ব্যাকুলতা কিন্তু হাত টানিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছিল, তিনি অতঃপর ধীরে সুস্থে আমাদের দিকে চাহিয়া কারণটা বিবৃত করিলেন, 'এখনও পাঁচটি দিন হয়নি মশাই ওয়ালটেয়ার থেকে আসছিলুম মাদ্রাজ মেলে, এক ভদ্রলোক অমনি কনুই বার করে বসেছিলেন, দেখতে দেখতে মশাই—আমার চোখের সামনে—হাতখানি তিন টুকরো! কনুইটি রইল বাইরে, বগল আর হাত ভেতরে চলে এল!'

চারিদিক হইতে একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠিল। যিনি কনুই বাহির করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার তো রীতিমতো মুখ শুকাইয়া গেল।

'বলেন কি মশাই?'

'আজ্ঞে, তবে আর অত ব্যস্ত হলুম কেন বলুন।'

ওধারের বেঞ্চ হইতে একটি মাড়োয়ারী যুবক বলিয়া উঠিল, 'লেকিন্ ক্যায়সে কাটা বাবুজী?'

ভদ্রলোক একটু যেন উষ্ণভাবেই কহিলেন, 'এটা আর সম্‌ঝা নেহি? পাথর পাথর! পাহাড়কা উপরসে পাথর গিরা!'

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলাম, 'বলেন কি মশাই?…পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর পড়ে বেচারার হাতটা কেটে গেল?'

'যাবে না? সে কি যা তা পাথর? অন্ততঃ আট-নয় মন ওজন হবে!'

একজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'ট্রেনে জার্নি করা প্রাণ হাতে করে।'

'কিছু বিশ্বাস নেই মশাই, বুঝলেন। যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ বিশ্বাস নেই।…এই তো মাস-খানেকের কথা, দানাপুর স্টেশনে গাড়ি থেমেছে, আমাদের ম্যাক্‌নীল কোম্পানির হরেনবাবু স্টলে গেছেন চা খেতে; ফিরে

আসছেন, আসতে আসতেই গাড়িটা দিয়েছে ছেড়ে। ও মশাই, সামান্য স্পীড, কিন্তু ভদ্রলোক একটুখানি পা পিছলে যেমন গলে পড়ে গেলেন আর অমনি দু-টুকরো।'

আবারও সেই অস্ফুট গুঞ্জন! অনেকেরই মুখ শুকাইয়া উঠিল, বোধহয় নিজেদের ইতিপুর্বেকার চলন্ত ট্রেনে উঠিবার ইতিহাস স্মরণ করিয়া। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁহার যুবক সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হাতরাস থেকে মথুরার ট্রেন ধরে কাজ নেই, বরং বাসে গেলেই হবে।'

আমাদের নবাগত ভদ্রলোকটি আরও যেন তাতিয়া উঠিলেন, 'বাস? ও আরও ডেঞ্জারাস? শুনবেন তাহলে বাসের কথা? আমার এক মাস্টার মশাই আসছিলেন তমলুক থেকে বাসে করে—পাঁশকুড়োর ট্রেন ধরবার জন্যে। হঠাৎ মোড় ঘুরেই দেখা গেল রাস্তার ওপর গোটাতিনেক ছাগলছানা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বাঁচাবার জন্য ড্রাইভার যেমন পাশ কাটাতে গেছে, একেবারে উঁচু রাস্তার ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে বাসসুদ্ধ চলে গেল নিচের জমিতে। সতেরজন প্যাসেঞ্জারের মধ্যে তিনজন তখনই মারা গেল, আর দুজন হাসপাতালে পৌঁছেই গেল; বাকি সকলকে মাস-ছয়েক করে ঝোল-ভাত খেতে হল। শুধু ড্রাইভার ভালো ছিল, তাব কিছু হয়নি।'

শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেরই এই বর্ণনায় গা-মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। আমার রীতিমতো পেট ব্যথা করিতে শুরু করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে প্রথম ভয়ের ব্যাপারটা কাটিতে আমাদের বিরাজবাবু সেই মথুরাবাসী বৃদ্ধটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ও বাসে-ফাসে কখনও চড়তে নেই মশাই। ভারী বিপজ্জনক। যদি নিজের মোটর থাকে, কিংবা ট্যাক্সি—'

'তাতেই বা কি সুবিধে মশাই? সেদিন কাগজে পড়েননি, এক বড়োবাজারের মহাজনের কী দুর্গতি! উপযুক্ত ছেলে, এক ছেলে, নিজে মোটর চালিয়ে ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে গেল আর ফিরল না। খোঁজখোঁজ—অনেক খুঁজে দেখা গেল যে, গড়ের হাটের কাছে এক বিরাট বটগাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরখানা ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে, আর তার সঙ্গে মোটরের মালিকও! ...নিজের মোটরের তো ঐ হাল, আর ট্যাক্সির তো কথাই নেই। রোজ অন্ততঃ চারটে করে অ্যাকসিডেণ্ট এই কলকাতা শহরেই হচ্ছে। এই তো গত বুধবারের আগের বুধবারে আমাদের চোখের সামনে একখানা ট্যাক্সি—'

ভদ্রলোকের কথায় একটা আকস্মিক বাধা পড়িল। ওধারের বেঞ্চি হইতে এক

ভদ্রমহিলা সহসা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সেই দিকে মনোযোগ দিলাম, 'কি হল—কাঁদছো কেন'—'কি হয়েছে মশাই ?' ইত্যাদিতে অন্য সব প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

অনেক প্রশ্ন করিবার পর তাঁহার সঙ্গীদের কাছে জানা গেল যে, ভদ্রমহিলার একমাত্র জামাতা ট্যাক্সি ও বাসে ধাক্কা লাগিয়া সম্প্রতি প্রাণ হারাইয়াছেন। মোটর দুর্ঘটনার এই প্রত্যক্ষ স্বরূপে আমরা সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বিরাজবাবু নিজে অনেকখানি সরিয়া বসিয়া নবাগত ভদ্রলোককে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন।

ওধারের ভদ্রমহিলার কান্না কমিয়া আসিলে প্রায় সমস্ত গাড়ি জুড়িয়া শুরু হইল বিবিধ বিচিত্র দুর্ঘটনার আলোচনা। নিজের জীবনে যে যতরকম দুর্ঘটনা দেখিয়াছেন, তাহাই মহা উৎসাহে বর্ণনা করিতে বসিলেন। যাহারা দেখেন নাই, তাহারা শোনা কথাকে অলংকার দিয়া বর্ণনা করিতে বসিলেন এবং খবরের কাগজের আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আমাদের নবাগত ভদ্রলোকটির বিড়ি টানা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাঁহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আর সকলের কথা ডুবাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, 'কোন্ যানবাহনটা নিরাপদ ? সাইকেল ? শহরে সাইকেল চালানো তো প্রাণ হাতে করে। এই বুঝি ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লাগল, ঐ বুঝি বাস চাপা পড়লুম, সর্বদা এই ভয়। ঘোড়ার গাড়ির তো কথাই নেই, ঘোড়া ক্ষেপে উঠলেই চোখে অন্ধকার। প্রভাত মুখুজ্যে, কি অনুরূপা দেবীর গল্পের নায়ক যদি কাছাকাছি থাকে তবেই রক্ষে, রাশ টেনে ঘোড়াকে আটকাবে ( যদি গাড়িতে নায়িকা হবার উপযুক্ত কেউ থাকে ), নইলে সটান নিমতলার ঘাটে।'

এক অর্বাচীন বালক বলিয়া ফেলিল, 'আগেকার হেঁটে যাওয়াই ভালো ছিল।'

'ওরে বাবা! বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় তো পদচারীদের স্থানই নেই। ট্রাম-বাস-মোটর-ঘোড়া এসব তো আছেই, মায় রিক্সা চাপা পড়া পর্যন্ত। আর যেখানে গাড়ি-ঘোড়া নেই, সেখানে সাপ-খোপ আছে।'

সম্মুখের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ফোঁস করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'বাইরে বেরোলেই অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা, তার চেয়ে ঘরে বসে থাকাই ভালো।'

'কিছু না, কিছু না, দেখলেন তো বিহারের ভূমিকম্পের সময় ? যারা বাইরে টাইরে ছিল তারা বরং এ রকম করে বেঁচেছে। যারা ঘরের মধ্যে ছিল, তাদের তো আর চিহ্ন রইল না। আমাদেরই এক আলাপী ভদ্রলোকের কি

হল তিনি আর তাঁর নাতনী বাইরের রাস্তায় পায়চারি করছিলেন, আর বাড়ির প্রায় সবাই ছিল ভেতরে, মশাই সেই একুশজন লোকের মধ্যে একজনও বাঁচল না। শুধু বুড়ো আর সেই নাতনী! বুড়ো তো পাগল হয়ে গেছে—'

মথুরাযাত্রী বৃদ্ধ লোকটি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ভ্যাঁক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, 'মশাই তাহলে কি আর কোনো উপায় নেই ?'

নবাগত ভদ্রলোকটি চিন্তিত মুখে কহিলেন, 'নাঃ—অ্যাক্সিডেণ্টের হাত এড়াবার কোনোও উপায় নেই। তবে যদি অল্প-সল্প কিছু হয় কিংবা পরিবারদের কোনোও ব্যবস্থা করতে চান তাহলে উপায় আছে বটে।'

চারিদিক হইতে ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন আসিতে লাগিল। 'কি রকম, কি রকম ?' 'কি বললেন মশাই ?' ইত্যাদি।

ভদ্রলোক কহিলেন, 'আজকাল সব বিলাতি ইনসিওরেন্স কোম্পানিই অ্যাক্সিডেণ্ট ইনসিওরেন্স করছে, সেগুলো মন্দ নয়। যদি হাত-পা ভাঙে কিংবা একেবারে মারা যান তাহলে মোটা টাকা দেবে, আর যদি অসুখবিসুখ করে তাহলেও মাসহারা দেবে—ভারী চমৎকার পলিসি। আমার কাছেও আছে একটা প্রসপেকটাস্ দেখবেন ? স্কটস্ ইউনিয়নের অ্যাকসিডেণ্ট পলিসি, নাম করা পলিসি; অনেক পুরনো কোম্পানি। প্রায় একশ বছরের—দেখবেন ?'

ভয়ের পরিবর্তে অনেকেরই মুখে চোখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, একজন তো স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল, 'ওঃ আপনি এজেণ্ট বুঝি ? তাই তো অত ভয় দেখাচ্ছিলেন ?'

ভদ্রলোক এই দোষারোপে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ধীরে সুস্থে স্যুটকেস্ খুলিয়া কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া কহিলেন, 'আজ্ঞে ভয় তো আর আমি মিথ্যে করে দেখাইনি। কোন্ কথাটা ওর মধ্যে বাজে ?…হাত পা ভেঙে যখন বাড়িতে এসে বসবেন, তখন যদি টাকাটা পান সেটা ভালো, না ভিক্ষে করা ভালো ? না—কি আপনি টাকাটা পেলে আমায় দেবেন ?'

তারপর প্রশান্তভাবে মথুরাযাত্রী ভদ্রলোকের হাতে একখানা প্রস্পেক্টাস্ দিয়া কহিলেন, 'দেখুন ভালো করে পড়ে দেখুন, বুঝতে না পারলে বরং আমায় বলবেন, বুঝিয়ে দেব—'

যে ভদ্রলোক কনুই টানিয়া লইয়াছিলেন, তিনি পুনরায় জানালায় হাত বাহির করিয়া বসিলেন।

সুবোধ বসু ( ১৯০৯—)

# ভগীরথের গংগা আনয়ন

খবরটা শুনিয়া গণেশ রায় স্তম্ভিত হইলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত কন্‌ট্রাক্টর। স্বয়ং মিনিস্টার খাল-খননের কাজ স্বচক্ষে পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন, এই খবর পাইয়াই তাঁহাকে কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে ; নহিলে বীরভূমের এই জনহীন ও বৃক্ষহীন প্রান্তরে তিনি ছুটিয়া আসিতেন না। সরকারী পূর্ত বিভাগে তাঁহার নাম-ডাক আছে। অথচ তিনি নিজে হাজির থাকা সত্ত্বেও ঠিক মিনিস্টারের পরিদর্শনের দিন মাটি কাটার চার-শ মজুর কাজ বন্ধ করিয়া বসিলে তাঁহার সম্মান থাকিবে কি ?

'ব্যাটাদের বদ্‌মাশিটা দেখলেন, স্যার ? ঠিক সময় বুঝে কোপ দিয়ে বসেছে।' তাঁবুর স্বল্প পরিসরের মধ্যে বারবার পায়চারিরত প্রভুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া গণেশবাবুর বিশ্বস্ত কর্মচারী ভগীরথ সামন্ত মন্তব্য করিলেন। 'নিশ্চয় এর পেছনে দুষ্ট লোকের উস্কানি আছে। নইলে কুলিদের পেটে এত শয়তানি।···ইদিকে আমি মন্ত্রীর অভ্যর্থনার জন্য সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। বাগ্‌দীপাড়ার কুলবধূরা এসে শাঁখ বাজাবে, সাঁওতাল আর বুনোদের দল ঢোল-মাদল বাজাতে আসছে, অভ্যর্থনার ফটক তো রেডিই, ফটকের উপর থেকে কারা কারা মন্ত্রীর মোটরে পুষ্পবর্ষণ করবে তাও ঠিক আছে। মানে, অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটিই রাখা হয়নি। ইদিকে মন্ত্রীমশাই যা পরিদর্শন করতে আসছেন, তাই যদি ফাঁকা পড়ে থাকে···'

'ওদের মিনিমাম ডিমাণ্ড কি ?' গণেশ রায় প্রশ্ন করিলেন।

'আজ্ঞে, নিম্নতম দাবি তো গুচ্ছের। এক রাত কেন, এক বছরেও তা মেটানো সম্ভব নয়।' ভগীরথ সামন্ত কহিলেন। 'তবে কখনো বা ধমকে, কখনো বা পিঠ চাপড়ে যা বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হয়, অন্ততঃ একটা দাবি মেটাতে পারলেই কালকের মতো ধর্মঘট আটকানো যায়··· ।'

'তবে আর দেরি করছ কেন ?' গণেশবাবু অধৈর্য ভাবে কহিলেন। 'মিনিস্টারের কাছে নাকাল হতে পারব না। বলো কি করতে হবে ?···'

'আজ্ঞে, একটা নাপিত এনে দিতে হবে।' ভগীরথ সামন্ত মাথা চুলকাইয়া

কহিলেন। 'মানে, অনেক দিন থেকেই এরা এই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে। বলছে, চুল দাড়ি ফেলতে হলেই পাঁচ মাইলের রাস্তা চণ্ডীগ্রামে ছুটে যেতে হবে, এও কখনো পারা যায়। একটা নাপিত এনে বসান। অথচ নাপিত ব্যাটারাও এমন বদমাশ, কেউ যদি সাইটে এসে থাকতে রাজী হয়। বলে, মশাই, ঐ মরুভূমিতে গিয়ে মানুষ বাস করতে পারে?···যেন আমরা মানুষ নই···'

'যা হয় একটা ব্যবস্থা করো!' গণেশবাবু হাসি দমন করিয়া কহিলেন।

'ভাবছি, কাল কাক-ভোরে উঠেই জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। ছোটবাবু যখন সেবারে কাজ দেখতে এসেছিলেন, তখন চণ্ডীগ্রামের গঙ্গারাম নাপিতকে একবার জীপে করে নিয়ে এসেছিলাম। ভাবছি, খুব সকালবেলা গিয়ে তাকে ধরে তুলে নিয়ে আসব।'

কাক-ভোরেই ভগীরথ সামন্ত উঠিয়াছিলেন, তবু আধঘণ্টা দেরি হইয়া গেল। পনের-কুড়ি মিনিট ব্যর্থ চেষ্টার পর জীপ-চালক কহিল, 'না স্যার, ফুয়েল-পাম্পে গোলমাল হচ্ছে, স্টার্ট নেবে না মনে হয়···'

'আঃ, কী মুশ্‌কিল!' সামন্ত মশাই অধৈর্য হইয়া কহিলেন। 'কৈ, কাল তো কিছু বলোনি। নাও, শিগগির করো। কলকাতার ড্রাইভারকে ডেকে তোলো। হুজুরের গাড়িটাই বের করতে হবে। আর একটুও দেরি করার জো নেই···'

রোগা লিকলিকে চেহারার লোক ভগীরথ, কিন্তু কাজ করিতে ও করাইয়া লইতে তাহার জুড়ি নাই। সে-ই গণেশ রায়ের স্থানীয় কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। প্রভু এবং তাঁহার কলিকাতার মোটর-চালক সকাল সাতটার আগে ঘুম হইতে উঠেন না। প্রভুর নিদ্রার ব্যাঘাত না করিয়া অগত্যা তাঁহার ড্রাইভারের নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে হইল। গণেশ রায়ের প্রকাণ্ড হাম্বার গাড়ি ইহার আধ ঘণ্টার মধ্যেই চণ্ডীগ্রামের দিকে রওনা হইয়া পড়িল।

গঙ্গারাম নাপিতের বাড়ি ভগীরথের আগে হইতেই চেনা। গাড়ি যখন সেখানে হাজির হইল তখন গঙ্গারাম প্রামাণিক কাজে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

গাড়ি হইতে নামিয়া মুখে প্রসন্ন হাসি আনিয়া সামন্ত মহাশয় বিশেষ তোয়াজের গলায় কহিলেন, 'এই যে গঙ্গারাম, চিনতে পারছ ? বের হচ্ছ বুঝি ?'

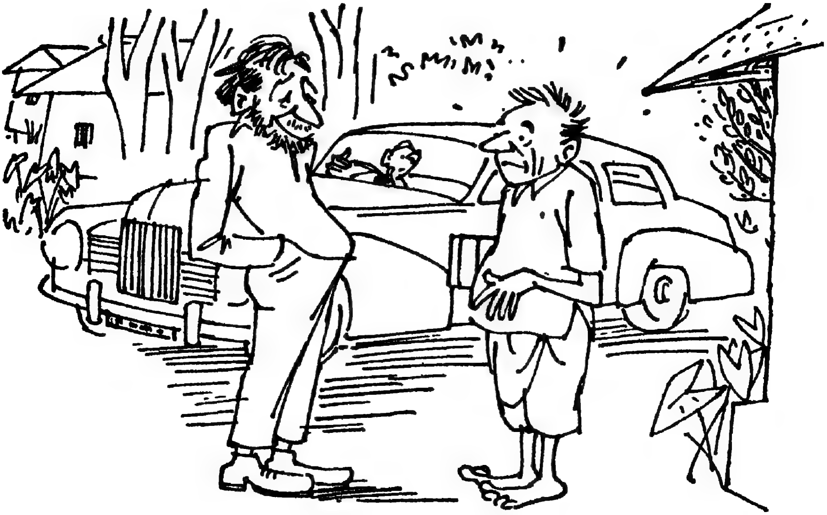

'কে, কাকিনীর খালের বড়োবাবু না ?' গঙ্গারাম নাপিত একবার ধূর্ত দৃষ্টিতে ভগীরথের দিকে তাকাইয়া সবিনয়েই কহিল। 'চিনতে পারছি বৈকি। তারপর এদিকে কি মনে করে ?'

প্রয়োজন জরুরী না হইলে গাড়ি করিয়া এই সাতসকালে কাকিনীর মাঠ হইতে কেহ আসে না, এ সম্বন্ধে গঙ্গারামের কোনো সন্দেহই ছিল না, তবু নিজের দাম বাড়াইবার জন্যই সে ফাল্‌তো প্রশ্ন করিল।

'আর বলো কেন। পুরুষমানুষ হয়ে জন্মালে তোমাদের কাছে না এসে উপায় কি,' ভগীরথ কহিলেন। 'একবার সাইটে যেতে হবে…'

'এই অনুরোধটি করবেন না, সামন্ত মশাই, ইটি রাখতে পারব না।' গঙ্গারাম গম্ভীর হইয়া কহিল। 'সেবারে আপনাদের ওখান থেকে ফিরে দু-কান মলেছি আর ওমুখো হচ্ছি না।'

'কেন বলো তো ?' ভগীরথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন। 'মোটরগাড়ি করে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম, ছোটবাবু খুশি হয়ে এক টাকা মজুরি দিয়েছিলেন…'

গঙ্গারাম এক টাকা মজুরির কথা কানে তুলিল না। কহিল, 'মোটরে চড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া দরকার মনে করেননি। কথায় বলে কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। সেই দুকুর-রোদ্দুরে ঘেমে

তেতে দু-কোশ পথ হেঁটে আসতে প্রাণান্ত। সেদিন ফিরে এসেই দু-কান মলেছি…'

ভগীরথ সামন্ত কনট্রাক্টরের ঝানু কর্মচারী। দরকার হইলে সে বাঘের চোখ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে। নাপিতের অভিমান ভাঙাইতে তাহার কষ্ট হইবে কেন ?

'কিছু ভেবো না,' সামন্ত বিশেষ মোলায়েম গলায় কহিলেন, 'একবার ত্রুটি ঘটেছে বলে সব বারই ত্রুটি থেকে যাবে, সেটি মনে করছ কেন ? এবার গাড়ি করেই ফেরত পাঠাব দেখো। প্রায় শ-খানিক লোক হয় দাড়ি চাঁচবে, নয় চুল ছাঁটাবে—মজুরিও নেহাত কম হবে না…'

সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণে গঙ্গারামের দুই চোখে পলকের জন্য লুব্ধ খুশির পুলক খেলিয়া গেল। তবু সে ঔদাসীন্যের ভান করিয়া কহিল, 'ওরে বাবা, এক বেলায় অত মক্কেল পার করবে কে ! চারটের পরে মশাই আমি বাড়ির বাইরে থাকিনে…'

ভগীরথ মনে মনে কহিলেন, 'নবাব খাঞ্জা খাঁ ! চারটের পরে হারেমের বাইরে থাকেন না !' কিন্তু প্রকাশ্যে তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলেন না। মনিব গণেশ রায়ের সম্মান আজ নাপিতের উপর নির্ভর করিতেছে এবং নাপিতের যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করিতেছে ভগীরথের মেজাজের উপর। এ অবস্থায় কোনোও বেফাঁস কথা উচ্চারণ করার উপায় নাই, তা প্ররোচনা যতই তীব্র হউক।

'আর একজন কাউকে ধরে নিয়ে যেতে পারো না ?' সামন্ত সবিনয়ে কহিলেন।

'আরে মশাই ইচ্ছেমতো পরামাণিক পাচ্ছেন কোথায় ?' গঙ্গারাম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল। 'এ কাজ অত সোজা নয় যে, যে ইচ্ছে সেই পরামাণিক সেজে বসবে।…এক ঐ নিকুঞ্জকে ডাকতে পারতাম। কিন্তু সে তো দিব্যি গেলে বসে আছে। মশানে যাব তো এ জন্মে আর কাকিনীর মাঠে যাব না। পয়সার লোভে সেবার গিয়ে মেহনতে হেদিয়ে দুকুর-রোদ্দুরে বাড়ি ফিরে সর্দি-গর্মিতে প্রাণ যায় আর কি। পনের দিন যমে-মানুষে লড়াই হয়ে প্রাণটা যখন ধুকধুক করছে তখন কোনোও গতিকে রেহাই পেল।…সে আর ওমুখো হচ্ছে না…'

'তবে তুমিই চলো।' ভগীরথ অধৈর্য দমন করিয়া কহিলেন। 'দু-দুটো করে ক্ষুরের টান দিও, তাতে যা কাটে। কুলি ব্যাটাদের খুশি করা বৈ তো নয়…'

মন্ত্রীর আসার কথা এবং ধর্মঘটের হুমকির কথা সামন্ত সযত্নে গোপন রাখিলেন।

'তা যেমন জরুরী ব্যাপার বলছেন, যেতেই হবে।' গঙ্গারাম নরম হইয়া কহিল। 'কিন্তু রুটিনের কাজগুলি না সেরে তো যেতে পারব না, মশাই। আপনারা ছ-মাস ন-মাস পরে একদিন ডাকবেন। আমার বাঁধা ঘরগুলো সারা বছরের খদ্দের। তা ঘণ্টাখানেকের বেশি দেরি হবে না। গাড়িটা নিয়েই চলুন, তাড়াতাড়ি সেরে নিই। ছু-পাঁচ বাড়ি বৈ তো নয়…' অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া গঙ্গারাম গটগট করিয়া মোটরে আসিয়া চড়িল।…

এমন অসম্ভব প্রস্তাব কেউ কখন শুনিয়াছে? কিন্তু রাজী না হইয়া উপায় কি? তাড়াতাড়ি লইয়া যাইবার তাড়া তো ছিলই, তার উপর সবেধন পরামাণিক বেহাত না হইয়া যায়, সেদিকেও নজর রাখা নেহাত প্রয়োজন।

নাপিত মোটরে চড়িয়া বাড়ি বাড়ি দাড়ি গোঁফ কামাইয়া বেড়াইতেছে, এই এই দৃশ্য হয়তো আমেরিকার পক্ষে বেমানান হইত না। চণ্ডীগ্রামে এমন তাজ্জব ব্যাপার গ্রামের যত ডেঁপো ছোঁড়ার কৌতূহল আকর্ষণ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি। এই কৌতূহলী জনতা-পরিবৃত হইয়া এক এক বাড়ির সামনে আধ ঘণ্টা হইতে সোয়া ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভগীরথের মতো বিবেচক লোকের ধৈর্যের পক্ষেও চূড়ান্ত পরীক্ষা। কিন্তু কিছু বলিবার উপায় নাই। সামান্যতম অনুযোগ করিলেই গঙ্গারাম বলে, 'সারা বছরের মক্কেল, নিজে থেকে কথা ওঠালে চটিয়ে আসতে পারি না, এক আধটু গল্প-গুজব করতেই হয়।…আর বেশি দেরি হবে না, আর ছু-তিনটে বাড়ি মাত্র…'

শেষ বাঁধা মক্কেলটির পরিচর্যা সারিয়া গঙ্গারাম যখন মোটরে প্রত্যাবর্তন করিল, তখন ভগীরথ অর্ধেক তৃপ্তি ও অর্ধেক ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন, 'এবার রওনা হবার সুবিধা হবে কি?'

'হবে বৈকি।' গঙ্গারাম গদিতে আসীন হইয়া কহিল। 'আপনাদের জরুরী কাজ, তাই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হল। ছু-গণ্ডা বাড়ি বাদ দিলুম। এবার রওনা হব বৈ কি। হাতে ঘড়ি আছে? সময় ক-টা হল দেখুন তো একবার?'

'সোয়া সাতটায় এসেছিলাম, ভগীরথ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'এখন এগারটা। সামান্য চার ঘণ্টার ব্যাপার!'

‘ক-টা বললেন ? এরই মধ্যে এগারটা বেজে গেছে !’ গঙ্গারাম উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাইল। ‘তা হলে আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে যেতে হবে। বাড়িতে নেমে চট করে চানটা সেরে নেব…’

‘বলো কি, আরও দেরি !’ ভগীরথ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন। চার ঘণ্টা অপেক্ষা করাইয়াও তোমার তৃপ্তি হইল না—এই মন্তব্যটি অতিকষ্টে ঠোঁটের উপর চাপিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, ‘চানটা এখন থাক। সে ব্যবস্থা না হয় সাইটে গিয়ে করে দেব। এতক্ষণ বলছি কি, আমার জরুরী দরকার…আর দেরি হলে তো আমার চলবে না…’

‘আপনার তো জরুরী ব্যাপার মশাই,’ গঙ্গারাম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল, ‘ইদিকে আমার স্বাস্থ্যটি বিগড়োলে তখন কি দেখতে আসবেন ! সেবার যে নিকুঞ্জ আপনাদের কাজে গিয়ে সর্দি-গর্মিতে টেঁসে যাবার জো হয়েছিল, তখন কি তার জন্যে আপনারা পাইপয়সাটি খরচা করেছিলেন ? যাই বলুন আর তাই বলুন, এত বেলায় চান না সেরে আমি দু-কোশের পথ বেরুতে পারব না।’

এখন হাত কামডাও আর দাঁত কিড়মিড় করো, সুদুর্লভ নরসুন্দরের মর্জি না মানিয়া উপায় নাই। একটা বেফাঁস কথা উচ্চারণ করিলেই গণেশ রায়ের সম্মান, ভগীরথের কর্মতৎপরতার খ্যাতি এবং মন্ত্রীর খাল-খনন-পরিদর্শন ভণ্ডুল হইয়া যায়।

ভগীরথেব নির্দেশেই ড্রাইভার গাডিটা গঙ্গারামের বাডির দরজার সামনে হাজির করিল।

অবশেষে যখন সত্যসত্যই কাকিনীর মাঠেব দিকে রওনা হওয়া গেল, তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা। গঙ্গারাম স্নান সারিয়া ফর্সা জামা পায়ে দিয়া ফিটফাট বাবুটি হইয়া আসিয়াছে। খাওয়া-দাওয়াও নিশ্চয়ই সারিয়া লইয়াছে—মেজাজের উন্নতি লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই। তপ্ত দ্বিপ্রহরে বৃক্ষবিরল প্রান্তরের মধ্য দিয়া কাঁচা রাস্তার ধূলা উড়াইয়া মোটরগাড়ি যতই মরিয়ার মতো ছুটিতে লাগিল, ততই তার কৌতূহল এবং প্রশ্ন উদ্দাম হইয়া উঠিল। খাল খুঁড়িয়া কি লাভ হইবে, কোথা হইতে কতদূর পর্যন্ত খননকার্য বিস্তারিত হইবে, নেড়া জমিতে আবাদের কিরূপ সুবিধা হইবে—প্রভৃতি হইতে লাট-বেলাটের সাম্প্রতিক হালচাল সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই বাদ পড়িল না। ভগীরথের কাছ হইতে জবাব না পাইলেও তাহার আসিয়া যায় না। তাহার নিজস্ব পুলকে সে বকর

বকর বকর করিয়া চলিল, অন্যের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনো তোয়াক্কাই রাখিল না। 'বেড়ে গাড়িটা কিন্তু আপনার!' বোধ হয় এতক্ষণ পর ভগীরথের নীরবতা লক্ষ্য করিয়া তাকে খুশি করিবার জন্যই গঙ্গারাম অবশেষে কহিল—'এই যে এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পথের উপর দিয়ে, কাঁটা আর শেকড় মাড়িয়ে হন্‌ হন্‌ করে ছুটে চলেছি, একটু টেরও পাওয়া যাচ্ছে না, বরঞ্চ গদির দুলুনিতে তোফা আরাম লাগছে—কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার, বেলা তিনটের এখনও ঢের দেরি। তার মধ্যে চার-পাঁচ গণ্ডা মক্কেলের গণ্ড-মুণ্ডুর ব্যবস্থা না করতে পারি তবে অ্যাদ্দিন মিছেই এ ব্যবসা করে আসছি। একটাকে ধরবো, আর গলায় এক এক পোঁচ বসিয়ে ছেড়ে দোব!' বলিয়া নিজের রসিকতায়ই সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

গঙ্গারামের গলায়ই ভগীরথের এই পোঁচটি দিতে ইচ্ছা হইতেছিল, অতিকষ্টে নিজেকে সংবরণ করিয়া সে একটু ফিকা হাসি হাসিল মাত্র।

'গিন্নী বলছিল,' গঙ্গারাম উদারতার সঙ্গে জানাইল, 'কাকিনীর মাঠের বাবুরা যদি ভালো কোয়াটারের ব্যবস্থা করে দিতেন, তবে না হয় ক-মাস ওদের ওখানে গিয়েই থাকতুম। কিন্তু আমি বললাম, শুধু কোয়াটার আর পয়সার দিক দেখলেই তো চলবে না গিন্নী, ওস্তাদ কারিগরের কাজের ওখানে কি রকম কদর, তার ওপরই যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর করছে। আরে, এরই মধ্যে এসে গেলাম দেখছি! ··ওটা কি মশাই, ফুল, পাতা, নিশেন সাজিয়ে এক পেল্লাই ফটক খাড়া করেছেন দেখছি···কী ব্যাপার ?'

'ওটা', ভগীরথ কাকিনীর মাঠের প্রবেশ-মুখের সুসজ্জিত অভ্যর্থনা-তোরণটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া হিংস্র-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'তোমারই অভ্যর্থনার সামান্য আয়োজন! গুণীলোকের কদর আর কি?···'

মন্ত্রী-অভ্যর্থনাকারীদল বেলা বারোটার আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছে। উৎসাহে একেবারে টগ্‌বগ্‌ করিতেছে। সম্মানিত অতিথি-মহোদয় যখনই আসিয়া পৌছান না কেন, তাহাদের দৃষ্টি বা অভ্যর্থনা এড়াইয়া যাইতে পারিবেন না। এমন সময় দূরে দেখা গেল নতুন চক্‌চকে প্রকাণ্ড মোটরগাড়ি; সকলে উদ্‌গ্রীব ও প্রস্তুত হইল। গাড়ির আরোহীরাও এইবার নজরে আসিয়াছে। ম্যানেজার ভগীরথ সামন্তের পাশে ফর্সা পাঞ্জাবি গায়ে ভারিক্কী চালে গদিতে পিঠ এলাইয়া হাঁটুর উপরে হাঁটু রাখিয়া একজন বসিয়া আছেন। গাড়ির চালকের সাজসজ্জাই বা কী আড়ম্বরপূর্ণ! মুহূর্তে দলের নেতার সংকেত ছুটিয়া

আসিল। পলকে বাগ্‌দীপাড়ার কুলবধূদের শঙ্খ দিগন্ত কাঁপাইয়া ধ্বনিত হইল, সাঁওতাল এবং বুনোদেরও এক মুহূর্ত দেরি হইল না, কাড়া-নাকাড়া-দামামার

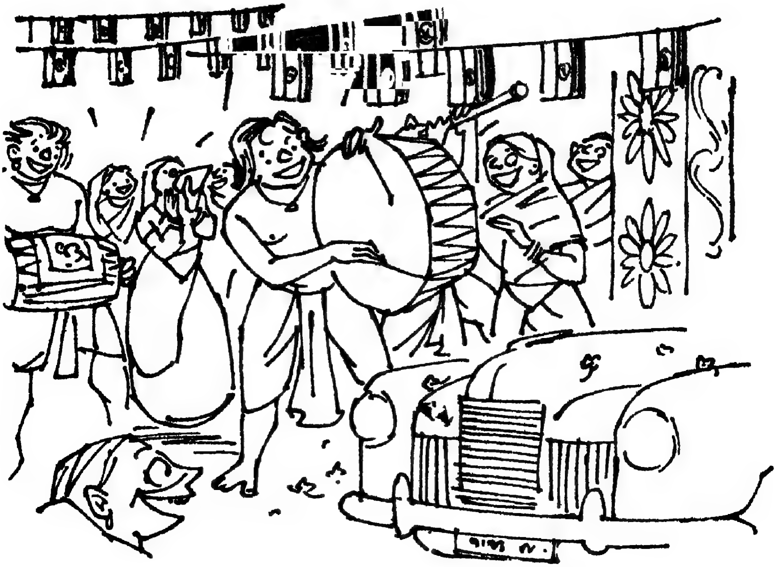

সম্মিলিত আওয়াজে কাকিনীর মাঠ প্লাবিত হইয়া গেল। তোরণের চূড়ায় অদৃশ্য জায়গায় যাহারা পুষ্প-বর্ষণের জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারা নিশানা লক্ষ্য করিতে একটুও ভুল করিল না, মোটরগাড়ি তোরণের তলায় পৌঁছানোমাত্র ধামা ধামা ফুল সম্মানিত অতিথির উপর শ্রাবণের বৃষ্টির মতো ঝরিয়া পড়িল।

গুণীর গুণের তারিফ করিবার লোকের তবে অভাব নাই! গঙ্গারাম প্রকৃতই খুশি হইল। সে স্থির করিল, উপযুক্ত কোয়াটার পাইলে ক-মাসের জন্য সে কাকিনীর মাঠে আসিয়াই বাস করিবে।

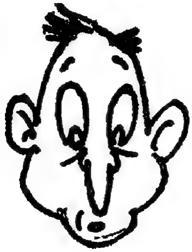

সম্বুদ্ধ ( ১৯১১— )

# বাইসন ও বায়োস্কোপ

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

নীলগিরিতে বদলি হয়েছিলাম বছর তিনেক, শিকারের পক্ষে খাসা জায়গা। বাঘ, ভালুক, হরিণ, মোষ—এসব তো রয়েইছে, এছাড়াও আরেকটি জীব আছে, যা ইণ্ডিয়ার আর কোথাও নেই— বাইসন। এই বাইসন নিয়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল আমি ওখানে থাকতে। এটা অবশ্য ঠিক আমার শিকারের গল্প নয়, কারণ সে বাইসন আমি নিজহাতে মারিনি। তবু সবসুদ্ধ ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত অলৌকিক যে, সে না শুনলে তোমাদের কিছুই শোনা হল না।

একটি কথা গোড়াতে বলে নিই। একটা ধারণা অনেকের মনে থাকে দেখেছি, বাইসনকে তারা বলেন, বন-মোষ। কথাটা ভুল, বাইসন মোষ নয় ; যদি বলতেই হয়, তবে একে বলা উচিত বন-গোরু। ইণ্ডিয়ার অনেক জায়গাতে বলে ‘গয়াল’। সংস্কৃতেও বাইসনের নাম, ‘গবয়’ ; ওটা গো থেকে হয়েছে।

আকৃতিতে গোরুর জ্ঞাতভাই হলেও প্রকৃতিতে কিন্তু বাইসন মোটেই গোরুর মতো নয়। বলতে কি, অমন দুর্দান্ত জীব কমই আছে পৃথিবীতে। এমন যে বনের রাজা সিংহ, সেও বাইসন দেখলে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবার পথ পায় না। এক জব্দ হয়েছে তারা মানুষের কাছে, সেও বন্দুক আবিষ্কার হবার পরে। ইওরোপে এক সময়ে বাইসনের মেলা ছিল—রাতারাতি দল বেঁধে এসে গাঁ-কে গাঁ ভেঙে-চুরে ছারখার করে দিয়ে যেত। ইওরোপে এখন একটাও বাইসন নেই। ওর বংশকে ঝাড়ে-মূলে শেষ করে দিয়ে তবেই তারা ঘর করেছে। তা না হলে এত বড়ো সিভিলিজেশন আর গড়ে তুলতে হত না, বাইসনের গুঁতোতেই সব ছত্রখান হয়ে যেত। বাইসনের বড়ো আড্ডা এখন আমেরিকা, সেখানে তারা যেদিকটায় থাকে, তার ত্রিসীমানায় মানুষের বাস নেই।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো আর হিংস্র বাইসন ছিল অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরির। এখন

তাদের বংশ লোপ হয়ে গেছে। আজকাল বড়ো বাইসন আমেরিকাতেই মেলে। কিন্তু আমাদের নীলগিরির বাইসনও খুব কম যায় না তাই বলে। আমি যেটার কথা বলছি, সে তো দস্তুরমতো একটা বিরাট ব্যাপার ছিল।

তিন মাসের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছিলাম, মেয়ের বিয়ে দিতে। দূর দেশ, তায় পথঘাট খারাপ, লটবহর টেনে দেশে আসাটা হামেশা হয়ে উঠত না। তাই আমরা বাঙালী যে কয়জন ছিলাম, এক বছর দেড বছর ছুটি জমিয়ে নিয়ে একবারে আসতাম।

দেশ থেকে ফিরে যেদিন গিয়ে পৌছলাম, সেদিনটা ভারী বাদলা। লোকজনের সঙ্গে একটু দেখাসাক্ষাৎ করতে বেরোব, সে একেবারে অসম্ভব। অথচ সেটি আমার ছুটির শেষ দিন। শনিবার। সোমবাবে আমাকে জয়েন করতে হবে। একটিমাত্র দিন মধ্যে।

সকালবেলাটা তবু যা হোক করে কাটল। দুপুরবেলা আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠলাম। বললাম—ধুত্তোর, কাঁহাতক এমন বসে থাকা যায়! দাও তো রেন-কোটটা বের করে, একটু ঘুবে আসি।

গিন্নী বললেন, তা বটে। কাল সারাটি রাত এসেছ রেলে ঠাণ্ডা লাগিয়ে। তার উপব এখন বিষ্টিতে ভিজে জ্বর বাধাও। ওসব হবে না।

আমি বললাম, কী পাগল, অসুখ হতে আমার দেখেছ কখনও। আর এতকাল পরে এলাম, একবার দেখা করতে যাব না। লোকগুলো কি ভাববে।

গিন্নী বললেন, ভাবুক গে যা খুশি, এই বাদলায় কোথাও যাওয়া-টাওয়া চলবে না, সোজা কথা।—বলে দুম্ দুম্ পা ফেলে চলে গেলেন।

আমার গিন্নীটির এই একটি মজা দেখেছি। এমনিতে এমন বুদ্ধিমতী, অথচ এক এক সময় যেন ছেলেমানুষের মতো অবুঝ হয়ে যান। বেরোনো হল না। মিছে ঝগড়াঝাটি বাড়িয়ে কি লাভ। সারাটা দুপুর ধরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি চলল। আমিও ইজি-চেয়ারে শালমুড়ি দিয়ে বই পড়ে পড়ে কাটালাম।

বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা কমে এল। চেয়ে দেখলাম, আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়ে এসেছে। চাকরকে ডেকে বললাম, ওরে বিশু, খানিকটা কড়া করে চা এনে দে তো বাবা। খেয়ে একবার একটু বেরোই।

বিশু আমার অনেক কালের চাকর। তার জিম্মাতেই বাড়ি রেখে দেশে এসেছিলাম। চা সে এনে দিলে, দিয়ে বললে, কিন্তু এখন সন্ধ্যের মুখে

বেরোবেন না, ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

আমি বললাম, কেন তোমার গিন্নিমা মন্তর দিয়েছেন নাকি ?

সে বললে, ঠাণ্ডার জন্যে বলছি না। একটা গোরু বেরিয়েছে।

আমি বললাম, গোরু বেরিয়েছে কি ?

সে বললে, এ গোরু নয়। পাহাড়ী গোরু। ওই যে বিশন না কি বলে।

আমি বললাম—বাইসন।

সে বললে, হ্যাঁ। তাই এসেছে।

বাইসন এসেছে কি রে বাবা ? বাইসন সে অঞ্চলে আছে জানি। কিন্তু তারা থাকে মাঠে—লোকালয় থেকে অনেক দূরে। শহরে আসবে কোত্থেকে।

বিশু বললো, তা কি জানি। দিন সাতেক হল তার একটা এসে শহরে ঢুকেছে। সারা রাত দৌরাত্ম্য করে বেড়ায়। ভয়ে কেউ সন্ধ্যের পর ঘর থেকে বেরোয় না।

একদম বাজে কথা। বাইসন একটা কোনো গতিকে ছিটকে এসে শহরে ঢুকেছিল—এ পর্যন্ত যদি বা মেনে নিই, সাত-সাতটা দিন সে শহরের মধ্যে টিকে আছে, এমন হতেই পারে না। শহরভর্তি মানুষ আছে, পুলিস আছে তবে কি করতে ?

বললাম, আচ্ছা আচ্ছা তুই এখন পালা।

বিশু বললে, বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু আমি মিছে কথা বলিনি। ওই তো জগদীশবাবু আসছেন, ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না।

জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলাম, সেখানকার একটি ভদ্রলোক বাড়িতে ঢুকছেন।

বিশু দোর খুলে দিয়ে চলে গেল। জগদীশবাবু ঘরে এসে বসলেন। জগদীশবাবুর আদিবাড়ি রংপুরের দিকে। তিনপুরুষ ধরে নীলগিরিতেই ডমিসাইল হয়ে গেছেন। ওখানে একটা বায়োস্কোপের বাড়ি খুলে ব্যবসা চালাচ্ছেন। তিনিই নাকি মালিক ম্যানেজার সব। আমার সঙ্গে সাধারণ রকম আলাপ পরিচয় ছিল, যেমন লোকের সঙ্গে লোকের হয়ে থাকে। বসে বললেন, ছেলেদের মুখে শুনলাম, আপনি এসেছেন তাই একবার এলাম। কখন পৌঁছলেন এসে ?

আমি বললাম, আজই সকালবেলা। বাদলার জন্যে বেরোতে পারিনি, নইলে আমার উচিত ছিল একবার ঘুরে আসা।

জগদীশবাবু বললেন, তাতে আর কি হয়েছে।

বিশু চা দিয়ে গেল। জগদীশবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, কিন্তু আপনি আজ এসে পড়ায় আমি ভারী বল পেয়ে গেছি। সেই কথাটাই বলতে এলাম। চলুন না, আজ একবার ছবি দেখে আসবেন।

আমি বললাম, ছবি মানে, বায়োস্কোপ ? এই বাদলায় ?

জগদীশবাবু বললেন, বাদলাতেই তো মজা।

আমি বললাম, মাপ করবেন মশাই। ওসব মেয়েমানুষের ঠ্যাং দেখা আমার সয় না। আমি বুঝি, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, গণ্ডার। বসে বসে খালি মেমের নাচ আর চোখ-ঘুরুনি দেখা কি ভদ্রলোকের পোষায় ?

জগদীশবাবু বললেন, আহা, আগে থেকেই ঘাবড়াচ্ছেন কেন। মেমসাহেবের ছবি নয়, বাঘ-ভাল্লুকেরই মেলা—আফ্রিকা স্পিক্স্। কেমন যাবেন তো ?

'আফ্রিকা স্পিক্স্' আমি আগেও দেখেছি। বড়ো ভালো বই। অনেক কিছু শেখবার জিনিস আছে। তোমরা যে না দেখেছ, এবার এলে দেখো। সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে তার মধ্যে আবার একটা জায়গা—আফ্রিকার নান্দী আর মাশাই জাতেরা কি রকম করে সিংহ মারে তার ছবি। নাম শুনে সেই জায়গাটা আবার দেখবার ইচ্ছে হল। বললাম, আচ্ছা, 'আফ্রিকা স্পিক্স্' হলে যেতে পারি। আপত্তি নেই।

শুনে জগদীশবাবু যেন স্বস্তি পেলেন মনে হল। একটু আশ্চর্যও লাগল। কোনোদিন তিনি এরকম জোর করেন না, আজই আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি এত অস্থির কেন ? বললাম, ব্যাপার কি বলুন তো ? হঠাৎ আমাকে পাকড়াবার এত তাড়া কেন ?

জগদীশবাবু বললেন, আর বলবেন না ভাই। মহা ফ্যাসাদে পড়া গেছে। এখন আপনারা না রাখলে মারা যাই।

বললাম, কী ফ্যাসাদ ?

জগদীশবাবু বললেন, ক-দিন ধরে একটা সাহেব এসেছে। রাজার গুষ্টির নাকি কে হয়। তাকে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনার আর পুলিসসাহেবের আনন্দের অন্ত নেই। এখন তিনিটির হঠাৎ শখ হয়েছে সিনেমা দেখবেন, আজ যাবার কথা। অথচ যা দিনকাল পড়েছে, আমার ওখানে থাকতে থাকতে যদি কেউ তাকে গুলি-টুলি করে বসে, তবেই আমি গেছি। আপনারা দুজন থাকলে

আমি একটু বল পাই।

আমি বললাম, তার মানে আমাকে তাঁর বডিগার্ড হতে হবে। আমি পারব না মশাই। তার চেয়ে আমার গুর্খা দরোয়ানটাকে নিয়ে যান।

জগদীশবাবু বললেন, ছি! ছি! বডিগার্ড হতে যাবেন কেন আপনি? আপনি আমার বন্ধু বলেই বলছি, গেলে আমি একটু ভরসা পাবো। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি মশাই, আমার হয়েছে উভয় সংকট, বুঝতে পারছেন? আপনারা না বাঁচালে বিদেশী বাঙালীকে কে বাঁচাবে বলুন? 'না' বললে আমি ছাড়ছি না আপনাকে।—বলে ভদ্রলোক উপুড় হয়ে একেবারে আমার হাত চেপে ধরলেন।

লজ্জায়ই পড়লাম। বললাম, আচ্ছা আচ্ছা, যাবো এখন হাত ছাড়ুন।

জগদীশবাবু উঠে বসলেন, বললেন, বাঁচালেন ভাই, আমার একটা দুর্ভাবনা ঘুচল। আপনাকে বন্দুক নিতে হবে না, কিছু না, শুধু গিয়ে ধারটিতে বসে থাকবেন। মানে, কি জানেন, আপনি হলেন একজন নামজাদা লোক, বন্দুকে পিস্তলে আপনার টিপের কথা না জানে এমন মানুষ নীলগিরিতে নেই। আপনাকে উপস্থিত দেখলে আর কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না।

আমি বললাম, বেশ। কিন্তু যাব যে, আপনাদের তো শুনছি নাকি বাইসন বেরিয়েছে শহরে।

জগদীশবাবু হেসে বললেন, এর মধ্যেই শুনেছেন? নাঃ, এ শহরের লোকেদের বুকের জোর আছে, মানতেই হবে।

আমি বললাম, কিন্তু কথাটা কি, খুলে বলুন তো? সত্যি এসেছে বাইসন?

জগদীশবাবু বললেন, আপনিও যেমন! বাইসন শহরের ভেতরে আসে, শুনেছেন কখনও?

বললাম, তবে?

তিনি বললেন, কিচ্ছু না। ক-দিন হল একটা ষাঁড় বোধহয় ক্ষেপে গিয়েছিল। রাতের বেলা সে দুদ্দাড় করে বেরিয়েছে, দুটো লোককে জখমও করেছে। শুনেছি, তার একজন নাকি মারাই গেছে হাসপাতালে। ব্যাস্, আর পায় কে, শহরের লোক ভয়ে অস্থির। বাইসন এসেছে, রোজ বিশ-ত্রিশটা করে লোককে ঘায়েল করছে ইত্যাদি রকমের সব লোমহর্ষক বুলেটিন মুখে মুখে ছড়াচ্ছে। আরে বাবা, কেউই তো তোরা বেরুচ্ছিস্ না ঘর ছেড়ে—মারবে যে, বিশ-ত্রিশটা লোক পাচ্ছে কোথায় সে রোজ রোজ?

আমি বললাম, যাক, যাচ্ছি তো, দেখবেন যেন শেষে বাইসনে খায় না।

জগদীশবাবু বললেন, কিছু ভয় নেই, আমি তো থাকব সঙ্গে। নেহাতই যদি খেতে আসে, অ্যায়সা এক ধমক লাগাব, ছুটে পালাতে পথ পাবে না।—বলে হো হো করে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসির ধাক্কায় আমার ঘরের ছাত কেঁপে উঠল, ফাট ধরে আর কি।

কথাটা একেবারে মিথ্যে বলেননি, গলা নিয়ে গর্ব করতে পারতেন বটে ভদ্রলোক। জীবনে বহু জায়গায় ঘুরেছি, অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি, এমন একখানা জাঁহাবাজ গলা আর দেখলাম না। সে যেন বাজের আওয়াজ, যেমন গম্ভীর, তেমনই ভরাট, সে গলার একখানা ধমক খেলে বাইসন তো বাইসন, হাতি অবধি উলটে পড়ে যায়।

আমিও হেসে বললাম, বেশ, আপনার গলা ধরেই ঝুলে পড়লাম। যা করেন কালী।

জগদীশবাবু উঠে পড়লেন। বললেন, আমি এখন যাই তা হলে। ছটা আন্দাজ এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।

বিশুটা ছাতা ধরে তাঁকে গাড়িতে পৌঁছে দিলে। ফিরে এসে আমাকে বললে, আপনি আজ বায়োস্কোপে যাবেন?

আমি বললাম, ভয় নেই রে তোর, বাছুরে আমাকে খাবে না।

সে বললে, করুন যা ভালো বোঝেন। কিন্তু আমার ভালো ঠেকছে না। যে দুটো লোককে মেরেছে, তারা বুনো। বুনোরা মিছে কথা কয় না।

আমি বললাম, জ্বালালে। তোর যদি ভয় ধরে থাকে, তুই কাঁথামুড়ি দিগে যা। আমাকে বকাসনি।

ছটার সময় জগদীশবাবু এসে আমাকে তুলে নিলেন। সন্ধ্যা ছটায় টাইম।

গিয়ে দেখলাম, এমন নামজাদা বই, তবু লোক বিশেষ হয়নি! বাদলা, বাইসনের আতঙ্ক আর সেদিন বিশেষ করে পুলিসের কড়াকড়ি—তিনে মিলেই দিশি লোকের উৎসাহ কমিয়ে দিয়েছে বোধ হয়। নিচের হলটায় পাবলিকের বসবার জায়গা, সেখানে বড়ো জোর জন পঞ্চাশেক লোক বসে আছে। ওপরের বক্সগুলো কিন্তু সব একেবারে ঠাসা—বড়ো থেকে চুনোপুঁটি সায়েব ফিরিঙ্গি কেউ আর আসতে বাকি নেই। মাঝখানে রয়াল বক্সে সেই মূল্যবান সায়েবটি। তার পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর দুই বডিগার্ড আর দুটো সার্জেণ্ট, সবার বেণ্টেই পিস্তল। সায়েবের এক পাশে ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিস-সায়েব, আর এক পাশে

বসলাম আমি আর জগদীশবাবু।

প্রথমে একটা ছোট কমিক। তারপর খানিকটা খেলা-ধুলোর ছবি দেখিয়ে আসল বই শুরু হল।

গোড়ার দিকটা তেমন কিছু দেখবার নেই, সবই আমার জানা কথা। তারপর ক্রমে সেই সিংহ শিকারের জায়গাটা কাছে এল। আমিও খাড়া হয়ে উঠে বসলাম।

নান্দীদের সিংহ শিকারের নিয়মটা অদ্ভুত—যেমন লাগে তাতে গায়ের জোর, তেমনই লাগে বুকের পাটা। সবাই মিলে গোল হয়ে তারা সিংহকে ঘিরে ফেলে, তারপর আস্তে আস্তে সেই ঘেরটা কমিয়ে ছোট করে আনতে থাকে। অস্ত্র বলতে তাদের সম্বল শুধু বড়ো বড়ো বল্লম, আর লতা দিয়ে বোনা ঢাল। সেই ঢালের ওপর বল্লম দিয়ে পিটে তারা বাজনা বাজায় আর তার তালে তালে গান গায়। গানের আওয়াজে সিংহ ক্ষেপে ওঠে। তারপর লাইন ভেঙে পালাবে বলে হঠাৎ একটা লাফ মেরে একদিকের একটা লোককে পেড়ে ফেলে। সে তক্ষুনি বল্লম ফেলে সিংহকে জড়িয়ে ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বল্লম ছুটে এসে সিংহকে একেবারে ভীষ্মের শরশয্যা বানিয়ে দেয়। সবসুদ্ধ সে একটা দেখবার মতো জিনিস।

সমস্ত হলে টুঁ শব্দটি নেই। আমরা ঝুঁকে বসে নান্দীদের যুদ্ধযাত্রা দেখছি।

দল বেঁধে ঢাল-বল্লম নিয়ে তারা গ্রাম থেকে বেরোল। মাঠের পারে সিংহ বসে ছিল, তাকে গিয়ে ঘিরে ফেললে। সিংহও উঠে দাঁড়াল। নান্দীদের লাইন ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। সিংহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলে। তারপর কেশর ফুলিয়ে এক গর্জন ছেড়ে সামনের দিকে ছুটে এল। নান্দীরা বল্লম তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ওদিকে কিন্তু আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। সিংহের গর্জন মিলিয়ে যেতে না যেতে হলের বাইরে থেকে এক ভয়ংকর গর্জন শোনা গেল।

সে হাঁক জীবনে যে একবার শুনেছে, তার চিনতে ভুল হয় না। বিশুটাই ঠিক বলেছিল—বাইসন।

সঙ্গে সঙ্গে নিচের হলের মধ্যে যেন একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। বাইসনের হাঁক কানে আসতেই লোকগুলো সব তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, তারপর সুটসাট যে যেখান দিয়ে পারে, দৌড়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, ভয়ে কারও মুখে কথাটি নেই অথচ এ ওকে ঠেলে টেনে সরিয়ে ডিঙিয়ে পালাবার

চেষ্টা করছে—সে যেন পুরনো কালের একটা সাইলেণ্ট ছবি। আধ মিনিটের ভেতর হল খালি হয়ে গেল।

ছবি কিন্তু ঠিক চলছে। সায়েবরা রয়েছেন, স্পেশাল নাইট, ছবি বন্ধ হবার জো নেই। তাতে এমন নিঃশব্দে চক্ষের পলকে নিচের হল খালি হয়ে গেছে, সেদিকে বোধ হয় সকলের নজরও পড়েনি।

আমি আবার ছবির দিকে তাকালাম। সিংহ তখন সোজা ছুটে নান্দীরা যেখানে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তার সামনেটায় এসে পড়েছে। সেইখানে এসে সে একবার থেমে দাঁড়াল, পাঁজরায় ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে ভয়ানক গর্জন করে উঠল। আর ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পায়ের নিচের হলের ভেতরে পাল্টা গর্জন উঠল। বাইসন হলের ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

বাইসনকে সিংহ ভয় করে জানতুম। কিন্তু বায়োস্কোপের ছবির কি সত্যি প্রাণ আছে? বললে বিশ্বাস করবে না তোমরা, কিন্তু আমি এক অক্ষর বানিয়ে বলছি না—সত্যিই যেন পাগলা বাইসনকে সামনে দেখে ছবির সে সিংহেরও ভয় ধরল। সামনের দিকে লাফ মারতে মারতে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

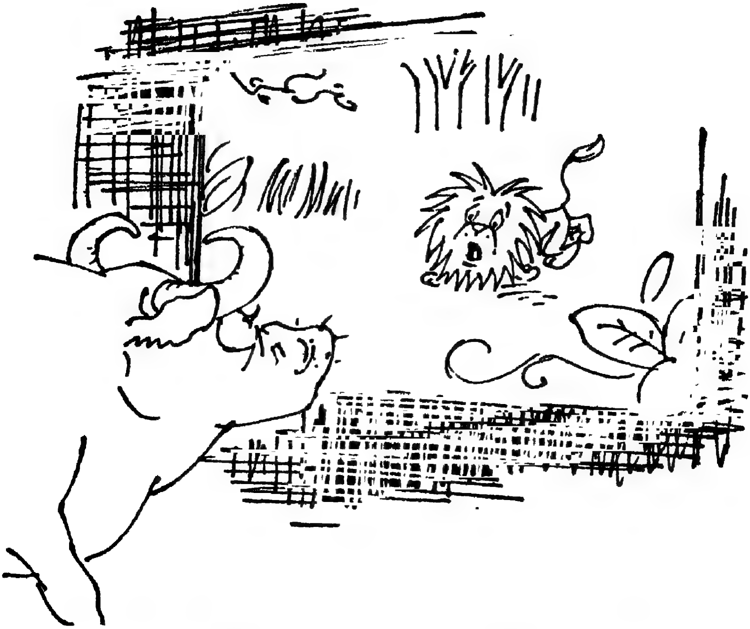

অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম, সে নড়ছে না চড়ছে না, যেন তার সমস্ত দেহ একেবারে জমে পাথর হয়ে গেছে। চট করে উঠে রেলিঙের ওপর দিয়ে

ঝুঁকে দেখলাম, আমাদের ঠিক নিচেই বাইসন দাঁড়িয়ে। আবছা অন্ধকারে চেহারাটা ভালো দেখা যায় না, মনে হল, যেন অন্ধকারের একটি ছোট পাহাড়। নিথর নিস্পন্দ, একদৃষ্টে ছবির পর্দায় সিংহের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে। সেকেণ্ড দুত্তিন এই ভাবে কাটল। তারপর আমার কানের পাশে জগদীশবাবুর গলাখানা বেজে উঠল, অর্ডার!

গলা বটে। সেই বাজের ধমক খেয়ে সিংহের যেন মূর্ছা ছুটে গেল। সে নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল, আবার নড়ে উঠল।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! ছবির যা গল্প, তাতে তার তখন সামনে লাফ মেরে নান্দীদের ওপর পড়বার কথা। তা না করে সে এক পা এক পা করে পেছু হটতে শুরু করলে। আর তার সে তেজ নেই, সে গর্জন নেই, সামনে বাইসনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে পায়ে পায়ে পেছিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে অনেক দূর পেছনে গিয়ে সে দাঁড়াল, দাঁত বার করে একবার গরগর করে উঠল। এবার আর আগের মতো গর্জন নয়। বরং আওয়াজ শুনে মনে হল, গর্জনটাকে সে উলটে ঢোঁক গিলে গলার ভেতরে ফিরিয়ে নিচ্ছে, যেন বাইসনের কাছে মাপ চেয়ে বলছে, উইথড্রন।

কিন্তু বাইসন তার সে কাতর মিনতিতে কান দিলে না। তার আওয়াজ কানে যেতেই সে হাঁক ছেড়ে একেবারে সোজা চার্জ করল — কামানের গোলার মতো সিধে ছুটে গিয়ে স্টেজের ওপর লাফিয়ে উঠে সিংহকে এক প্রচণ্ড গুঁতো বসিয়ে দিলে। ফ্রাশ করে পর্দাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

বক্সে বক্সে মেমসায়েবরা চিৎকার করে উঠল। জগদীশবাবু চেঁচিয়ে বললেন, লাইট!

সঙ্গে সঙ্গে হলের সমস্ত আলো জ্বলে উঠল। আমরা সবাই আসন ছেড়ে ছুটে রেলিং ধরে দাঁড়ালাম।

নিচে তখন প্রলয়কাণ্ড চলেছে। আলো জ্বলতেই ছবি অদৃশ্য হয়েছে—সিংহকে না খুঁজে পেয়ে বাইসন একেবারে ক্ষেপে উঠল। লাফিয়ে সে স্টেজ থেকে নেমে এল, পিঠে করে চেয়ারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। তার সেই ভয়ংকর মূর্তি দেখে কয়েকজন মেম ফিট হয়ে পড়ল, সায়েবরা তাদের নিয়ে ব্যস্ত। ওদিকে বাইসন খালি গাঁক গাঁক করে গজরাচ্ছে আর চেয়ার টুল সব ভেঙে একশা করে দিচ্ছে।

জগদীশবাবু চেয়ে চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, দেউলে করে ছাড়বে

দেখছি।

পুলিস সায়েব সার্জেণ্টদের বললেন, গুলি চালাও।—বলে নিজেই পিস্তল বার করে তাকে তাক করে ঘোড়া টানলেন। সার্জেণ্ট আর বডিগার্ডদের পিস্তলও ছুটল।

বীভৎস দৃশ্য! হলের মধ্যে আটকা পড়েছে বাইসন—চারিদিকে চেয়ার রেলিং আর গ্যালারির চাপে ভালো করে নড়তে চড়তেও পারছে না, পায়ে পায়ে হোঁচট খাচ্ছে। আর ওপর থেকে চার-পাঁচজন লোক সমানে তার ওপরে গুলি চালাচ্ছে। বাইসনের সারা গা বেয়ে ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ছে, তবু পিস্তলের পাঁচ-দশটা গুলিতে কাবু হবার জীব সে নয়। ওর মধ্যেই সে প্রাণপণে ছোটাছুটি করতে লাগল। একবার ছুটে গিয়ে দোরের ওপর পড়লও, কিন্তু সে দোরগুলো খোলে হলের ভেতর দিকে—ভেতর থেকে ঠেলা খেলে তারা চৌকাঠের ওপর সেঁটে বসে যায়, না ভেঙে তাকে সে ভাবে খোলা সম্ভব নয়।

পালাতে না পেরে বাইসন ধীরে ধীরে হলের মাঝখানে ফিরে এল। অসহায়ের মতো ওপর দিকে চেয়ে কাতর গলায় ডেকে উঠল।

কিন্তু বাহাদুর বলতে হবে সায়েব বাচ্চাদের—নাগালের বাইরে থেকে ক-জনে মিলে একটা জীবকে মারছে, তাতেই তাদের হাত ঠকঠক করে কাঁপছে। একটা গুলি বাইসনের গায়ে লাগে তো, দশটা যায় মিস হয়ে।

জগদীশবাবু আমাকে বললেন, কান্তিবাবু, এদের দিয়ে হবে না, আপনি শেষ করে দিন ওটাকে।

আমি বললাম, ছিঃ!

রোমের গ্ল্যাডিয়েটারদের কথা বইয়ে পড়েছি, কিন্তু এর তুলনায় সেও ঢের ভদ্র জিনিস। সে তবু হত হাতাহাতি লড়াই, সমানে সমানে। আর এ একগুষ্টি মানুষ মিলে একটা জীবকে তিল তিল করে বধ করছে—তার না আছে পালটে মারবার উপায়, না আছে পালাবার পথ খোলা। এর চেয়ে নিচ কাপুরুষতা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। আমি ছুঁড়ব সেই জানোয়ারের ওপর গুলি? আমি কান্তি চৌধুরী, যার নাম তিনটে কন্টিনেন্টের লোকে জানে! তার আগে বন্দুক ছেড়ে চুড়ি পরব হাতে।

ক্রমে বাইসনের শক্তি ফুরিয়ে এল। লাফালাফি বন্ধ করে সে হলের এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর আরও গোটাকতক গুলি খেয়ে ধীরে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়লাম। কাছে গিয়ে তার মুখটাকে দু-হাতে করে তুলে ধরলাম; দেখলাম, তার দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তখনও তার একটু একটু নিশ্বাস বইছিল। তারপরই একটা জোর নিশ্বাস ছেড়ে চারটে পা টান করে দিয়ে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

সায়েবরা নেমে এল। রাজবংশী সায়েব তখনও কাঁপছে। বললে, একেবারে মরেছে তো ? আমি বললাম, এতগুলো বীরপুরুষ যেখানে, না মরে যায় ? গুলি না লাগলেও শুধু লজ্জায়ই মরে যেতো। বলে সোজা হল থেকে বেরিয়ে এলাম। বিষ্টিতে ভিজে হেঁটেই বাড়ি ফিরলাম—ঐ মহাবীরদের সঙ্গে এক গাড়িতে গায়ে গা দিয়ে বসতে ঘেন্না হচ্ছিল।

গিন্নী কিন্তু শুনে বললেন, তোমারই তো ভুল। নইলে যাদের দেশের সিংহই অতটা ভয় খেয়ে যায়, তাদের মানুষরা কি করবে বলে তুমি আশা করেছিলে ? শুনে মনে হল, কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়, সায়েবদের দোষ নেই। পরদিন গিয়ে সায়েবদের সঙ্গে আবার ভাব-সাব করে এলাম।

কিন্তু আরও পরে জেনেছি, গিন্নীই ঠকেছিলেন। সিংহ সত্যি করে ভয় পায় নি—ছবির সিংহ ভয় পায় না। ওটা হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

আমরা বলিলাম, কি ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বাইসনের গর্জন শুনে অপারেটর ভয়ে কল বন্ধ করে ফেলেছিল। তারপর জগদীশবাবুর হাঁকে চটকা ভেঙে তাড়াতাড়ি আবার কল চালিয়েছে। কিন্তু গোলমালে তখন তার মাথার ঠিক নেই, তাই অজানতে কণ্ট্রোল ভুল দিকে ঠেলে ব্যাক-গিয়ার করে দিয়েছে। ফিলমও তাই উল্‌টো বাগে ঘুরে গেছে, মনে হয়েছে, যেন সিংহই পেছিয়ে যাচ্ছে।

আমরা বলিলাম, কিন্তু ফিলম কি পেছন দিকে চালানো যায় ?

কান্তি চৌধুরী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, যায় কি না যায়, তার আমি কি জানি ! পছন্দ না হয় যদি, শুনতে না এলেই পারো !

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ( ১৯১৮— )

# ইদু মিঞার মোরগা

বৌ জোহরা প্রায়ই ঝগড়া করে :

—ওটাকে এবার বিক্রি করে দাও না। দিব্যি তেল চুকচুকে হয়েছে—গোস্ত হয়েছে অনেক। এখন বেচলে কোন্ না চারটে টাকাও দাম পাওয়া যাবে ওর !

কিন্তু ইদু মিঞা কিছুতেই রাজী হয় না। বলে, এখন থাক।

—থাক ? কেন থাকবে ? খাসী মোরগ—গোস্ত খাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজে তো লাগবে না। মিথ্যে পুষে লাভ কি ?

—ওকে পুষতে তোমার কি খুব খরচ হচ্ছে ?—ইদু মিঞা কান থেকে একটা বিড়ি নামায় : ঘরের খুদকুঁড়ো আর আদাড়ে-পাঁদাড়ে যা পায় কুড়িয়ে খেয়ে বেড়ায়। ওর জন্যে তোমার চোখ টাটায় কেন ?

জোহরা বলে, এমনি টাটায় না। আর ক-দিন পরে বুড়ো হয়ে যাবে, পোকা পড়বে গায়ে, শক্ত ছিবড়ে হয়ে যাবে মাংস। আট গণ্ডা পয়সাও কেউ দেবে না তখন।

—দরকার নেই। ও যেমন আছে তেমনি থাক।

শুনে গা জ্বালা করে জোহরার।

বেশ তো, বেচো না তুমি। একদিন নিজেই আমি ওটাকে কেটে উনুনে চড়াবো।

বিড়িটা ধরাতে ধরাতে শান্ত কঠিন গলায় ইদু মিঞা বলে : তা হলে সেদিনই আমি পাড়া পড়শী জড়ো করবো সমস্ত। তারপর সকলের সামনে চেঁচিয়ে তিনবার বলবো : তালাক্—তালাক্—তালাক্—

—এতবড়ো কথা তুমি বলতে পারলে আমাকে ! আমার চাইতে ওই খাসী মোরগটাই বড়ো হল তোমার কাছে !—জোহরার চোখে জল আসে : বেশ তাই হোক। আমাকে তুমি তালাকই দাও।

জোহরার চোখের জল অনেকবারই অনেক অঘটন ঘটিয়েছে ইদু মিঞার জীবনে। ডাইনে চলতে গিয়ে অনেকবার বাঁয়ে ঘুরেছে—যাদের সঙ্গে দাঙ্গা